প্রকাশক,

প্রজাপতি-সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার

২০৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মহারাজা স্যর লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর।

উৎসর্গ পত্র।

যিনি পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালা সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের—

কলাবিদ্যার এবং ধর্ম্মালোচনার পৃষ্ঠপোষক

যাহার বংশের যশের প্রভায়

বাঙ্গালার ইতিহাস আলোকিত

যিনি নিজগুণে সর্ব্বত্র সমাদৃত

সেই স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ

মাণিক্য বাহাদুরের করকমলে

বাঙ্গালার ইতিহাসের এই উপকরণ সংগ্রহ

বংশ পরিচয় ২য় খণ্ড

গ্রন্থকারের অসীম শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে

অর্পিত হইল।

মহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর সিং বাহাদুর।

মহারাজ-কুমার কামেশ্বর সিং—শৈশবে।

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ মাণিক্য।

মহারাজ-কুমার কামেশ্বর সিংয়ের বর্ত্তমান প্রতিকৃতি।

মহারাজ-কুমার বিশ্বেশ্বর সিং।

সূচীপত্র।

কণিকার রাজা অনারেবল রাজেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ দেও ।

কণিকার রাজকুমার

বেহার ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর
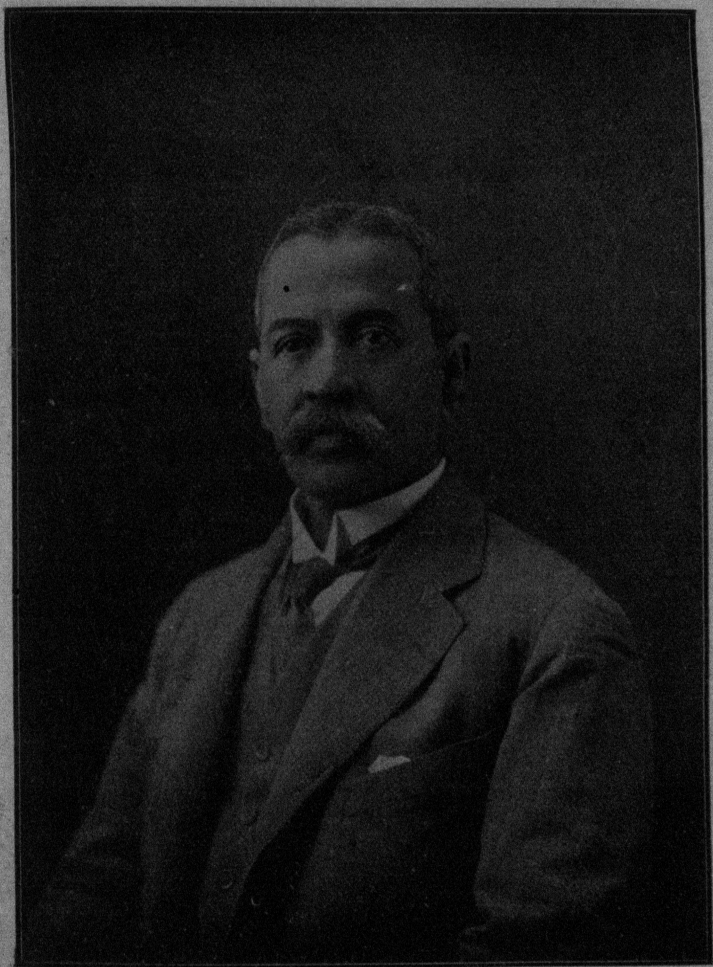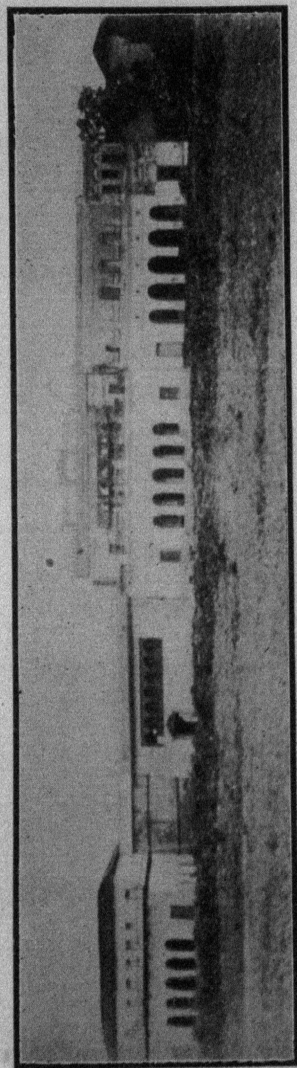
লর্ড সিংহ।

রঙ্কার রাজপ্রাসাদ।
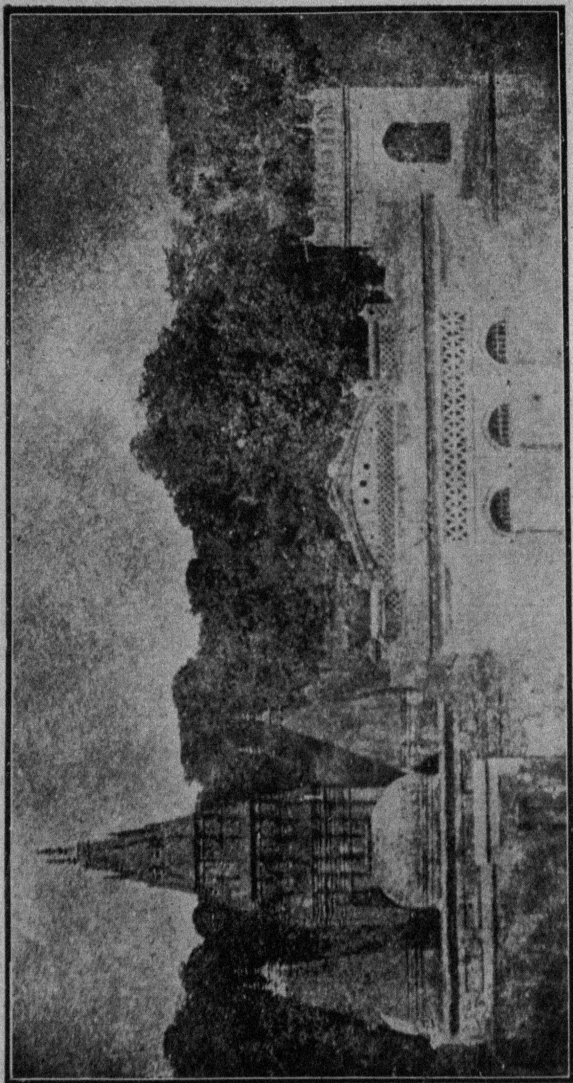
রঙ্কার দেবমন্দির।

বংশ-পরিচয়

[দ্বিতীয় খণ্ড]

লর্ড সিংহ।

লর্ড সিংহের পূর্ণনাম শ্রীযুত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। ইনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত রায়পুরের প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত সিংহ-বংশ-সম্ভূত। সিংহ-পরিবার উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ-সমাজে চিরকালই সম্মানের আসন অধিকার করিয়া আছেন। রায়পুরের সিংহ-বংশের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা, সম্ভ্রম ও খ্যাতি হিন্দুসমাজে যথেষ্ট। ইহারা বংশানুক্রমে জমিদার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লর্ড সিংহের বংশধরগণ সমরূপগড়ের রাজা চিত্রসেনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।

[বংশ-গৌরব]

সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের পিতা স্বর্গীয় সিতিকণ্ঠ সিংহ প্রথমে উকীল ছিলেন; পরে মুন্সেফ ও সদর আমিন হইয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি চারি পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম স্বর্গীয় রমাপ্রসন্ন সিংহ; ইনি বীরভূমের সরকারী উকীল ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম বাবু দেবেন্দ্রনাথ সিংহ; ইনি বাড়ীতে থাকিয়া বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান

[পিতা ও ভ্রাতৃগণ]

ব্রহ্মায় ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড মিণ্টো কর্ত্তৃক প্রথম ব্যাঘ্র-শীকার।

করিতেন। তৃতীয় পুত্রের নাম কর্ণেল নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ; ইনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস-ভুক্ত ছিলেন এবং বহুদিন সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্থ বা কনিষ্ঠ হইলেন শ্রীযুত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন দুই বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং তাঁহার শিক্ষার ভার তাঁহার জননী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর নিপতিত হইয়াছিল। তাঁহার জননী অতীব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বাল্যকালে তাঁহার পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত 'রায়পুর মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ে' ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে তিনি বীরভূম গবর্মেণ্ট জেলা স্কুলে প্রবিষ্ট হন। সেই সময়ে স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সোম এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ইঁহারই নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি মেধাবী ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন এবং গভীর মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতেন। এই স্কুল হইতে তিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করেন এবং বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। এখান হইতে দুই বৎসর পরে তিনি ফার্ষ্ট্ আর্টস পরীক্ষা প্রদান এবং গুণানুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম স্থান অধিকার করেন। পর বৎসরে তাঁহার বিবাহ হয়।

[শিক্ষা]

সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের পিতা আর্স্কাইন এণ্ড কোম্পানীর নিকট দশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীযুত নরেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সেই সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় এই টাকা তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়ে। তিনি সেই সময়ে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন।

এখনকার মত তখনও ভারতীয় কলেজ হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইলে ছাত্রদের ভাগ্যে ভাল কাজকর্ম খুব কমই জুটিত। এই

[বিলাত-গমন]

জন্য নরেন্দ্রপ্রসন্ন সঙ্কল্প করেন,—বিলাতে গিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বড় চাকুরী লইয়া দেশে ফিরিবেন। ঠিক এই সময়ে এই টাকা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়ে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্র-প্রসন্নও তাঁহার সঙ্কল্পের সহিত নিজ সঙ্কল্প মিশাইয়া দেন। কনিষ্ঠের আগ্রহ দেখিয়া নরেন্দ্রপ্রসন্নের সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। সে সময়ে বিলাত-গমনের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজে ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। তখন বিলাত যাইলে জাতি যাইত; লোকে সমাজচ্যুত হইত। দুই ভ্রাতাই ভাল রকমই জানিতেন যে, তাঁহাদের সঙ্কল্পের কথা একটু প্রচারিত হইলে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন। তখন সঙ্কল্প-সাধন তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সেইজন্য দুই ভ্রাতা অতি সংগোপনে বিলাত-যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দুই ভ্রাতা বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহারা জাহাজে চড়িবার এক ঘণ্টা পরে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন এই সংবাদ জানিতে পারেন। তাঁহারা ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত দুই ভ্রাতার পশ্চাদনুসরণ করেন; কিন্তু তথায় যাইয়া দেখেন, জাহাজ চলিয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় অধ্য-বসায় সহকারে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তিনি 'লিনকন্‌স ইনে' প্রবিষ্ট হইয়া ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার গুণপণার পরিচয় সকলে প্রাপ্ত হন। ইনি রোম্যান আইনের পরীক্ষায় প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ডক্টর হাণ্টার তাঁহার ভূয়সী

প্রশংসা করেন। পাঁচ বৎসর তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন। এই পাঁচ বৎসরে তিনি প্রায় সকল পারিতোষিকই লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল পুরস্কারের পরিমাণ ৬০০ পাউণ্ড, তখনকার সময় প্রায় ৯০০০৲ টাকা। শিক্ষক-মণ্ডলী সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের যোগ্যতা ও পারদর্শিতায় এরূপ বিশ্বাসী ছিলেন যে, তাঁহাকে শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত দিতে হয় নাই। পড়িবার সময়ে তিনি ভাইকাউণ্ট ব্রাইস, ফ্রেডারিক হ্যারিসন এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইংরেজগণের সহিত পরিচয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিষ্টার-শ্রেণীভুক্ত হন। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং ইউরোপের কতিপয় ভাষাও শিক্ষা করেন। এই বৎসর নভেম্বর মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবার সনন্দ লাভ করেন। সেই সময়ে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের অভাব ছিল না। নূতন ব্যারিষ্টারের ভাগ্যে মামলার নথিপত্র জুটিত না। এই অবস্থায় সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে আগত যুবক সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রথম প্রথম তিনি সাফল্যলাভে সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম, একাগ্র অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, নিয়মিত অধ্যয়ন দ্বারা তিনি আপনাকে যোগ্য করিয়া তুলিতেছিলেন। তিনি প্রত্যহ আদালতে উপস্থিত হইতেন এবং তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টারগণের মামলা-পরিচালন-কৌশল দেখিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেন। তিনি আরম্ভ হইতেই আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়াছিলেন; কারণ এমন পারিবারিক প্রভাব ও পরিচয় তাঁহার কলিকাতা সহরে ছিল না যাহাতে তাঁহার অধিক মামলা জুটিতে পারে।

[ব্যারিষ্টার]

কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-শ্রেণীভুক্ত হইবার পর বৎসর তদানীন্তন বিচারপতি মাননীয় মিঃ নরিস দায়রা আদালতে জনৈক দরিদ্র আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন এরূপ যোগ্যতার সহিত সেই ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন যে, এজলাস-গৃহে উপস্থিত প্রবীণ ব্যারিষ্টার ও এটর্ণিগণ এবং বিচারপতি মহোদয়ও বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই তাঁহার সাফল্যের সূচনা হয়। সকলেই বুঝিতে পারেন যে, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন উত্তরকালে পারদর্শী ব্যারিষ্টার হইবেন। অধ্যবসায়-বলে তিনি ক্রমেই উন্নতি-শিখরে উঠিতে লাগিলেন; ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পশার আরম্ভ হইল। অবশেষে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার-রূপে পরিগণিত হইলেন। তিনি যখন হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। ৮ বৎসর পরে তাঁহার পশার আরম্ভ হইয়াছিল।

[সাফল্যের সূচনা।]

[ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সুলী]

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তদানীন্তন ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সুলী মিঃ উডরফ হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হইলে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সুলী নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে একবার মাত্র জনৈক ভারতবাসীর ভাগ্যে এই উচ্চপদ-লাভ ঘটিয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসরে ভারত গবর্মেণ্ট ইঁহাকে হাইকোর্টের বিচারপতি-পদ প্রদান করিতে চাহেন, কিন্তু তিনি ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে অসম্মত হন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের তদানীন্তন এডভোকেট জেনারেল মিঃ ও' কেনেলি ছুটী লইলে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ছয়মাসের জন্য অস্থায়ি-

ভাবে এডভোকেট-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর মিঃ ওকেনেলি অবসর গ্রহণ করিলে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পদে পাকা হন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসীকে এই পদ প্রদান করা হয় নাই।

এডভোকেট-জেনারেল।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন তাঁহার শক্তি ষোল আনা নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাঁহার কর্ম্মে এতদিন তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টারের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি অনন্যমনা অনন্য-কর্ম্মা হইয়া আপনার ব্যবসায়ে কৃতিত্বঅর্জ্জনের চেষ্টা করিতেন। সে চেষ্টা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, কিন্তু এইজন্য তিনি প্রথমে রাজনীতি-চর্চ্চায় মনোযোগী হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি দেশের খবর রাখিতেন। বর্ত্তমান ঘটনাবলীর স্রোত কি ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতেন। তিনি এ সকল তথ্যের গোপনে আলোচনা করিতেন। মোট কথা, তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ না দিলেও দেশের লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতিগতির সহিত পরিচিত ছিলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের বয়স যখন ২৩ বৎসর, সেই সময়ে তিনি কলিকাতা কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ভারতের কোনও সামন্ত-রাজকে রাজ্য কুশাসন করিতেছিল বলিয়া বা কুচরিত্র এই অপরাধে বিনা বিচারে সিংহাসনচ্যুত করা হইবে না। বিচার সাধারণ আদালতে সাধারণের সম্মুখে হওয়া চাই এবং জনসাধারণের ধারণা হওয়া চাই যে, সুবিচার হইয়াছে, কেবল তাহাই নয়, এই বিচার যে সন্তোষজনক হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট এবং সামন্ত-রাজগণও স্বীকার করিবেন। এই তাঁহার কংগ্রেসে প্রথম যোগদান ও প্রথম প্রস্তাব। ভারতে অসন্তোষ, বঙ্গ-ভঙ্গ, এ দেশবাসীর অতি ঘোর দারিদ্র্য, শিল্পবাণিজ্যের

রাজনীতি-ক্ষেত্রে।

অধোগতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত তাঁহার দেশবাসীর অভিমত অপেক্ষা বিভিন্ন নহে। ভারতবর্ষ স্বহস্তে শাসন করিবার অধিকার ভারতবাসীর আছে এবং এ অধিকার তাহারা ইংরেজের কাছে ভিক্ষা হিসাবে নয় রাজভক্তির পুরস্কার-হিসাবে পাইতে চায় না—অধিকারের হিসাবেই ভারতবাসী স্বরাজের অধিকার চায়—এই অভিমত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময়ে এই কথাগুলি তিনি বলিয়াছিলেন।

গত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেস বরাবর বলিয়া আসিতেছে যে, ভারত গবমেণ্টের ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের শাসন-পরিষদে ভারতবাসীর নিয়োগ হওয়া উচিত। এই সম্বন্ধে ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত গবর্মেণ্টের সহিত ভারত-সচিবের লেখালেখি চলিতে থাকে। অবশেষে তদানীন্তন ভারত-সচিব মিঃ মর্লি কংগ্রেসের এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন।

ভারতে ব্যবস্থা সচীব।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বড়লাটের ব্যবস্থা-সচিব-পদে নিযুক্ত হন। এত বড় উচ্চপদ ইহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসীকে দেওয়া হয় নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পদত্যাগ করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালার শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি সদস্য থাকিবার সময় পল্লীর স্বায়ত্তশাসন-সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছিলেন। এই বৎসরেই বিলাতের গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে, সমর-সংসদে (Imperial War Conference) দুইজন ভারতবাসী প্রতিনিধি আবশ্যক, ইহারা ভারতসচিবের সহকারী থাকিবেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন

বাঙ্গালার শাসন পরিষদের সদস্য।

গভর্ণমেণ্ট অন্যতম প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া সমরসংসদে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ভারতের প্রতিনিধিরূপে সমরসংসদে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন শান্তিসভায় (Peace Conference) ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। অতঃপর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সহকারী ভারতসচিবের (Under Secretary to the Secretary of State for India) পদে নিযুক্ত হন। এই সময়েই তাঁহাকে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিংস কাউন্সিল (King's Counsil) ও পরে প্রিভি কাউন্সিলের (Privy Couneillor) করিয়াছেন। তাহার পর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহাকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করিয়া বিলাতের অভিজাত-শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর-পদে নিযুক্ত হইয়া বিলাত হইতে ভারতে আগমন করেন। বর্ত্তমান ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি এই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

লর্ড সিংহের ভাগ্যে যেরূপ অমূল্য সম্মান ও পদগৌরব লাভ ঘটিয়াছে কোনও ভারতবাসীর ভাগ্যে আর কখনও তাহা ঘটে নাই। এক কথায় তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের দেশীয় প্রথম এডভোকেট জেনারেল, ভারতের প্রথম দেশীয় ব্যবস্থা-সচিব, ভারতসচিবের প্রথম দেশীয় সহকারী, প্রথম দেশীয় "লর্ড" এবং প্রথম দেশীয় গভর্ণর বা লাট।

লর্ড সিংহের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ অনারেবল অরুণ সিংহ, ইনি ব্যারিষ্টার; দ্বিতীয় অনারেবল শিশির সিংহ ইনিও ব্যারিষ্টার; তৃতীয় অনারেবল সুশীল সিংহ, ইনি সিভিলিয়ান, এক্ষণে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, কনিষ্ঠ অনারেবল তরুণ সিংহ, ইনি বিলাতের সাণ্ডহার্ষ্ট সামরিক বিদ্যালয়ে সেনানী (Army Officer) হইবার উপযোগী শিক্ষালাভ করিতেছেন।

দ্বারবঙ্গ-রাজবংশ।

বিহার প্রদেশে দ্বারবঙ্গ-রাজবংশ খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে, সম্মান-সম্ভ্রমে এবং ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধিতে অগ্রগণ্য। এই রাজবংশ সুপ্রাচীন। এই রাজবংশের আদিপুরুষের নাম মহামহোপাধ্যায় মহেশ ঠাকুর। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী কোনও গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি মধ্য প্রদেশের কোনও রাজার সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কেবল রাজসভায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াই মহামহোপাধ্যায় মহেশ ঠাকুর তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না; তিনি অধিকাংশ সময়ই পাঠার্থীগণকে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। কথিত আছে, মহামহোপাধ্যায় মহেশঠাকুর একবার দিল্লীর বাদসাহ আকবরের সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচারে জনৈক মোল্লাকে পরাজিত করেন। আকবর তাঁহার যুক্তিতর্ক, পাণ্ডিত্য ও বিচার-পদ্ধতি দর্শন করিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ হন এবং পুরস্কারস্বরূপ এই হিন্দু পণ্ডিতকে সমগ্র ত্রিহুত সরকার প্রদান করেন। এখনকার দ্বারভাঙ্গা ও মজফরপুর জেলা দুইটি লইয়া তখনকার ত্রিহুত সরকার গঠিত হইয়াছিল।

খণ্ডনধর নামক সংস্কৃত পুস্তকের ভূমিকা-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ত্রিহুতের তদানীন্তন রাজবংশ—কামেশ্বর-বংশে পুরুষ কেহ ছিল না। এইজন্য মহামহোপাধ্যায় মহেশঠাকুর সেই রাজবংশের সিংহাসন অধিকার করেন। সম্রাট আকবর তাঁহাকে শাসন-ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছিলেন।

জনকপুরের এক কূপ-সংলগ্ন প্রস্তরখণ্ডে যে লিপি খোদিত আছে তাহা হইতেই এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় মহেশঠাকুর সম্রাট আকবরের নিকট হইতে যে ত্রিহুত সরকার পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা গঙ্গা হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং গণ্ডক নদী হইতে কোশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রিহুত পরগণায় একটি ছড়া প্রচলিত আছে তাহার অর্থও ইহা:—

আজ গাং তা সাং
আজ ঘোষা তা কোশা

পূর্ণিয়া জেলার সার্ভে-সেটলমেণ্ট-রিপোর্টে এই ছড়াটি মুদ্রিত আছে।

মহামহোপাধ্যায় মহেশ ঠাকুর সংস্কৃত ভাষায় সম্রাট আকবরের শাসনকালের একাংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে এই পুস্তকের এক খণ্ড রক্ষিত আছে। (ভিন-সেণ্ট স্মিথ প্রণীত 'Life of Akbar' নামক পুস্তকের পরিশিষ্টের ৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইনি আরও অনেকগুলি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মহামহোপাধ্যায় গোপাল ঠাকুর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহামহোপাধ্যায় গোপাল ঠাকুরের উত্তরাধিকারী রাজা শুভঙ্কর ঠাকুর। ইনি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি ভৌর হইতে ভৌয়ারায় বসবাস উঠাইয়া আনেন এবং তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; উহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা শুভঙ্কর ঠাকুরের পর রাজা পুরুষোত্তম ঠাকুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। ইহার পর রাজা নারায়ণ ঠাকুর সিংহাসনে অভি-

ষিক্ত হন। ইনি ১৬২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার উত্তরাধিকারীর নাম রাজা সুন্দর ঠাকুর; ইনি ১৬৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার পরবর্ত্তী রাজার নাম রাজা মহীনাথ ঠাকুর (১৬৬৮-১৬৮০)। রাজা মহীনাথ ঠাকুরের উত্তরাধিকারী—রাজা নরপতি ঠাকুর (১৬৮০-১৭০১) ইঁহার পরবর্ত্তী রাজার নাম রাজা রাঘব সিং (১৭০১ ১৭৩৯)।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মৌলবী আবদাস সালেমের রিয়াজ-উ-সালাতিন নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, আলিবর্দ্দী খাঁ রাজা রাঘব সিংকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, রাজা রাঘব সিং স্বাধীন ছিলেন।

রাজা রাঘব সিংয়ের উত্তরাধিকারীর নাম—রাজা বিষ্ণু সিং (১৭৩১-১৭৪৩) এবং রাজা বিষ্ণু সিংয়ের পরবর্ত্তী রাজার নাম—রাজা নরেন্দ্র সিং (১৭৪৩-১৭৬০)। ইহার পর রাজা প্রতাপ সিং সিংহাসনে আরোহণ করেন; ইনি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার উত্তরাধিকারীর নাম—রাজা মাধো সিং (১৭৭৫-১৮০৭)।

রাজা মাধো সিংয়ের পূর্ব্বে সমগ্র ত্রিহুত সরকার এই রাজবংশের সম্পত্তি ছিল এবং ইঁহারা ত্রিহুতের রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। রাজা উপাধি ইঁহাদের বংশগত। ১১৯৪ হিজরীতে অর্থাৎ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট সাহ্ আলম একখানি ফারমানে রাজা মাধো সিংকে 'রাজা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

এই রাজপরিবার ইতিপূর্ব্বে যে ঠাকুর উপাধি পুরুষ-পরম্পরায় ব্যবহার করিতেন সেই উপাধি রাজা বা বড় বড় ভূম্যধিকারীদেরই উপাধি ছিল। কাথিবাড়ের রাজন্যবর্গ এখনও ঠাকুর উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী সময়ে ঠাকুর উপাধির পরিবর্ত্তে রাজা উপাধি

ত্রিহুতের রাজগণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। মহারাজ-কুমার বাসুদেব সিং বনাম মহারাজা রুদ্র সিংয়ের আপীল-মামলায় কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ২৭ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে রায় দেন তাহার একাংশে এইরূপ লিখিত আছে :—"উপরিলিখিত বংশতালিকা হইতে জানা যাইবে যে, ঠাকুর বা রাজগণ এই রাজ্য ও সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।

ত্রিহুত স্থানবিশেষের নাম নয়; বর্ত্তমান মজফরপুর ও দ্বারবঙ্গ জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত। দ্বারবঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজের পূর্ব্ব-পুরুষগণকে কোনও একটি স্থানবিশেষের রাজা বলিয়া অভিহিত করা হইত না; পরন্তু তাঁহাদিগকে ত্রিহুতের অধীশ্বর বলা হইত। রাজ-দপ্তরের পুরাতন কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা মাধো সিংয়ের বিচারালয় ছিল এবং সেই বিচারালয়ে একজন প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন বিচারপতি নিযুক্ত ছিলেন। ইহাতেই মনে হয়, তাঁহার এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের বিচার ও রাজস্ব-আদায়-ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। রাজা মাধো সিংয়ের রাজত্বকালেই দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। এই বন্দোবস্তের সময় ত্রিহুত সর-কারের বার্ষিক জমা কলেক্টর কর্ত্তৃক যেরূপ নির্দ্ধারিত হয়, রাজা মাধো সিং তাহা অত্যন্ত অধিক মনে করেন; সেইজন্য তিনি সমগ্র ত্রিহুত সরকার জমা লইতে অস্বীকার করেন। সুতরাং ত্রিহুত সরকারের অধিকাংশ অঞ্চলই রাজা মাধো সিংয়ের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গীরদারগণ জমাস্বরূপ গ্রহণ করেন। যে সকল সম্পত্তি রাজা মাধো সিংয়ের খাসে ছিল, কেবল সেই সকল সম্পত্তিই তিনি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। রাজা মাধো সিং কলেক্টর এই মীমাংসার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য লড়িয়াছিলেনও খুব; কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সমগ্র ত্রিহুত

সরকারের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে কতক টাকা দস্তুরানা প্রদান করেন। মজফরপুর জেলার সার্ভে-সেটেলমেণ্ট-রিপোর্টে এবং ফারমিনঙ্গার-প্রণীত ভারতীয় ঘটনাবলীর রিপোর্টে (The report of the East Indian affairs by Farminger) এই কথাগুলির উল্লেখ আছে। সনন্দগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র ত্রিহুত সরকার এই রাজবংশেরই অধিকারভুক্ত ছিল।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রাজা মাধো সিং পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজা ছত্র সিং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে নেপাল যুদ্ধের সময়ে বিশিষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস তাঁহাকে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ইনি তাঁহার ডায়েরীতে মহারাজা ছত্রসিংকে ত্রিহুতের রাজা বলিয়া অভিহিত করেন। (এলাহাবাদের পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "Private Journals of Lord Hastings" নামক গ্রন্থ দেখুন)।

মহারাজা ছত্র সিংয়ের উত্তরাধিকারীর নাম মহারাজ রুদ্র সিং। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর তারিখের এক পরওয়ানায় ভারতের তদানীন্তন বড়লাট ইঁহাকে "মহারাজা বাহাদুর" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

মহারাজা রুদ্র সিংয়ের পুত্র মহারাজা মহেশ্বর সিংকেও গভর্ণমেণ্ট 'মহারাজা বাহাদুর' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন ব্যবস্থা অনুযায়ী 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি দ্বারবঙ্গ-রাজগণের বংশগত হইয়া যায়। রুদ্র সিংয়ের ভ্রাতা বাবু বাসুদেব সিং এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র বাবু গণেশ দত্ত সিং রাজ-সম্পত্তির দাবী করিয়া এক মামলা রুজু করেন। নিম্ন আদালতে, আপীল আদালতে এবং

পরিশেষে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে এই মামলার বিচার হয় এবং বিচারে সাব্যস্ত হয় যে, রাজসম্পত্তি অবিভাজ্য ; ইহাকে বিভাগ করা যাইতে পারে না। এই সম্পত্তি পূর্ব্বে একটি রাজ্য ছিল এবং এই রাজ্যার অধিকারীরা বংশানুক্রমে রাজা ছিলেন। ইহাদের অধীনে জায়গীরদার ছিল, তালুকদার ছিল এবং ইহারা সমগ্র ত্রিহুত সরকারের অধীশ্বর ছিলেন। (Moore's Indian Appeal নামক গ্রন্থের Volume I pages 187, 178, 188 and 192 দ্রষ্টব্য।) ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রুদ্র সিং পরলোকে গমন করিলে মহারাজা মহেশ্বর সিং বাহাদুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মহেশ্বর সিং বাহাদুর ইহার দুই নাবালক পুত্র— জ্যেষ্ঠ মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর ও কনিষ্ঠ বর্ত্তমান মহা-রাজাধিরাজ রামেশ্বর সিং বাহাদুরকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এই রাজবংশের আদিপুরুষ— মহামহোপাধ্যায় মহেশঠাকুরের অধস্তন ১৭শ পুরুষ। পিতার মৃত্যুকালে ইনি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না ; তখন ইহার বয়স মাত্র দুই বৎসর। কাজেই ইহার বিপুল সম্পত্তির পরিচালন-ভার গবর্মেণ্ট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হস্তে প্রদান করিলেন। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস সবিশেষ কৃতিত্ব ও প্রশংসার সহিত ১৯ বৎসর কাল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই ব্যবস্থায় মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস প্রথমে মহারাজাকে বেনারসের ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউটে পাঠাইয়া দেন। সেখানে মিঃ চেষ্টার ম্যাকনাটান

তাঁহাকে শিক্ষাদান করেন। অতঃপর তাঁহাকে দ্বারভাঙ্গায় ফিরাইয়া আনা হয় ; এখানে মিঃ আলেকজাণ্ডার তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে তিনি যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তদানীন্তন ছোটলাট স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলী তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে বিহারের কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের প্রতিনিধি ছিলেন। সেইজন্য মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং যেরূপ শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন তাহা তিনি স্বয়ং বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন। তাই বাঁকিপুরে মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংয়ের সিংহাসনাধিরোহণের সময়ে তিনি তাঁহার অভিভাষণে এই বিষয়ের উল্লেখ বিশেষরূপেই করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণের সেই অংশটুকুর মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"অদ্যকার এই উৎসবের সহিত আমার একটু বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। কারণ, দ্বারবঙ্গের নবীন মহারাজকে আমি বহুবৎসর ধরিয়াই জানি। এমন সময় গিয়াছে যখন প্রতিদিনই তিনি আমার সময় ও চিন্তার কিয়দংশ অধিকার না করিতেন। আমি তাঁহাকে তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে দেখিয়াছি ; তিনি কি ভাবে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইয়াছেন তাহা আমি ভালরূপ জানি এবং আমি আরও জানি যে তাঁহার চরিত্র, আচার-ব্যবহার, গুণ ও পারদর্শিতা তাঁহাকে রাজপদের উপযোগী করিবে। নবীন মহারাজের ভবিষ্যৎ জীবন এরূপ উৎকৃষ্ট হইবে যে, তাহাতে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ ও তাঁহার শিক্ষকবর্গের সুনাম ঘোষিত হইবে।"

মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর শিষ্টাচারসম্পন্ন, বিনম্র ও মধুরস্বভাব ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি অতীব উচ্চাঙ্গের ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় ইনি চারিবৎসর কাল জমীদারীর কাজকর্ম্ম ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন এবং জমীদারীর পরিচালন-ব্যাপারে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা

অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজ ভদ্রলোকের মতই ইংরেজী অনর্গল লিখিতে এবং বলিতে পারিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর যেমন সুন্দর ছিল, তেমনি তাহার ভাষা বিশুদ্ধ, সহজ এবং নির্দ্দোষ ছিল। ইংরেজীতে সুশিক্ষিত হইয়াও নবীন মহারাজ খাঁটি হিন্দু ছিলেন এবং জাতীয়তা-বর্জ্জিত হন নাই; ইহা তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার কথা। তিনি যেমন তেজস্বী, তেমনই স্বাধীনচেতা এবং স্বাতন্ত্র্যই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

দ্বারবঙ্গ-রাজের জমিদারী মজফরপুর, দ্বারবঙ্গ, পাটনা, মুঙ্গের, ভাতামপুর এবং পূর্ণিয়া জেলায় আছে; জমিদারীর বার্ষিক আয় প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। মহারাজার নাবালক অবস্থায় কোর্ট অফ ওয়ার্ডস এই বিপুল জমিদারীর প্রায় সমস্ত খাসে বিলির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; সেই ব্যবস্থা এখনও চলিতেছে দ্বারবঙ্গ রাজসরকার স্বব্যয়ে দ্বারবঙ্গে একটি প্রথম শ্রেণীর হাঁসপাতাল, একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল পরিচালিত করিতেছেন; এতদ্ব্যতীত জমিদারীর খরচায় দ্বারবঙ্গ ও মজফরপুর জেলায় ২৩টি পাঠশালা চলিতেছে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে এবং গবর্মেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলসমূহে ও জমীদারী হইতে অর্থসাহায্য করা হয়। মহারাজ দ্বারবঙ্গ লেডী ডফারিন হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য এই হাঁসপাতাল নারীদিগের চিকিৎসার জন্য স্থাপিত হয়।

দ্বারবঙ্গ জেলায় ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের অধিকাংশ মহারাজার জমির উপর দিয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ মহারাজের বদান্যতা ও জন-হিতৈষিণায় এই রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে; কারণ তাঁহার জমিদারীর যে যে ভূমিখণ্ডের উপর এই রেলপথ গিয়াছে সেই ভূমি মহারাজা দান করিয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে মহারাজা কলিকাতায় আসিয়া ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন ও তদীয় মহিষী লেডী লিটনের সম্মানার্থ টাউন হলে এক নৃত্য ও ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেরূপ বিপুল অর্থব্যয় করিয়া তিনি হলটি সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং যেরূপ প্রচুর আহার্য্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মার্জ্জিত রুচি ও মুক্ত-হস্ততার পরিচয় প্রস্ফুট হইয়াছিল।

মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর কয়েকবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী সদস্যগণের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তথায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অনেকবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক প্রসিদ্ধ ভূস্বামী-সভার প্রেসিডেন্ট বা অধিনায়ক ছিলেন। ভারতের আভিজাত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমেই তিনি জি-সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজার দান।

মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুরের বদান্যতা ও জন-হিতৈষণা দেশ-প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি করুণহৃদয় উদারচেতা ভূস্বামী ছিলেন এবং তাঁহার দয়া ও পরোপচিকীর্ষা সুবিপুল ছিল। মহারাজা তাঁহার জীবদ্দশায় বিভিন্ন জনহিতকর অনুষ্ঠানে সর্ব্বসাকল্যে দুই কোটি টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি মুক্ত-হস্তে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর ক্লেশ-মোচনের জন্য তিনি ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। অনশনক্লিষ্ট প্রজাদিগকে যে খাজনা মাপ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে যে অর্থ দান করিয়াছিলেন, তাহার

পরিমাণই ১০ লক্ষ টাকার উপর হইবে। তিনি ইংলণ্ডের ইম্পিরিয়ল ইনষ্টিটিউট ফণ্ডে ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য।

মহারাজা ১৮৮০-১৮৮২ খৃষ্টাব্দ, ১৮৯৫-৯৭ খৃষ্টাব্দ এবং ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। কি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে, কি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশপ্রাণ তেজস্বী ও সুবক্তা ছিলেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপির আলোচনা যে সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় হইতেছিল সেই সময় তিনি বিহার ও বাঙ্গালার ভূম্যধিকারিবর্গের প্রতিনিধিরূপ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি ভূম্যধিকারিগণের পক্ষ-সমর্থন যে ভাবে করিয়াছিলেন তাহাতে ভূস্বামিবৃন্দ যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তদানীন্তন বড়লাট লর্ড এলগিনও তেমনি তাঁহার যোগ্যতা ও যুক্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভারতের সুসন্তান স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহারাজার স্মৃতির উদ্দেশে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতের "মাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন" পত্রে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলাম, সেই সময়ে মহারাজাও তথাকার সদস্য ছিলেন। সেই সময়ে তিনি এমন অসুস্থ ছিলেন যে, অতি কষ্টে তিনি সোপানশ্রেণী আরোহণ করিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিতেন। কখনও কখনও তাঁহাকে বসিয়া বক্তৃতা করিবার অনুমতিও প্রদত্ত হইত। দেশের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা তাঁহার হৃদয়কে এমনই বিচলিত করিত যে, তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইতে বিরত থাকিতেন না। তিনি যখনই বক্তৃতা করিতেন, তখনই তাহাতে স্পষ্টবাদিতার, নির্ভীকতার

এবং প্রতিপক্ষের প্রতি যথোচিত সম্মানের পরিচয় পরিস্ফুট হইত। তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরাগী ও শ্রদ্ধাবান যেমন ছিলেন, স্বদেশের প্রতিও তেমনই তাঁহার সুগভীর ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। গবর্মেণ্টের আনুগত্যে এবং স্বদেশ-সেবায় তাঁহার অকপটত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার মৃত্যু-উপলক্ষে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একদিনের অধিবেশন তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল।

স্বদেশ-সেবক-হিসাবে মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতিতে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন! তিনি যে সময়ে মণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই সময়ে সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় স্বর্গগত মহারাজার গুণগ্রামের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"এই বৎসরের শেষ মাসে—এখনও এক পক্ষকাল গত হয় নাই—ভারতমাতার অঙ্ক হইতে তাঁহার যে সুসন্তান মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন তিনি কেবল আভিজাত্যে ও সম্ভ্রমে যে মহৎ ছিলেন তাহা নয়; আভিজাত্য ও সম্ভ্রম অপেক্ষাও যাহা মহত্তর এবং বিধাতার যাহা শ্রেষ্ঠ দান—উচ্চ হৃদয়,—তাহারই অধিকারী তিনি ছিলেন। তাঁহার প্রাণ ছিল উদার; সে প্রাণ স্বদেশের সেবার জন্য সতত ব্যগ্র থাকিত; স্বদেশবাসীর সেবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। দ্বারবঙ্গাধিপের মৃত্যুতে গবর্মেণ্ট একজন অনুরক্ত প্রজা এবং ব্যবস্থাপক সভায় বিশ্বাসী ও সম্মানভাজন সদস্য হারাইলেন। দেশবাসীরাও তাঁহাদের অকপট বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে বঞ্চিত হইলেন। কংগ্রেস ও একজন উদারহৃদয় সুহৃদ ও সহায়ক এবং পৃষ্ঠপোষক বর্জ্জিত-

হইল। তিনি যে কংগ্রেসের কত বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মনে পড়ে, দুই বৎসর পূর্ব্বেকার দৃশ্য—তিনি যখন কংগ্রেস-মণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সমবেত জন সংঘ গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েরই অকৃত্রিম বন্ধুর সম্মানের জন্য সোৎ-সাহে আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ব্যক্তিগত হিসাবে দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর আমার বন্ধু ছিলেন। তাই তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছি। তিনি ত মহাপ্রস্থান করিয়া-ছেন, কিন্তু যে আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অবিনশ্বর। তাঁহার সেই আদর্শ আমাদিগকে উৎসাহিত করুক; তাঁহার আদর্শ দেশের ভূস্বামিবৃন্দকে এবং মাতৃভূমির সেবকবৃন্দকে পথ প্রদর্শন করুক।"

মহারাজা অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪২ বৎসরের অধিক হয় নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এক সহোদর এবং দুই বিধবা পত্নীকে রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতার হস্তে আসিয়া পড়ে। তিনিই এক্ষণে দ্বারবঙ্গের বর্ত্তমান অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ অনারেবল্ স্যর রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর। অগ্রজের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া উপলক্ষে তিনি মুক্ত-হস্তে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। সে দানের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

দুঃখী-কাঙ্গালীদিগকে বিতরণের জন্য বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের হস্তে ১০ হাজার টাকা; বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং পঞ্জাব গবর্মেণ্ট—প্রত্যেকের হস্তে ৫০০০৲ টাকা; পাটনা বিভাগের কমিশনা-রের হস্তে ৫০০০৲ টাকা এবং দ্বারবঙ্গের কলেক্টরের হস্তে ৫০০০৲ টাকা; বেনারসের কমিশনারের হস্তে ২০০০৲ টাকা; করাচির কমিশনারের

হস্তে ২০০০৲ টাকা; ফাদার মার্কোর হস্তে ২০০০৲ টাকা; এবং মজঃফরপুর, গয়া, সারণ, চম্পারণ, সাহাবাদ, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, মালদহের কলেক্টর ও দেওঘরের মহকুমা হাকিম প্রত্যেকের হস্তে ১০০০৲ টাকা।

বাঙ্গালা গবর্মেণ্ট কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় মহারাজার মৃত্যুতে এই মর্ম্মে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে দ্বারবঙ্গের মহারাজা অনারেবল স্যর লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর জি-সি-আই-ই পরলোক গমন করিয়াছেন। এই সংবাদে ছোটলাট বাহাদুর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। মহারাজা এই প্রদেশের ভূস্বামিবর্গ ও অভিজাত-সমাজের অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জনহিতৈষী ছিলেন, এবং লোকহিতকর অনুষ্ঠানে মুক্তহস্তে সহায়তা করিতেন। এই জন্য তিনি তাঁহার সকল শ্রেণীর দেশবাসীর ও গবর্মেণ্টের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে দেশের সেবা যে ভাবে করিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই মূল্যবান। তিনি দেশবাসীর দুঃখকষ্ট-বিমোচনে এবং সাধারণ-হিতকর কর্ম্মে সহায়তা-প্রদানে মুক্তহস্ত ছিলেন এবং এইজন্যই তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে এই প্রদেশের সকলেই দুঃখিত হইবে।"

পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় মহারাজের নিম্নরূপ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"ভারতের বর্ত্তমান স্বদেশভক্ত লোকহিতৈষী এবং সম্মানভাজন রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিং অপেক্ষা অধিকতর স্বদেশভক্ত ও লোকহিতৈষী নহেন। তিনি খাস ইংরেজ শিক্ষকগণের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি ইংরেজী নিখুঁতভাবে বলিতে পারিতেন। যাঁহারা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অথবা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহারাজাকে লোকমতের সমর্থন করিতে শুনিয়াছেন, তাঁহারা মহারাজের তেজপূর্ণ নির্ভীক বক্তৃতা শুনিয়া এবং সেই সঙ্গে গবর্মেণ্টের প্রতি অনুরাগ ও দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। বাঙ্গালার অন্যান্য জন-নায়কগণের মতের দৃঢ়তা কখনও কখনও ভাঙ্গিয়া যাইত; তাঁহাদের কেহ কেহ ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক কারণে দেশের স্বার্থকে বলি দিতেন। কেহ বা ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য জনসাধারণের স্বার্থকে ভাসাইয়া দিতেন। কিন্তু দ্বারবঙ্গাধিপের আচরণ নিষ্কলঙ্ক; তাঁহার সুনাম ও যশঃ কখনই নিষ্প্রভ হয় নাই এবং তাঁহার আচরণেও কেহ কখনও বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবসর পায় নাই। যখন অন্যান্য জননায়কগণ তাঁহাদের মত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখনও তিনি স্বদেশের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করিয়া স্বমত পরিত্যাগ করেন নাই; বরং দৃঢ়তার সহিত উহা আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতেন। তিনি বাঙ্গালার জমিদার-সম্প্রদায়ের অতুলনীয় ছিলেন। কাহারও স্তুতি-নিন্দায় তিনি বিচলিত বা কাহারও তিরস্কারে তিনি ভীত হইতেন না। তিনি ভূস্বামী ছিলেন সত্য; কিন্তু কৃষাণদিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ভালই ছিল; গবর্মেণ্টও এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বদেশভক্ত হিসাবে তিনি জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে মুক্তহস্তে সহায়তা করিয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গাধিপ কোনও ব্যক্তিকে ভয় করিতেন না এবং কাহারও অনুগ্রহের উপযাচক ছিলেন না। যখন তিনি বুঝিয়া-ছিলেন যে, তাঁহার শিক্ষিত স্বদেশবাসীরা দেশের কল্যাণকল্পে বিধিসঙ্গতভাবে রাজনীতিক আন্দোলন চালাইবার জন্য যে অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহার আবশ্যকতা আছে, তখন তিনি সাগ্রহে তাহাতে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীরা চিরকাল

তাঁহার এই সহায়তার কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। তাঁহার নির্ভীক আচরণের জন্য শাসক-সম্প্রদায় কখনও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য এমনই সুস্পষ্ট ছিল, তাঁহার স্বদেশভক্তি এতই অচলা ছিল যে, বড়লাট ছোটলাট প্রভৃতিও তাঁহাকে সুবিধাবাদীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেন। আমি প্রায়ই স্বর্গীয় মহারাজাকে লাট-বেলাটের সহিত মেলামেশা করিতে দেখিয়াছি এবং আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, তাঁহাকে তাঁহারা যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন।"

স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর সম্বন্ধে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকটিত হইয়াছিল :—

"দ্বারবঙ্গের মহারাজা স্যর লক্ষ্মীশ্বর সিংয়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ অভিজাত সম্প্রদায়ের জনৈক মুখ্য ব্যক্তিকে এবং জনসাধারণ একজন মুক্ত-হস্ত দানশৌণ্ড লোকহিতৈষীকে হারাইয়াছে। মহারাজা বাল্যকালে খাস ইংরেজ শিক্ষকগণের নিকটে শিক্ষালাভ করিলেও তিনি তাঁহার জাতীয়তা বজায় রাখিয়াছিলেন; ইহাতেই তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যায়। ইংরেজের মত ইংরেজী শিখিয়াও তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার অবিচল অনুরাগ এবং শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। মহারাজার জীবন—স্বদেশ-সেবকের জীবন। জনহিতকর অনুষ্ঠানসমূহে—যেখানেই হউক বাঙ্গালায় বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে—তিনি অর্থসাহায্য করিতেন। বোধ হয় তিনি মনে করিতেন, তাঁহার দরিদ্র ভ্রাতাগণের দুঃখ-মোচনের জন্যই তাঁহার হস্তে এত অর্থ সমর্পিত হইয়াছে।

কলিকাতার লালদিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সাধারণের প্রদত্ত অর্থে দ্বারবঙ্গের পরলোকগত মহারাজা স্যর লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুরের মর্ম্মর-

মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট স্যর এনড্রু ফ্রেজার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ তারিখে এই প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন।

অনারেবল মহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর সিং বাহাদুর।

অনারেবল মহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর সিং বাহাদুর জি-সি-আই-ই, কে-বি -ই দ্বারবঙ্গের বর্ত্তমান অধীশ্বর। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে দ্বারবঙ্গে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দ্বারবঙ্গ প্রাচীন মিথিলার অন্তর্ভুক্ত। এই মিথিলাভূমি রাজর্ষি জনক, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, সীতা প্রভৃতিকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ মৈথিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী—শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত। শ্রোত্রিয় অর্থে বেদ-পারদর্শী। ইনি মহারাজা মহেশ্বর সিং বাহাদুরের তিন পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইঁহার পিতার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ইঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা স্বর্গীয় মহারাজা স্যর্ লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর জি-সি-আই-ই দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। মহারাজা স্যর লক্ষ্মীশ্বর ও মহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক সেই সময় মহারাজা মহেশ্বর সিং বাহাদুর পরলোকগমন করেন। সুতরাং দ্বারবঙ্গরাজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হস্তে নিপতিত হয়। দুই ভ্রাতাই দ্বারবঙ্গ মজঃফরপুর এবং কাশীর কুইন্স কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। কিছু দিন ইঁহারা মিঃ চেষ্টার ম্যাকনাউটেন (যিনি পরে রাজকোটের রাজকুমার কলেজের) প্রমুখ প্রখ্যাতনামা ইউরোপীয় শিক্ষকগণের নিকট বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা ইংরেজী, সংস্কৃত ও পারস্য তিনটী ভাষাতেই প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় মহারাজাধিরাজ রামেশ্বর তাঁহার

অগ্রজ অপেক্ষা অধিকতর মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। তিনি ১২ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিধিসঙ্গত বয়স অপেক্ষা ৪ বৎসর ন্যূন বলিয়া তাঁহাকে সার্টিফিকেট বা উত্তীর্ণ হইবার প্রমাণপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ প্রদান করেন নাই। তাঁহার অগ্রজ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে দ্বারবঙ্গের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ রাজপরিবারের চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারে বাবুয়ানা বৃত্তিস্বরূপ দ্বারবঙ্গ জেলার অন্তর্গত বাছাউর পরগণা প্রাপ্ত হন। তিনি উৎকৃষ্টরূপ বিষয়কার্য্য পরিচালনার দ্বারা এই সম্পত্তির আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন এবং এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত রাজনগরে একটী সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন তাঁহাকে 'বেঙ্গল ষ্ট্যাটুটরী সিভিল সার্ভিসে' নিযুক্ত করেন এবং মহারাজাধিরাজ প্রথমে এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে দ্বারবঙ্গ, ছাপরা ও ভাগলপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কর্ম্মে ইস্তফা প্রদান করেন। কারণ, তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিবেন, এইরূপ প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বৎসরেই তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর গবর্মেণ্ট তাঁহাকে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি দেন এবং তাঁহাকে ২৫ জন সশস্ত্র অনুচর নিযুক্ত করিবার অধিকার প্রদান করেন। এই সময়ে কেবল যে তিনি তাঁহার জমীদারী সুপরিচালিত করেন তাহা নয়, তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। সে সময়ে ভারতের সমগ্র তীর্থভ্রমণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। গুহানাহ্রদের বিদ্রোহের সময়ে তিনি গঙ্গোত্রীর তীর্থের যাত্রী রূপে তদঞ্চলে অবস্থান

করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই জন্য তাঁহার অগ্রজ সবিশেষ আতঙ্কিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার অগ্রজ মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের মৃত্যু হইলে তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরমাসে দ্বারবঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই সময়ে তিনি মহারাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বে সরকারী সদস্যগণের প্রতিনিধিরূপে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

এই পদে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার অগ্রজ স্বর্গীয় মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিং অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর তিনি কয়েক বার বঙ্গীয় ব্যস্থাপক সভায় সদস্যবর্গের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল বক্তৃতা করিতেন তাহাতে স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতার পরিচয়ই যে কেবল পাওয়া যাইত তাহা নহে; তাঁহার বক্তৃতায় যুক্তি, তর্ক ও দেশানুরাগের অস্তিত্বও যথেষ্ট, পরিমাণে থাকিত। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুলিশ কমিশনের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এই কমিশনে তিনিই একমাত্র বেসরকারী ভারতবাসী ছিলেন। পুলিশ কমিশনের রিপোর্টে তিনি দুইটী স্বতন্ত্র অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহাতে তিনি পুলিশ-সংস্কার-বিষয়ে দেশের লোকমতের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। তিনি বিচার ও শাসন-বিভাগকে স্বতন্ত্র করিবার কথা বলিয়াছিলেন।

যে সময়ে বিহার ও বাঙ্গালা একই প্রদেশভুক্ত ছিল সেই সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের আসন ছিল কলিকাতায়। তখন মহারাজা স্যর রামেশ্বর অধিকাংশ সময় কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেন। তখন সাধারণ-হিতকর সকল প্রকার আন্দোলনের তিনি অধিনায়ক হইতেন।

শিক্ষিত বাঙ্গালীরা তাঁহাকে তাঁহাদের নেতা বলিয়া মান্য করিতেন। তিনি চারিবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি বিহার-ভূস্বামি-সমিতির এবং ত্রিহুত জমীদার-সভায় আজীবন সদস্য। তিনি 'ইণ্ডিয়ান ফেমিন ট্রষ্ট' বা ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-নিবারণী-সমিতির সদস্য। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী (এক্ষণে ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী) কলিকাতা পরিদর্শন উপলক্ষে তিনি কলিকাতাবাসী কর্ত্তৃক গঠিত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞীর কলিকাতায় শুভাগমন ব্যাপার স্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহাদের হস্তে একলক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং এই টাকা তাঁহাদের ইচ্ছামত যে কোন জনহিতকর অনুষ্ঠানে দান করিতে অনুরোধ করেন। যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী এই টাকা গ্রহণ করেন এবং ইহা মেডিক্যাল কলেজ ও লেডী ডফরিন হাঁসপাতাল-ফণ্ডে দান করেন।

মহারাজা স্যর রামেশ্বর বিপ্লববাদীদের কার্য্যকলাপের ঘোর বিরোধী এবং বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে কয়েকবার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। তিনি বিহার ও ছোটনাগপুরের বহু অধিবাসীর স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদ-পত্র বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এনড্রু ফ্রেজারের নিকটে প্রেরণ করেন। উহাতে রাজদ্রোহ ও বিপ্লববাদের উৎকট নিন্দা করা হইয়াছিল। স্যর এনড্রু ফ্রেজার এজন্য বাঁকিপুরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মহারাজের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

তিনি মামলা-মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিবার বড়ই পক্ষপাতী। তিনি বিহার পঞ্চায়েৎ সমিতির অধ্যক্ষ। এই সমিতি তাঁহার অধিনায়কতায় বহু মামলা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

দিল্লীর রাজ্যাভিষেক উৎসবের পর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী

মেরী কলিকাতায় পদার্পণ করেন। এই সময়ে কলিকাতায় তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সম্বর্দ্ধনার জন্য তিনি খাঁটি দেশীয় সং, পুতুল, হাতি-ঘোড়া-উটের মিছিল প্রভৃতি ঘটা ও সাজসজ্জার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্বর্দ্ধনা-উৎসবে এই দেশীয় সজ্জা সকলের দৃষ্টি বিশিষ্টরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালা হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়। এই সময়ে তিনি এই নূতন প্রদেশের শাসন পরিষদে অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি পাঁচ বৎসর কাল সবিশেষ কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করেন।

ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু যখন শাসন-সংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপির সম্পর্কে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন; সেই সময়ে মহারাজা তিনটি সম্প্রদায়ের নেতৃরূপে ভারত-সচিব ও বড়লাট বাহাদুরের নিকটে তিনটী অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন। সে তিনটী সম্প্রদায় এই—নিখিল-ভারত জমীদার-সংঘ, নিখিল-ভারত হিন্দু-সম্প্রদায় এবং বিহার ভূস্বামি-সম্প্রদায়।

ইহার অল্পদিন পরেই মহারাজা স্যর রামেশ্বর সিং নিখিল-ভারত জমীদার-সংঘ গঠিত করেন। তিনিই এখন ইহার সভাপতি। এই সংঘ অনেক কাজ করিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে সাধারণ আয়কর বর্দ্ধিত হইয়া 'সুপার ট্যাক্সে পরিণত হয় এবং দেশময় গুজব উঠে যে, এই ট্যাক্স চাষ-বাস, জমি-জমার আয়ের উপরও ধরা হইবে। মহারাজা বাহাদুর এই ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী হইয়া উঠেন এবং দিল্লীতে জমীদারগণের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হয়; এ দেশের জমীদারগণ সুপারট্যাক্স-প্রদানের অসুবিধা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন।

নিখিল-ভারত জমিদার-সংঘের চেষ্টায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতের

ভূস্বামিবর্গের প্রতিনিধিবৃন্দ মহারাজা স্যর রামেশ্বর সিংহের নেতৃত্বে দিল্লী সহরে বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজা বাহাদুর তাঁহাদের পক্ষ হইতে বড়লাট বাহাদুরকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন, বড়লাট বাহাদুর তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছিলেন। অভিনন্দনপত্র প্রদানের পর বড়লাট বাহাদুরের সম্মানার্থ এক উদ্যান-সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল।

মহারাজই সর্ব্বপ্রথমে একটি হিন্দু মহাসভা-গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে বিহার হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তিনি স্বয়ং উহার সভাপতি হন। তাঁহারই উৎসাহে ও কথা-মত পঞ্জাবে হিন্দু সভা স্থাপিত হইয়াছে। পরিশেষে তিনি স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের সহিত একযোগে নিখিল-ভারত হিন্দুসভার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের পরলোকগমন-উপলক্ষে মহারাজা বাহাদুর কলিকাতায় এক বিরাট হিন্দু শোকসভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে হিন্দুগণ শুভ্র-বসন-পরিহিত হইয়া নগ্নপদে বিরাট শোকের মিছিল বাহির করিয়াছিল, মহারাজা বাহাদুর গণ্য-মান্য লোকদিগকে লইয়া তাহার পুরোভাগে নগ্নপদে পদব্রজে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি শোক-প্রকাশক অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে বহুসংখ্যক কাঙ্গালী পরিতোষ-সহকারে ভোজন করান হইয়াছিল।

বিগত মহাসমরের সময়ে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের অনুমতি লইয়া তিনি ভারতের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীদিগের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ রাজশক্তির জয়-কামনার জন্য মন্দিরে পূজা ও হোম-যাগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সমুদয় মন্দিরে এই শুভ কর্ম্ম

সম্পাদিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ রাজশক্তির জয়-কামনার সহিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও তাঁহার পরিবারবর্গের দীর্ঘজীবন ও কল্যাণ কামনাও করা হইয়াছিল। এই শুভ কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য মহারাজা বাহাদুর হরিদ্বার, মথুরা ও লাহোরে তিনটি বিরাট হিন্দু মহাসম্মেলনের অধিবেশন করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি এককালীন দান করিয়া চাঁদা দিয়া, সমর-ঋণের কাগজ ক্রয় করিয়া এবং সংগৃহীত সৈনিকগণকে নানা প্রকারে পুরস্কৃত করিয়া গবর্মেণ্টের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। সিমলা ও রাঁচিতে তাঁহার যে সুবৃহৎ অট্টালিকা আছে উহা তিনি সৈনিকদিগের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের সময়ে তিনি উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। বিগত আফগান-যুদ্ধের সময়েও তিনি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছিলেন।

মহারাজা বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ স্মৃতি-ভাণ্ডারের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় লর্ড হার্ডিঞ্জের একটি ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় এবং তিনি এই মূর্ত্তি পাটনার 'হার্ডিঞ্জ পার্কে' প্রতিষ্ঠিত করেন। লেডী হার্ডিঞ্জের একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তিও এই সঙ্গে তথায় স্থাপিত হইয়াছে। এই পার্ক বা উদ্যান-রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি স্থায়ী কমিটিও গঠিত হইয়াছে। মহারাজা বাহাদুর স্বয়ং এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট।

বিহার ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর চার্লস বেলীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য পাটনা সহরে 'বেলী মেমোরিয়াল লাইব্রেরী' নামক একটি পুস্তকাগার স্থাপিত হইতেছে। এইজন্য যে স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে,

মহারাজা বাহাদুর উহারও প্রেসিডেণ্ট। ইতিমধ্যেই এই পুস্তকাগারের জন্য ভূমি ও বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাবপ্রতিষ্ঠা হয়, এজন্য মহারাজ বাহাদুর সবিশেষ উদ্যোগী। এপক্ষে তিনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ তাহার মূল্য উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারই অনুরোধে ও প্রস্তাবক্রমে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আগা খাঁর নেতৃত্বে এলাহাবাদে হিন্দু মুসলমান কনফারেন্সের বৈঠক বসিয়াছিল এবং উহাতে পরলোক-গত স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবরণ উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা বাহাদুর এই কনফারেন্সে সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। আলিগড়ের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা-ভাণ্ডারে মহারাজা ২০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন এবং ইহার পর যখন তিনি আলিগড়ে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তথাকার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। মহারাজা বাহাদুর যখন বোম্বাই গমন করিয়াছিলেন সেই সময়ে আগা খাঁর অধিনায়কতায় তথাকার মুসলমান-সমাজ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং বোম্বাইয়ের এক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁহার সম্মানের জন্য উদ্যানসম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিহারের পাটনা সহরে প্রাদেশিক হিন্দুমুসলমান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; মুসলমান সমাজের প্রধানগণও এই সমিতির আনুকূল্য করিতেছেন।

মহারাজা স্যর রামেশ্বরকে সমগ্র ভারতের হিন্দুগণ তাঁহাদের অগ্রণী ও নেতৃস্থানীয় বলিয়া মনে করেন। মিথিলার কোনও ব্যক্তিকে হিন্দুসমাজচ্যুত করিতে হইলে তাঁহার অনুমতি আবশ্যক। তাঁহার বিনা অনুমোদনে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে কোনও বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তিনি ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের আজীবন সদস্য।

ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় বারাণসীধামে। এই মহা-মণ্ডলের সহিত ভারতের হিন্দু সামন্ত রাজগণের সম্পর্ক আছে। লাহোরে নিখিল-ভারত ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তিনি তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহে যে ব্রাহ্মণ-সম্মিলন হইয়াছিল, মহারাজা বাহাদুর তাহারও সভাপতি হইয়া-ছিলেন। কলিকাতায় ও এলাহাবাদে যে নিখিল ধর্ম্মমহামণ্ডলীর অধিবেশন হইয়াছিল তিনি তাহারও সভাপতি-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও সদ্ভাব-প্রতিষ্ঠাই এই মহামণ্ডলীর উদ্দেশ্য ছিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী সহরে যে অভিষেক-দরবার হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে পঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুরের প্রস্তাবক্রমে মহারাজা স্যর রামেশ্বর সিং ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও ভারত রাজরাজেশ্বরী সম্রাজ্ঞী মেরীর দীর্ঘজীবন ও কল্যাণ-কামনার জন্য হিন্দুগণের পক্ষ হইতে ভগবানের আশীর্ব্বাদ-লাভের জন্য এক অনুষ্ঠান করেন। এই ব্যাপারের সম্পর্কে হিন্দুগণের যে বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল মহারাজা বাহাদুর তাহার পুরোভাগে গমন করিয়াছিলেন। হিন্দুগণের বিভিন্ন শাখার নেতৃগণ এবং খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ ভারতের নানা স্থান হইতে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। মহারাজার আমন্ত্রণে বহু পণ্ডিত, শ্রীশঙ্করাচার্য্য এবং বহু মোহান্ত ও ধর্ম্মগুরু তাঁহার দিল্লী-স্থিত শিবিরে আগমন করিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের প্রাতে দিল্লী নগরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর সম্মুখে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে উপস্থিত করা হইয়াছিল। দ্বারবঙ্গের মহারাজা হিন্দু, মুসলমান ও শিখ প্রতিনিধিগণের অগ্রণী হইয়া গমন করিয়াছিলেন। সম্রাটের শিবিরে ইঁহারা উপস্থিত হইয়া

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রতিনিধি-সংঘের অগ্রণীরূপ দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুরকে সর্ব্বপ্রথমে পঞ্জাবের ছোট লাট বাহাদুর সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কল্যাণের জন্য মহারাজা বাহাদুর এ পর্য্যন্ত ভারতের বৃহৎ বৃহৎ সহরে ও বহু স্থানে বিরাট হিন্দু সভার সভাপতি হইয়াছেন। এই সকল সভায় তিনি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, সে সকল বক্তৃতায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কৃতিত্ব ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় শোভাবাজার রাজবাটীতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বিরাট সভা হইয়াছিল মহারাজা স্যর রামেশ্বর সিং বাহাদুর সেই সভায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা খুবই উচ্চদরের হইয়াছিল। খাল খননের জন্য হরিদ্বারে গঙ্গার জল অবরুদ্ধ করিয়া রাখার বিরুদ্ধে হিন্দুগণ যে আন্দোলন করিয়াছিলেন, মহারাজা বাহাদুর সেই আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন। নারোরা দাম নামক স্থানে গঙ্গার স্রোত ৪০ বৎসর রুদ্ধ ছিল, ইহার বিরুদ্ধেও তিনি ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন।

মহারাজ বাহাদুর শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষপাতী। তিনি দ্বারবঙ্গ সহরে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। তাঁহারাই ব্যয়ে মজঃফরপুর এবং দ্বারবঙ্গ জিলার বহু স্কুল পরিচালিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত অনেকগুলি টোল-চতুষ্পাঠীও তাঁহারই অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। তিনি কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার একমাত্র ট্রষ্টি এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী। বাঙ্গালা দেশে এই মহাকালী পাঠশালাই একমাত্র বালিকা বিদ্যালয় যাহা প্রকৃত হিন্দু আদর্শে বালিকাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা প্রদান করিতেছে।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে আড়াই লক্ষ টাকা প্রদান করেন; এই টাকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; 'দ্বারবঙ্গ হাউস' নামক নব-নির্ম্মিত বিরাট সৌধে এই লাইব্রেরীটি স্থাপিত হইয়াছে। তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডারে ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে তিনি প্রথম হইতে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির প্রেসিডেন্টরূপে ইহার পরিকল্পনা হইতে রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক ইহার ভিত্তি-প্রস্তর-স্থাপন পর্য্যন্ত সমান ভাবে কার্য্য করিয়াছেন। ভারত গবর্মেণ্ট প্রথম প্রথম হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার উদ্যমকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু মহারাজা বাহাদুরের প্রভাব ও ব্যক্তিত্বের জন্য গবর্মেণ্ট হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়াছিলেন এবং পরিশেষে আইন করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহাকে বহু সভা আহ্বান ও বহু বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। বড় বড় চাঁদা তাঁহারই প্রভাবে ও চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি লাহোরের সনাতন ধর্ম্ম-কলেজ-প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন; এইজন্যই তথায় এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। কলিকাতায় গ্রীষ্মমণ্ডল-সুলভ রোগ-সমূহের চিকিৎসার জন্য যে বিদ্যালয় এক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই বিদ্যালয়ের (School of Tropical Medicine) প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ডাক্তার ডি এন রায়-প্রমুখ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যে কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন, মহারাজা বাহাদুর সেই প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। পাটনা সহরে যে তিব্বি-ইউনানী কনফারেন্স বসিয়াছিল, তিনি তাহার

সভাপতিরূপে দিল্লীতে তিব্বি-ইউনানী কলেজ-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কয়েকটি সংস্কৃত পাঠশালায় তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছেন। মজঃফরপুরের বি-বি কলেজটি যখন অর্থাভাবে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি অর্থসাহায্য করিয়া উহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি গবর্মেণ্ট-পরিচালিত সংস্কৃত ইউনিভার্সিটীর সহিত সংলগ্ন বিহার-উড়িষ্যা সংস্কৃত-সমিতির প্রেসিডেণ্ট। এই সমিতির সম্পর্কে থাকিয়া তিনি বিহারে সংস্কৃত শিক্ষা-বিস্তারকল্পে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পাটনা সহরে মেডিক্যাল কলেজ-প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া বিহারের অধিবাসীরা এইরূপ একটি কলেজের অভাব অনুভব করিতেছিলেন।

মহারাজা স্যর রামেশ্বর কৈশর-ই-হিন্দ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে কে-সি-আই-ই উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। অতঃপর মহারাজা বাহাদুর উপাধিটি গবর্মেণ্ট বংশানুগত করিয়া দেন। পরে তিনি জি-সি-আই-ই ও কে-বি-ই উপাধি লাভ করেন। সম্প্রতি "মহারাজাধিরাজ" উপাধি প্রদান করিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছেন।

মহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর ইংরেজী, সংস্কৃত, পার্শী, উর্দ্দু, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা বেশ ভালরূপই জানেন। দ্বারবঙ্গে তাঁহার নিজের এক সুবৃহৎ পুস্তকাগার আছে; প্রতি বৎসরই উহাতে পুস্তকের সংখ্যা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তিনি বহুবিধ পুস্তক পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহার জ্ঞানও নানাবিষয়ক। তিনি মজলিসী লোক এবং কথোপকথনে সুনিপুণ। তিনি দ্বারবঙ্গ জেলার রাজনগরে এক বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; উহাতে ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মোগল-

যুগের অবসানের পর এমন প্রাচ্য-স্থাপত্য-কৌশল-সমন্বিত প্রাসাদ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় আর কেহ নির্ম্মিত করেন নাই। রাজনগরে যিনি এক সুন্দর মর্ম্মর-নির্ম্মিত কালীমন্দির তৈয়ারী করিয়াছেন ইহাতেও স্থপতির সূক্ষ্ম কারুশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দ্বারবঙ্গে, পাটনায়, বারাণসীতে, কামাখ্যায়, খড়্গপুরে, দ্বারবঙ্গ জেলার কয়েকটি গ্রামে কতকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং আরও কতকগুলি তয়ারী হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্দেশে গঠিত বিভিন্ন সভা সমিতিতে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ ও বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় জ্ঞাতব্যবিষয়ের সমাবেশ যথেষ্টই থাকে। মহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর ভারতের প্রায় সমুদয় তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক তীর্থেই যে সকল বিধি-নিষেধ পালন করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া থাকেন। যেখানে উপবাস করিতে হয়, সেখানে উপবাস করেন; যেখানে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সেখানে তাহাই করেন। শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিয়া ধর্ম্মাচারসমূহ তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে তিনি আদর্শপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি পরিশ্রমী এবং বিপুল সম্পত্তির পরিচালনাব্যাপার তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

মহারাজাধিরাজ স্যর রামেশ্বর দানবীর। জন-সাধারণের কল্যাণকর বহু অনুষ্ঠানে তিনি বিপুল অর্থ দান করিয়া মহতী কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ৫০ লক্ষ টাকা সদনুষ্ঠানে দান করিয়াছেন।

দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজের জমিদারী মজঃফরপুর জেলায়, দ্বারবঙ্গ জেলায়, পূর্ণিয়া জেলায়, ভাগলপুর জেলায়, মুঙ্গের জেলায়, গয়া জেলায়,

পাটনা জেলায়, এবং আসাম প্রদেশে বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত দার্জ্জিলিং, সিমলা, এলাহাবাদ, বারাণসী, রাঁচি, হরিদ্বার, কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানে তাঁহার বাটী আছে। তাঁহার বিপুল জমিদারীর পরিমাণ অনুমান ২৫০০ বর্গমাইল।

কণিকা-রাজবংশ।

অনুমান ১২০০ খৃষ্টাব্দে ময়ূরভঞ্জের তদানীন্তন অধীশ্বরের ভ্রাতা ভুজবল ভঞ্জ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করেন; উহাই এক্ষণে কণিকা নামে অভিহিত। এই রাজ্য পূর্ব্বে কোনও নীচজাতীয় রাজার অধীন ছিল। ভুজবল ভঞ্জ উহাকে পরাজিত করিয়া তথায় নিজরাজ্য স্থাপন করেন।

ইতিবৃত্ত।

তিনি এই কিল্লার ভঞ্জরাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব গজপতিবংশ ইঁহাদিগকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন।

এক্ষণে যাহা এলেকা চামুখা নামে অভিহিত, তাহাই প্রথমে কিল্লার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে বালেশ্বর জেলার অন্তঃপাতী পাঁচমুখা অঞ্চল ইহার সহিত সংযুক্ত হয়। কিছুদিন পরে তিনি এলেকা কেরারা বাহুবলে অধিকার করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন। কোন সময়ে এই রাজ্য অধিকৃত হয়, তাহা এক্ষণে নিরূপণ করা যায় না। সর্ব্বশেষে 'কালদ্বীপ' এই

রাজ্য-পরিচয়।

রাজ্যের পরিধি বর্দ্ধিত করে। কালদ্বীপ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত 'হরিচন্দন' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের শেষ রাজা তাঁহার কন্যার সহিত কণিকা-রাজ 'বলভদ্র ভঞ্জ বাহাদুরের বিবাহ দেন। এই বিবাহ-সূত্রে কালদ্বীপ কণিকা-রাজ্যভুক্ত হয়। ধামরার মোহনার উভয় পার্শ্বে সমুদ্রতীরে এই কিল্লা অবস্থিত। সমুদ্রতীর হইতে ভিতরে প্রায় ২০ মাইল পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ-ফল প্রায় ৪৪০ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা ১ লক্ষ।

প্রথমে কণিকা-রাজ্যের রাজধানী ছিল—বাজারপুর ; ইহা বৈতরণী নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এই স্থান অস্বাস্থ্যকর বলিয়া এখান হইতে রাজধানী রাজ-কণিকায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। রাজ-কণিকা কটক-চাঁদবালি রোডের উপরে অবস্থিত; চাঁদবালি বন্দর এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ। এই স্থান কটক ও কলিকাতা হইতে সহজেই যাতায়াত-যোগ্য ; কারণ চাঁদবালি বন্দর পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাতায়াত করে। বেঙ্গল নাগপুর রেল-পথের ভদ্রক ষ্টেশন এখান হইতে বেশীদূর নহে ; সুতরাং রেলপথও ইহার সন্নিকট।

রাজধানী

কণিকা-রাজপরিবারের কুলচিহ্ন—ময়ূর। ইহা হইতেই ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের নামোৎপত্তি হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জ-রাজকুলের আভিজাত্যিক চিহ্নও ময়ূরধ্বজ-সমন্বিত। যেহেতু ময়ূরভঞ্জ-রাজপরিবারভুক্ত এক ব্যক্তি কণিকার ভঞ্জরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, সেই হেতু এই রাজবংশের আভিজাতিক চিহ্ন ময়ূর হইয়াছে। এই রাজপরিবার সূর্য্যবংশীয়, ইঁহারা রাজপুতানার জয়পুর-রাজবংশের একটি শাখা।

কুলচিহ্ন

বংশ-তালিকা

এই কিল্লার রাজগণের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ অধিকার পর্য্যন্ত রাজগণের নাম ইহাতে দেওয়া হইল :—

১। ভুজবল ভঞ্জ

২। বিশ্বনাথ

৩। ত্রিলোচন ভঞ্জ (১ম)
৪। গোপীনাথ „ (১ম)
৫। পরমানন্দ „ (১ম)
৬। দিব্যসিংহ „ (১ম)
৭। নরসিংহ „ (১ম)
৮। ত্রিবিক্রম „ (১ম)
৯। গঙ্গাধর „
১০। গোপাল „ (১ম)
১১। বাসুদেব „ (১ম)
১২। রঘুনাথ „
১৩। লক্ষ্মণ „
১৪। বৈরাগী „ (১ম)
১৫। ত্রিলোচন „ (২য়)
১৬। গোপীনাথ „ (২য়
১৭। পরমানন্দ „ (২য়)
১৮। সর্ব্বসিংহ „
১৯। বাসুদেব „ (২য়)
২০। দিব্য সিংহ „ (২য়)
২১। নরসিংহ „ (২য়)
২২। ত্রিবিক্রম „ (২য়)
২৩। গদাধর „
২৪। গোপীনাথ „ (৩য়)
২৫। দাশরথি „
২৬। গোপাল (২য়)

২৭। বৈরাগী ভঞ্জ (২য়)

২৮। বলভদ্র „

কিল্লার রাজন্যবর্গের মর্য্যাদা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র অর্দ্ধ স্বাধীন রাজগণের মত ছিল। ইঁহারা প্রথমে উড়িষ্যার অধীশ্বরগণের, পরে মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ ইঁহারা স্বাধীন ছিলেন। কিল্লার অভ্যন্তরে তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন অর্থাৎ তাঁহাদের ক্ষুদ্র রাজ্যের তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন।

কিল্লার মর্য্যাদা—ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বে ও পরে

"কন্ক" (কণিকা) উড়িষ্যা প্রদেশের একটি নগর। ইহা কটক জেলার অন্তর্ভুক্ত। ইহা কটক জেলার একটী করদ রাজ্যের রাজধানী। কণিকা ব্রিটিশ-বিধি-বিধানের অধীন। এই রাজ্যের পরিমাণফলের যথাযথ নির্দ্ধারণ কোনও কালে হয় নাই। তবে মোটামুটী হিসাবে স্থির হইয়াছে যে, এই রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে ৭৫ মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৫০ মাইল।

অধিষ্ঠান

কটক ব্রিটিশ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে কন্ক-রাজ এই বিস্তৃত জলাস্তীর্ণ অস্বাস্থ্যকর ভূমি মহারাষ্ট্রীয়গণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা কন্ক-রাজ্য যত বারই আক্রমণ করিয়াছিলেন, ততবারই তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ বড় বড় নৌকায় করিয়া সৈন্য ও কামান পাঠাইত; এ সকল নৌকা দ্রুতগামী ছিল না। সমুদ্রের নিকট নদীর মোহনায় এ সকল নৌকায় কোনও কাজ হইত না। কন্ক-রাজের লম্বা লম্বা ছিপ ছিল; কতকগুলি ছিপের ১০০টি করিয়া দাঁড় থাকিত। মহারাষ্ট্রীয়দের ঐ সকল বৃহৎ নৌকা এই সকল দ্রুতগামী নৌকার সহিত

পাল্লা দিতে পারিত না। সুবিধা বুঝিয়া কঙ্ক-রাজের লোক-লস্করেরা মহারাষ্ট্রীয়দের এক একটি নৌকা আক্রমণ করিত এবং উহার চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত লোককে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিত। যখন অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয় নৌকারই এইরূপ দশা হইত, তখন অবশিষ্ট নৌকাগুলি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইত। কঙ্ক-রাজের লস্করেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বন্দী করিয়া রাখিত। এখানকার জলবায়ু এতই মন্দ ছিল যে, বন্দী অবস্থাতেই তাহাদের মৃত্যু হইত। বস্তুতঃ এ অঞ্চল যমালয়তুল্য ছিল; এখানকার আদিম অধিবাসী ভিন্ন অপর কেহ এখানে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।

সরকারী কাগজপত্রে কিল্লার মর্য্যাদা

সরকারী কাগজপত্রে এবং প্রামাণিক গ্রন্থাদিতে কিল্লার মর্য্যাদার উল্লেখ আছে। প্রাচীন রাজগী এবং রাজগী-পরিবারের ইতিহাসও উহাতে পাওয়া যায়। কুজঙ্গ ও কণিকার বর্ত্তমান রাজগণের পূর্ব্বপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহারা উড়িষ্যার গজপতিরাজগণের অধীন ছিলেন। †

আউল, পটমুণ্ডাই বহু শতাব্দী ধরিয়া দেশীয় রাজন্যগণের প্রভাবাধীন ছিল এবং কুজঙ্গ কণিকা ও আউল রাজ্যের অধীশ্বরগণ কটক জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে প্রভূত ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। (Vide the Bengal District Gazetteer Cuttack).

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। সেই সময়ে

---

* Orissa by Andrew Sterling Esq. Persian Secretary to the Bengal Govt. Edited by James Peggs. pp. 38-39.

† Statistical account by W. W. Hunter Vol. XVIII Page 125.

তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারল মার্কুইস অফ ওয়েলেস্লীর প্রতিনিধিবর্গের সহিত কণিকা-রাজের সন্ধি হইয়া যায়। সেই সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষই স্বাক্ষর করেন। উহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সহিত সন্ধি

সন্ধির সর্ত্তাদি স্থির করিবার জন্য মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মিঃ হারকোর্ট ও মিঃ মেলভিল্‌কে সুবা উড়িষ্যার কমিশনার (Special Commissioners) নিযুক্ত করেন। কিল্লা কণিকা কটকের অধীন একটি করদ মহাল। এই মহালের রাজা কোম্পানীর কমিশনারগণের সহিত নিম্নলিখিত সর্ত্তে সন্ধি করেন :—

আমি উড়িষ্যা সুবার অন্তর্গত কিল্লা কণিকার অধীশ্বর রাজা বলভদ্র ভঞ্জ মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলাম। এই সন্ধির নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি আমি বিশ্বস্তভাবে যথাযথ পালন করিব :—

১। আমি উক্ত মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিব এবং তাঁহাদের অধীন রহিব।

২। আমি বিনা ওজর-আপত্তিতে উক্ত কোম্পানীকে চৈত্র জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাসে তিন সমান দফায় বার্ষিক ৮৪, ৮৪০ কাহন কড়ি কর প্রদান করিব।

৩। যদি কোনও অপরাধী কোম্পানীর সুবা হইতে আমার রাজ্যে পলাইয়া আসে, তাহা হইলে দাবী করা মাত্র আমি উহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীর হস্তে সমর্পণ করিব।

৪। আমার রাজ্যের কোনও অধিবাসী মোগলবন্দীর এলাকায় কোন প্রকার অপরাধ করিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া আনিবার

* Vide pages 314-316 of Part III of Vol I of Aitchison's Collections of Treaties, Engagements and Sanads.

দাবী যদি আমি করি তাহা হইলে মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঐ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করাইয়া বিচারের জন্য আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন। যদি মোগলবন্দীর কোনও প্রজার সম্পত্তির বিরুদ্ধে আমার কোনও দাবী থাকে, তাহা হইলে আমি নিজ হস্তে তাহা আদায় করিব না; পরন্তু কোম্পানীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট সেই দাবী পেশ করিব এবং তাঁহার বিচারে যাহা সাব্যস্ত হইবে তাহাই আমি মানিয়া লইব।

৫। মহামান্য কোম্পানীর ফৌজ আমার রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইলে আমার কিল্লার প্রজাগণ ফৌজের লোকদিগকে যথাসাধ্য সুবিধা দরে রসদ ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবে। কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারী, প্রজা বা কোনও লোক যদি মালপত্র লইয়া অথবা কোম্পানীর কোনও আদেশপত্র লইয়া আমার রাজ্য মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে আমি কোনও কারণে, এমন কি ছলক্রমেও তাহাকে কোনও বাধা প্রদান করিব না, তাহার গতিরোধ করিব না। বরং যাহাতে ঐ ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের জীবহানি বা আর্থিক ক্ষতি না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিব।

৬। যদি আমার কোনও প্রতিবেশী রাজা বা অপর কেহ কোম্পানীর অবাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি কোম্পানীর ইঙ্গিত প্রাপ্তিমাত্র বিনা আপত্তিতে তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে অথবা কোম্পানীর সৈন্যদিগের সহিত একযোগে অভিযান করিতে বাধ্য থাকিব। যতদিন আমার সেনাদল ঐ বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত থাকিবে ততদিন তাহারা কোম্পানীর নিকট হইতে কেবল রসদ পাইবে। ইতি—

২২শে নভেম্বর ১৮০৩,

শাওয়ন ৬ই, ১২১১ উম্লী।

এই সময়ে এইরূপ সন্ধি কিল্লা আটজুড়, কিল্লা বারম্বার, কিল্লা নরসিংগড়, কিল্লা জৌরমু, কিল্লা তিচের, কিল্লা তিগ্রীয়া, কিল্লা হিন্দোল, কিল্লা কুণ্ডপাড়া, কিল্লা ঢেঙ্কানল, কিল্লা রণপুর, কিল্লা নয়াগড়, এবং কিল্লা নীলগিরির অধিপতিগণের সহিত হইয়াছিল এবং তৎসহ উঁহাদের কাহারও কাহারও রাজস্বের পরিমাণও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তবে উঁহাদের কাহারও রাজস্ব কণিকা-রাজ্যের রাজস্ব অপেক্ষা অধিক হয় নাই।

কণিকারাজ যেরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কবুলনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন। সেই কবুলনামায় এইরূপ লেখা ছিল যে, বাৎসরিক রাজস্ব চিরদিনের জন্য ৮৪,৮৪০ কাহন কড়ি ধার্য্য করা হইল; ইহা ব্যতীত কণিকা-রাজের নিকট হইতে নজর ইত্যাদি লওয়া হইবে না। এই কবুলনামা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২২শে নবেম্বর, ১২১১ সালের ৬ই শাওয়ন তারিখে লিখিত হইয়াছিল এবং উহাতে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জি হারকোর্ট ও মিঃ জে মেলভিলের স্বাক্ষর ছিল।

বংশ-তালিকা।

[ব্রিটিশ অধিকারের পরে]

ব্রিটিশ অধিকারের পর হইতে কণিকা কিল্লার রাজন্যবর্গের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। জগন্নাথ ভঞ্জ
২। হরিহর "
৩। বিনায়ক "
৪। ত্রিবিক্রম "
৫। পদ্মনাথ "
৬। নৃপেন্দ্রনাথ " (নাবালক অবস্থার মৃত্যু হয়)
৭। রাজেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ দেও (বর্ত্তমান রাজা)

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ দেও

অনারেবল রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ দেও কণিকা রাজ্যের বর্ত্তমান অধীশ্বর। ইনি পার্শ্ববর্ত্তী আউল রাজ্যের অধিপতির দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইনি কণিকারাজবংশে পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। ইনি যতদিন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন, ততদিন রাজ্যের পরিচালন-ভার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হস্তে ন্যস্ত ছিল। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ কটকের গভর্ণমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলে ও কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইনি নারায়ণগড়ের পরলোকগত রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রাপ্তবয়স্ক হন এবং কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের নিকট হইতে রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি গঞ্জাম-বহরমপুর উৎকল কনকারেন্সে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ড পরিদর্শন এবং ইউরোপের কিয়দংশ পরিভ্রমণ করেন: ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে বেঙ্গল এডভাইসরী ফিসারি বোর্ডের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের ভূস্বামিগণ ইঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনারায়ণ পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য লিন্‌কন্‌স ইনে ভর্ত্তি হন। এই বৎসরই ইঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে গভর্ণমেণ্ট 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর অভিষেক-উৎসবে ইনি যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং দিল্লীর অভিষেক-দরবারে উপস্থিত হন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইলে তিনি উড়িষ্যার ভূস্বামি-বর্গের প্রতিনিধিস্বরূপ তথাকার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিটীর সদস্য ছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইনি পুনরায় উড়িষ্যার ভূস্বামিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি সমগ্র বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ভূস্বামিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি ভারত ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিভাগ-সংক্রান্ত কমিটীর জনৈক সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কমিটী প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষৎ ও মন্ত্রিগণের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিবেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ও-বি-ই উপাধি লাভ করেন এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ইঁহার 'রাজা' উপাধি কৌলিক বা বংশগত করিয়া দেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ব্যবস্থাপক সভায় দেশের হিতকর এবং যে সম্প্রদায়ের তিনি প্রতিনিধি সেই ভূস্বামি-সম্প্রদায়ের কল্যাণকর সকল প্রস্তাব ও আলোচনার সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। উড়িষ্যার প্রজাস্বত্ব আইনের পাণ্ডুলিপি যখন লাট-সভায় পেশ হয়, তখন উহাতে জমিদারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি উহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় জমিদার-গণের কতক কতক অধিকার ও স্বার্থ এই আইনে বজায় রাখা হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকিবার সময়ে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয় এবং তাঁহারই চেষ্টায় কতকগুলি বিশিষ্ট অধিকার এই আইনের অঙ্গীভূত হয়। সাধারণ-হিতকর সকল অনুষ্ঠানেই তিনি আগ্রহের সহিত যোগদান করেন। ইনি উড়িষ্যা ল্যাণ্ডহোল্ডার্স্ এসোসিয়েসনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং বাঙ্গালা

ও বিহার ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ এসোসিয়েসনের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট। ইনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী ও সোসাইটী অফ আর্টসের সদস্য।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের নিকট হইতে যখন স্বহস্তে রাজ্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, তখন এই ব্যাপারটীকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি কটকের জেনারেল হাঁসপাতালে একটি "ফিমেল ওয়ার্ড" নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। একাধিকবার তিনি তাঁহার প্রজাগণের দুর্দ্দশা-মোচনের জন্য মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই সকল সৎকীর্ত্তির প্রশংসা করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণের ক্লেশ-মোচনের যে সকল ব্যবস্থা করেন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া প্রজাবৃন্দের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে চীফ সেক্রেটারী অনারেবল মিঃ ম্যাকফারসন এই সম্বন্ধে বলেন :—প্রত্যেক জেলাতেই দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্য-কল্পে রিলিফ ফণ্ড খোলা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারের সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট সবিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন যে, কণিকা-রাজ অনারেবল রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ দেও রিলিফ ফণ্ডে বিশেষ রূপে অর্থসাহায্য করিয়া মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাপারের প্রসঙ্গেই ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তারিখে কটক সহরে যে দরবার আহূত হয় সেই দরবারে ভারতের রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং বলেন :—"আপনাদের জেলায় যে লোকের প্রাণহানি ঘটে নাই, ইহাতে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আমার বিশ্বাস, গবর্ণমেণ্ট যেরূপ তৎপরতার সহিত প্রজাবৃন্দকে অগ্রিম টাকা দিয়াছেন এবং রিলিফ ফণ্ড গঠিত হইয়াছে—যে রিলিফ ফণ্ডে কণিকার রাজা মুক্তহস্তে

অর্থসাহায্য করিয়াছেন—তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণের ক্লেশ ঘুচিয়াছে। ক্ষেত্রে জল-সেচনের জন্য অনেক খালের সংস্কার করাইয়াও গবর্ণমেণ্ট বহু দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোককে প্রতিপালন করিয়াছেন। ইহাতেও অনেক সুফল ফলিয়াছে। তাহার পর আরও সান্ত্বনার বিষয় এই যে, এবার সময়মত সুবৃষ্টি হওয়াতে এবং বন্যার পলির জন্য রবিখন্দ যথেষ্ট জন্মিয়াছে।"

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ শিক্ষা-বিস্তারের অনুরাগী, এপক্ষে তিনি সদাই চেষ্টিত। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেম্বার ও ফেলো এবং কটক রাভেন্‌সা কলেজের 'গভার্ণিং বডি'র সদস্য। তিনি তাঁহার রাজ্যে বালক ও বালিকাদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যের বাহিরেও স্কুল-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার রাজ্যে একটী উচ্চ ইংরেজী স্কুল এবং কয়েকটী উচ্চপ্রাথমিক ও নিম্নপ্রাথমিক স্কুল তাঁহার অর্থসাহায্যে চলিতেছে। তাঁহার রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ছয়টী টোল আছে। তিনি কটকের রাভেনসা কলেজের একটি স্বতন্ত্র লাইব্রেরীর গৃহনির্ম্মাণের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ নিজরাজ্য মধ্যে চারিটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল ডাক্তারখানায় তাঁহার প্রজাগণ এবং এবং বাহিরের লোকও বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইয়া থাকে।

বিগত মহাসমরের সময়ে তিনি নানাপ্রকারে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছেন। নিম্নে উহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

(১) ১৯১৪—ইম্পিরীয়াল ওয়ার রিলীফ ফণ্ডে ১০০০ টাকা দান।

(২) ১৯১৬—কটক ওয়ার রিলীফ ফণ্ড ও লেডী হার্ডিঞ্জ উইমেন্‌স হস্পিট্যাল ফণ্ডে দান—৩০০০৲ টাকা।

(৩) ১৯১৭—সেণ্ট জন্‌স আম্বুলেন্স এসোসিয়েসন আওয়ার ডে ফণ্ডে দান—৫৫০০৲ এবং একটি মোটর আম্বুলান্স গাড়ী।

(৪) ১৯১৮—মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহারের জন্য রেড ক্রশ সমিতির হস্তে একটী মোটর লঞ্চ দান।

(৫) ১৯১৯—যুদ্ধে নিহত সৈনিকগণের পরিবারবর্গের জন্য এবং আহত সৈনিকগণের জন্য স্থাপিত রিলিফ ফণ্ডে দান—৫০০০৲। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রায় ৮॥ লক্ষ টাকা সমর-ঋণের কাগজ খরিদ করেন এবং মেসোপটেমিয়ায় কার্য্য করিবার জন্য বহুসংখ্যক শ্রমজীবী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

যুদ্ধের সময়ে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে কণিকা-রাজ্য হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক শ্রমজীবী-পল্টন সংগৃহীত হইয়াছিল। এই রাজ্যের লোকেরা অত্যন্ত রক্ষণশীল। সুতরাং উহাদিগকে বিদেশে গিয়া কার্য্য করিতে সম্মত করার জন্য রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে অমানুষিক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং এ ব্যাপারে তিনি অসামান্য কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাদের মধ্যে যাহারা শ্রমজীবী পল্টনে ভর্ত্তি হইয়াছিল তাহাদের অনেককেই তিনি নানারূপ পুরস্কার দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি সে প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ছোটলাট বাহাদুর বলেন,—"কণিকার মাননীয় রাজা বাহাদুর উড়িষ্যা প্রদেশে যুদ্ধের জন্য শ্রমজীবি-সংগ্রহের ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।"

১৯২০ খৃষ্টাব্দের বর্ষার শেষে উড়িষ্যা প্রদেশে প্রবল বন্যা হয়। সেই বন্যা তাঁহার রাজ্যেও ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল। ফলে বিস্তর লোক গৃহহীন হইয়াছিল, অনেকের একমুষ্টি অন্নের সংস্থানও ছিল না। কণিকার বর্ত্তমান অধীশ্বর রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ অবিলম্বে এই সকল বিপন্ন নর-নারীর জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অসাধারণ মহানুভবতা ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার কারুণ্যে বহুলোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ এইরূপ আকস্মিক বিপদের সময়ে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করেন। বিপন্নের সহায়তা করিতে তিনি সততই প্রস্তুত থাকেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বিলিয়ার্ড, টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি ভাল শিকারী এবং তাঁহার লক্ষ্য অব্যর্থ। এক কথায় সম্ভ্রান্ত ও উন্নতরুচিসম্পন্ন ব্যক্তির যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন তাহা তাঁহার আছে।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্রের নাম টিকায়েৎ শৈলেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ দেও। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কণিকার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী। ইনি দেখিতে অতীব সুশ্রী। রাজারাজেন্দ্রনারায়ণ ইঁহাকে সুশিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ কখনও কটকে, কখনও রাজ-কণিকায় অবস্থান করেন। উভয় স্থানেই রাজপরিবারের বাসোপযোগী প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা আছে। কটকে ইঁহার যে বিশাল বাটী আছে তাহার শস্পাবৃত সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ এবং সুন্দর বৃহৎ পুষ্করিণী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কটক সহরে এত বড় ও সুন্দর বাটী আর নাই। রাজ-কণিকায় কণিকারাজের প্রাসাদ যেমন সুদৃশ্য, তেমনই সুসজ্জিত অনেকে ইহাকে উড়িষ্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন।

রঙ্কা-রাজবংশ।

রঙ্কার অধিপতি কুমার গিরিবরপ্রসাদ সিংহ সুপরিচিত প্রাচীন চামারগড় রাজপুত-জাতিসম্ভূত। ইঁহারা চন্দ্রবংশীয় এবং গার্গ-গোত্রজ। এককালে রাজস্থানে গোর-সম্প্রদায় সবিশেষ সম্মানিত ছিল। বাঙ্গালার প্রাচীন রাজবংশ এই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁহাদের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীকে এই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাগজপত্রে তাঁহাদিগকে 'আজমীরের গোর' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "ভবিষ্যপুরাণে' এবং 'পৃথ্বিরাজের যুদ্ধ' নামক গ্রন্থে তাঁহাদিগকে সুপ্রসিদ্ধ সেনানায়ক বলা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে একজন মধ্যভারতের সুপুরে এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। ৭০০ বৎসরের মুসলমান শাসনের পরও ইহা টিকিয়া আছে। এই সুবিখ্যাত পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণকে 'শূরবর' আখ্যায় অভিহিত করা হইত। যুদ্ধকালে বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন বলিয়া ইঁহাদিগকে এই আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রাচীন অধিবাসই হইল—সুপুরে।

এই প্রসিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দুঃশাসন সিং সুপুর রাজ্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দান করিয়া মোগল-সম্রাট আকবরের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন। ইনি কয়েকটি স্থান সম্রাটের অধিকারভুক্ত করিলে সম্রাট আকবর তাঁহার উপর প্রীত হইয়া তাঁহাকে এক প্রস্থ বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক পরিচ্ছদ ও তৎসহ মির্জাপুর জেলার বাগাহা, আদালপুরা ও পাথলগড় তালুক এবং সমগ্র

কিরাত পরগণা ও সাসেরাম পরগণার অন্তর্ভুক্ত ধাউদণ্ড ও তিলোথু তালুক পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন।

তাঁহার পুত্র রাজা শার্ঙ্গধর ধাউডণ্ডে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রোটাসের রাজদুর্গও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল।

রাজা শার্ঙ্গধরের পুত্রের নাম রাজা দেওসাহী। ইঁহার রাজত্বকালে চেরোরাজ ভগবন্ত রায় বাদশাহ জাহাঙ্গীর-প্রেরিত সেনাদলের হস্তে যথাক্রমে মোরাং, তিরবহুত ও ভোজপুর নামক স্থানে পরাজিত হইয়া রাজা দেওসাহীর নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাসেরামের নিকটবর্ত্তী ধাউদণ্ড গ্রামের দুর্গে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। রাজা দেও সাহীর কনিষ্ঠ পুত্র ঠাকুরাই পুরণমল ভগবন্ত রায়কে সঙ্গে লইয়া পালামৌ-অভিমুখে যাত্রা করেন। পালামৌ সেই সময়ে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত সিরগুজার বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষ রাক্‌সেলগণের অধিকারাধীন ছিল। ঠাকুরাই পুরণমল ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে পালামৌ অধিকার করিয়া রাজা ভগবন্ত রায়কে তথাকার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। সেই সময়ে উভয়পক্ষে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, ঠাকুরাইগণই এই দেশ-শাসনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং ভগবন্ত রায়ের বংশধরদিগের মধ্য হইতে পালামৌয়ের ভবিষ্যৎ অধীশ্বরকে নির্ব্বাচিত করিবেন। ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঠাকুরাইগণের ইঙ্গিতে তাঁহারাই পালামৌয়ের রাজ-সিংহাসনের অধিকারী মনোনীত হইতেন। মোগল বাদশাহগণ পর্য্যন্ত ঠাকুরাইদিগের এই কর্ত্তৃত্ব মঞ্জুর করিতেন। মোগল বাদশাহগণ ঠাকুরাইদিগকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। ঠাকুরাইগণ যুদ্ধব্যাপারে মোগলদিগের সহায়তা করিতেন। এই জন্য ঠাকুরাই-পরিবার মোগল বাদশাহদিগের নিকট হইতে বিস্তর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদশাহ আলমগীর, মহম্মদ শাহ ও ফেরকসায়ার

কর্ত্তৃক প্রদত্ত ফারমানে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঠাকুরাই পুরণমলের বৃদ্ধ প্রপৌত্র কিরাত সিং, কনক সিং এবং নেইত সিং মোগল বাদশাহদিগের এতই প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, তাঁহারা বাদশাহদিগের সিংহাসনের বেদীতে উপবেশন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন।

ঠাকুরাই অমরসিংহ কিরাতসিংয়ের পুত্র। ইনি ১৭২১ খৃষ্টাব্দে চেরো-রাজ রণজিৎ রায়কে পরাভূত করেন ও তাঁহার সিংহাসনে জয়কৃষ্ণ রায়কে অভিষিক্ত করেন। তিনি পালামৌ-সীমান্তে পিণ্ডারী দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার তিন পুত্রের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠটী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ইহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম ঠাকুরাই ভক্তউরসিং; ইহার বংশধরগণ চৈনপুরে বাস করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম—শকতসিং, ইনিই রঙ্কার বর্ত্তমান অধীশ্বর কুমার গিরিবর প্রসাদ সিংয়ের পূর্ব্বপুরুষ।

ঠাকুরাই শকতসিংয়ের পুত্রের নাম—ঠাকুরাই সনাথ সিং। সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইয়া টাপ্পা চেক্‌তিতে নিষ্কর ২৭টী গ্রাম লাভ করেন ' এই সকল গ্রাম উত্তরাধিকারসূত্রে কুমার গিরিবরপ্রসাদের হস্তগত হইয়াছে। রাজা জয়কৃষ্ণ রায় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইঁহাকে নিহত করেন।

ঠাকুরাই সনাথ সিংয়ের পুত্র ঠাকুরাই রাজা শিউপ্রসাদ সিং। যখন ইহার পিতা নিহত হন, তখন ইহার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। এত অল্প বয়সে তিনি সসৈন্যে রাজা রাজকৃষ্ণ রায়ের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাঁহাকে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চেৎমা পাহাড়ের নিকটে পরাজিত ও নিহত করিয়া চিত্রজিৎ রায়কে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া দেন।

ইহার কিছুদিন পরে চেরো-রাজসিংহাসন লাভ করিবার জন্য রাজবংশীয় আত্মীগণের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে রাজ্যময়

অশান্তি দেখা দিল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। অশান্তি-দমনের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পাটনা-স্থিত প্রতিনিধি কাপ্তেন ক্যামাক একদল সৈন্য পালামৌ অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুরাই রাজা শিউপ্রসাদ সিং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সৈনিক দিয়া সাহায্য করিলেন। ফলে পালামৌয়ের রাজা গোপাল রায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রাজ্য অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। কাপ্তেন ক্যামাক পালামৌ হইতে চলিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই রাজা গোপাল রায় ব্রিটিশ পক্ষীয় কানুনগোকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিলেন নিহত কানুনগোর আত্মীয়বর্গ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইলেন। সেই সময়ে লেস্‌লিগঞ্জে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সামান্য একদল সৈনিক ছিল। সাপুরে রাজা গোপাল লাল রায় একটী নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই সৈনিকদল তদভিমুখে যাত্রা করিল। এই সময়েও ঠাকুরাই রাজা শিউপ্রসাদ সিং তৎপরতার সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সহায়তা করিলেন। তিনি স্বব্যয়ে ৪০০ সৈনিক পালামৌতে রাখিয়া তথাকার ব্রিটিশ প্রতিনিধি মিঃ ক্রফোর্ডের সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে রাজা গোপাল রায় বন্দী হইয়া ছাতরায় প্রেরিত হন; কিন্তু তথায় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিম্নে একখানি পত্র প্রকাশিত হইল। এই পত্র মিঃ ক্রফোর্ড মিঃ লেস্‌লিকে লিখিয়াছিলেন। ইহাতে ঠাকুরাই রাজা শিউপ্রসাদ সিং সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

ছাত্‌রা, ২৬শে অক্টোবর,
১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রিয় মিঃ লেস্‌লি,

আপনি পালামৌ যাইতেছেন। এই পত্রখানি ঠাকুরাই শিউপ্রসাদ সিংয়ের মারফতে আপনি পাইবেন। ইঁহাকে আপনি অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে দেখিবেন। কারণ, এই জেলার মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ও গুণবান। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে পালামৌতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্রোহ-দমনের জন্য স্বব্যয়ে ৪০০ লোক রাখিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি উপযুক্ত পুরস্কার পান নাই। সুতরাং এ অবস্থায় যদি আপনি তাঁহার বার্ষিক রাজস্ব কমাইয়া দিতে পারেন বা অন্য প্রকারে তাঁহার আয় বাড়াইতে পারেন, তাহা হইলে অতি সঙ্গত কার্য্য হইবে। আপনি এ কার্য্য করিলে আমি বাধিত হইব। ইতি

আপনার চিরানুগত

(স্বাক্ষর) জে ক্রকোর্ড।

রাজা গোপাল রায়ের মৃত্যুর পর বসন্ত রায় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন; কিন্তু ঐ বৎসরই অর্থাৎ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা চূড়ামণ রায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ঠাকুরাই রাজা শিউপ্রসাদ সিং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিপদের সময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বার্ষিক রাজস্ব কমাইয়া ৮০০৲ করিয়া দেন। রাজা চূড়ামণ রায়ের নাবালক অবস্থায় ঠাকুরাই রাজা শিউপ্রসাদ সিং সামন্ত-রাজের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে এই অধিকার প্রদান করেন। ঠাকুরাই রাজা শিউপ্রসাদ সিং এই সময়ে সমগ্র পালামৌ পরগণার শাসন-ব্যাপারে

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় ও সুচারুরূপে কর্ত্তব্যপালনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

চূড়ামণ রায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তাঁহার রাজ্যের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু রাজ্য-পরিচালনে সমর্থ হইলেন না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল জোন্‌স একদল সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলে বিদ্রোহীরা সিরগুজায় পলায়ন করিল। তখন গভর্ণমেণ্ট ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহীদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিবার ও উহারা পালামৌতে যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাদের প্রধান আড্ডা—সিরগুজায় দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন। পর বৎসর গভর্ণমেণ্ট ছয়মাসের জন্য সিরগুজা যুদ্ধে ঠাকুরাই রাজা শিউপ্রসাদ সিংকে কর্ণেল জোন্‌সের সরকারী নিযুক্ত করেন। তিনি এই কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন।

রাজা চূড়ামণ রায় অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং রাজ্য-পরিচালনেও অসমর্থ ছিলেন। এই জন্য তিনি দেউলিয়া হইয়া পড়েন। তাঁহার রাজ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট ৫৫,৭০০৲ টাকা রাজস্ব বাকী পড়ে। গভর্ণমেণ্ট তখন পালামৌ পরগণা নিলামে চড়াইয়া দেন এবং ৫১ হাজার টাকায় গভর্ণমেণ্টই উহা ক্রয় করেন। এই সময়ে ঠাকুরাই রাজা শিউপ্রসাদ সিংয়ের পুত্র উত্তরাধিকারী ঠাকুরাই বসন্ত সিং পালামৌ পরগণার জরিপ ও রাজস্ব-নির্দ্ধারণ-ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের প্রভূত সহায়তা করেন এবং গভর্ণমেণ্ট এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে একটি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট ও "পাগড়ী" প্রদান করেন।

সার্টিফিকেটের অনুবাদ।

ঠাকুরাই বসন্ত সিং জরিপ ও রাজস্ব-নির্দ্ধারণ-ব্যাপারে আমাকে

প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমি এই কার্য্য করিতে পারিতাম না। তাঁহার এই গুণের ও যোগ্যতার পুরস্কার এবং সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ আমি এই "পাগড়ী" তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতেছি।

(স্বাক্ষর) ন্যাথ, স্মিথ।

লোহারডাগা, ২৪শে মার্চ্চ, ১৮২৪।

ঠাকুরাই বসন্ত সিংয়ের পর তাঁহার পুত্র রায় ঠাকুরাই কৃষ্ণদয়াল সিং বাহাদুর তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভোগ্‌টা বিদ্রোহের সময়ে ইনি ও ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঠাকুরাই দেওনাথ সিং (বর্ত্তমান কুমারের পিতামহ) বিদ্রোহীদিগকে পেন্‌লি, বাহাহারা, পালামৌ-কিল্লা, গুগুমারাঘাট ও বাঘওয়ার নামক স্থানে পরাজিত করেন এবং এই বিদ্রোহ দমন করিতে ও ভোগটা বিদ্রোহের নায়ক—পীতাম্বর সাহী, লীলাম্বর সাহী ও অপর চারি জনকে গ্রেপ্তার করিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে প্রভূত সাহায্য করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রায় বাহাদুর ঠাকুরাই কৃষ্ণদয়াল সিং রামগড় সেনাদলের ভূতপূর্ব্ব হাবিলদারকে এবং আরও কয়েকজন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যাপারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাহার্য্য করেন। এতদ্ব্যতীত যখন ৯০০ বিদ্রোহী গভর্ণমেণ্টের বলগড় থানা আক্রমণ করে, সেই সময়ে তিনি এই থানা বিপুল বিক্রমের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বীরত্ব ও সাহসের প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি এবং তৎসহ একটি রাইফেল বন্দুক, একছড়া মুক্তার মালা, একটি মাথার পোষাক এবং কতকগুলি বিশেষত্বজ্ঞাপক পরিচ্ছদ প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত ২১টি গ্রামসমন্বিত টাঁপা বারকল পরগণা ইনামী-জায়গীর-স্বরূপ দান করেন। ১৮৬০

খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রায় বাহাদুর ঠাকুরাই কৃষ্ণদয়াল সিং অনারারী এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি অনশনক্লিষ্ট নরনারীকে সাহায্য করিবার জন্য অক্টোবর মাসে পাল্কীতে বহু অর্থব্যয়ে একটি গোলা নির্ম্মাণ করেন। এই সৎকীর্ত্তির জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে যুবরাজের সম্বর্দ্ধনার্থ বাঁকিপুরে যে দরবার আহ্বান করেন, সেই দরবারে রায় বাহাদুরকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

রায় কৃষ্ণদয়াল সিং বাহাদুর গভর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা হইল:—

ভারত গভর্ণমেণ্টের
এসিষ্টাণ্ট মীর মুন্সি
ইজ্জহার হুসেনের
শীলমোহর।

(স্বাক্ষর) ক্যানিং,
ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও গভর্ণর-জেনারেল।

ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও স-কৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল রঙ্কার রায় কৃষ্ণদয়াল সিং বাহাদুরকে 'রায় বাহাদুর' উপাধির এই সনন্দ প্রদান করিলেন—

"বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি বিদ্রোহের সময়ে আপনার লোকজন সহিত লেপ্টেনাণ্ট গ্রেহামের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং আপনার পক্ষের অন্যান্য লোকেরা বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; তাহাতে পালামৌ জেলায় পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই জন্য আপনাকে আমরা 'রায় বাহাদুর উপাধি ও তৎসহ ১০০০৲ এক হাজার টাকা খিলাত

করিতেছি। আপনি এই দান ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শুভেচ্ছামূলক ও আপনার কৃতকর্ম্মের প্রশংসামূলক মনে করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কল্যাণ-সাধনে চেষ্টিত হইবেন। আপনি এই দান গৌরব ও সম্মান-জনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

এলাহাবাদ, ১৫ই নভেম্বর, ১৮৫৮ (স্বাক্ষর) ইজ্জহর হুসেন, ভারত গভর্ণমেণ্টের এসিষ্টাণ্ট মীর মুন্সি

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী গত ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ছোটনাগপুরের কমিশনারকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

"ঠাকুরাই কৃষ্ণদয়াল সিং ও রঘুবর দয়াল সিং বিদ্রোহের সময়ে বরাবর গভর্ণমেণ্টকে ঐকান্তিকভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। আমার অনুরোধ আপনি ছোটলাট বাহাদুরের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন।"

(স্বাঃ) এ বি ইয়ং
বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।
[অবিকল নকল]

(স্বাঃ) আর সি বোবিয়েলক, লেপ্টেনাণ্ট
কমিশনারের সহকারী।
[অবিকল নকল)

(স্বাঃ) জে এস ডেভিস
কমিশনারের সিনিয়র এসিষ্টেণ্ট।
[অবিকল নকল]

(স্বাঃ) জে কোলম্যান
এক্সট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ে রায় ঠাকুরাই কৃষ্ণদয়াল সিং বাহাদুরের বদান্যতায় মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পালামৌয়ের এক্সট্রা-এসিষ্টাণ্ট কমিশনার মিঃ ক্যাম্‌বেল এই প্রসঙ্গে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম :—

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে আপনি দুর্ভিক্ষের সময়ে আপনার রাজ্যের প্রজাদের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত ছোটলাট বাহাদুর আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি আপনার কার্য্যে যেমন প্রীত হইয়াছেন তেমনই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন নাগারের ভাইয়া ভগবান দেওয়ের উপরে; কারণ ইনি দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাগণের ক্লেশ-মোচনের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই।

(স্বাক্ষর) ডব্লিউ এন ক্যাম্বেল,
এক্সট্রা-এসিষ্টাণ্ট কমিশনার।

রায় ঠাকুরাই কৃষ্ণদয়াল সিং বাহাদুর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঠাকুরাই মহীপাল সিং; কিন্তু ইনি রায় বাহাদুরের জীবিতকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঠাকুরাই মহীপাল সিংয়ের তিন পুত্র; ঠাকুরাই দেওনাথ সিং, রায় ঠাকুরাই যদুনাথ সিং বাহাদুর এবং ঠাকুরাই দ্বারকাপ্রসাদ সিং।

ঠাকুরাই দেওনাথ সিংয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরাই জানকীপ্রসাদ সিং

সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঠাকুরাই দেওনাথ সিং রায় বাহাদুর কৃষ্ণদয়ালের মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন।

রক্কার বর্ত্তমান রাজপরিবার ঠাকুরাই মহীপাল সিংয়ের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রগণ দ্বারা গঠিত এবং পরিবারভুক্ত প্রত্যেকেই পূর্ব্বপুরুষের মত লোকহিতৈষী ও ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি অনুরাগী।

ঠাকুরাই জানকীপ্রসাদ সিং বিদ্রোহী কোরওয়াস সম্প্রদায়কে দমন করিবার জন্ত গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কোরওয়াস জাতি সিরগুজা রাজ্যের অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত রাজরাজেশ্বরী"-উপাধি-গ্রহণ-উপলক্ষে রাঁচিতে এক দরবার বসিয়াছিল। সেই দরবারে ঠাকুরাই জানকীপ্রসাদ সিং নিমন্ত্রিত হন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দরবার মণ্ডপে এক সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। তাহাতে তাঁহার, তাঁহার পিতৃদেব ও খুল্লতাত মহাশয়ের রাজভক্তি এবং গভর্ণমেণ্ট সহযোগিতার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করা হইয়াছিল। ঠাকুরাই জানকীপ্রসাদ সিং সকল সময়েই গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

ঠাকুরাই জানকীপ্রসাদের মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুজ রাজা গোবিন্দপ্রসাদ সিং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি রক্কাতে একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালন করেন। এই দুই সদনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার প্রজাবর্গ সবিশেষ উপকার লাভ করিয়াছে। তিনি প্রজাবর্গের দুঃখ ও অভাব-মোচনে এবং তাহাদের কল্যাণ-সাধনে সদাই তৎপর ছিলেন। ১৮৯০ ও ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে অনশন-ক্লিষ্ট নর-নারীর সাহায্যার্থ তিনি মাটি কাটা এবং ইমারত নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া কয়েক সহস্র

রাজা গোবিন্দপ্রসাদ সিং ও পরিবারবর্গ।

টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি ডালটনগঞ্জে ইলিয়ট-কূপ, ফ্রেজার জলের কল, ভিক্টোরিয়া ও এডওয়ার্ড স্মৃতি-মন্দির এবং এলাহাবাদে মিণ্টো স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের জন্য মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই জেলায় এমন কোনও সাধারণ-হিতকর অনুষ্ঠান নাই যাহা তাঁহার অর্থসাহায্য লাভ করে নাই। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এনড্রু ফ্রেজার তাঁহাকে বেলভিডিয়র প্রাসাদে 'রাজা' উপাধির সনন্দ-প্রদান-কালে তাঁহার রাজভক্তি ও জনহিতৈষিতার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি রাজা গোবিন্দ-প্রসাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এই :—

"পালামৌয়ের রাজা গোবিন্দপ্রসাদ সিং প্রসিদ্ধ জমিদার এবং এই অঞ্চলের অতীব প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশভুক্ত। তিনি সুবিবেচক, ধীরবুদ্ধি এবং প্রজাবর্গ ও জনসাধারণের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব আছে। দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বিপত্তির সময়ে তিনি মুক্তহস্তে প্রজাবৃন্দকে সাহায্য দান করিয়া থাকেন।"

গোবিন্দপ্রসাদ সিং নানাবিধ সদনুষ্ঠান ও রাজভক্তির জন্য ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'রায় বাহাদুর' এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। ইনি অশ্বারোহণ-বিদ্যায় পারদর্শী, শিকারে সুদক্ষ এবং সাহসী ও নির্ভীক। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টো ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সর্ব্বপ্রথম ইঁহারই রাজ্যস্থ জঙ্গলে ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালা দেশের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে দিল্লীর করোনেশন দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সম্রাটদম্পতীর অভ্যর্থনা উপলক্ষে কলিকাতায় যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, ইনি তাঁহার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

রাজা গোবিন্দপ্রসাদ সিং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬

খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং কর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

কুমার গিরিবরপ্রসাদ সিং

রাজা গোবিন্দপ্রসাদ সিংয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র—কুমার গিরিবরপ্রসাদ সিং এক্ষণে উত্তরাধিকারীস্বরূপ রঙ্কার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গভর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত 'কুমার' উপাধিধারী। ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন বেনারসের 'কুইনস কলেজে' অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি রাজভক্ত ন্যায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সুদক্ষ শিকারী, লক্ষ্যবেধ--বিদ্যায় পটু, পারদর্শী তরবারী-চালক এবং ইঁহার পিতার ন্যায় অশ্বারোহণে সুনিপুণ।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লী সহরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উপলক্ষে যে দরবার হইয়াছিল, ইনি সেই দরবারে বাঙ্গালা দেশের অন্য তম প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের লেভীতেও তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছোটনাগপুরের জমিদার-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে দুইবার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য দানের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য :—ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান ওয়ার রিলিফ ফণ্ড—৬০০০৲; পাঁকি দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণকল্পে ১০০০৲ টাকা; ডালটনগঞ্জের দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতির জন্য—১০০০৲ টাকা; সেণ্ট জন আম্বু-লেন্স ও আওয়ার ডে ফণ্ডে—১০০০৲ টাকা।

কুমার গিরিবরপ্রসাদ সিংয়ের পিতামহ রায় ঠাকুরাই

কুমার গিরিবরপ্রসাদ সিং

যদুনাথ সিং বাহাদুরের বয়স এক্ষণে ৮০ বৎসর। তাঁহার জেলার মধ্যে তিনি একজন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। জনহিতকর কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

ছোটনাগপুরের উচ্চ উপত্যকা ভূমির উপর রঙ্কা রাজ্য অবস্থিত। উহার পরিমাণফল ৪১৬ বর্গ মাইল। এই রাজ্যের ভিতরে বিশাল অরণ্য আছে এবং তাহাতে শিকারের এমন কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্থান আছে যাহা সমগ্র পালামৌ জেলার অন্য কোথাও নাই।

কথিত আছে,—এই রাজবংশের কোনও পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে বহু ভিক্ষুককে (রঙ্ক) প্রতিপালন করিতেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে—রঙ্কা-রাজবংশ।

বংশ-তালিকা।

রাজা দুঃশাসন সিং
|
রাজা শার্ঙ্গধর
|
রাজা দেও সাহী ওরফে মোকাম সিং
|
(১) রাজা হেমসাহি — (২) ঠাকুরাই পূরণ মল

ঠাকুরাই পূরণ মল
|
ঠাকুরাই ভারথি চাঁদ
|
(১) ঠাঃ মদন সিং — (২) ঠাঃ কুঙ্কুম সিং (চাপিতে আছেন)

৫

ঠাঃ মদন সিং

ঠাকুরাই সুরত সিং

(১) ঠাঃ নৈইতালল সিং (২) ঠাঃ কনক সিং (৩) ঠাঃ কিরাত সিং

ঠাঃ হিমৎ সিং ঠাঃ বোধ সিং ঠাঃ অমর সিং

ঠাঃ শিউ সিং ঠাঃ জগ সিং

ঠাঃ জিৎ সিং ঠাঃ পরিশাল সিং

(১) ঠাঃ শক্ত সিং (২) ঠাঃ ভক্তেশ্বর সিং ৩। ঠাঃ শত্রুদলন সিং

(ইনি চৈনপুরে বসবাস করেন)

(১) ঠাঃ সনৎ সিং ঠাঃ বুলাকি সিং

(ইনি বুধিবীরে থাকেন)

ঠাকুরাই সনৎ সিং

ঠাকুরাই শিউপ্রসাদ সিং

ঠাকুরাই বসন্ত সিং

ঠাঃ বসন্ত সিং

ঠাঃ বৈদ্যনাথসিং জগমোহনসিং রায় কৃষ্ণদয়ালসিং মহীপালসিং অনুজসিং
বাহাদুর

ঠাকুরাই দেওনাথ সিং রায় ঠাঃ যদুনাথ সিং ঠাঃ দ্বারকাপ্রসাদ সিং

জানকীপ্রসাদ তুলসীপ্রসাদ রাজা গোবিন্দপ্রসাদ লক্ষ্মীপ্রসাদ অজিৎপ্রসাদ

কুমার গিরিবর প্রসাদ সিং রাজেশ্বরপ্রসাদ দেবেন্দ্রপ্রসাদ সরযূপ্রসাদ জগদীশপ্রসাদ

শশিশেখরপ্রসাদ সিং

ঠাকুরাই রায় যদুনাথ সিং বাহাদুর

বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ

কামেশ্বরপ্রসাদ সিং প্রভৃতি

নাগেশ্বরপ্রসাদ সিং গুপ্তেশ্বরপ্রসাদ সিং

নাগেশ্বর প্রসাদ সিং
|
চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ সিং

ঠাকুরাই দ্বারকাপ্রসাদ সিং
|
- ভগবানপ্রসাদ সিং
  - রুদ্রপ্রসাদ সিং প্রভৃতি
- কালীপ্রসাদ সিং
- ঠাকুরপ্রসাদ সিং
  - হরপ্রসাদ সিং প্রভৃতি

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে-সি-আই-ই বাঙ্গালী জাতির গৌরবস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার নাম কেবল বাঙ্গালী নয় শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেই সগৌরবে উল্লেখ করিয়া থাকেন। আইনে যেমন স্যর রাসবিহারী ঘোষ, পাণ্ডিত্যে যেমন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সাহিত্যে যেমন কবিবর রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানে যেমন স্যর জগদীশ ও স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র, পূর্ত্তবিদ্যায় ও বাণিজ্যক্ষেত্রে তেমনই স্যর রাজেন্দ্রনাথ।

ইংরেজী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটের নিকটস্থ গ্রামে ব্রাহ্মণ-পরিবারে রাজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের পূর্ত্তবিদ্যা-বিভাগে (engineering branch) ভর্ত্তি হন। তথায় তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর তিনি পল্‌তায় জলের কল-নির্ম্মাণের কণ্ট্রাক্ট বা ঠিকা লন। এই কার্য্য করিবার সময়ে তিনি জলের কল-নির্ম্মাণ-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মেসার্স ওয়াল্‌স লোভেট এণ্ড কোম্পানীর সহিত একযোগে এলাহাবাদে জলের কল-নির্ম্মাণের ভার চুক্তিবদ্ধ হইয়া গ্রহণ করেন। এই কোম্পানীই পরে মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোম্পানী নামে অভিহিত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্যর একুইন মার্টিনের অংশীরূপে ব্যবসায় আরম্ভ এবং মার্টিন কোম্পানীর

ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ

পত্তন করেন। বাঙ্গালাদেশের প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান নগরে, যুক্তপ্রদেশের বড় বড় নগরে এবং কাশ্মীর-রাজ্যে জলের কল নির্ম্মাণের জন্য মার্টিন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। জলের কল পত্তন করা সম্বন্ধে রাজেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সুতরাং মার্টিন কোম্পানীর সুযশঃ শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং নানা স্থান হইতে তাঁহাদের উপর জলের কল পত্তন করিবার আদেশ আসিতে লাগিল।

রাজেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মার্টিন কোম্পানী দেশময় ছোট ছোট রেলপথ বা লাইট রেলওয়ে (Light Railways) নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই নূতন কর্ম্মে তিনি যথেষ্ট সফলতাও লাভ করিলেন। এই সকল লাইট রেলওয়ের তিনি অন্যতম ডিরেক্টর। পূর্ত্তকর্ম্মে মার্টিন কোম্পানী এরূপ খ্যাতি-প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়া পড়িলেন যে, ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধের নির্ম্মাণ-ভার তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত করা হইয়াছে। মার্টিন কোম্পানী এই বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন। কলিকাতার বহু সরকারী ও বে-সরকারী সুন্দর সুন্দর ইমারত মার্টিন কোম্পানীই নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অংশী স্যর একুইন মার্টিন লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রনাথ মার্টিন কোম্পানীর প্রধান অংশীদার হইয়াছেন। মার্টিন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা যেমন বাড়িতেছে, উঁহাদের কার্য্যের বিস্তৃতিও তেমনই ঘটিতেছে। রাজেন্দ্রনাথ বিচক্ষণ উন্নতিশীল পুরুষ; তাই কার্য্যবিস্তৃতির সহিত তিনি অভিজ্ঞতার প্রসার বৃদ্ধি করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ইউরোপের বড় বড় কলকারখানা ও পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ কোম্পানীর কার্য্যাবলী পরিদর্শনের জন্য তিনি কয়েকবার ইউরোপে গমন করিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিয়া

আসিয়াছেন। সেই জন্য এত বড় কোম্পানীর সমস্ত কার্য্য তাঁহার নখদর্পণে।

স্যর রাজেন্দ্রনাথ কেবল পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদই নহেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের নানাক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা আছে এবং সে প্রতিভার প্রকৃষ্ট নিয়োগ করিতেও তিনি জানেন। মার্টিন কোম্পানী পূর্ত্তকার্য্য করিয়া থাকেন; কিন্তু স্যর রাজেন্দ্রনাথ মার্টিন কোম্পানীকে জীবন বীমার ব্যবসায়েও প্রবৃত্ত করাইয়াছেন; রেলের ব্যবসায় অবলম্বন করাইয়াছেন। তিনি স্বাবলম্বী ও পুরুষকারসম্পন্ন পুরুষ; তিনি ঘোর অধ্যবসায়ী ও অসাধারণ পরিশ্রমী; তাঁহার বুদ্ধিশক্তিও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তদ্ব্যতীত তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। যে কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া মনে করেন, পূর্ব্ব হইতেই সেই কার্য্যে পারদর্শিতা লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই সকল গুণের সমাবেশ তাঁহার চরিত্রে যথেষ্ট আছে বলিয়াই তিনি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, সেই কার্য্যেই অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করেন।

স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতি যাহাতে হয়, সে পক্ষে তিনি প্রয়াসী। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় যে 'ভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনী' হইয়াছিল, তিনি উহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধ্যক্ষ-পদে বৃত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের যোগ্যতা অসাধারণ। গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ইহা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে

দেশ ও দশের কার্য্য

গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার শাসন পরিষদের (Bengal Executive Council) সদস্য পদ তাঁহাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং তিনিও প্রভূত আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়া উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও কারণ-

বশতঃ তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তখন রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীকে এই পদ প্রদান করা হয়। তিনি কিছুকাল কলিকাতার অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি 'ডিষ্ট্রিক্ট্ চেরিটেবেল সোসাইটি'র সদস্যরূপে, কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের অবৈতনিক সম্পাদকরূপে এবং এডওয়ার্ড স্মৃতি-সমিতির সদস্যরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হন এবং এক বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে কংগ্রেস-মণ্ডপে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। রাজেন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিতে হইলে যে রক্ষণ-নীতির প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক—ইহা তিনি স্পষ্টভাষায় বলিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"এ দেশের কোনও শিল্পজাত সামগ্রী যদি বিদেশী পণ্যের আমদানীর সঙ্কোচ করে, তাহা হইলে বিদেশী শিল্পীর দল কিছু দিনের জন্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এত অল্প মূল্যে সেই সকল পণ্য আমাদের দেশে আনিয়া ফেলিবে যে, সেইরূপ মূল্যে আমরা সেই পণ্য যোগাইতে পারিব না। কাজেই আমাদের নূতন শিল্প স্থায়ী হইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় স্বদেশী শিল্পসামগ্রীকে রক্ষা করিবার জন্য যদি কোনও উপায় করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে স্বদেশী সামগ্রী ত বাজারে বিকাইবে না।" স্বদেশী শিল্পসামগ্রীকে বাজারে চালাইতে হইলে গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে যাহা করা উচিত রাজেন্দ্রনাথ তাহা দশ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া দিয়াছেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে রাজেন্দ্রনাথ সি-আই-ই

উপাধিতে ভূষিত হন। তৎপরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উপলক্ষে তিনি কে-সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন।

রাজ-সম্মান লাভ

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যর রাজেন্দ্র শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সভায় তিনি বলিয়াছিলেন:— 'বাঙ্গালীর মধ্যে সাধারণতঃ ভাল ইঞ্জিনীয়ার হয় না, এই অভিযোগ প্রায়ই শুনা যায় এবং অনেকে আরও বলেন যে, আমরা কোনও কাজ নিজেরা অগ্রণী হইয়া করিতে পারি না; আমাদের সাহস নাই এবং বহু লোককে খাটাইয়া লইতে বা শাসন-সংযত করিয়া রাখিতে আমরা জানি না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙ্গালীর ধাতুতে এমন কোনও পদার্থ নাই যাহাতে তাহাকে ভাল ইঞ্জিনীয়ার হইতে দেয় না। যদি বাঙ্গালা দেশে স্যর সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (এক্ষণে লর্ড সিং) ও স্যর রাসবিহারী ঘোষের মত ব্যবহারাজীব, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের মত বিচারপতি, ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার ও ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর মত চিকিৎসক; আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক এবং কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সাহিত্য-রথীর উদ্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ভাল ইঞ্জিনীয়ারের আবির্ভাব হইবে না কেন? শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র-বন্ধুগণ! বাঙ্গালীর নামে এই যে কলঙ্ক ঘোষিত হয়, ইহা দূর করিবার ভার তোমাদের উপর ন্যস্ত। তোমাদের দেশবাসিগণ অন্যান্য বিভাগে যেরূপ সাফল্য লাভ ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, পূর্ত্তবিভাগীয় কর্ম্মে তোমরাও সেইরূপ খ্যাতি-

প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বাঙ্গালী জাতীকে গৌরবান্বিত কর। তাহা হইলে এই কলেজের নাম সার্থক হইবে ; কারণ তোমরা এখানে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছ এবং এইখানকার শিক্ষার উপরই তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইবে। এদেশে আইন ও চিকিৎসাবিদ্যায় উপার্জ্জন যত অধিক হয়, পূর্ত্তবিদ্যায় তেমন হয় না। এইজন্যই আমার মনে হয়, উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা পূর্ত্তবিদ্যা শিক্ষা করিতে অগ্রসর হয় না। তাহার উপর পূর্ত্তবিদ্যা শিখিতে হইলে কায়িক পরিশ্রমও করিতে হয়। সেইজন্যও অনেক ছাত্র এখানে আসিতে চায় না।

"তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ত্তবিদ্যা-বিষয়ক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ইঞ্জিনীয়ার হও নাই। তোমাদিগকে এখনও অন্ততঃ ২।৩ বৎসর কাল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে কয়েকটি উপদেশ দিতেছি; আশা করি, সেগুলি তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনকই হইবে। উপদেশগুলি এই :— ১। কলেজ হইতে বাহির হইবার পর অধ্যয়ন ত্যাগ করিও না ; পূর্ত্তবিদ্যা সম্বন্ধে নিত্য যে সকল নূতন নূতন জ্ঞানের প্রচার হইতেছে, সেগুলির সহিত পরিচিত থাকিবে। ২। একথা স্মরণ রাখিবে যে, পূর্ত্তবিদ্যা-সংক্রান্ত সকল বিভাগে পারদর্শিতা লাভ করা অসম্ভব। মোটামুটী সাধারণ জ্ঞান লাভ করিবার পর কোনও একটী বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়া লইবে এবং সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবার চেষ্টা করিবে। ৩। কায়িক পরিশ্রম করিতে কোনও প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিও না। প্রয়োজন হইলে নিজের হাতে কাজ করিতে হইবে ; কারণ এরূপ না করিলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় না। যদি প্রয়োজন হয়, ইঞ্জিন চালাইতে, পাম্প বা কলের চাকা ঘুরাইতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইও না। তোমার অধীনে যাহারা কর্ম্ম করিয়া

থাকে তাহারা যদি জানিতে পারে যে, তুমি তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দক্ষভাবে তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলে তাহারা তোমায় সম্মানও করিবে এবং তোমার বাধ্যও হইবে। ৪। ব্যবহারিক যন্ত্র-বিজ্ঞান বেশ ভাল করিয়া আয়ত্ত করিও ; কারণ, যন্ত্র-বিজ্ঞানে পারদর্শী না হইলে ভাল সিবিল ইঞ্জিনীয়ার হওয়া যায় না। ৫। পথে যখন যাইবে, তখন চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া যাইবে। পূর্ত্তকার্য্যের সামান্ত খুঁটিনাটিও যদি দেখিতে পাও, ভাল করিয়া তাহা দেখিবে। বাড়ীতে যাইয়া যাহা দেখিলে তাহা খাতায় টুকিয়া রাখিবে। ৬। তোমার উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের আদেশ সর্ব্বদা পালন করিবে এবং তাহা সার্থক করিবার চেষ্টা করিবে। ৭। যদি কোনও সাধারণ কারিগর তোমাকে তাহার কার্য্যের সম্বন্ধে কোনও কথা বলে, বা সে সম্বন্ধে তোমার সহিত আলোচনা করিতে চায়, তাহা হইলে তুমি ধীরভাবে তাহার বক্তব্য শুনিবে। দেখিবে যে, তোমার উচ্চ কলেজী শিক্ষা সত্বেও তাহার নিকট হইতে নূতন কিছু শিখিতে পারিবে। ৮। কর্ম্মের দায়িত্ব সর্ব্বদাই গ্রহণ করিবে। যদি কোনও ভ্রম-প্রমাদ হয় তাহা স্বীকার করিবে। ভুল-ভ্রান্তিই মানুষকে অভিজ্ঞতার পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। ৯। কোনও ভুলের জন্য কখনও তোমার অধীন কর্ম্মচারীদিগকে তিরস্কার করিও না ; বা সে ভুলের বোঝা তাহাদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিও না। ১০। অধীন কর্ম্মচারীদিগের সহিত ব্যবহার করিবার সময় ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং দৃঢ় হইবে। কারণ, ন্যায় ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক ব্যবহার দ্বারাই তোমরা তাহাদের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারিবে। ১১। যখন সাধারণ ও প্রচলিত কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তখন তোমার অধীন কর্ম্মচারীদিগকে এরূপ করিবার কারণ বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে। তাহারা তোমার

যুক্তি বুঝিতে পারিলেই তোমার নূতন আদেশ পালন করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। ১২। ন্যায় ও সত্যের দিকে চাহিয়া কর্ম্ম করিবে। ১৩। খুব নিম্নতন কার্য্য লইয়া তোমার জীবন আরম্ভ করিবে। ক্রমে ক্রমে পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও ধীরতার সহিত ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে থাকিবে। তোমার অব্যবহিত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কর্ম্ম ভাল করিয়া শিখিয়া রাখিবে। ১৪। নিষ্ফল হইলেও নিরাশ হইও না; অধ্যবসায়ের সহিত অবলম্বিত কার্য্য ধরিয়া থাকিবে; কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, প্রকৃত দায়িত্বজ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও চরিত্রবল থাকিলে পরিণামে সাফল্য আসিবেই আসিবে।"

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি টাটা ইনডষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার পরিচালক-সমিতির সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রেল তারিখে লর্ড রোণাল্ডসে যখন এই ব্যাঙ্কের দ্বার উদ্ঘাটন করেন, সেই সময়ে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—"কিছুদিন হইতে এবং বিশেষতঃ এই যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষকে তাহার নিজের অর্থবলের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইয়াছিল। নূতন নূতন শ্রমশিল্পের পত্তন হইয়াছে। আমরা শ্রমশিল্পের এক বিরাট জাগরণ-যুগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। জর্ম্মণী, অষ্ট্রীয়া ও জাপানের শ্রমশিল্পের উন্নতি ইন্ডষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের দ্বারাই হইয়াছে। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের দ্বারাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমশিল্পগুলির অভ্যুদয়, উন্নতি, বিস্তার ও পুষ্টি ঘটিয়াছে। যে সকল শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যাইত, এই জাতীয় ব্যাঙ্ক সেই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিয়াছে। যাহা অন্যান্য দেশে ঘটিয়াছে; তাহা ভারতবর্ষে ঘটিবে, ইহাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। বোম্বাইয়ের টাটা সন্স এণ্ড কোম্পানী এই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান ইন্ডষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কটীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমাদের প্রভূত গৌরবের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষ

হইতে সাত কোটি টাকা চাঁদা উঠিয়াছে এবং ইউরোপীয়গণ দেড় কোটি টাকা চাঁদা দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ আশা কিছু করেন না, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন।"

স্যর রাজেন্দ্র বঙ্গীয় কুটীর-শিল্প-সমিতির সভাপতি (President of the Bengal Home Industries Association)। এই সমিতি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতি ভারতজাত দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয় ও প্রচার-চেষ্টা করিতেছেন।

১৯১৭।১৮ খৃষ্টাব্দে স্যর রাজেন্দ্রনাথ ভারত-শ্রমশিল্প কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়া ভারতের সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান নগরী পরিদর্শন করিয়াছেন। কমিশনের প্রেসিডেণ্ট স্যর টমাস হল্যাণ্ড কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন এবং স্যর রাজেন্দ্রনাথ প্রেসিডেণ্টের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি সাক্ষ্যে বলেন,—"খালি চাকুরীগুলির অন্ততঃ অর্দ্ধেক ভারতবাসীদিগকে দেওয়া উচিত। আমি প্রকাশ্য-ভাবে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষার পক্ষপাতী। এক্ষণে যে মনোনয়ন-প্রথা চলিতেছে, তাহাতে কেহ সন্তুষ্ট নহে। কারণ, মনোনয়ন প্রথা প্রচলিত থাকায় উৎকৃষ্ট লোক পাওয়া যাইতেছে না।"

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্যর রাজেন্দ্রনাথকে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মনোনীত করেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মণ্টেগু চেমসফোর্ড-প্রস্তাবিত ভারত-শাসন-সংস্কার আইন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা বা খসড়া ভালই হইয়াছে; তবে ইহা সকল সম্প্রদায়ের

আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ হয় নাই। সংস্কার আইনে ভারতবাসীরা যে অধিকার পাইবে, সেই অধিকারের যদি তাহারা সুপ্রয়োগ করিতে পারে, তাহা হইলে আমার স্থির বিশ্বাস, দশ বৎসর পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে স্বায়ত্ত শাসনের পথে আরও অগ্রসর হইবার জন্য আর একপ্রস্থ অধিকার দান করিবেন।”

স্যর রাজেন্দ্রনাথ দশকর্ম্মান্বিত পুরুষ এবং তাঁহার কর্ম্মশক্তিও অসাধারণ। তিনি কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের ও এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের ট্রষ্টি। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ফ্যাকাল্‌টী অফ এন্‌জিনিয়ারিংয়ের সদস্য। তিনি বেঙ্গল ইনজিনিয়ারিং কলেজের পরিচালক-সমিতির সদস্য। তিনি ইংলণ্ডের ইনষ্টিটিউসন অফ মেক্যানিক্যাল এন্‌জিনিয়ার্সের অনারারী লাইফ মেম্বার বা আজীবন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এত বড় বিশিষ্ট সম্মানের পদ তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী পায় নাই। কারণ এই সমিতিতে মাত্র সাত জন সদস্য আছেন, ইংলণ্ডের মহামহিমান্বিত সম্রাট্ ও যুবরাজ তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর তারিখে স্যর রাজেন্দ্রনাথ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন উপলক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কনভোকেসনের বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ও ভাইস-চ্যান্সেলারগণই করিয়া থাকেন। কিন্তু স্যর রাজেন্দ্রনাথ এই দুই জনের একজনও নহেন। সুতরাং একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, স্যর রাজেন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রিত করিয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার একস্থলে তিনি বলিয়াছেন:—

“বিশ্ববিদ্যালয় সারস্বত-আয়তন। এখানকার উচ্চ জ্ঞান, সংস্কার ও

অনুশীলন-প্রবৃত্তির প্রশংসা আমি করিব। কিন্তু আজ আমি আপনাদিগকে অন্য কথা শুনাইব; এই কথা শুনাইতেই আমি আসিয়াছি। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ সামান্যভাবে খাটাইলে আর চলিবে না। পৃথিবীব্যাপী জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। স্বদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ পূর্ণভাবে খাটাইয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশের লোক যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে বিদেশীরা আসিয়া সে কার্য্য করিবে এবং প্রভূত লাভবান্ হইবে। সেই জন্যই বলিতেছি, এই বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার মুখে যদি তোমরা টিকিয়া থাকিতে চাও, তাহা হইলে প্রস্তুত হও। যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ অধিক, এবং যে দেশে তাহা খাটাইয়া লইবার জন্য বিশেষজ্ঞ আছে, সে দেশের সুবিধা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বেশী। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর, এখন যাহাতে সেই সকল সম্পদ হইতে বিপুল ধন অর্জ্জন হইতে পারে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করুন; এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের এখন প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় সে প্রয়োজন পূর্ণ করুন; পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে আমার অনুরোধ, তাঁহারা এমন ভাবের শিক্ষা প্রদান করুন যাহাতে বিশেষবিৎ বৈজ্ঞানিক প্রস্তুত হয় এবং তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়-পরিত্যাগের পরেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। দেশের খনিজ সম্পদ ও কাঁচা মাল হইতে বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দেশে প্রভূত ধনাগমের ব্যবস্থা যাহাতে হইতে পারে, এমন শিক্ষা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করিবার ব্যবস্থা করুন।"

স্যর রাজেন্দ্রনাথ সম্প্রতি নব-গঠিত রেলওয়ে কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। কিছুদিন হইল, তাঁহাকে নিখিল ভারতবিজ্ঞান মহাসম্মেলনের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

স্যর রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতা ক্লবের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম। ইনি এই ক্লবের সেক্রেটারী ছিলেন এবং পরে প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন।

স্যর রাজেন্দ্রনাথের দুই পুত্র ও পাঁচটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠের নাম বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। জিতেন্দ্রনাথ মার্টিন কোম্পানীর একজন ইঞ্জিনীয়ার। কনিষ্ঠ বীরেন্দ্রনাথ শিবপুর কলেজে পড়েন।

ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত। ইনি সুপারিণ্টেণ্ডিং ইন্‌জিনিয়ার। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছে শ্রীযুত প্রভাতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত; ইনি মেসার্স মার্টিন কোম্পানীর ইন্‌জিনিয়ার; তৃতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছে শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত, ইনি ব্যারিষ্টার। চতুর্থা কন্যার বিবাহ হইয়াছে ব্যারিষ্টার শ্রীযুত মণিনাথ কাঞ্জিলালের সহিত এবং পঞ্চমা কন্যার বিবাহ হইয়াছে ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত।

শ্রীযুত খিজারী সওদাগর

শ্রীযুক্ত খেজাহ্রী সওদাগর।

শ্রীযুক্ত খেজাহ্রী সওদাগর চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কক্সবাজার মহকুমার রামুগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স এক্ষণে ৫৮ বৎসর। ইঁহার পিতার নাম ফাপহ্রু সওদাগর। ইঁহারা জাতিতে আরাকানী বৌদ্ধ; আরাকান হইতে আসিয়া ইঁহারা চট্টগ্রামে বসবাস স্থাপন করেন।

শ্রীযুক্ত খেজাহ্রী স্বনামধন্য পুরুষ। ইনি ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং স্বীয় অধ্যবসায়-বলে কলিকাতা সহরের অন্যতম প্রসিদ্ধ বণিকরূপে গণ্য হইয়াছেন। ব্যবসায়-উপলক্ষে ইঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হয় বটে, কিন্তু জন্মভূমি চট্টগ্রামের উপর ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ।

ইনি যেমন বিনয়ী, শিষ্টাচার-সম্পন্ন এবং তেমনই সরল ও অকপট-হৃদয় ব্যক্তি। কিন্তু ইনি নির্ভীক, তেজস্বী এবং স্বাধীনচেতা। কর্ম্ম-উপলক্ষে ইঁহাকে সর্ব্বদা কলিকাতায় অবস্থান করিতে হইলেও জন্মভূমি চট্টগ্রামের প্রতি ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ রহিয়াছে। এখানকার প্রায় সকল সদনুষ্ঠানের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট। চট্টগ্রামের বহু নিরাশ্রয় দীনদুঃখীকে ইনি অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন।

যেবার চট্টগ্রাম সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল, সেবারে তিনি ৭৫০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। এত অধিক টাকা অন্য কেহ প্রদান করেন নাই।

ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা জানেন। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সহায়ক

সকল প্রকাব অনুষ্ঠানে তিনি অর্থ সাহায্য দান কবিয়া থাকেন। ইঁহার নিজগ্রামে প্রতিষ্ঠিত খেজাহ্রী উচ্চ ইংরেজী স্কুলের বাটী নির্ম্মাণ ও আসবাব ইত্যাদির জন্য ইনি ১৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং প্রতি মাসে দুইশত টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য কবিয়া আসিতেছেন।

প্রায় এক বৎসর হইল, ইঁহার পত্নী স্বর্গগমন করিয়াছেন। সেই সময়ে ইনি দীন-দুঃখিকে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ইনি স্বগ্রাম রামুতে তাঁহার পত্নীর স্মরণার্থ একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন এবং উহার পরিচালনার জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করিতেছেন। কক্সবাজাব মধ্য ইংরেজী স্কুলেব জন্য যতবার তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কবা হইয়াছে, ততবাবই তিনি প্রতিবারে ১০০৲ টাকা হিসাবে দান করিয়াছেন।

ইনি স্বধর্ম্মানুবাগী। রামু চৈতন্যসংস্কারের জন্য উনি ৬০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। চট্টগ্রাম টাউন হলেব জন্য ৩৫০০৲ টাকা ও কক্সবাজার বাব লাইব্রেবীর জন্য ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। সম্প্রতি আকিয়াবে ব্রহ্মদেশীয় দরিদ্র ছাত্রদিগেব শিক্ষার সুব্যবস্থাব জন্য তিনি ৭ হাজাব টাকা দান করিয়াছেন, ইহার সুদ হইতে মাসিক প্রায় ৩০৲ টাকা আয় হয়। এই টাকায় অনেক দবিদ্র ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম হইয়া থাকে। বুদ্ধদেব কুশীনগরে চিরনির্ব্বাণ লাভ কবেন। কুশীনগব গোরক্ষপুব জেলায় অবস্থিত। এইখানে তিনি একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যে ভূমিখণ্ডে ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই ভূমিখণ্ড ক্রয় করিতেই ১২ হাজার টাকা লাগিয়াছে। এই সমস্ত টাকা শ্রীযুক্ত খেজাহ্রী প্রদান করিয়াছেন। এখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সাহায্যার্থ তিনি প্রতি মাসে ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। কুশীনগর ধর্ম্মশালার নিকট এক

বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে ; এই অনুষ্ঠানে তিনি ৮০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ইংরেজী ১৯২০ খৃষ্টাব্দ এপ্রিল মাসে শ্রীযুত খেজাহ্রী সপুত্র ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বহু অর্থ দান করিয়া আসিয়াছেন। আরাকান সোসিয়াল এসোসিয়েসনের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ৭৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় বণিক-সমিতির (Burmese Chamber of Commerce) সদস্যগণের ব্যবহারের জন্য "শ্রীমতী খেজাহ্রী লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি ৪০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ ছাত্রগণ যাহাতে উচ্চাঙ্গে বণিকবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে এজন্য তিনি ১৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে ব্যবসায় বা বণিক-বিদ্যা-শিক্ষার্থী ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ ছাত্রগণকে সাহায্য করা হইবে। শ্রীযুত খেজাহ্রী এ যাবৎ প্রায় লক্ষাধিক টাকা লোকহিত-কর নানা অনুষ্ঠানে দান করিয়াছেন।

ইঁহারা সম্প্রতি "খেজাহ্রী বর্ম্মা টোব্যাকো লিফ লিমিটেড" নামক একটী ব্রহ্ম যৌথ ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন। এই কোম্পানীর মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা, ইঁহাদের দেশবাসীগণ যাহাতে সুশিক্ষা লাভ করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করিয়া স্বাবলম্বী হইয়া উন্নতিব পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেপক্ষে ইঁহারা সততই যত্নবান।

শ্রীযুত খেজাহ্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীযুত ক্যোজান লহা। ইনিও ব্যবসায় ক্ষেত্রে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ব্যবসায়-শিক্ষার জন্য ইনি শীঘ্রই ইউরোপ যাত্রা করিবেন। ইঁহাব বয়স এক্ষণে ৩৫ বৎসর। ইনি পিতার ন্যায় তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা, অথচ বিনয়ী ও শিষ্টাচারশীল। ইনি বিদ্যানুরাগী এবং দানশীল। যিনি একবার ইঁহাব কলিকাতা ওয়েষ্টন ষ্ট্রীটের 'খেজাহ্রী লজে' গমন করিয়াছেন, তিনিই

তাঁহার গৃহের সাজসজ্জা ও পাঠাগার দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর স্মরণার্থ চট্টগ্রামের বৌদ্ধ বিহারে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে পিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সকল কাজকর্ম্ম দেখিতেছেন।

শ্রীযুত খেজাহ্বী সওদাগরের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম—শ্রীমান্ কিয়াও হ্টুন। ইঁহার বয়স এক্ষণে ১৮ বৎসর; ইনি সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের জুনিয়র কেম্ব্রিজ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন।

ঢাকার জীবনবাবুর বংশ।

ঢাকার জীবন বাবুর অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের বংশ সম্ভ্রম, মর্য্যাদা ও প্রাচীনত্বের হিসাবে পূর্ব্ববঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ। এই বংশের আদিনিবাস ছিল মালদহে; এই বংশের যুবরাজ রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মালদহ হইতে ঢাকায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। ইঁহারা নীল, লবণ ও অন্যান্য জিনিষ-পত্রের ব্যবসায় করিয়া শীঘ্রই ধনশালী হইয়া উঠেন। শুনা যায়, জগন্নাথ রায়ের সময়ে ইঁহারা অপরিমিত অর্থসম্পদের অধিকারী হইয়া পড়েন।

প্রায় এক শত বৎসর হইল, ঢাকার নর্থব্রুক হলের নিকটবর্ত্তী বুড়ীগঙ্গার ঘাট এই জগন্নাথ রায় মহাশয় প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া দেন। রাজমহাল হইতে বহুকষ্টে ও বিপুল অর্থব্যয়ে প্রস্তর আনীত হইয়াছিল। এই প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘাটের ফটকে যে ভাস্কর্য্য আছে, তাহা বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের তদানীন্তন ছোটলাট স্যর চার্লস বেলী, মিঃ বোনহাম কার্টার ও মিঃ মার এবং অন্যান্য রাজপুরুষগণ এই ঘাট পরিদর্শণ করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র জীবনকৃষ্ণ বাবু এক বিশাল নাটমন্দির নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। এই নাটমন্দির "জীবন বাবুর নাটমন্দির" নামে খ্যাত। নর্থব্রুক হল নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এই নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তখনকার কালে বহু সভাসমিতির অধিবেশন এই নাটমন্দিরে হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। জীবন বাবু বৃন্দাবনে বহু অর্থব্যয়ে একটী সুন্দর মন্দির তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন; উহা

জীবনবাবুর কুঞ্জ নামে বিখ্যাত। রায়-পরিবার হইতে এই মন্দির-রক্ষার সুব্যবস্থা আছে এবং তদনুসারে জীবন বাবুর কুঞ্জের পরিরক্ষণ-ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। এই কুঞ্জের সংলগ্ন একটী ধর্ম্মশালাও আছে। জীবন বাবুই উহার নির্ম্মাণকর্ত্তা; বহু তীর্থযাত্রী এই ধর্ম্মশালায় আহার ও বাসস্থান পাইয়া থাকেন।

ভাগ্যকুলের প্রসিদ্ধ কুণ্ডু-বংশের বাবু গুরুপ্রসাদ কুণ্ডু (ইনি রাজা শ্রীনাথ রায়, সীতানাথ রায় ও জানকীনাথ রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী) জীবন বাবুর লবণের ব্যবসায়ের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। ইনি একবার স্বত্বাধিকারীদের মত না লইয়াই বহু লক্ষ টাকার লবণ ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে এই লবণ তিনি অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিস্তর লাভ করেন। এই কর্ম্মচারী জীবন বাবুকে সমস্ত কথা জানান এবং বলেন যে, একলক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। জীবন বাবু সমস্ত শুনিয়া বলেন, "লাভের এক পয়সাও আমি লইব না; কারণ, আপনি যদি ক্ষতি করিতেন ক্ষতির দায়ী আমি কিছুতেই হইতাম না।" তখন কর্ম্মচারী তাঁহাকে লাভের কিছু অংশ লইতে বিস্তর পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু জীবন বাবু তাঁহার কথায় সম্মতি দিলেন না। শুনা যায়, এই লক্ষ টাকাই নাকি ভাগ্যকুলের কুণ্ডুপরিবারের লক্ষ্মী। ভাগ্যকুলের কুণ্ডুপরিবার জীবন বাবুর বাটীর হাতার মধ্যেই বাস করিতেন; তাঁহাদের বাসাকে লোকে "কুণ্ডুদের হাভেলী" বলিত। ভাগ্যকুলের কুণ্ডুপরিবার এখনও পর্য্যন্ত এই প্রাচীন বংশকে যথেষ্ট সম্মান ও সম্ভ্রম করিয়া থাকেন।

এই বংশের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় বাবু জীবনকৃষ্ণ রায়ের আমলে। জীবন বাবু ইউরোপীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি শিষ্টাচার-সম্পন্ন এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইউরোপীয়

রাজপুরুষ ও বে-সরকারী ভদ্রলোকেরা বেশ খোলাখুলিভাবে তাঁহার সহিত মেলামেশা করিতেন এবং তাঁহার গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিতেন। এই পরিবারের কোনও কোনও ব্যক্তি সুশিক্ষিত ও উচ্চরাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। জীবনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীকৃষ্ণ রায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি সম্মানের জন্য এই চাকুরী লইয়াছিলেন এবং দুই বৎসর করিয়া পদত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র বাবু রাধিকামোহন রায় পুলিশ ইনস্পেক্টর, ইনকমট্যাক্স-এসেসর ও কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার হইয়াছিলেন। তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও ঢাকা বাতুলাগারের পরিদর্শক ছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত-সম্রাজ্ঞী উপাধিলাভ-উপলক্ষে ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্মানসূচক সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। ৭২ বৎসর বয়সে সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দানশীলতা, হৃদয়ের ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের জন্য এই বংশের যথেষ্ট খ্যাতি বিদ্যমান। মকিমাবাদ পরগণার ৬১নং এষ্টেট বাকী খাজনার দায়ে নিলামে উঠিলে উহা জীবনবাবু ক্রয় করেন। এই এষ্টেটের বহু প্রজা উচ্চবংশীয় হিন্দু ছিলেন এবং তাঁহারা প্রায় অনেকেই সিকিমদারও ছিলেন। নিলামে সম্পত্তি বিক্রয় হওয়াতে তাঁহাদের সকলেরই আশঙ্কা হইল যে, তাঁহারা যেরূপ সর্ত্তে জমি ভোগদখল করিতেছিলেন তাহা আর থাকিবে না। কয়েক জন কুলীন ব্রাহ্মণ এইজন্য জীবন বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আশঙ্কার কারণ তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করেন এবং তাঁহার নিকটে অভয় প্রার্থনা করেন। তিনি কেবল যে তাঁহাদিগকে বিনা নজরানায় ও সামান্য খাজনায় প্রজাস্বত্ব দিলেন তাহা নহে, কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তরও দান করিলেন। এই ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের সমাচার বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল

এবং লোকে জীবনবাবুকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ইঁহার গুপ্ত দানও যথেষ্ট।

এক্ষণে এই বংশ ক্রমিক বিভাগবশতঃ অর্থহীন হইয়া পড়িতেছেন বটে, কিন্তু প্রাচীন ভূম্যধিকারী-বংশ বলিয়া এখনও ঢাকা জেলায় তাঁহাদের যথেষ্ট গৌরব। এক্ষণে এই বংশের খ্যাতনামা বংশধর বাবু গোকুলচন্দ্র রায় বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

দাহুরদার "মহাশয়"-বংশ।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচলে যাইতেছিলেন, তখন জলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে তাঁহার সহিত রামচন্দ্র খাঁয়ের সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে ইনি উড়িষ্যা সুবার সদর কানুনগো ছিলেন। এই রামচন্দ্রের নাম 'চৈতন্য ভাগবত'-কার অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

সম্রাট আকবর রামচন্দ্রকে "রায়মহাশয়" ও "খাঁ উপাধি" প্রদান করেন। রায়মহাশয় রামচন্দ্র খাঁ দাহুরদার 'মহাশয়'-বংশের আদিপুরুষ। ইনি যে সময়ে "কটকিটিয়ারপুর" ও অন্যান্য স্থানের "চদিদার" ছিলেন সেই সময়ে নবাব সরকারের কয়েক লক্ষ টাকা নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে ব্যয় করিয়া ফেলেন। এই অপরাধের জন্য তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এই সংবাদ তাঁহার মাতার কর্ণে পৌঁছিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এক লক্ষ টাকা তাঁহার পুত্রের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু এই এক লক্ষ টাকা তাঁহার পুত্রের মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। রামচন্দ্র পরদুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন; এই টাকা দিয়া তিনি ২৫ জন সহ-বন্দীকে মুক্তি প্রদান করাইলেন। এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও সহানুভূতির কথা যখন বাদশাহের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া রামচন্দ্রকে রাজধানীতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং এই সদ্‌গুণের জন্য তিনি তাঁহাকে সুবা বাঙ্গালা ও সুবা উড়িষ্যার সদর কানুনগো নিযুক্ত করিয়া দুইখানি ফারমান বা নিয়োগপত্র প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে মুক্তি দিলেন।

কারামুক্ত হইয়া রামচন্দ্র বাটী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে গঙ্গা স্নান করিবার জন্য তিনি বাদসাহের ফারমান বা নিয়োগপত্র দুইখানি কাপড়ের সহিত তীরের উপর রাখিয়া জলে অবতরণ করিলেন। ইতিমধ্যে একটি শঙ্খচিল আসিয়া যে ফারমানখানি দ্বারা তিনি সুবে বাঙ্গালার সদর কানুনগো নিযুক্ত হইয়াছেন সেই ফারমানখানি ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল এবং নিকটবর্ত্তী একখানি বাড়ীতে তাহা ফেলিয়া দিল। তখনকার কালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, স্বয়ং ভগবতী সময়ে সময়ে শঙ্খচিলের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র ঐ বাটীর কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবতীর ইচ্ছা হইয়াছে যে আপনিই সুবে বাঙ্গালার কানুনগো হউন। এই কথা বলিয়া তিনি অবশিষ্ট ফারমানখানি লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সুবে উড়িষ্যার কানুনগো পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। কংসাবতী ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহ তাঁহার এলেকাধীন ছিল। এরূপ অনুমান হয়, হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার রায় মহাশয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তিনিই অপর ফারমানখানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাঁশবেড়িয়া ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী; ত্রিবেণীতে বহুলোক গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে।

রায় মহাশয় রামচন্দ্রখাঁর পৈত্রিক নিবাস বালিগ্রামে ছিল। এই গ্রামে থাকিয়া দূরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ উড়িষ্যার সুবার কার্য্য পরিদর্শন বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। এইজন্য তিনি বালিগ্রামের বাটী ও সম্পত্তি অপরকে দান করিয়া জলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী সুবর্ণরেখা নদীর তীরস্থ লক্ষ্মণনাথ গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন।

উড়িষ্যার পাঠান শাসনকর্ত্তা সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে সম্রাট আকবর বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মহারাজা মান-

সিংহকে প্রেরণ করেন। রামচন্দ্র মানসিংহকে এ ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ তিনি মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক "রায় মহাশয়" উপাধিতে ভূষিত হন। এরূপ প্রকাশ, বাঁশবেড়িয়ার রাজ-পরিবারকে রায় মহাশয় উপাধি এবং সাবর্ণ পরিবারকে রায় চৌধুরী উপাধি মহারাজা মানসিংহই প্রদান করেন।

রায় মহাশয় রামচন্দ্র খাঁ উপাধি বর্জ্জন করেন ও কেবল রায় মহাশয় উপাধিই ব্যবহার করিতে থাকেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন তারিখে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রায় মহাশয় উপাধির অনুমোদন ও সমর্থন করেন। "রায় মহাশয়" বংশ 'গোষ্ঠিপতি' বলিয়া পরিচিত; কংসাবতী ও ঋষিকুল্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসী কায়স্থগণ ইঁহাদিগকে 'গোষ্ঠিপতি' বলিয়া মাল্যচন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার কায়স্থগণ বাঁশবেড়িয়ার 'রায় মহাশয়' বংশকে 'গোষ্ঠিপতি' এবং ২৪ পরগণার ব্রাহ্মণগণ সাবর্ণ রায় চৌধুরীগণকে 'গোষ্ঠিপতি' বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

সাবর্ণ বংশের আদিপুরুষ কামদেব ব্রহ্মচারী মহারাজা মানসিংহের গুরু ছিলেন। কামদেব পরম শাক্ত ছিলেন। কথিত আছে, কালীঘাটের কালী সাবর্ণগণের রক্ষয়িত্রী দেবী। এইরূপে বাঁশবেড়িয়ার রায় মহাশয়দিগের রক্ষয়িত্রী দেবী হংসেশ্বরী নামে সুপরিচিত। লক্ষ্মণনাথ ও দাহুরদার রায় মহাশয় বংশের রক্ষয়িত্রী দেবীও কালী।

যখন লক্ষ্মীনারায়ণ রায় লক্ষ্মণনাথ রায় মহাশয় বংশের কর্ত্তা ছিলেন, সেই সময়ে প্রতাপনারায়ণ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হন। প্রতাপনারায়ণ রামচন্দ্রের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। ইনি বিচ্ছিন্ন হইবার সময়ে আট ভাগের তিন ভাগ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন এবং দাহুরদা গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা প্রতাপনারায়ণের

"রায় মহাশয়" উপাধি ব্যবহার অনুমোদন করেন। এই বংশের শ্রীবৃদ্ধি ও সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় মহাশয় সৃষ্টিধর রায়ের সময়ে, ইনি প্রতাপ নারায়ণের প্রপৌত্র। বাঙ্গালা ১২২৫ সালে সৃষ্টিধর জন্মগ্রহণ করেন; ইহার মৃত্যু ঘটে বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে। মহাশয় কৈলাস চন্দ্র রায় ইহার একমাত্র জীবিতাবশিষ্ট পুত্র। [১৯০৭ খৃষ্টাব্দের "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবারের সংখ্যায় এই বিবরণটী বাহির হইয়াছিল।]

বাবু লোকনাথ ঘোষ প্রণীত "The modern history of the Indian chiefs, Rajas, zeminders etc নামক গ্রন্থের ২য় ভাগের ৪৪৬ পৃষ্ঠায় বাবু সৃষ্টিধর রায় মহাশয় ও বাবু কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয় সম্বন্ধে নিম্ন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে :—

বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় বাবু সৃষ্টিধর রায় মহাশয়ের পুত্র। সৃষ্টিধর বাবু অত্যন্ত দয়ার্দ্রহৃদয় ও ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার ছিলেন। কৈলাস চন্দ্র রায় মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী জকপুর ও জলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী লক্ষ্মণনাথ গ্রামের প্রাচীন কায়স্থবংশ-সম্ভূত। মুসলমান শাসনকালে এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ সময়ে ইহারা অতীব যোগ্যতার সহিত সদর কানুনগোর কার্য্য করিয়াছিলেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের নিকট হইতে ইহারা যে "পাঞ্জা" পাইয়াছিলেন তাহা এখনও পর্য্যন্ত পরিবারে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পাঞ্জা বালেশ্বরের তদানীন্তন কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট বীম্‌স সাহেব দেখিয়া নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"পাঞ্জাতে কেবল কোরানের শ্লোক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বাণী উদ্ধৃত আছে, বাদশাহের নাম বা তারিখ ইহাতে নাই। মুসলমান রাজত্বকালে যাঁহারা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, সম্মানের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদিগকে এইরূপ 'পাঞ্জা' দিবার পদ্ধতি ছিল।"

স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র

শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়।

বাবু কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয় বালেশ্বর ও মেদিনীপুরের কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠিপতি ছিলেন। ইঁহারা লক্ষ্মণনাথ মহাশয় বংশের শাখা। নবাব সুজাউদ্দোলার রাজত্বকালে প্রতাপ নারায়ণ রায় মহাশয় লক্ষ্মণনাথ রায় মহাশয়ের বংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাহুরদা গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন। ইনি দাহুরদা মহাশয়-বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় লক্ষ্মণনাথ মহাশয়-বংশের তদানীন্তন কর্ত্তা ছিলেন। দাহুরদার বাবু কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলায় জমিদারী ও তালুক আছে। দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি প্রজাবর্গকে সাহায্যদান করিয়াছিলেন এবং অনেক সময়ে মুক্তহস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কয়েক বার ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

রায় রাধাকান্ত আইচ রায় বাহাদুর।

রায় রাধাকান্ত আইচ রায় বাহাদুর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমার এলেকাভুক্ত জয়নগর গ্রামে জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ। ইঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় দ্বারকানাথ আইচ রায়।

ইঁহাদের বংশের আদি বিবরণ বিশেষ কিছু জানা যায় না। কারণ, ইঁহার পিতা ২৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। রাধাকান্তবাবুর এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার নিকট হইতে যতদূর শুনা যায়, তাহাতে প্রকাশ,— আইচ-বংশের আদিনিবাস পশ্চিম বাঙ্গালার কোনও জেলায় ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গজেন্দ্রনারায়ণ ও রাজেন্দ্রনারায়ণ আইচ রায়; তাঁহাদের বংশধরগণ ত্রিপুরা জেলায় আসিয়া জয়নগর গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন। প্রায় ২০০ বৎসরের উপর আইচ-বংশ এই গ্রামে অবস্থান করিতেছেন এবং এই জেলার অনেক স্থলে জমিদারী ক্রয় করিয়াছেন। এই বংশের বাবু শিবচন্দ্র আইচ রায় ত্রিপুরা জেলা-আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "হীরক জুবিলী" উপলক্ষে বাবু শিবচন্দ্র 'সার্টিফিকেট অফ অনার' পাইয়াছিলেন।

১৮৭৩ ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রাধাকান্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ ও বি-এল পরীক্ষা দেন এবং দুইটী পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ওকালতি আরম্ভ করেন।

গত ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে রাধাকান্ত নোয়াখালির উকীল সম্প্রদায়ের

অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া উকীল-সভার প্রেসিডেণ্ট বা অধিনায়ক ছিলেন। ইনি নোয়াখালি মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার এবং ১৮৯৭ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান ছিলেন। তাহার পর ইনি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পুনরায় মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার মনোনীত হন এবং পরবর্ত্তী মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীতে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বহুদিন নোয়াখালির অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বে-সরকারী কারাগার-পরিদর্শক ছিলেন তিনি নোয়াখালি বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং সদর চেরিটেবল ডিস্পেন্সারীর যথেষ্ট সংস্কার-সাধন করেন। তিনি যে সময়ে নোয়াখালি মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই নোয়াখালি সহরের বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়। কুমিল্লায় যে বিভাগীয় কনফারেন্সের অধিবেশন হয়, তিনি তাঁহার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্য। দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েই তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে আস্থাবান্। এইজন্য ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে হাট-লুটের মামলার বিচারের জন্য যে স্পেশাল ট্রিবিউন্যাল বা বিশেষ আদালত গঠিত হইয়াছিল, তিনি উহার অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হন এবং তাঁহার বিচারে গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী সন্তোষ-প্রকাশ করেন।

১৯১৯ সালের ৩রা জুনের গেজেটে সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে যে উপাধিবিতরণ-তালিকা বাহির হয়, তাহাতে রাধাকান্তের নাম ছিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি-দানে সম্মানিত করিয়াছেন।

রায় রাধাকান্ত যেমন গবর্ণমেণ্টের দরবারে প্রভূত সম্মান লাভ

করিয়াছেন, তেমনই দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও সম্মানেরও তিনি অধিকারী হইয়াছেন। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের কল্যাণ-সাধনের জন্য যে স্বদেশী আন্দোলন উঠিয়াছিল, রায় রাধাকান্ত তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময়ে জাতীয় ভাবে শিক্ষাদানের জন্যও এক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার ফলে দেশের অনেক স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে নোয়াখালিতে যে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহার প্রথম প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন রায় রাধাকান্ত।

তিনি দরিদ্র-বান্ধব। অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিতে বিরত হন না।
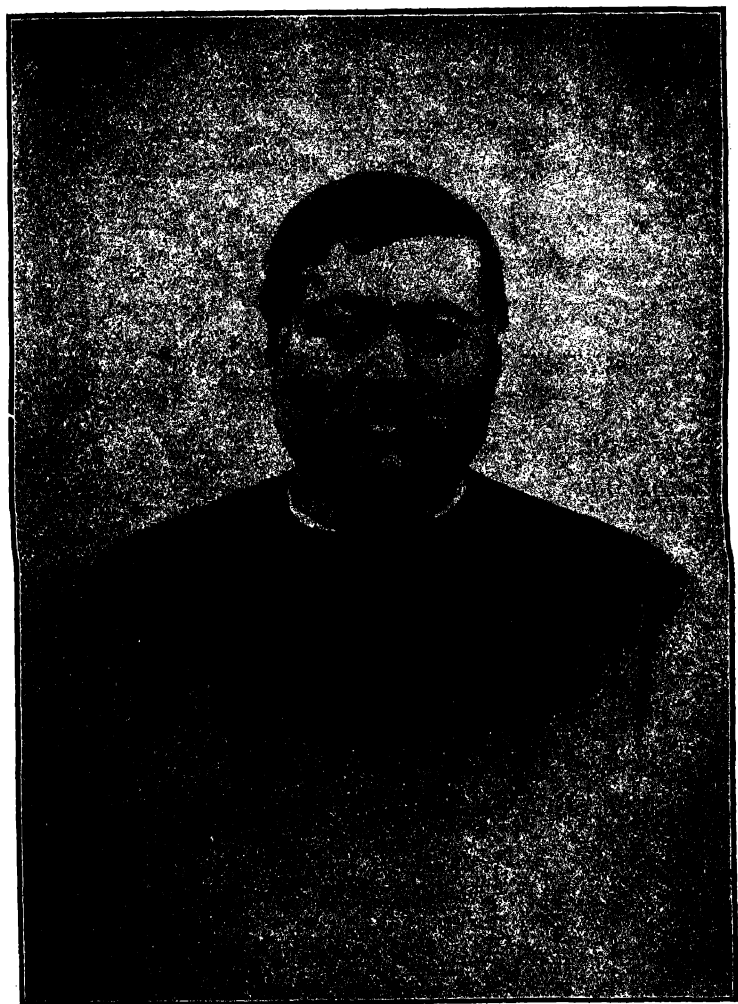
স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র

স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র।

২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রামের (দমদমার নিকট) সুপ্রসিদ্ধ মিত্র বংশীয় কায়স্থকুলে রমেশচন্দ্র ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ কালীপ্রসাদ মিত্র নদীয়ার কালেক্টারের অধীনে কর্ম্ম করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া যান। কালীপ্রসাদ দানাদি সৎকর্ম্মে বহু অর্থব্যয় করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামধন পিতার যত্নে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের মুন্‌সেফী পদ পান। তাঁহার পক্ষপাতশূন্য ন্যায়বিচার-দর্শনে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ও প্রজাসাধারণ তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তৎপুত্র রামচন্দ্র মিত্র উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদারের পদ লাভ করেন। তিনি তদানীন্তন ২৪পরগণার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ (পরিশেষে সার রবার্ট) বার্লোর নিকট একদিন দেওয়ানী পদের প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; রামচন্দ্র স্বীয় প্রতিভাবলে অবিলম্বেই প্রার্থিত পদ লাভ করিলেন; এই সাক্ষাৎই তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল; কারণ, এমন কি, রামচন্দ্রের মৃত্যুর পরও স্যার রবার্ট বার্লো তাঁহার (রামচন্দ্রের) পরিবারবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন ভাবী কুশলের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ও যত্নবান থাকিতেন। রামচন্দ্রের অমায়িক ব্যবহারে এবং তাঁহার অসাধারণ কার্য্যনৈপুণ্যে স্যার রবার্ট বার্লো তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। স্যার রবার্ট কার্য্যানুরোধে যেখানে যেখানে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্রও তাঁহার সহিত সেই সেই স্থানে স্থানান্তরিত

হইতেন। মিঃ বার্লো হুগলী জেলার ডিষ্ট্রিক্ট জজ হইয়া আসিলেন; রামচন্দ্রও তাঁহার দেওয়ান হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিলেন। এখান হইতে নিম্নলিখিত ঘটনাটির জন্য তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন:—

হুগলীতে অবস্থানকালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত রামচন্দ্রের আলাপ পরিচয় হয়। জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমায় বার্লোর এজলাসে জয়কৃষ্ণ উপস্থিত হন। বার্লোর উপর রামচন্দ্রের প্রভূত আধিপত্য আছে,—এই ধারণায়, জয়কৃষ্ণ যাহাতে মোকদ্দমাটির বিচার তাঁহারই অনুকূলে নিষ্পন্ন হয়, সেই জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। রামচন্দ্র দলীলাদি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জয়কৃষ্ণকে কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হন। জয়কৃষ্ণের সহস্র অনুনয় বিনয়, এবং উপরোধ অনুরোধ নিস্ফল হইল। তিনি বিফলমনোরথ হইলেন। ইহার অল্পদিন পরেই শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রে (সমাচার-দর্পণ) রামচন্দ্র সম্বন্ধে এক অযথা অবৈধ প্রবন্ধ প্রচারিত হইল। যে দিন এই প্রবন্ধ রামচন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইল, তিনি সেই দিনই মিঃ বার্লোর নিকট তাঁহার কর্ম্মত্যাগের পত্র resignation প্রেরণ করিলেন। মিঃ বার্লো তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং বলিলেন, "আমি সন্দেহাতীত না হইলে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি না।" তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া ভবানীপুর চলিয়া আসিলেন। এই ঘটনাটি তাঁহার নির্ভীকতার, স্পষ্টবাদিতার এবং স্বাধীনচিত্ততার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই তেজস্বী পিতার তেজস্বিতা এবং নির্ভীকতা রমেশচন্দ্র পূর্ণমাত্রায়ই পাইয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের ছয় পুত্র। প্রসন্নচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র (বিখ্যাত

অনারেবল স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্র

পাখোয়াজ-বাদক) কালীচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ মাননীয় রমেশচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

রমেশচন্দ্রের মাতুলালয় তাঁহার জন্মভূমি বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশে। ৺মধুসূদন ঘোষ তাঁহার মাতুল ছিলেন। মাতার নাম কমলমণি। তিনি নানা সদগুণে অলঙ্কৃতা এবং সাতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। রমেশচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র চারি বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

বাল্যকালে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসকালেই রমেশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময় হইতেই লেখাপড়ায় তাঁহার চিত্ত অভিনিবিষ্ট দেখিয়া সাধারণে তাঁহার ভাবী সমৃদ্ধির আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষীয় রমেশচন্দ্র প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকগণের দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থসকল শিক্ষকের বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন করিতেন ও তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন।

কলিকাতা-প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অধ্যবসায়ে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উহার পর বৎসর আইন (B. L.) পরীক্ষা দিয়া কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নবালিখিত সনন্দানুসারে প্রাচীন সুপ্রীম কোর্ট ও প্রেসিডেন্সী-বিভাগের সদর আদালত-সমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়া হাইকোর্ট নামে পরিচিত হয়। রমেশচন্দ্র প্রথমে দেড় বৎসরকাল সদর দেওয়ানীতে ও পরে মহামান্য হাইকোর্টে (Appellate side) দ্বাদশ বৎসরকাল বিশেষ দক্ষতার সহিত ওকালতী করিয়া একজন সুযোগ্য প্রধান উকিল বলিয়া গণ্য হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মাননীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর তিনি গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত আসনে উপবেশনার্থ সাদরে আহূত হন।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে প্রায় ১৫ বৎসরকাল উপবিষ্ট থাকিয়া তিনি স্বীয় যোগ্যতা ও বিচার দক্ষতার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে চিফ্ জষ্টিস্ স্যর রিচার্ড গার্থ স্বদেশ গমনার্থ ফার্লো (furlough) লইলে লর্ড রিপণ বাহাদুর রমেশচন্দ্রকেই প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ করেন। বাঙ্গালী প্রধান বিচারপতির পদে সমাসীন হইতেছে দেখিয়া উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন। গার্থের বন্ধুবর্গ তাঁহাকে ছুটী লওয়া বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি ভারত-রাজপ্রতিনিধিকে স্বীয় আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বে বড়লাট রমেশচন্দ্র মিত্রকে উক্তপদে মনোনীত করায় তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন নাই। অগত্যা গার্থকে অর্দ্ধাবকাশ লইয়া গৃহগমন করিতে হইল। রমেশচন্দ্র সেই অর্দ্ধাবকাশের সময় প্রধান বিচারপতি হইয়া কাজকর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু তিনি হাইকোর্টের বিচারপতিত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সদগুণ সম্পন্ন দেশীয়দিগকে উচ্চরাজপদে নিয়োগের জন্য রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফ্রিন বাহাদুর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্রকে Public Service Commissionএর সদস্যপদে বরণ করেন। এই পদে থাকিয়া তিনি দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ফেলো এবং কলিকাতা ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত নানা শিক্ষা-সমিতির সভ্য হইয়া সেই সেই সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করার পর তিনি রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউন কর্ত্তৃক তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন যখন "সম্মতি-

স্বর্গীয় মন্মথনাথ মিত্র

সঙ্কট আইন "(Age of Consent Bill) বিধিবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হন, তখন রমেশচন্দ্র স্বীয় গভীর যুক্তিসহকারে ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার ভ্রম দূর করিতে প্রয়াস পান। তিনি তাঁহাকে আইনের মর্ম্ম বুঝাইতে গিয়া স্পষ্টতই বলিয়াছিলেন যে, এরূপভাবে আইন সংগঠন করিলে বাঙ্গালীর ধর্ম্মহানির বিশেষ সম্ভাবনা আছে, সুতরাং প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত রাজপ্রতিনিধির এরূপ কঠোর নিয়ম-দণ্ড প্রচলন করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহার নির্ভীক ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতায় তৎকালীন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। দুইদিন ঘোরতর বাগ্‌বিতণ্ডার পর রমেশচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, বড়লাট বাহাদুর এই আইন সঙ্কলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এবং সেই জন্য তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না— তখন তিনি অভিমান-ভরে সেই মাননীয় সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া সভার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন।

তিনি সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য কলিকাতা ভবানীপুরে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রতি তিনি নিজেও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষাবস্থায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট তিনি বিশেষ পরিশ্রম ও আগ্রহসহকারে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

তিনি প্রকৃত দানবীর ছিলেন। আর্ত্তের মর্ম্মভেদী চীৎকারে এবং দুঃখীর দুঃখে তাঁহার করুণ হৃদয় আর্দ্র হইত। তিনি ভবানীপুর সাহায্য-সমিতি স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে তিনি তাঁহার সমুদায় পেন্সনের টাকা অর্থাৎ মাসিক ১২০০৲ টাকা দানশীলতায় ব্যয় করিতেন। কিন্তু তিনি কখনও অযোগ্য পাত্রে দান করিতেন না; কোন সুরাপায়ী বা কলুষিত-চরিত্র লোক অথচ

দীনদরিদ্র যদি তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে এক কপর্দ্দকও না দিয়া চাউল অথবা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সেই ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

তিনি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন; হিন্দু শাস্ত্রক্রিয়া-কলাপের প্রতি তাঁহার প্রকৃত আস্থা ছিল। হিন্দু বালিকাদের শিক্ষার প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; ভবানীপুর হিন্দুবালিকাবিদ্যালয়ের তিনিই স্থাপয়িতা। এতদ্ভিন্ন স্বদেশের এবং স্বসমাজের উন্নতিকল্পে অনেক সভাসমিতির অনুষ্ঠান করিয়া এবং বিবাহ-ব্যয়-হ্রাসের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পরদুঃখকাতরতা ও সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছায় উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বীয় জীবনের অবশিষ্ট কাল রাজনীতির সংশ্রব বর্জ্জন করেন এবং স্বীয় ভবানীপুর-ভবনে অবস্থিত থাকিয়া সমাজ, শিক্ষা ও সঙ্গীতবিদ্যাবিষয়ক নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

তিনি অতিশয় শান্ত, ধীরপ্রকৃতি এবং যৎপরোনাস্তি সহিষ্ণু ছিলেন তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার একমাত্র জীবনাধিক প্রিয় কন্যার মৃত্যুজনিত অদম্য শোক সম্বরণ করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার জন্মভূমি বিষ্ণুপুরে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার দেশবাসীকে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

স্যর রমেশচন্দ্র ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিত্বে বৃত হইয়াছিলেন। এই মহাসভা উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু তিনি স্বয়ং পাঠ করিতে

অনারেবল শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র মিত্র সি, আই, ই

পারেন নাই। তাঁহার অভিভাষণ স্বর্গীয় স্যর রাসবিহারী ঘোষ পাঠ করেন ইহাতে তাঁহার প্রগাঢ় দেশহিতৈষণা, রাজভক্তি ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যভঙ্গ না হইলে তিনি অচিরেই এই জাতীয় মহাসভার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিতেন।

স্যর রমেশচন্দ্র বহুমূত্রাদি দীর্ঘকালস্থায়ী নানা উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে ইহধাম ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করেন।

রমেশচন্দ্রের চারি পুত্র। মধ্যম পুত্র অতি অল্প বয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺মন্মথনাথ মিত্রও অকালে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন এবং পিতার অধিকাংশ সদ্‌গুণেরই অধিকারী ছিলেন; রোগে শোকে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত না হইলে এবং অকালে কালের করাল কবলে পতিত না হইলে তাঁহার দেশবাসী এবং সুধীসমাজ আজ ধন্য হইতেন। তৃতীয় পুত্র স্বনামধন্য অনারেবল স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্র; ইনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্ত ব্যবসায় করিয়া পরিশেষে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল (Standing counsell) পদে নিয়োজিত হন এবং ইহার কিছুদিন পরেই এড্‌ভোকেট্ জেনারেল (Advocate General) পদে সাদরে বৃত হন। ইঁহার অসামান্য প্রতিভায় গবর্মেণ্ট বাহাদুর প্রীত হইয়া স্বল্পকালমধ্যেই ইঁহাকে 'নাইট্' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি সম্প্রতি ষ্টেট কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কনিষ্ঠ অনারেবল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই,; ইনি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া ইঁহাকে সি-আই-ই উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা-সচিব (Minister of Education) হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মৈত্র।

শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ১২৯১ সালের ২৪শে মাঘ তারিখে পাবনা জেলার অন্তর্গত বল্লভপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ মৈত্র। ইনি প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। ইঁহারা কাশ্যপগোত্রজ বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, "কাপ" এবং মৈত্র-বংশের মণ্ডলযানি শাখার অন্তর্ভুক্ত।

অপরিহার্য্য পারিবারিক কারণে বাধ্য হইয়া যোগেন্দ্রনাথকে স্কুল ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু এজন্য প্রকৃত শিক্ষালাভে যে তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে ব্রতী হন। তিনি একজন অধ্যাপকের নিকট ইংরেজী সাহিত্য ও রাজনীতি এবং একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ও হিন্দুনীতিশাস্ত্র গৃহে বসিয়াই শিক্ষা করেন। "গৃহশিক্ষা লোককে উন্নত করিয়া থাকে—" যোগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

যোগেন্দ্রনাথ প্রসিদ্ধ শীতলাই জমিদার-বংশের বংশধর। এই জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার পিতামহ স্বর্গগত লোকনাথ মৈত্র। ইনি কাশীধামে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা রাজ-রাজেশ্বরীর নামে "রাজ-রাজেশ্বরী" ছত্র স্থাপন করেন। বাঙ্গালা ১২৬০ সালে একটী উইল করিয়া এই ছত্র-রক্ষার জন্য দুইটী সম্পত্তি দান করিয়া যান। তিনি ছত্র-পরিচালনার এমন সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, আজ পর্য্যন্ত তাহারই ফলে ছত্রের কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চালিত হইতেছে। ছত্রে প্রত্যহ শিবপূজা ও নিত্য শত শত "দরিদ্র নারায়ণে"র সেবা হইয়া থাকে।

শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র।

তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি নিজ নামে রাজসাহীতে দরিদ্র বালকগণের জন্য একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপিত করেন এবং দানপত্রে এই বিদ্যালয় রক্ষার ও পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া যান। সে সময়ে এই শ্রেণীর স্কুল-প্রতিষ্ঠার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল এবং যে সময়ে এই স্কুলটী স্থাপিত হয় সেই সময়ে জনসাধারণ তাঁহার নিকটে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। জনহিতকর কার্য্যের জন্য গবর্মেণ্ট লোকনাথ মৈত্র মহাশয়কে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। সমাজের কল্যাণকর বহু কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া তদানীন্তন সমাজ-পতিগণ তাঁহাকে "স্বর্ণকমল" উপাধি দান করিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ পূর্ব্বপুরুষের এই সকল সদগুণ উত্তবাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন এবং সে সকলের পরিচয়ও দিতেছেন। ইনি নিষ্ঠাবান হিন্দু; ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম ইনি করিয়া থাকেন। ইনি স্থানীয় ব্রাহ্মণ সভার অন্যতম নেতা। হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তিনি অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকারে কাতর নহেন। তিনি সুবক্তা; আবশ্যক হইলে ধর্ম্মসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

যোগেন্দ্রনাথ পাবনা সদরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও পাবনা মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচিত কমিশনার ছিলেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি জেলা-বোর্ডের সদস্যপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি যুদ্ধের সময়ে "বেঙ্গল লাইট হর্স" বা বাঙ্গালী অশ্বারোহী পল্টনে ভর্ত্তি হইয়া ছয় মাস কাল এই বিভাগে সমরবিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ রাজসাহী লোকনাথ মধ্যইংরেজী স্কুলে মাসিক বিস্তর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে, শীতলাই মধ্যইংরেজী স্কুলে, পাবনা বালিকা বিদ্যালয়ে, গুরুদাসপুর মধ্যইংরেজী

স্কুলে এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে ও টোল-চতুষ্পাঠীতে দাতব্য চিকিৎসালয়ে, পাবলিক লাইব্রেরী বা সাধারণের জন্য স্থাপিত পাঠাগারসমূহে রীতিমত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইঁহার পাবনার আবাস-বাটী "শীতলাই কুঠীতে" দরিদ্র ছাত্রগণ আহার ও বাসস্থান পাইয়া থাকে।

যোগেন্দ্রনাথ উত্তম চিত্রকর এবং সঙ্গীতবিৎ। ইঁহার পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা।

বংশ-তালিকা।

সিতলাই জমিদার বাটী।

কাশীকান্ত
উমাকান্ত
জগন্নাথ
লক্ষ্মীকান্ত
কাশিকান্ত
জীবনকান্ত
রুদ্রকান্ত
ঈশ্বরচন্দ্র
লোকনাথ
কালিদাস
চন্দ্রনাথ
প্রাণকান্ত
রতিকান্ত
দুর্গাকান্ত
হরকান্ত
ওরফে ভিখারী
যোগেন্দ্র নাথ
কমলাকান্ত
জগদীন্দ্র
যতীন্দ্র
প্রতিভা
(কন্যা)
জ্যোতিরিন্দ্র
রথীন্দ্র
খোকা
খুকী
(কন্যা)
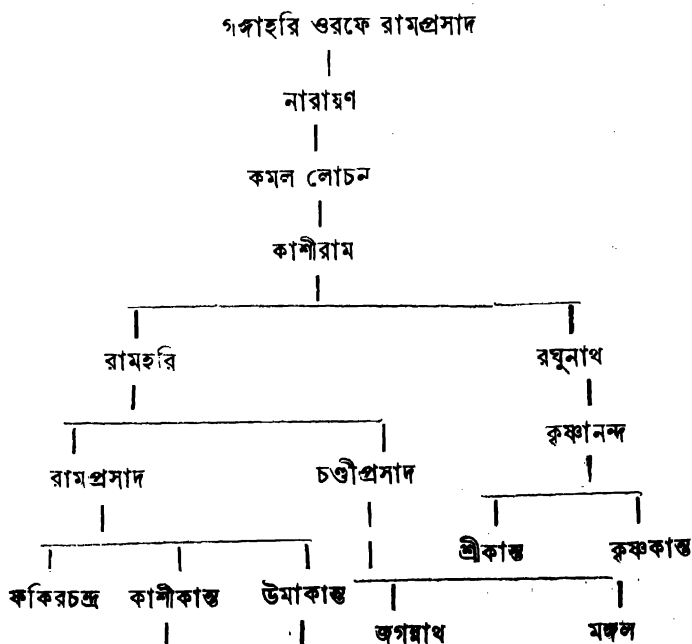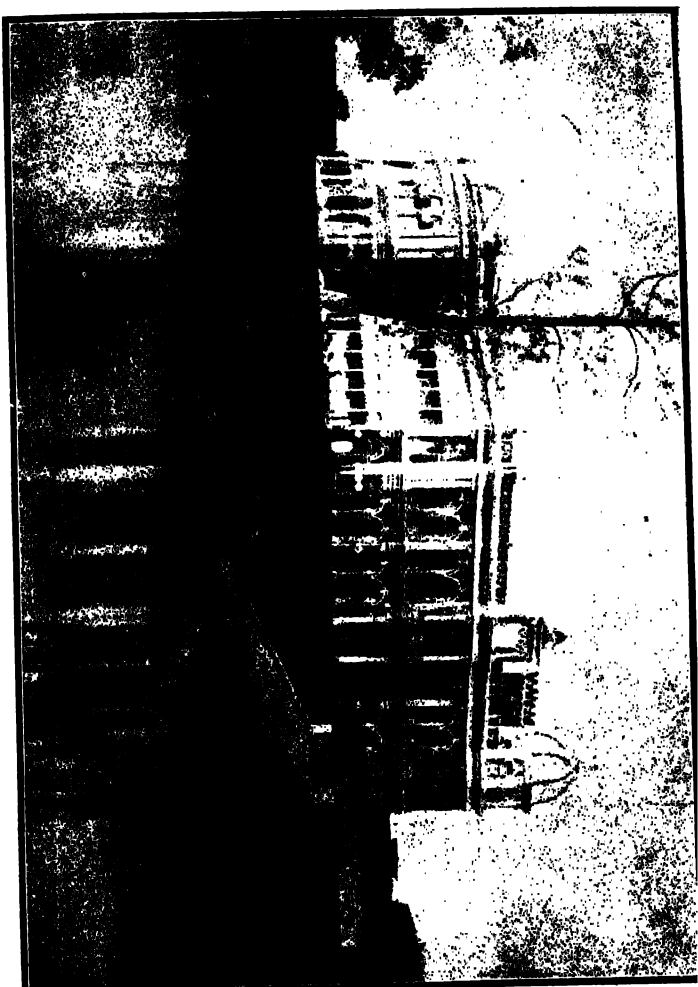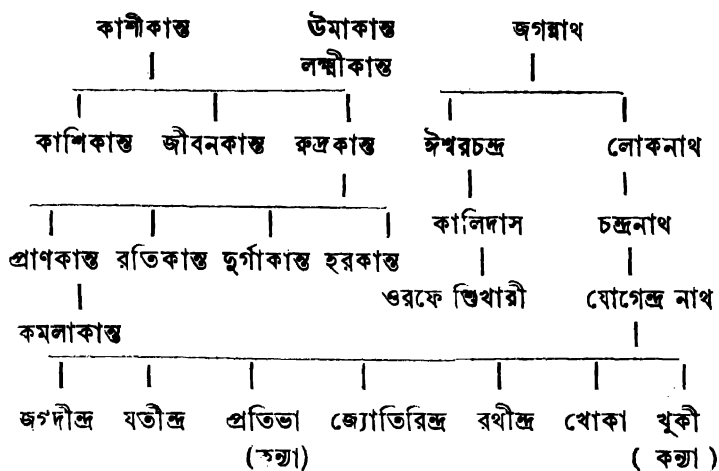
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ পাল।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ পাল মুর্শিদাবাদ জিলার সৈদাবাদ গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার। এই বংশের আদিপুরুষ জগন্নাথ পাল বৰ্দ্ধমান জিলার পালিস গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পৌত্র রামধন পাল বহু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া বৰ্দ্ধমান জিলার ভাটাকুল গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন। ইনি স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর কনিষ্ঠা ভগিনী মধুসুন্দরীকে বিবাহ করেন। ইঁহার দুই পুত্র ভোলানাথ ও শ্রীনাথ (রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর)। এই পরিবারের সকল পুরুষই বেশ সবল ও সুদৃঢ়কায়। ভোলানাথবাবুতে এই গুণ যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ তিনি অতি সবল, স্বাস্থ্যবান্ এবং সুদৃঢ়কায় ছিলেন।

ভোলানাথ লেখাপড়া শিখিয়া অতি অল্প বয়সেই জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতে বাধ্য হন। কিন্তু ভোলানাথের হৃদয় ধৰ্ম্মপ্রবণ ছিল এবং তিনি কতকটা বৈরাগ্যভাবের ভাবুক ছিলেন। তিনি নির্জ্জনতা ও শান্তি ভালবাসিতেন। এইজন্য তিনি ভাটাকুল গ্রামেই তাঁহার প্রজাদের মধ্যে বাস করিতেন। দরিদ্র রায়তের সুখ-দুঃখের ভিতরেই তাঁহার দিনগুলি কাটিত। তিনি অভাবগ্রস্ত রায়তের অভাব-মোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি যেমন ধৰ্ম্মভীরু তেমন সত্যবাদী ছিলেন; মিথ্যা কথা ভুলিয়াও বলিতেন না। ৩১ বৎসর বয়সে পূর্ণ যৌবনে অকাল-মৃত্যু তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করে। তিনি বিধবা পত্নী, এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া যান। পুত্রের নাম ক্ষেত্রনাথ। কন্যাটি ভোলানাথ পাল মহাশয়ের মৃত্যুর দুই মাস পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাত্র দুই বৎসর জীবিত ছিল।

শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ পাল।

এই পরিবারের সহিত মহারাণী স্বর্ণময়ীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়া ইঁহারা মহারাণীর মৃত্যু পর্য্যন্ত কাশিমবাজার রাজবাটীতে অবস্থান করিতেন। মহারাণী ক্ষেত্রনাথকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং সেইরূপ যত্নে তাঁহাকে লালন-পালন করিতেন ও লেখাপড়া শিখাইতেন। মহারাণীর কন্যাগণের মৃত্যু হইলে তিনি একবার ক্ষেত্রনাথ পোষ্যপুত্র লইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্ষেত্রনাথের মাতা তাঁহার একটি মাত্র পুত্রকে পোষ্যপুত্র করিতে দেন নাই।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হয়। মহারাণীর স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়; কিন্তু কাশিমবাজার রাজ ষ্টেটের উত্তরাধিকারী মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই গোলযোগ এই মর্ম্মে নিষ্পত্তি করিতে সম্মত হন যে, শ্রীনাথ ও ক্ষেত্রনাথ উভয়েই মহারাণীর স্ত্রীধন পাইবেন। এই নিষ্পত্তি অনুসারে শ্রীনাথ ও ক্ষেত্রনাথ মহারাণীর স্ত্রীধন প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রনাথ তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক। ইহার পর ক্ষেত্রনাথের পরিবারবর্গ সৈদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পাল স্বেচ্ছায় কাশিমবাজার রাজ ষ্টেটের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন ও কিছু দিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষেত্রনাথের সহিত পৃথক হইয়া কলিকাতায় নিজ বাটীতে বাস করেন।

ক্ষেত্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন, পরে তথা হইতে তিনি কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়াস´ কলেজে ভর্ত্তি হন। এইখানে তিনি বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

ক্ষেত্রনাথকে তাঁহার জমিদারীর কার্য্য দেখিতে হয়। ইহা ব্যতীত তাঁহার তেজারতীর কারবারও আছে। তিনি বহরমপুর মিউনিসিন্যালিটীর কমিশনার এবং তথাকার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি বহরমপুরের বাতুলাগারের পরিদর্শক। সৈদাবাদের হার্ডিঞ্জ হাই স্কুলের তিনি

অনারারী সেক্রেটারী। বহরমপুরের কারাগারে যে সমস্ত রাজনীতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণ বন্দীরূপে আছে তিনি তাহাদের অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিবুক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, তিনি গভর্ণমেণ্টের কিরূপ বিশ্বাসভাজন। তিনি দেশ ও দেশের কল্যাণসাধনে সততই প্রস্তুত। তিনি এক লক্ষ পনর হাজার টাকা মূল্যের সমর-ঋণের কাগজ ক্রয় করিয়াছেন। বাঙ্গালী পল্টনের প্যাট্রিয়টিক ফণ্ডে এবং ইউরোপীয় মহাসমর-সংক্রান্ত ফণ্ডে তিনি অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র অরবিন্দকুমার হার্ডিঞ্জ স্কুলে পড়াশুনা করিতেছে।

বংশ-তালিকা।
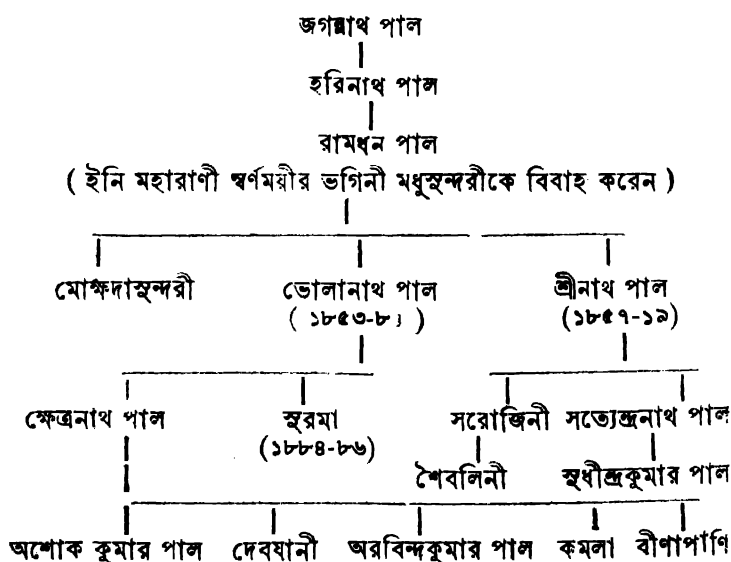
কমলপুরের বসু-বংশ।

কমলপুর গ্রাম দামোদর নদীর দক্ষিণ তীরে বর্দ্ধমান সহর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিশোরীমোহন বসু গ্রামটীর মনোহর দৃশ্য এবং লক্ষ্মীশ্রী দেখিয়া এই গ্রামে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম দেবনারায়ণ বসু। ইনি সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলে ইনি কোম্পানী কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান কালেক্টরীর প্রথম দেওয়ান নিযুক্ত হন। দেবনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপনারায়ণ ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কনিষ্ঠ পুত্র শশিভূষণ ইঁহার মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করেন। শশিভূষণ বসু কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল— সাধারণতঃ বর্দ্ধমানের আদালতেই ওকালতী করিয়া থাকেন। বর্দ্ধমানে ইঁহার নাম ও খ্যাতি যথেষ্ট। ইনি বর্দ্ধমানের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। ইঁহার পুত্র সন্তোষ বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতেছেন। সন্তোষ বাবুর এক্ষণে বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানপদে অধিষ্ঠিত আছেন। সন্তোষ কলিকাতা ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত রায় হরিশ্চন্দ্র মিত্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর হরিশচন্দ্র বাঙ্গালার একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেলের অফিসের চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

সন্তোষ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিভূতি। বিভূতি পরলোকগত সবজজ বাবু হেমচন্দ্র মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। বিবাহের সময় কন্যাটী তাঁহার মাতামহের বাটীতে ছিল এবং বিবাহের সময়ে পাত্র

পাত্র পক্ষ হইতে বরপণ বা যৌতুকের কোনও কথা পর্য্যন্ত উত্থাপিত হয় নাই। সন্তোষ বাবুর প্রথমা কন্যার সহিত কলিকাতার পরলোকগত এটর্ণী বাবু অমরনাথ ঘোষের পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ ঘোষের বিবাহ হইয়াছিল। অরুণেন্দ্রবাবুও এটর্ণী হইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় অকালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহারা কলিকাতার বিখ্যাত শঙ্কর ঘোষের বংশ। সন্তোষবাবুর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছে মেসার্স বামার লরি কোম্পানীর প্রসিদ্ধ বেনিয়ান শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্রের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সহিত; ইঁহাদের বাটী কলিকাতায় রাজা লেনে।

গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদয়াল শশিভূষণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। রামদয়ালের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রে নাথ বসুর এম্, এ, বি, এসের সহিত কলিকাতা হাটখোলার বিখ্যাত দত্ত-বংশজ এটর্ণী শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ দত্তের কন্যার বিবাহ হইয়াছে। সুরেন্দ্র এক্ষণে বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী।

রূপনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাচাঁদ বর্দ্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। সেকালে যখন গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানলাভ প্রায় সকলের ভাগ্যে ঘটিত না, সেই সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তারাচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দের পুত্রগণের মধ্যে অতুল এক্ষণে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং বনবিহারী বাঙ্গালা সি-আই-ডি পুলিশের ইনস্পেক্টর।

ভগবতীচরণের বংশধরগণের মধ্যে বিহারীলাল কলিকাতা ভবানীপুরের বিখ্যাত ডাক্তার।

কমলপুরের বসুবংশ অতিথিসেবার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের বাটীতে অতিথি গমন করিলে তাঁহারা সেই অতিথির সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বংশ-তালিকা।

দাশরথি (১)
|
কৃষ্ণ (২)
|
ভবনাথ (৩)
|
হংস (৪)
|
মুক্তি (৫) (মাহীনগর সমাজ)
|
দামোদর (৬)
|
অনন্ত (৭)
|
গুণাকর (৮)
|
মাধব (৯)
|
লক্ষ্মণ (১০)
|
মহীপতি (১১)
|
ঈশান (১২)
|
বল্লভ (১৩) সুন্দরবর খাঁ নাম পরিচিত)
|
ত্রিলোচন (১৪)

ত্রিলোচন
সঙ্কেত (১৫)
বিজয়রাম (১৬)
রূপকর্ণ (১৭) (কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সুনরার)
কিশোর (১৮) (কমলপুরে বসবাস স্থাপন করেন)
ভগবতীচরণ (১৯)
শিবচরণ (২০)
কালীচরণ
মহাদেব (২১)
রামকান্ত
দেবনারায়ণ (২২)
ইন্দ্রনারায়ণ
রূপনারায়ণ
গোবিন্দ (২৩)
রামগোপাল
বিহারীলাল
তারাচাঁদ
আনন্দ
রামদয়াল
শশিভূষণ (২৪)
সন্তোষ (২৫)
বসন্ত
অতুল
বনবিহারী
নারায়ণ
সুরেন্দ্র
যতীন্দ্র
জ্ঞানেন্দ্র
নরেন্দ্র
বিভূতি
অমিয় (২৬)
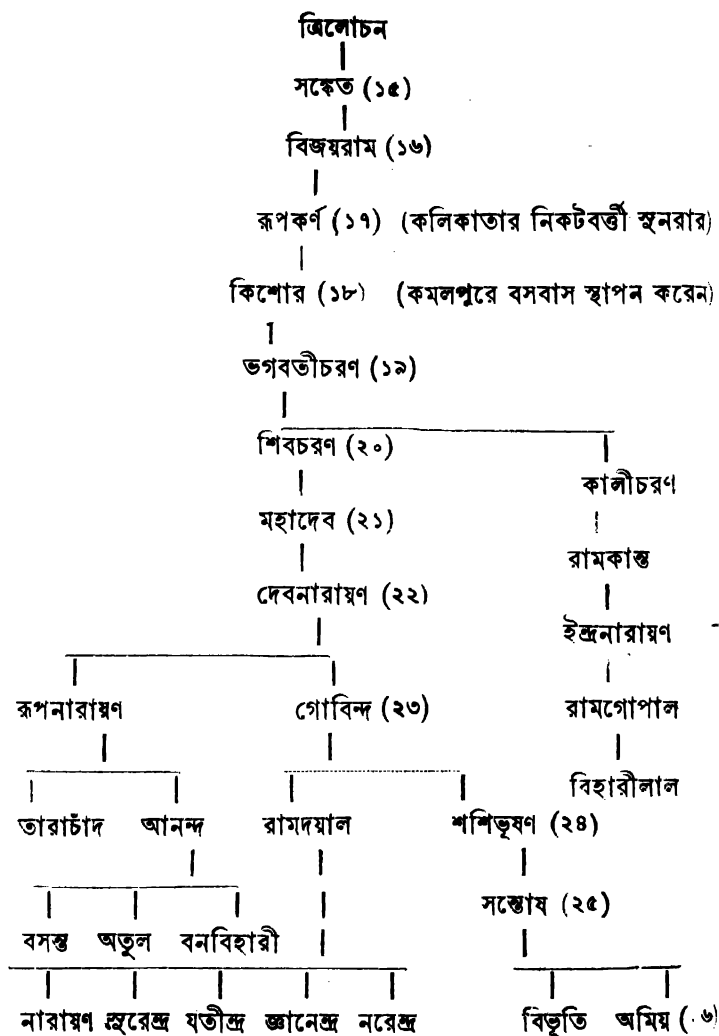
মিঃ এস সি চক্রবর্ত্তী।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ময়মনসিংহ—যলার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও বিবিধ সৎকর্ম্মের অনু-
ষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দেশের কল্যাণ-সাধনে সততই নিযুক্ত
আছেন। ইনি ১২৮৮ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে ময়মনসিংহ জিলার
অন্তর্গত মুক্তাগাছা থানার এলেকাভুক্ত পুখুরিয়া পরগণার অধীন বিদ্যা-
র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার নাম
স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইনি জমিদার ছিলেন এবং জমিদারী
কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেন। ইঁহার প্রপিতামহ স্বর্গীয় ব্রজকিশোর
চক্রবর্ত্তী ময়মনসিংহের সরকারী উকীল ছিলেন।

এই বংশের আদিপুরুষ শ্রীবর তর্কাচার্য্য শান্তিপুর হইতে এখানে
আগমন করেন, ইনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র স্বর্গীয় আনন্দী-
রাম চক্রবর্ত্তী জমিদারী ক্রয় করেন। তাঁহার খুল্লতাত ৺কাশীরাম
চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন; ইঁহার বৃহৎ চতুষ্পাঠী ছিল। ইনি
একটী প্রকাণ্ড শিবমন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইনি বহু দেবোত্তর
ব্রহ্মোত্তর শিবোত্তর প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার বংশধর শ্রীযুক্ত
জ্ঞানেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক্ষণে নানাবিধ সদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন।
এই বংশের রায় প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এই অঞ্চলের অন্যতম
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইনি সতীশচন্দ্রের খুল্লপিতামহ। ইঁহার বিস্তৃত
জমিদারী আছে।

সতীশচন্দ্র শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী এবং স্বয়ং বিদ্যার অনুশীলন
করিয়া থাকেন। তিনি আর্য্যসমাজ হইতে তত্ত্বনিধি উপাধি এবং

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-টি-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। স্বধর্ম্মে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। ইনি পণ্ডিতগণকে বার্ষিক বৃত্তি দান এবং টোলচতুষ্পাঠীতে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর মন্দির স্থাপন করিয়াছেন; ইনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা ও লাইব্রেরীর স্থাপয়িতা। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীর নাম সতীশ লাইব্রেরী। কলিকাতায় হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার সময় ইনি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ-প্রবর্ত্তিত শিল্পবিজ্ঞান সমিতি দেশী যুবকগণকে বিদেশের শিল্পশিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন—সতীশ চন্দ্র এই শুভকার্য্যে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি তীর্থসংস্কারে মন্দির-সংস্কারে এবং অন্যান্য নানা সদনুষ্ঠানে অর্থদান করিয়া থাকেন। ইনি দরিদ্র ও অনাথের বন্ধু এবং বিপন্নের আশ্রয়স্থল। অতিথিসেবা ইঁহার বাটীতে নিত্যক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত। ইনি ইংলণ্ড ফ্রান্স ও আমেরিকার মনোবিজ্ঞান-মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Member of the Psychological Institution and University of Professer E. Elmer Knowledge London, France and America) মনোনীত হইয়াছেন। কেবল অন্তরের গুণেই যে ইনি গুণবান তাহা নহে, ইঁহার অন্যান্য গুণও যথেষ্ট আছে। ইনি ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রাঙ্কনবিদ্যায় সুপটু; পূর্ত্তবিদ্যায় ইঁহার অভিজ্ঞতা আছে। ইনি বন্দুক-চালনা, বাইসিকেল-পরিচালনা প্রভৃতি বেশ ভালরূপ জানেন। ইঁহার দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ শ্রীমান নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কনিষ্ঠ শ্রীমান শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—দুই জনেই পড়াশুনা করিতেছে।

বংশ-তালিকা ।

১

শ্রীবর তর্কাচার্য্য

| ৯

আনন্দীরাম চক্রবর্ত্তী

| ১০

ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী

১১

ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী — রায় প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী বাহাদুর

| ১২

কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

| ১৩

সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী — শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

করা সুকঠিন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনকালীন রাজপুরুষদের নিকট যাঁহারা তোষামোদ দ্বারা ও নানাকার্য্যবশতঃ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভাল ভাল জমী তরফ ইত্যাদি নিজেদের নামে ইজারা ও বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া জমিদার হইলেন। এইরূপ ভাবে জমিদার, ডেপুটী, দেওয়ান, কালেক্টরীর সেরেস্তাদার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে এখনও নয়াপাড়া, পরৈড়ো কলীঘরে ও অন্যান্ত গ্রামে তাঁহাদের বংশাবলীর মধ্যে কেহ কেহ জমীদার আছেন; তবে অনেকেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

৺রামচন্দ্র খাস্তগির অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধিবলে জন-সাধারণ ও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুপরিচিত হয়েন, তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা বাঙ্গালা ও ফারসী ভাষায় পণ্ডিত এবং মুন্সি উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তৎকালে ইংরেজী শিক্ষা চট্টগ্রামে প্রচলিত ছিল না। ইনিই ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে যোগদান করিয়া চট্টগ্রামে ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলেজ, স্কুল ইত্যাদি স্থাপন করেন ও নিজের তিন পুত্রকে শিক্ষার্থ ভর্ত্তি করিয়া দিয়া স্বদেশের মান্যগণ্য সমস্ত ভদ্র পরিবার হইতে ছেলেদের পিতা ও অভিভাবকদের বুঝাইয়া শিক্ষার্থ ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছেন। কারণ তৎকালে জনসাধারণের এই বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা ধর্ম্ম নষ্ট হইবে ও জাতিচ্যুতি ঘটিবে।

স্বর্গীয় ৺রামচন্দ্র মুন্সীই চট্টগ্রামের শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতির মূল। তাঁহাকে কর্ত্তৃপক্ষ মুন্সেফী পদ প্রদান করেন। তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া উকিল-সরকারী পদই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন, যেহেতু তদবস্থায় তিনি স্বদেশের অনেক উন্নতি ও উপকার করিতে পারিবেন। তৎকালীন কমিশনার সার্ হেন্‌রী রিকেট্, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি বক্‌ল্যাণ্ড

এবং জজ (নাম জানি না) তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং দেশের কোন গুরুতর ও আবশ্যক বিষয়াদিতে তাঁহাকে আহ্বান করতঃ পরামর্শ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও বক্ল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার বন্ধুর পুত্রদ্বয়ের (স্বর্গীয় উমাচরণ ও অন্নদাচরণের) উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কোন বিপদ ঘটিলে স্বয়ং লাট্-বেলাট চিফ্ জাষ্টিস্, চিফ্ সেক্রেটারী এবং মেডিক্যাল বোর্ডে যাইয়া পক্ষ সমর্থন করিতেন। চিঠিপত্রে ও মৌখিক আলাপের সময় নামের পূর্ব্বে বাবু শব্দ প্রয়োগ না করিয়া নিজ সন্তানবিশেষে বন্ধু-পুত্রদ্বয়ের উমা, অন্নদা, শ্যাম বলিয়া ডাকিতেন। স্বর্গীয় উমাচরণ খাস্তগির চট্টগ্রাম কলেজে জুনিয়ার পরীক্ষা পাশ করিয়া ওকালতি পাশ করেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা স্বর্গীয় ডাক্তার খাস্তগির জুনিয়ার পরীক্ষা পাশ করিয়া বৃত্তি লইয়া ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিতে যান। তিনি তথায় অসাধারণ প্রতিভাবলে সিনিয়র পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৫৫৲ টাকা বৃত্তি লইয়া কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়িতে যান, তথায় কিছুকাল পর আর একটী পরীক্ষার পাশ করিয়া ৩০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই উভয় বৃত্তিতে মাসিক ৮৫৲ টাকায় সপরিবারে তিনি কলিকাতায় থাকিয়া পাঠ শেষ করিলেন। তাঁহার প্রথম চাকুরী আরাকানে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের কর্ম্ম। সমুদ্র উপকূল দিয়া পালকী-যোগে তথায় যাইতে হইয়াছিল। তিনি তথায় যাইয়া গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লেখালেখি করিয়া চট্টগ্রামে ও আরাকানে জাহাজ-যাতায়াতের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেন। তৎপর তিনি বাড়ী আসিয়া জাহাজযোগে সপরিবারে সমুদ্রপথে আরাকানে যান। হিন্দু পরিবারের সমুদ্র-পথে আরাকান গমন সম্বন্ধে অনেক বড় বড় হিন্দু পরিবার নানা আপত্তি করায় তিনি তাহা খণ্ডন করিয়া

ভবিষ্যতে উন্নতি ও নানারূপ সুবিধা নিরাপদতা ইত্যাদি দেখাইয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন। তথায় কয়েক বৎসর অবস্থিতির পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺মহেন্দ্রলাল খাস্তগির প্লীহা ও যকৃৎ রোগে ৫ বৎসর বয়সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপর তিনি বরিশাল জিলায় বদলী হয়েন। তথায় তিনি সাড়ে তিন বৎসর ছিলেন; ইতিমধ্যে কারাগারের মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী হওয়ায় জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে কৈফিয়ৎ চাহেন—কেন এইরূপ হইতেছে এবং কি প্রকারে উহার প্রতীকার হইবে। জেলার কর্ত্তা যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁহার নিকট রিপোর্ট চাওয়া হইয়াছিল। তিনি কারণ ও প্রতীকার সম্বন্ধে রিপোর্ট দেওয়ার পর জেলের কর্ত্তাকে তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে জেলের কর্ত্তা করিয়াছিলেন। তিনি কয়েদীগণের বাসস্থান, তাহাদের পরিশ্রম সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম করিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা একেবারে কমাইয়া দিলেন। এই সূত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে তাঁহার মনোবাদ চলিতে আরম্ভ হয় এবং পরস্পর বচসা এমন কি হাতাহাতির উপক্রম হয়। তৎসম্বন্ধে উভয়েই নিজ নিজ বিভাগের কর্ত্তার নিকট রিপোর্ট করেন। মেডিক্যাল বিভাগের কর্ত্তা উভয়েরই মধ্যে প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট দেন। গভর্ণমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধমক দিয়া ডাঃ খাস্তগীরকে মথুরা বেনারসের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পদে বদলী করেন। কিন্তু মেডিকেল বোর্ড তাঁহার সপক্ষে থাকিয়া কিছু প্রতীকার করিতে পারিলেন না। তখন ডাক্তার খাস্তগীর চাকুরী ইস্তফা দিতে চাহিলে তাঁহারা তাঁহাকে তাহা করিতে দিলেন না, বলিলেন যে, সত্বর তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক পদে বদলী করিয়া আনা হইবে নতুবা তাঁহার পদোন্নতি করা হইবে। তিনি মেডিক্যাল বোর্ডের আশ্বাস পাইয়া এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাতুল্য

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশক্রমে তাঁহার তত্ত্বাবধায়কত্বে পরিবার কলিকাতায় রাখিয়া বেনারসে চলিয়া যান। মালদহ ত্যাগ করিবার এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার তৃতীয় পুত্র ৺সত্যেন্দ্র খাস্তাগর ৫ বৎসর বয়সে আমাশয় রোগে পরলোক গমন করে। এক বৎসর তথায় অবস্থানের পর তিনি দীর্ঘ ছুটী প্রার্থনা করেন। ছুটী লইয়া তিনি কলিকাতায় চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তাহাতে তাঁহার সমকালীন ডাক্তারদের পশার হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল; ইহাতে ডাক্তারদের কেহ কেহ তাঁহাকে হিংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার সরকার, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী, ডাক্তার বসু তাহার সমপাঠী ছিলেন, ইহাদের সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। ছুটী শেষে তিনি মেডিক্যাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যায় অস্থায়ী অধ্যাপক হয়েন, তৎপরে তিনি যশোহর বদলী হয়েন। তথায় এক বৎসর থাকিয়া স্বীয় দেশে বদলী হইয়া আসেন, উদ্দেশ্য দেশের উন্নতি সাধন করা। চট্টগ্রামে তিনি যে কয়েক বৎসর ছিলেন, সেই অল্প সময়ের মধ্যে সামাজিক শিক্ষা, চিকিৎসা, সভা সমিতি স্থাপন, দেশের দুরবস্থা, অভাব এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের জবরদস্তি ইত্যাদি গভর্ণমেণ্টের গোচর করা বিষয়ে তিনি সকলকে উৎসাহ দিতেন। তিনি চট্টগ্রাম এসোসিয়সন স্থাপনের মূল পরামর্শদাতা। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি গণিত শাস্ত্রে, ইংরাজী শাস্ত্রে ও মাতৃভাষাতে সমপারদর্শী ছিলেন। তৎপর তিনি শিবসাগরের সিবিল সার্জ্জন পদে উন্নীত হয়েন। কিন্তু তথায় যাত্রা করিবার দিবসে তাঁহার দশমবর্ষীয়া সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনী ওলাউঠা রোগে মারা যায়, সুতরাং তিনি শিবসাগর যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করায় কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে কলিকাতায় সাউথ সুবর্ব্বন হাঁসপাতালের ভার প্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তথায় তিন বৎসর কাল থাকিয়া সর-

কারী কর্ম্ম ছাড়িয়া নিজেই ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে বাড়ী ক্রয় করিয়া ডিস্পেন্সারী স্থাপন করেন ও চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তাঁহার ন্যায় অস্ত্র-চিকিৎসক, ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ও সাধারণ রোগ চিকিৎসক ছিল না, তৎকালে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও কেহ তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফেবার ও ডাক্তার ম্যাকনামারা তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অবস্থানকালে খুব কঠিন রোগী পাইলে ডাক্তার খাস্তগীরকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন। শেষোক্ত ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, চক্ষু চিকিৎসাতে ডাক্তার খাস্তগীর মহাশয়ের সমকক্ষ এইখানে কাহাকেও দেখিতেছি না। ওলাউঠা রোগে তাঁহাকে সকলে বিশেষজ্ঞ মনে করিতেন। তাঁহার হাতে শতকরা ২।৪ জন মারা যাইত। বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়া সংক্রামক হইয়া শত শত নরনারী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল—ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া গেল, কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ প্রতীকার করিতেছেন না দেখিয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক সত্বর ইহার প্রতীকারের জন্য এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র জারী করিয়া দেন যে, এই ব্যাধির কারণ নির্ণয় ও প্রতীকারের যুক্তিযুক্ত উপায় যিনি বাহির করিবেন তাঁহাকে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। তিনি ৫০০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার অন্যান্য সিভিল ও এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনগণ তারতম্য-হিসাবে ৫০০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন। তিনি অসংখ্য পাথার রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। ধাত্রীবিদ্যায় ভারতবর্ষে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, জরায়ুস্থ সন্তান মরিয়া পঁচিয়াছে এই অবস্থায় পতিত হাজার হাজার গর্ভিণীদের তিনি রক্ষা করিয়াছেন। কলিকাতা বরাহনগর হাঁসপাতালে একটি রোগীর এক মণ কত সের মেদপূর্ণ কুরণ্ড কাটিয়া স্বাভাবিক কোষে পরিণত করেন। তদ্রূপ আর

একটী রোগী যশোহরে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তিনি কাটিতে পারিলেন না। কারণ দুই দিবস পর তাঁহাকে চট্টগ্রাম হাজির হওয়ার জন্য রওনা হইতে হইল। তথাপি তিনি তাহাকে সঙ্গে আনিয়া মেডিক্যাল কলেজে রাখিয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সে বলিল, "আপনার হাতে মরিলেও ভাল, অন্য স্থানে যাইব না"। যাহাদের অন্য ডাক্তার কবিরাজেরা মারা যাইবে ভাবিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার চিকিৎসায় এইরূপ মহাসঙ্কটাপন্ন রোগীরা রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। তিনি "আয়ুর্বর্দ্ধন" ও ধাত্রীবিদ্যা নামে দুই খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে বেঙ্গল কনফারেন্স প্রথম স্থাপিত হয় ও তিনিই উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর আর অন্ধকারে থাকিযা কেরাণীগিবি করিয়া দিনাতিপাত করিবার সময় চলিয়া গিয়াছে; উন্নতিব সোপান অবলম্বন করা বিধেয়। দেশের অভাব, অত্যাচার, সামাজিক দোষ কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করা কর্ত্তব্য। পবে জাতীয় কন্‌ফারেন্স বা কংগ্রেস দ্বারা সকলে একবাক্যে একমতে কর্ত্তৃপক্ষের তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, গভর্ণমেণ্ট তাহা না শুনিয়া কখনও পারিবেন না। ডাক্তাব খাস্তগীরের সেই বেদবাক্য ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে চলিল। তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

তিনি চট্টগ্রাম থাকিবার কালে প্রথম নাট্যাভিনয় করাইয়াছিলেন। স্কুলের পণ্ডিত মাষ্টার উকীল মোক্তার কেরাণী, ইঁহাবাই অভিনেতা থাকিতেন। ছেলেরা অভিনয় করিতে পাবিত না। তদ্রূপ যে অভিনয় দ্বারা সামাজিক দোষ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি দূর হইবে তদ্রূপ বিশুদ্ধ নাটকেব অভিনয় হইত, মদ ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি অভিনয়ে যোগ দিতে পারিত না। এই নাটক অনেক বৎসর স্থায়ী ছিল। তিনি সতত রোগ-ব্যবস্থা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন, কবিরাজী মুষ্টিযোগ,

এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি-সংক্রান্ত নানারূপ গ্রন্থ তিনি আলোচনা করিতেন, তিনি এইহেতু মাসিক চিকিৎসা-সম্মিলনী বাহির করিতেন। ইহাতে অনেক বড় বিচক্ষণ কবিরাজ ও ডাক্তার প্রবন্ধ দিতেন। তিনি কলিকাতায় একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের উদ্যগীছিলেন উাহা বর্ত্তমানে বেলগেছিয়া মেডিক্যাল স্কুল নামে খ্যাত। তিনি অত্যন্ত অধ্যয়নরত ছিলেন। রাত্রে ১০টা বাজিলে শুইতেন। ১ কি ২ বাজিলে উঠিয়া বই পড়িতেন ও লিখিতেন। রাত্র ৪ বাজিলে পাইখানাতে যাইতেন ও ৫টা বাজিলে ভ্রমণে বাহির হইয়া ২ মাইল হাঁটিতেন। তিনি চা পানের বিরোধী ছিলেন। ভোরে ফিরিয়া গাভী-দুগ্ধ দোহন করিয়া কাঁচা দুগ্ধ ⁄॥৹ সের তিন ছটাক চিনি যোগে পান করিয়া ডাক্তারখানায় যাইতেন, দিবা ১২টার সময়ে আহার করিতেন। অর্দ্ধঘণ্টা বিছানাতে এপাশ-ওপাশ করিয়া কাটাইতেন, তৎপর উঠিয়া পড়া লিখা আরম্ভ করিতেন। ৪টার সময়ে ডাক্তারখানাতে যাইতেন। তৎপর বাহিরে রোগী দেখিতে যাইতেন। স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে তিনি সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অলসতা কি তাঁহার জীবনে কখনও জানিতেন না।

তিনি প্রিয়ভাষী ছিলেন। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি পরিত্যক্ত অসহায় বালক-বালিকা, ও পিতৃহীন যুবকগণকে নিজে আশ্রয় দিয়া ও যথাযোগ্য শিক্ষা দানে মানুষ করিয়া দিতেন; ইহা ভিন্ন জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন, দেশী বিদেশী অনেক গরীব ছাত্রকে ভরণ পোষণ করিতেন ও পড়াইতেন। গরীব দুঃখী রোগী ও স্বদেশী ছাত্রবৃন্দ যাহারা কলিকাতায় অধ্যয়ন করিত, তিনি তাহাদের নিকট হইতে দর্শনী লইতেন না।

তিনি উচ্চশিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই দুইটী বিষয়ই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল তিনি তাঁহার চতুর্থ কন্যা

কুমুদিনীকে বেথুন কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমতী কুমুদিনী সংস্কৃত সাহিত্যে অনার লইয়া বি-এ পাশ করেন। পূর্ব্বে পূর্ব্ববাঙ্গলার ইহার আর কোন মহিলা বি-এ পাশ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। ডাক্তার খাস্তগীর মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত স্বর্গীয় বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছিল। দ্বিতীয়া কন্যার আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত করুণাচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। তৃতীয় কন্যা চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক ৺যাত্রামোহন সেনের পত্নী। চতুর্থা কন্যাকে এডিনবরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ডাক্তার ৺নগেন্দ্রচন্দ্র দাস মহাশয় বিবাহ করেন। পঞ্চমা কন্যা জীবদ্দশায় মারা যান।

তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন বটে; কিন্তু সাধারণ বা নব বিধান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তিনি স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতাবলম্বী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি অবসর পাইলেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখিতে যাইতেন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, মিথ্যাবাদী, তোষামোদকারী, ভণ্ডদিগকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি যেরূপ ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তদ্রূপ ধর্ম্মপ্রবণা ছিলেন। প্রত্যেক মহৎকার্য্য সম্পাদনে তিনি আদর্শ রমণীরত্নের সাহায্য পাইতেন।

তাঁহার পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা। প্রথম পুত্র—৺মহেন্দ্রলাল খাস্তগীর; দ্বিতীয় পুত্র—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল খাস্তগীর; তৃতীয় পুত্র ৺সত্যেন্দ্রলাল খাস্তগীর; চতুর্থপুত্র রায় হেমেন্দ্রলাল খাস্তগীর এম-এ বাহাদুর, ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট; এবং পঞ্চম পুত্র—সুরেন্দ্রলাল খাস্তগীর—বার-এট্-ল।

প্রথমা কন্যার নাম ৺সৌদামিনী গুপ্ত। দ্বিতীয় কন্যার নাম ৺মোহিনী সেন। তৃতীয়া কন্যার নাম ৺বিনোদিনী সেন। চতুর্থা কন্যার নাম ৺কুমুদিনী দাস বি-এ কলিকাতা বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল; এবং পঞ্চমা কন্যার নাম ৺সরোজিনী খাস্তগীর।

বিগত ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে খাস্তগীর মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ক্রম ৫৭ বৎসর হইয়াছিল।

স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল শেঠ।

স্বর্গীয় নিত্যগোপাল শেঠ।

নিত্যগোপাল শেঠ মহাশয় বাঙ্গালা ১২৬৩ সালের পৌষ মাসে চন্দন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শম্ভুচন্দ্র শেঠ মহাশয় এক-জন প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন। এরূপ সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিক লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে বিশেষ উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, প্রথম অবস্থায় তিনি কলিকাতায় এক দোকানে ৮।১০ টাকা বেতনে চাকুরি করিতেন। পরে কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে অতি সামান্য, সম্ভবতঃ হাজার টাকা মাত্র, মূলধন সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার বড়বাজারে এক-খানি সামান্য লোহার দোকান করেন এবং ক্রমে তাঁহার সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা ও স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা কালে লৌহ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন।

শম্ভুচন্দ্র ইংরাজী জানিতেন না, বাঙ্গালাও খুব সামান্যই জানিতেন, কিন্তু নিজ প্রতিভাবলে তিনি ইউরোপের সহিত ব্যবসায়-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যথেষ্ট সাফল্য ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই দেশবাসীকে লৌহ ও ষ্টীলের আমদানী ব্যবসায়ের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

শম্ভুচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ হুগলী জেলার হারীট গ্রামে বাস করিতেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই প্রপিতামহ প্রথমে চন্দননগরে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের প্রকৃত উপাধি শেঠ নহে—নন্দী; চৌধুরী, মল্লিক, সামন্ত প্রভৃতির ন্যায় "শেঠ" নবাব প্রদত্ত উপাধি। এই শেঠ বংশ চির-

কালই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অর্থশালী ছিলেন। শুনা যায়, পিতা রাধামোহন এক ব্রাহ্মণের অন্যের নিকট ঋণ-গ্রহণকালে মৌখিক জামিন হন। পরে সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায় রাধামোহন তাঁহার নিজ বাসের প্রকাণ্ড বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণের ঋণ শোধ করেন। সেই বাড়ী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দেখিলে বুঝা যায় যে, উহা বর্ত্তমানেও চন্দন নগরের প্রধান অট্টালিকা সমূহের মধ্যে অন্যতম।

নিত্য গোপালকে লোকে সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ বলিয়া জানিলেও তিনি পিতার তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তাঁহার পাঁচ সহোদর ও তিন সহোদরা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৪ বৎসর ও মধ্যম ভ্রাতা ১৮ বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁহার অদৃষ্টে মাতৃস্নেহ লাভ বেশী দিন ঘটে নাই। যখন তাঁহার বয়ক্রম নয় বৎসর তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। সে সময়ে এক বিধবা পিতৃস্বসা ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীলোক না থাকায় সংসারে অত্যন্ত অসুবিধা ছিল। তাঁহার শৈশবের শিক্ষা এক বাঙ্গালা পাঠশালায় শেষ হয়। তৎপরে তিনি স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর মাত্র, সম্ভবতঃ প্রবেশিকার ৬ষ্ঠ বা ৫ম শ্রেণী পাঠ করিয়া পিতার বার্দ্ধক্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু-হেতু ব্যবসায় কার্য্য দেখিবার অন্য লোক না থাকায় তাঁহাকে কলিকাতায় কাজ কর্ম্ম শিখিবার জন্য যাইতে হয়। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা লেখা পড়ায় বেশ উন্নতি করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। লেখা পড়া শিক্ষা পাছে এই পুত্রেরও বিপদের হেতু হয়, প্রাচীন সংস্কারপূর্ণ বৃদ্ধ পিতার এই আশঙ্কাও পুত্রের লেখাপড়া ছাড়াইবার একটী কারণ।

নিত্যগোপাল শৈশবে ও বাল্যকালে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও দুরন্ত ছিলেন, বয়সের সহিত সে দুরন্ত ভাব দূর হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার
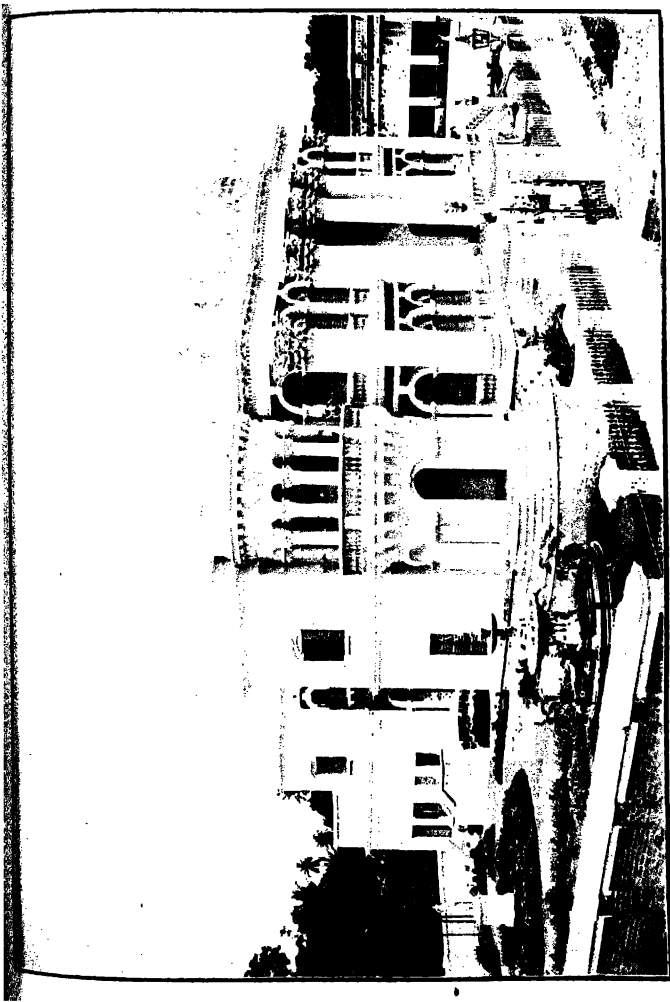
নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির।

শেষ দিন পর্য্যন্ত সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাব কোন দিন হয় নাই। অতি শৈশবেও তিনি খুব প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। একদিন একজন মর্ত্তমান রম্ভা বিক্রয় করিতে আসিয়া সে তাহার গুণব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলে, 'এ কলার ভিতর ক্ষীর আছে।" তৎক্ষণাৎ শিশু নিত্যগোপাল উত্তর দেন, "আমার এ পয়সার ভিতরও সোনা আছে"। আর একদিন তাঁহার গুরুমহাশয় বলেন, 'তোমার বাবার ত আমার মত চালা ঘর নাই ?' তাহাতে তিনি উত্তর দেন, 'আমার বাবার মত আপনার মাথায় ত টাক নাই।'

১৬ বৎসর বয়সে খামারপাড়া নিবাসী স্বনামধন্য স্বর্গীয় ভুবন চাঁদ কুণ্ডু মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার পত্নী বিয়োগ ঘটায় পরবৎসর দ্বিতীয় বার কলিকাতার স্বর্গীয় ব্রজ কুমার নন্দী মহাশয়ের তৃতীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ধনীর কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলে অমঙ্গল ঘটে এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এবার তিনি ইচ্ছা করিয়া একটী সুলক্ষণা দরিদ্রের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন।

পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মানসিক শান্তিহীনতার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সংসার তত্ত্বাবধারণের সকল ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল, এই সময় হইতেই কলিকাতার ও অন্যান্য সকল স্থানের কার্য্য দেখিবার পূর্ণ ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। সে সময়ে লোহা ও ষ্টীলের কাজ ভিন্ন কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মোকামি কাজ ছিল এবং কলিকাতার হাটখোলায় তাহার প্রধান কেন্দ্র ছিল। তিনি নিজে সকল কাজ দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পিতাকে যাহাতে সংসারের সকল চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ অবসর দিয়া তাঁহার ভগবচ্চিন্তায় সহায়তা করিতে পারেন সে বিষয়ে যতদূর সম্ভব যত্ন করিতে লাগিলেন। পিতা মাতার প্রতি

তাঁহার বাল্যকাল হইতেই প্রগাঢ় ভক্তি ছিল এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও পুণ্যপ্রভাবেই যে তাঁহার যাহা কিছু উন্নতি ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। তাঁহার পিতাও তাঁহার পিতৃভক্তি ও বিবিধ গুণ দেখিয়া সকল পুত্র অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর স্নেহ করিতেন এবং প্রকৃতই তাঁহারই যত্নে শেষজীবনে অনেকাংশে শান্তিলাভ করিয়া পরিশেষে পরিতৃপ্ত চিত্তে স্বর্গারোহণ করেন।

পিতার মৃত্যুকালে নিত্যগোপালের বয়স পঁচিশ বৎসর, তখন তাঁহার আর দুইটী ছোট সহোদর ও দুই জ্যেষ্ঠাভগ্নী ছিলেন। তিনি অতি সমারোহে পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেন, তৎপূর্ব্বে এরূপ শ্রাদ্ধ চন্দননগরে বা নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে খুব কমই হইয়াছিল। তাঁহার সেজ ভ্রাতার মৃত্যু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, এক্ষণে শম্ভুচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের সন্তানদের মধ্যে অবশিষ্ট নিত্যগোপালের কনিষ্ঠ সহোদর মাত্র জীবিত আছেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে উপযুক্ত ব্যবহার তিনি কখনও পান নাই, বরং তাঁহাদের জন্য সময় সময় নিদারুণ মনোকষ্ট পাইয়াছেন, তথাপি এজন্য কোন দিন কনিষ্ঠদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। ভ্রাতাদের নিকট অতি সামান্যমাত্র সাহায্য না পাইয়াও তিনি সম্পূর্ণ লোভশূন্য অন্তঃকরণে আজীবন পরিশ্রম করিয়া যেমন ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন তেমনই সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতার দ্বারা সকল কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পিতার অর্জ্জিত সুনাম বহু পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন। একমাত্র নিজ পরিশ্রমের দ্বারা পৈতৃক বিষয়ের অনেক গুন বৃদ্ধি করিলেও তাহাতে অপর ভ্রাতাদের অপেক্ষা কাহার যে কিছুমাত্র অধিক দাবি আছে এ কথা তিনি কখন মনে করেন নাই, এবং শেষ পর্য্যন্ত ভ্রাতাদের পৃথক করিয়া দিবার কল্পনাও কখন মনে স্থান পায় নাই। বরং মৃত্যুর পূর্ব্বে

পুত্রদের বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহাদের খুল্লতাত বিষয়-সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলে তাহাদের যে অংশ দিবেন তাহাতেই যেন তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। তিনি মনে করিলেই তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অনেক অংশ অনায়াসেই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু সে কাজ করা দূরে থাকুক সে চিন্তাও বোধ হয় কখন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনকে কলুষিত করে নাই।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করা, সত্যে বিশ্বাস ও মিথ্যায় ঘৃণা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। কথায় ও কার্য্যে অন্তর ও বাহিরের অসামঞ্জস্য তাঁহার মধ্যে কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। তাঁহার বিনয়ের অভাব না থাকিলেও তিনি অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। সত্য কঠোর হইলেও আবশ্যক হইলে কখনও তাহা তিনি বলিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না বা তাহাতে নিজ ক্ষতির সম্ভবনা থাকিলেও সে জন্য গ্রাহ্য করিতেন না।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁহার সাধুতা, সত্যবাদিতা, উদারতা, অমায়িকতা প্রভৃতির যেরূপ সুনাম ছিল, কলিকাতায় অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তাহা খুবই দুর্ল্লভ, এবং তাঁহার অর্জ্জিত খ্যাতির প্রভাবেই আজিও শম্ভূচন্দ্র শেঠ এণ্ড সন্সের নাম ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও লৌহ ব্যবসায়ীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহতভাবে এরূপ সুনাম রক্ষা করিয়া কাজ করার উদাহরণ কলিকাতার ব্যবসায়ের ইতিহাসে কমই দেখা যায়। তাঁহার সত্যবাদিতার প্রতি লোকের এরূপ বিশ্বাস যে, কি কলিকাতায় কি ইউরোপে তাঁহার সহিত যাঁহারা কাজ করিয়াছেন এ পর্য্যন্ত কেহ কখন কোন কণ্ট্রাক্ট বা এগ্রীমেণ্ট সহি করিতে বলেন নাই। কণ্ট্রাক্ট সহি না করিয়া কাজ করা শুধু দেশীয় ফার্ম্ম কেন বড় বড় ইংরাজী ফার্ম্মের মধ্যেও

তিনি কখন থাকিতেন না। তাঁহার দেশবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বহুবার তাঁহাকে মিউনিসিপ্যালিটি ও স্থানীয় সভার কাউন্‌-সিলার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে সব সম্মানকে লোভনীয় মনে করেন নাই। যে সকল উপায়ের দ্বারা ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট উপাধি লাভ করা যাইতে পারিত, তাঁহার সে স্থযোগ খুব বেশী ছিল, কিন্তু প্রবৃত্তির অভাবে তাহার অন্বেষণ করেন নাই। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে বা তাঁহার বাটিতে কোন কারণে না আসিলে স্থানীয় প্রধান রাজপুরুষদিগের সহিত এমন কি গভর্ণর বাহাদুরের সহিতও সাক্ষাৎ করার আগ্রহ ছিল না।

নিত্য বাবুর বাল্যকাল হইতেই শিল্পকলায় একটু স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যাইত। তিনি স্বহস্তে অনেক শিল্পের কাজ করিতে পারিতেন। কোনরূপ শিক্ষা না থাকিলেও তিনি চমৎকার ছবি আঁকিতে ও মৃৎপুত্তলিকা তৈয়ারী করিতে পারিতেন। স্থাপত্য শিল্পে তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। তাঁহার শিল্প ও সৌন্দর্য্যের যে রুচি ছিল তাহাও প্রশংসনীয়। তিনি একদিনের জন্যও অলস ছিলেন না, কর্ম্মই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। লোহা ষ্টিল ও করোগেট ব্যতীত তিনি অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের ব্যবসায় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল তাঁহার পক্ষে বেশী স্থবিধাজনক হয় নাই বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। মোকামি কাজও তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তুলিয়া দিয়াছিলেন। শেষে কেবল মাত্র তাঁহাদের পুরাতন কাজ ও ব্যাংকিং কাজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে অধিকতর উচ্চ বাসনা ছিল, অন্যান্য কতিপয় বাসনার সহিত সাংসারিক কারণে তাহা পূর্ণ হয় নাই।

যে সকল গুণ বর্ত্তমান থাকিলে মানুষ প্রকৃত বড় হয় তাহা তাঁহার চরিত্রে একাধারে প্রায় সমস্তই বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল

ও পবিত্র ছিল। যাহাকে অন্যায় বা পাপ বলিয়া মনে করিতেন সে কাজ করা দূরে থাক তাহার চিন্তাকেও তিনি পাপ মনে করিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম-লিপ্সা চিরদিনই প্রবল ছিল, দেবদ্বিজে তিনি যথেষ্ট ভক্তিমান ছিলেন, ইষ্টমন্ত্র যপ না করিয়া কখন জল গ্রহণ করিতেন না, নিষ্ঠাবান হিন্দুর যাহা কর্ত্তব্য তিনি তাহা পালন করিতেন, কিন্তু ধর্ম্মের গোঁড়ামিকে ঘৃণা করিতেন, কর্ত্তব্য পালনই মানুষের প্রধান ধর্ম্ম ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহার সমস্ত জীবন পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই সকল দিকে সর্ব্বদা প্রতীয়মান হয়। নিজ সংসারের প্রতি এই কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয়ের কতকগুলি উচ্চ সাধ তাঁহার জীবনের সহিত চিরদিনের তরে বিলীন হইয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের জ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনি কোন সৎকার্য্যই ভ্রাতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করিতেন না।

তাঁহার নিজের সাজসজ্জা সামান্য ছিল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভাল বাসিলেও তিনি বিলাসিতা ভালবাসিতেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই ২।৪ খানি গাড়ি জুড়ি রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার বাবুগিরি কিছুই ছিল না, এমন কি তাঁহাকে কেহ কেশের পারিপাট্য সাধন করিতে কখনও দেখেন নাই। নিজ পুত্র কন্যাদেরও কখন বিলাসী হইতে দিতেন না। তিনি নিতান্ত সাদাসিদাভাবে থাকিয়া প্রায় সমস্ত জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, নিজের বিলাস চরিতার্থ করিতে কখন অর্থ নষ্ট করেন নাই, কিন্তু তাঁহার ঈপ্সিত সদিচ্ছা সকল যাহা অর্থের দ্বারা পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, অবস্থার প্রতিকূলতায় তাহা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার নিকট কি বিদ্যার্থী, কি গৃহহীন, কি কন্যাদায়গ্রস্ত, কি বিপদ্গ্রস্ত বন্ধুদের যিনিই যখন কোন প্রার্থনা জানাইয়াছেন কখনও কাহাকেও তিনি, বিমুখ করেন নাই। তাঁহার

জন্মভূমির সকল সাধারণ ও হিতকর অনুষ্ঠানেই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব হিসাবে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াও দরিদ্রদের স্থায়ী হিতকর কোন কোন বিষয়ের কিছু করিবার তাঁহার আন্তরিক সাধ ছিল, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইবার পক্ষে বাধা থাকায় তিনি অন্তরে অসুখী ছিলেন। তিনি যে সকল দান করিতেন তাহা সহজে জানিবার উপায় ছিল না। তিনি কখন কোথাও কিছু দান করিয়া আধুনিক পদ্ধতিমতে নিজ নাম দাতব্য-তালিকায় স্বাক্ষর করিতেন না বা তাহা সংবাদ পত্রে কি জন-সাধারণে জানাইতেন না এবং কোথাও কিছু দান করিতে স্বীকার করিয়া বিলম্ব করাও তাঁহার স্বভাব ছিল না, যাহা স্বীকার করিতেন তাহা সঙ্গে সঙ্গেই দান করিতেন। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দান ছিল, আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও বৃহৎ দানের পথে যে অন্তরায় ছিল শেষ সময়ে যখন বুঝিলেন সে অন্তরায় যখন আর ইহকালে যাইবার সম্ভাবনা নাই তখন তিনি তৎকালীন ব্যবস্থায় যাহা সম্ভব পঞ্চাশ হাজার টাকা, দেশের হিতের জন্য দান করিয়া যান। সে টাকা এখন জমা আছে শীঘ্রই চন্দননগরের কোন জন-হিতকর কার্য্যে তাহা ব্যয় করা হইবে।

যিনি কখনও তাঁহার সহিত অল্প সময়ের জন্যও আলাপ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার স্বাভাবিক নিরহঙ্কার, অমায়িকতা, সরলতা ও বিনয় সৌজন্যাদি গুণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রকৃতই অর্থের সহিত এমন ঔদার্য্য, গাম্ভীর্য্যের সহিত এমন সরলতা, বিচক্ষণতার সহিত এমন কার্য্যদর্শীতা আধুনিক যুগে বড়ই দুর্ল্লভ।

এই সকল বহু গুণের অধিকারী থাকায়, তিনি আজীবন অজাতশত্রু ছিলেন, এবং জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন। তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ দেশে আবাল-বৃদ্ধ সকলে তাঁহার নাম
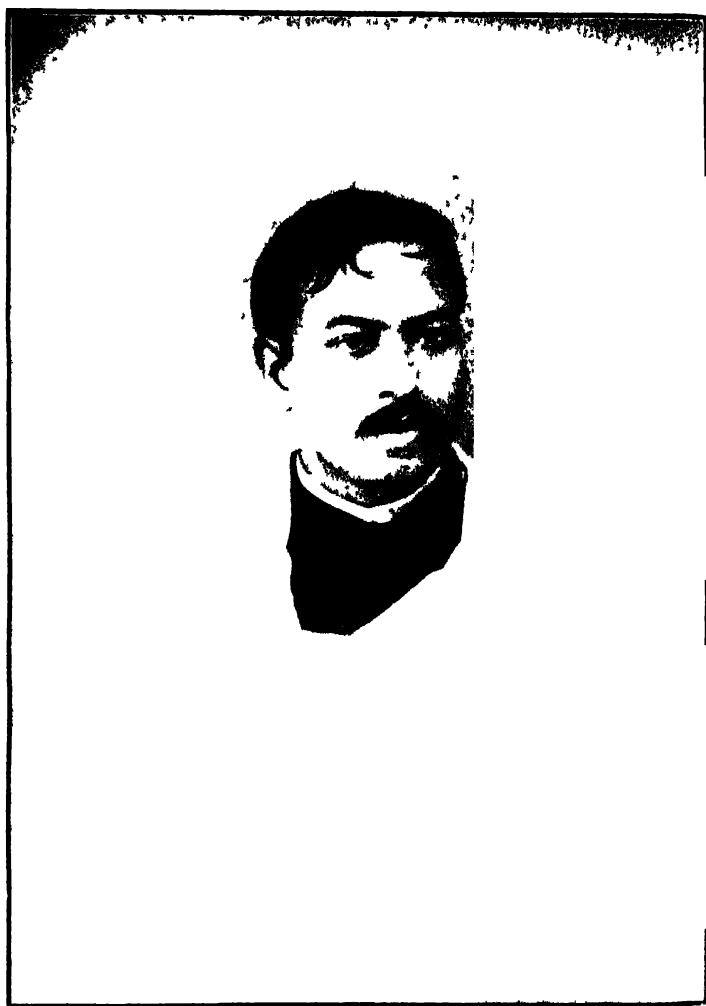
শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ।

আজিও সম্মানের সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার মৃত্যুব পর কলিকাতায় সমগ্র লোহাপটী একদিন সকলে বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

মৃত্যু কালে তাঁহাব বয়ঃক্রম সাতান্ন বৎসব হইয়াছিল। শেষ দশায় কএক বৎসর তিনি বিশেষ অসুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাব বৈধব্য ও সেজ ভ্রাতাব মৃত্যু ভিন্ন অন্য বিশেষ শোক তিনি আব কিছু পান নাই। মৃত্যুব পূর্ব্বে কযেক মাস কাল শয্যাগত থাকিযা ১৩২০ সালে চৈত্র মাসে তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া সাধনোচিত ধামে গমন কবেন

তাঁহাব পুত্রত্রয়েব মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিহব শেঠ বহু মাসিক পত্রাদিতে প্রবন্ধ এবং "অভিসাপ" "প্রসাদ" "অদ্ভুত গুপ্ত লিপি" "অমৃতে গবল" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছেন। অপব দুহ পুত্র শ্রীযুক্ত শিববাম ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস শেঠ। এই তিন উপযুক্ত গুণবান্, পিতৃভক্ত, দেশবৎসল পুত্র পিতাব স্মৃতি চিরস্থায়ী রাখিবাব জন্য চন্দননগবে ন্যূনাধিক পঞ্চাশসহস্র মুদ্রাব্যয়ে সাধাবণেব হিতার্থে "নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিব" নামে একটি বিরাট প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা সাধাবণ পুস্তকাগারে পরিণত কবিয়াছেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি

স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ব্যবহারশাস্ত্রে বাঙ্গালীর সুগভীর জ্ঞান ও মনীষার পরিচয় যাঁহারা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ রায়, স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত, স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ মিত্র প্রভৃতি যে সকল বাঙ্গালী ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া হাইকোর্টের উকীল সমাজ ও বিচারপতির আসনকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার জীবিতকালে ইনি দেশবাসীর নিকট—বিশেষতঃ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট যেরূপ খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অনুকূলচন্দ্রের অকালে মৃত্যু না হইলে ইঁহার প্রতিভা ও যোগ্যতা পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইবার অবসর পাইলে তাঁহার সুযশঃ ও সুনাম যে আরও কত বৃদ্ধি পাইত তাহা বলিতে পারি না।

অবস্থা অনুকূল হইলে জীবনে সাফল্য অর্জ্জন অনেকেই করিতে পারে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যাঁহারা সাফল্যের পথে অগ্রসর হন এবং কঠোর সংগ্রাম করিয়া তাহা লাভ করেন তাঁহাদের জীবনই প্রকৃত জীবন। এমন জীবনে লোকের শিখিবার, জানিবার, জীবনের গতি নির্দ্ধারণ করিবার যথেষ্ট উপকরণ থাকে। বিচারপতি, অনুকূলচন্দ্রের জীবন—এইরূপ সংগ্রামের জীবন। তাই ইঁহার জীবনকথা "বংশপরিচয়ের" পাঠকপাঠিকাগণেকে উপহার দিলাম :—

বংশ-পরিচয় ও জন্ম।

শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণবংশে অনুকূলচন্দ্রের জন্ম। ইহারা পণ্ডিতবর মনোহরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বংশ। অনুকূলচন্দ্রের পিতামহ দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভাঙ্গামোড়া—গোপীনাথপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রাম হুগলী জেলার অন্তর্গত। ইনি পরে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং এইখানেই সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন। অনুকূলচন্দ্রের পিতা স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। সমাজে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে ইনি প্রভূতি পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন এই কলেজের সেক্রেটারীও ছিলেন।

বাঙ্গালা ১৩৩৬ সালে ২৯শে চৈত্র শনিবার রাত্রিতে অনুকূলচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৩৩৬ সাল ইংরেজী ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক। যিনি অনুকূলচন্দ্রের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, এই বালক পরে রাজা হইবে এবং বহুলোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইবে। এক হিসাবে আচার্য্য মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

শিক্ষা।

সেকালে ছেলেবেলায় ভদ্রঘরের ছেলেদিগকে পার্শী পড়াইবার রীতি ছিল অর্থাৎ অক্ষর-পরিচয় পার্শীতেই হইত। কারণ পার্শী তখনও একরূপ রাজভাষাই ছিল; আদালতে এবং রাজার কাছারীতে পার্শী ভাষারই প্রাধান্য ছিল। তখনকার সমাজে পার্শী না জানিলে লোকে শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইত না। অতি শৈশবে অনুকূলচন্দ্রকে একজন মুন্সীর নিকটে পার্শী শিক্ষা করিতে দেওয়া হইল। দুই দিনেই তিনি

পার্শী ভাষায় অক্ষরসমূহ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। একমাসের মধ্যে অনুকূলচন্দ্র পার্শী ভাষায় বানান শিক্ষা প্রভৃতি শেষ করিলেন। অতঃপর তিনি পার্শী ব্যাকরণও অতি অল্পদিনেই শিখিয়া ফেলিলেন। দুই বৎসরের মধ্যে তিনি পার্শী ভাষায় হাতেমতাই, বাগবাহার, গুলিস্থান প্রভৃতি পুস্তক পড়িতে সমর্থ হইলেন। পার্শী পড়িবার সময়ে তিনি সামান্য কিছু সংস্কৃতও শিখিয়াছিলেন।

আট বৎসর বয়সে গোবিন্দ বসাকের স্কুলে অনুকূলচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। এখানে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে যে তিনি অসাধারণ মেধা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তবে তাঁহার অধ্যয়ন ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতি খুবই নিয়মিত ছিল। শিখিবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহার খুবই ছিল। তাঁহার কোনও কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে অতি সন্তর্পণে যেন কত ভয়ে ভয়ে—অতি নিম্নস্বরে শিক্ষক মহাশয়কে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। মনে হইত, কৌতূহল বা জানিবার আগ্রহ অপেক্ষা লজ্জা ও ভয় তাঁহার যেন অধিক। বুঝিবার শক্তি যেমন তাঁহার অসামান্য ছিল, স্মরণশক্তিও তেমনই তাঁহার বেশী ছিল। তাঁহার অন্যান্য সহপাঠীরা যে পাঠ আয়ত্ত করিতে ৪।৫ ঘণ্টা লাগাইত, তিনি সেই পাঠ প্রাতে এক ঘণ্টা বসিয়াই আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। তিনি কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রত্যহ প্রাতে অভ্যাস করিতেন। ছাত্রজীবনে বিশেষ প্রতিভা না দেখাইলেও ইহা হইতে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন, অনুকূলচন্দ্রের ভবিষ্যৎ ভাল হইবে; তিনি দশ জনের একজন হইবেন।

অনুকূলচন্দ্রের প্রকৃতি অতি নম্র ছিল। কাহারও মনে কোন রকম সামান্য আঘাত তিনি করিতেন না। কলেজের সহপাঠীদের সহিত বালক-সুলভ দুষ্টামিও তিনি কখনও করেন নাই। তিনি অন্যান্য

ছেলেদের মত খেলাধূলা করিতেন না। জলযোগের ছুটীর সময়ে অন্যান্য ছেলেরা যখন খেলা করিত, তখন তিনি ক্লাসে নিজের আসনে বসিয়া বই পড়িতেন। এজন্য অনেকে তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, তাঁহার বই ফেলিয়া দিত। ছেলে বয়সে এমন বুড়ার ভাব তাঁহার সহপাঠীদের ভাল লাগিত না বলিয়া তাহারা নানা রকমে তাঁহাকে উত্যক্ত করিত। কিন্তু অনুকূলচন্দ্র এজন্য কাহাকেও কিছু বলিতেন না। ইহাতে নিরীহস্বভাব অনুকূলচন্দ্র সকল সহপাঠীরই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তখনকার কালে ছেলেরা যাদুঘর, মনুমেণ্ট বা কেল্লা দেখিবার জন্য স্কুলে অনুপস্থিত হইত। বালক অনুকূলচন্দ্রও এইরূপ স্বভাব হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি সহপাঠীদের দলে থাকিয়া এইজন্য স্কুলে অনুপস্থিত হইতেন। একবার বড়দিনের ছুটীর দিন কয়েক আগে অনুকূলচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতাদের সঙ্গে মনুমেণ্টে উঠিতে গিয়াছিলেন। তিনি মনুমেণ্টের কয়েকটী সিঁড়ি উঠিয়াছেন এমন সময়ে তাহার মাথায় ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত হইল। এই আঘাতে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। পরে তাঁহার সঙ্গীরা অনেক কষ্টে তাঁহাকে বাহিরে লইয়া আসেন। বাহিরে আসিয়া অনুকূলচন্দ্রের চেতনা সঞ্চার হয় পরমুহূর্ত্তেই একজন ইংরেজ জাহাজী-মাল্লা বাহির হয়। তাহাকে তখন বালক অনুকূলচন্দ্র ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি আমাকে মারিলে কেন?

ইংরেজ জাহাজী-মাল্লা উত্তর দিল,—"আমি কুকুর মনে করিয়া মারিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি তুমি কালা আদমী। কালা আদমী কুকুরে তফাৎ নাই।"

অনুকূলচন্দ্র উত্তর শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি এই অভদ্র উদ্ধত জাহাজের খালাসীকে খ্রীষ্টানধর্ম্মের মূল সূত্র

প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক মানুষের উপর কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ইত্যাদি বিষয় অনেক্ষণ বুঝাইলেন। শেষে এই গোঁয়ার-গোবিন্দ জাহাজী মাল্লার কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। সে বালক অনুকূলচন্দ্রের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল।

সাংসারিক দুরবস্থা ও কলেজ ত্যাগ।

অনুকূলচন্দ্র হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারসিপ বা ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি পাইবার পরে আরও কিছুদিন তাঁহার কলেজে অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু তাঁহার এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবার অবসর পায় নাই। অনুকূলচন্দ্রের অতি শৈশবে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। তিনি প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। অনুকূলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের তেজিমন্দি খেলায় তাহা ক্রমশঃ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের পারিবারিক অবস্থা এমন হইয়া পড়িল যে, উদর-পোষণই দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইল। অনুকূলচন্দ্র প্রতি মাসে যে বৃত্তি পাইতেন, তাহা তিনি সংসারে দিতেন। কিন্তু সে অল্প টাকায় পরিবার প্রতি-পালন অসম্ভব ছিল। কাজেই সংসারের এই দারুণ অভাব দেখিয়া তাঁহাকে অতি অল্প বয়সেই চাকুরীর সন্ধান করিতে হইল। এই বয়সে ছাত্রজীবন জলাঞ্জলি দিতে হইল দেখিয়া অনুকূলচন্দ্রের প্রাণে যে কত দূর কষ্ট হইয়াছিল, তাহা অনুকূলচন্দ্রের মত অধ্যয়ন-স্পৃহাশীল যুবকেরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন।

অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষা।

তবে ইহাতে কেহ যেন কল্পনা করিবেন না যে, অনুকূলচন্দ্র অর্দ্ধ-শিক্ষিত হইয়াই কলেজ হইতে বাহির হইয়াছিলেন। অনুকূলচন্দ্র

রীতিমত শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান গভীর ও শিক্ষা সুবিস্তৃত ছিল। সেকালে হিন্দুকলেজে শিক্ষানুরাগী ও মেধাবী ছাত্রগণ সুশিক্ষিতই হইতেন এবং সুপণ্ডিত বলিয়া দেশে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিতেন। অনুকূলচন্দ্র ইঁহাদেরই ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন।

চাকুরী।

অনুকূলচন্দ্রের মাতা পুত্রকে চাকুরী করিবার জন্য বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মাতৃভক্ত পুত্র মাতার অনুরোধ-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু চাকুরীর উমেদারী করিতে তাঁহার যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। পিতামহ ও পিতার পদগৌরব ও মর্য্যাদার বিষ তাঁহার মনে জাগরুক রহিয়াছে; তিনি কেমন করিয়া ২০৲ ৩০৲ টাকার চাকুরী করিবেন—এই ভাবনা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। এই সময়ে অনুকূলচন্দ্র প্রত্যহ দশটার সময়ে আহারাদি করিয়া বাটী হইতে বাহির হইতেন, এবং অফিসে গিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতেন; কিন্তু কাহাকেও চাকুরীর কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না। এই ভাবে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু কোনও ফলই হইল না। এ সময়ে অনুকূলচন্দ্রও যেমন কষ্ট পাইতে লাগিলেন, অনুকূলচন্দ্রের পরিবারবর্গও তেমনই কষ্টভোগ করিতেছিলেন। অবশেষে একদিন অনুকূলচন্দ্র অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, হাবড়া ম্যাজিষ্ট্রেট-আদালতের নাজিরের পদ খালি হইয়াছে। তিনি এই সংবাদ পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত করিলেন। এই পদের জন্য ৩০ জন প্রার্থী ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ইহা-

দিগকে প্রতিযোগী পরীক্ষা দিতে বলিলেন। পরীক্ষা গৃহীত হইল। পরীক্ষায় অনুকূলচন্দ্র সাফল্য লাভ করিলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করিলেন।

অনুকূলচন্দ্র যখন নাজিরী পাইলেন, তখন মিঃ এডওয়ার্ড জেন্‌কিন্স হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট। ইঁহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট হন—মিঃ জে কে, গ্রে। গ্রে সাহেবের পর মিঃ ড্যাম্পিয়ার হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হন। এই ড্যাম্পিয়ার সাহেবই পরে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের বোর্ডের মেম্বর হইয়াছিলেন। এই তিন জন ম্যাজিষ্ট্রেটই অনুকূলচন্দ্রের কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই বদলী হইবার সময়ে অনুকূলচন্দ্রকে খুব ভাল সার্টিফিকেট দিয়া গিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর তিনি নাজিরী করিয়াছিলেন; তাহার পর এই কার্য্যে ইস্তফা দেন।

উন্নতির সূচনা—আইন অধ্যয়ন।

'আগুন কখনও ছাই চাপা থাকে না'—এই প্রবাদ আমাদের দেশে খুবই প্রচলিত। মানুষের ভাগ্যও তেমনই চিরদিন দুঃখের পাষাণ-চাপে প্রপীড়িত হইয়া থাকে না, সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই তাহা প্রবল বিক্রমে সে চাপ দূর করিয়া উন্নতির পথে প্রধাবিত হয়। মিঃ এবারক্রম্বি ডিক তখনকার সদর দেওয়ানী আদালতের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। অনুকূলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার সদ্ভাব ছিল। ডিক সাহেব পাথুরিয়াঘাটার মুখোপাধ্যায় পরিবারকে বিশেষরূপে জানিতেন এবং সমাজে তাঁহাদের সম্ভ্রম, মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি কেমন, তাহাও তাঁহার ভালরূপই জানা ছিল। হরিশবাবু ডিক সাহেবকে যখন জানাইলেন যে, অনুকূলচন্দ্রকে একটী ভাল চাকুরী দিন, সে এখন হাবড়ায় নাজিরী করিতেছে, এ পদের বেতনে সংসার

চলে না, তখন সত্য সত্যই তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! অনুকূলচন্দ্রের মত মেধাবী যুবককে এত সামান্য চাকুরী কেন করিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ডিক সাহেব হরিশবাবুকে তিরস্কার করিলেন। বলিতে কি, ডিক্ সাহেব মুখোপাধ্যায়-পরিবারের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহাদের কল্যাণ চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিলেন,—'হরিশবাবু আপনার ভাইকে আইন পড়িতে দিন।' ইহার পর একদিন অনুকূলচন্দ্র ডিক সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। এবং দেখা করিবার পরদিন হইতেই আইন পাঠ আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে অনুকূলচন্দ্রকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। সমস্ত দিন আদালতে কার্য্য করিতে হইত। বাটীতে মাত্র সকালে ও রাত্রিতে তাঁহার আইন পড়িবার অবসর ছিল। তাহার উপর বাটীতে ইদানীং কষ্ট ও উদ্বেগের মাত্রা বাড়িয়াছিল; অভাবের পীড়নও যে অল্প ছিল তাহা নহে। কাজে কাজেই তিনি সকালে ও রাত্রিতে নিরুদ্বেগে অধ্যয়ন করিতে পারিতেন না। কিন্তু একনিষ্ঠ ও একলক্ষ্য যিনি, তাঁহার সম্মুখে কোন বাধাই তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি অবিচলিত অধ্যবসায় ও অবিরাম উদ্যম সহকারে আইন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন পরীক্ষা দিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০ জন আইনের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল, তখন সকলে দেখিতে পাইলেন, অনুকূলচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই বৎসরেই তিনি নাজিরের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

ওকালতি আরম্ভ।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। জীবনের এই পরিবর্ত্তনে ডিক্ সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায়

তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। আশা ও আকাঙ্ক্ষার অরুণ-রশ্মি তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইল। উৎসাহ ও উদ্যম আবার নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিল। তিনি যেন সকল বন্ধনমুক্ত হইয়া নূতন বলে বলীয়ান হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এতদিনের পর প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র পাইয়াছেন,বলিয়া তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। ওকালতি আরম্ভ করিবার দুই এক দিন পর হইতেই তাঁহার মক্কেল জুটিতে লাগিল। প্রত্যহই তিনি এক, দুই, তিনটী করিয়া মামলা পাইতে লাগিলেন। চারি পাঁচ বৎসরেই তাঁহার মাসিক আয় ৮০০৲ হইতে ১০০০৲ টাকায় উঠিল। বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তিনি একত্র কার্য্য করিতেন। অনুকূলচন্দ্রের সহিত কর্ম্মসূত্রে যিনিই আসিতেন, তিনিই তাঁহার অসাধারণ চরিত্রবল, যোগ্যতা এবং ব্যবসায়ে সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়া তাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতেন।

বাবু রমাপ্রসাদ রায় সে সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতের শ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে তথাকার উকীলসম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া জানিতেন। অনুকূলচন্দ্র শীঘ্রই ইঁহার নজরে পড়িলেন। সে সময়ে আদালতে একটী প্রথা ছিল; প্রবীণ উকীলেরা প্রত্যেক মামলায় একজন নবীন উকীলকে সহকারী লইতেন। নূতন উকীলদিগকে তাঁহারা যে উপকার করিবার হিসাবে লইতেন এমন কথা বলা যায় না; আর স্বার্থের হিসাবেও যে লইতেন এমন প্রমাণেরও অভাব। তবে এই প্রথা প্রচলিত থাকায় নূতন উকীলদের আর্থিক কষ্ট অনেকটা কম হইত এবং তাঁহারা মামলা পরিচালনার পদ্ধতিও শিক্ষা করিতেন। উকীল সমাজের ইহাতে অসুবিধা ছিল না। এই ভাবের সাহায্য সহানুভূতি ও পোষকতা তখনকার কালের অনেক বড় বড় উকীলকেই

গোড়ায় পাইয়া তবে খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। অনুকূলচন্দ্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

বস্তুতঃ বাবু রমাপ্রসাদ রায় যেরূপ উদারভাবে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন, তাহাতে অনুকূলচন্দ্রের উন্নতির পথ অতি শীঘ্রই মুক্ত হইয়াছিল। লোকে তাঁহার যোগ্যতা বুঝিতে পারিয়াছিল। এই জন্য মোক্তারের মারফতে মামলা না লইয়া তিনি নিজের দায়িত্বেই মামলা লইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনুকূলচন্দ্রের ওকালতিতে সাফল্যের ইহাই ভিত্তি এবং এ ভিত্তি কখনও শিথিল হয় নাই।

সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিয়া অনুকূলচন্দ্র প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। উপার্জ্জিত অর্থে প্রথমেই তিনি পারিবারিক অভাব ও অর্থকষ্ট দূর করিলেন। সংসারে আবার স্বচ্ছলতা ও সন্তোষ বিরাজ করিতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয়-পরিজনবর্গের মুখ আবার প্রফুল্ল হইল। এই পারিবারিক কর্ত্তব্য-সমাধার পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত তাহাতে তিনি সকল রকমের মূল্যবান আইনের গ্রন্থ ক্রয় করিতে লাগিলেন। সচরাচর অর্থ উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে লোকে পড়া শুনা পরিত্যাগ করে, কিন্তু অনুকূলচন্দ্র পড়া শুনা ত্যাগ করেন নাই। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি পুস্তক পাঠ করিতেন। দিনের বেলায় আদালতে কর্ম্ম করিতেন। সন্ধ্যায় বন্ধু-বান্ধবের সহিত কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিতেন। তাহার পর রাত্রিতে পড়িতে বসিতেন।

তখন সদর দেওয়ানী আদালতে কাজ খুব বেশী ছিল। জজের সংখ্যা কম ছিল বলিয়া প্রত্যেক জজকেই গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। আবার এদিকে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাও বেশী ছিল। কাজেই মামলা-মোকদ্দমার বিচার শীঘ্র শেষ হইত না। সেকালের সদর দেওয়ানী আদালতে এক একটী মামলা ৪।৫ বৎসর ধরিয়া পড়িয়া থাকিত।

হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা।

এই দুরবস্থার প্রতীকার করিবার জন্ম ১৮৬২ সালে হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হয় এবং জজদের সংখ্যাও বাড়াইয়া দেওয়া হয়। সদর দেওয়ানী আদালতের ভাষা উর্দ্দু ছিল। কিন্তু হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আদালতের ভাষা উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে ইংরাজী হইল। উর্দ্দুর প্রচলনের সময়ে বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও মুন্সী আমীর আলি খাঁ বাহাদুরের বিস্তৃত পশার ছিল। ইংরেজীর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সে পশার কমিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের অকাল মৃত্যু হইল। তাঁহাকে তখন হাইকোর্টের বিচারপতির আসন প্রদান করা হইয়াছে, সমস্ত বঙ্গদেশ তাঁহার নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এমন সময়ে বিচারপতি রমাপ্রসাদ পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে প্রসিদ্ধ উকীল বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সকল ঘটনায় অন্যান্য উকীলের পক্ষে হাইকোর্টে পশারের পথ খুলিয়া গেল এবং সেই পথে প্রবেশ করিবার জন্য প্রতিযোগিতা হইতে লাগিল। প্রতিযোগিতায় অনুকূলচন্দ্র, বাবু দ্বারকানাথ মিত্র এবং বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন। ফলে তাঁহাদের সকলেরই পশার খুব বাড়িয়া গেল।

অল্পদিনের মধ্যেই অনুকূলচন্দ্র যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেশীয় উকীল-সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলে তাঁহার যোগ্যতা একরূপ অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহার প্রতিপত্তি ও সুনাম দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। এই সাফল্যের বন্যায় অনুকূলচন্দ্রের মনুষ্যত্বের স্রোত বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু তাহা পঙ্কিল বা অন্য প্রকারে আবিল হইতে পারিল না। অনুকূলচন্দ্র

পূর্ব্বে যেমন নিরহঙ্কার, নিরভিমান, বিনয়ী, অকপট এবং সরল ছিলেন, প্রভূত ধন ও যশঃমানের অধীশ্বর হইয়াও তিনি তেমনই রহিলেন। তিনি ভুলিয়াও এক দিন টাকাকড়ির বা পদমর্য্যাদার দর্প-দম্ভ প্রকাশ করেন নাই। বরং বিস্তর অর্থের অধিকারী হইয়া তিনি ইচ্ছামত পরের উপকার করিতে লাগিলেন। অনুকূলচন্দ্র তেজস্বী, নির্ভীক এবং স্পষ্ট-বাদী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় উদার ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল।

অনুকূলচন্দ্র ব্যবহারশাস্ত্রের অর্থাৎ আইনের একনিষ্ঠভাবে অনুশীলন করিতেন। ওকালতিতে সাফল্যলাভ করিবার পরও তিনি তাঁহার এই অনুশীলন বজায় রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি বন্ধুবান্ধবের সহিত মজলিস করিতেন। এই জন্য অনেকে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেন যে, অনুকূলচন্দ্র কেমন করিয়া শ্রেষ্ঠ উকীলের পদ অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যদি জানিতেন যে, মজলিসের পর তিনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত গভীর অভিনিবেশসহকারে আইন অধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এরূপ বিস্মিত হইতে হইত না। অনুকূলচন্দ্র যেমন পরিশ্রমী ছিলেন, তেমনই তাঁহার অসাধারণ মেধা ও ধারণাশক্তি ছিল। সুতরাং একবার যাহা পড়িতেন, তাহা আর ভুলিতেন না।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুকূলচন্দ্র হাইকোর্টের যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল—ইহা সাধারণে বুঝিয়াছিলেন। এই বৎসরে তাহার বার্ষিক আয় ৪৮,১১২৲ টাকা হইয়াছিল।

অনুকূলচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন সোমবার অনুকূলচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ ঘটে। তিনি শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতি শৈশবে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মাতৃদেবীই তাঁহাকে মানুষ

করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। মাতৃভক্ত পুত্র মাতার মৃত্যুতে দুই দিন এইরূপ শোকমগ্ন হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারা যায় নাই। এই দুই দিন তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল না। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অচল বিশ্বাস ছিল। তিনি বিশেষ সমারোহের সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধে তখনকার কালে তাঁহার ২০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন মঙ্গলবার বিচারপতি শম্ভুনাথের মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী জুলাই মাসে উকীলপ্রবর দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। দ্বারকানাথের নিয়োগে অনুকূলচন্দ্রের পশার খুবই বাড়িয়া যায় এবং তিনি হাইকোর্টের দেশীয় উকীল-সম্প্রদায়ের নেতৃপদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ৭,৯১০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রবিভাগ হইতে তিনি এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' বা সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ঐ মাসেরই ২৯শে তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহাশয় তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন যে, সিণ্ডিকেট তাহাকে "ফেকাল্‌টী অফ ল"য়ের মেম্বার বা সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সুচারুরূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

সরকারী উকীল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩৪শে ডিসেম্বর অনুকূলচন্দ্র হাইকোর্টের জুনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লীডার বা সহকারী সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হন।

হাইকোর্টে অদ্ভুত প্রথা।

হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত মক্কেলগণ প্রত্যেক মোকদ্দমায় একজন ব্যারিষ্টার ও উকীল এক সঙ্গে নিযুক্ত করিতেন। ইহাই সে সময়ের প্রচলিত প্রথা ছিল। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য যে না ছিল, তাহা নহে। তখনকার মক্কেলগণের ধারণা ছিল যে, ব্যারিষ্টার অপেক্ষা উকীলে মামলাটী বুঝিবেন ভাল। উকীল মামলাটী বুঝিয়া লইয়া মামলার অবস্থা ব্যারিষ্টারকে বুঝাইয়া দিবেন। ব্যারিষ্টারেরা ইউরোপীয়। তাঁহারা মামলাটী বুঝিয়া লইয়া জজের সম্মুখে মামলাটী উকীলদের চেয়ে ভাল করিয়া ও স্বাধীনভাবে বুঝাইতে পারিবেন। কারণ, জজও ইউরোপীয় এবং ব্যারিষ্টারও ইউরোপীয়। মক্কেলদের ধারণা ছিল যে, এইরূপ উপায় দ্বারা জয়লাভ করিতে পারা যাইবে। এই প্রথা বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। এক পক্ষে ব্যারিষ্টার প্রথমে মামলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, তাঁহার পরে উকীল বক্তৃতা করিতেন। এই পদ্ধতি অনুসারেই মামলা-পরিচালনের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছিল। প্রবীণতার হিসাবে কে আগে মামলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবে প্রবীণ ও পুরাতন উকীল অগ্রে করিবে, কি নব্য ব্যারিষ্টার আগে করিবে, এ প্রশ্ন কখনও উঠে নাই।

উকীল ও ব্যারিষ্টারের অধিকার।

অতঃপর মান্যবর বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র এই প্রশ্ন হাইকোর্টে উত্থাপন করিলেন। একবার তিনি ও স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ একই মামলায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আইন ব্যবসায়ের হিসাবে প্রবীণ বলিয়া এবং মামলা পরিচালন সম্বন্ধে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে অটুট বিশ্বাস ছিল বলিয়া তিনি প্রথম বক্তৃতা করিলে মক্কেলের

স্বার্থ উত্তমরূপে সংরক্ষিত হইবে বলিয়া অনুকূলচন্দ্র প্রথমেই বক্তৃতা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ব্যারিষ্টার-প্রবর মনোমোহন বিলাত হইতে নূতন ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা প্রথম বক্তৃতা হইলে মামলাটী পাছে মাটী হয়, এই আশঙ্কায় অনুকূলচন্দ্র প্রথমেই বক্তৃতা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টার মনোমোহন তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, আমি ব্যারিষ্টার; ব্যারিষ্টারের হিসাবে উকীলের আগেই আমার বক্তব্য শুনিতে হইবে। কিন্তু অনুকূলচন্দ্র ইহাতে টলিলেন না। বিশেষতঃ ইহাতে যখন উকীল সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা ও যোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কাও তাঁহার হইল, তখন তিনি উকীলদের স্বার্থরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ শুক্রবার তিনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ ফিয়ার ও বেলীর এজলাসে এই সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। যুক্তির হিসাবে তিনি হটেন নাই; কিন্তু তাঁহার যুক্তিপ্রদর্শন বৃথা হইল। বিচারপতিগণ ব্যারিষ্টারদিগের অনুকূলেই মত দিলেন। অনুকূলচন্দ্র ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া অসন্তুষ্ট মনে উকীলদিগের লাইব্রেরীতে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রধান বিচারপতির অনুরোধ।

পরদিন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর বার্ণেস পিকক তাঁহাকে হাইকোর্টের এডভোকেট হইবার জন্য পত্র লিখিলেন। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, আমি এডভোকেট হইলে প্রবীণতার হিসাবে বহু ব্যারিষ্টার অপেক্ষা আমি জজদের নিকট অগ্রে বলিবার অধিকার পাইব বটে, কিন্তু তাহা হইলে হাইকোর্টের জজ হইবার পথ আমার পক্ষে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সম-ব্যবসায়ী উকীলদের দো-টানা অবস্থার মধ্যে

পড়িতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বার লাইব্রেরীতে উকীলদের এক সভা আহ্বান করিলেন। সভায় সকল উকীলেই একবাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এডভোকেট হইবেন না। অনুকূলচন্দ্র উকীলদের সিদ্ধান্তই গ্রহণ এবং সম্মানের সহিত প্রধান বিচারপতির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অতঃপর অনুকূলচন্দ্র হাইকোর্টের অন্যান্য সিনিয়র উকীলদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহারা অর্থাৎ সিনিয়র উকীলেরা কোনও মোকদ্দমা ব্যারিষ্টারদের সঙ্গে লইবেন না। যতদিন তিনি উকীল ছিলেন, ভত দিন এই সঙ্কল্প অবিচলিত ছিল। হাই-কোর্টের আপীল বিভাগে জুনিয়র ব্যারিষ্টারেরা এক রকম কোনও মামলাই পাইতেন না। কারণ, একমাত্র তাঁহাদের উপর মক্কেলগণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল মঙ্গলবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হঠাৎ অপস্মার রোগে পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে সংসারের অনেক চাপ তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাতে তাঁহাকে অস্থির হইতেও হইয়াছিল।

পীড়া ও বাসস্থান পরিবর্ত্তন।

জীবনের শেষ ছয় বৎসর তাঁহাকে প্রায়ই রোগ ভোগ করিতে হইত। মাসের মধ্যে পাঁচ ছয় বা দশ দিন তাঁহার একটা না একটা রোগ লাগিয়াই থাকিত। হয় জ্বর, না হয় অন্যরূপ অসুখ। ইহার ফলে তিনি আদালতে যাইতে পারিতেন না। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভীষণ রোগ হইল। তাঁহার একটী ফোড়া হইল। তাঁহার পারিবারিক

চিকিৎসক ও আত্মীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায় জুলাই মাসের ২০শে তারিখ বৃহস্পতিবারে এই ফোড়ায় অস্ত্রোপচার করেন। ২৮শে তারিখে অর্থাৎ ৮ দিনে ফোড়া শুকাইয়া যায়। কিন্তু এই দিনই সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার সামান্য জ্বর হয়। এই জ্বর ক্রমে বাড়িতে থাকে এবং ক্রমে তাহা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ২রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। ৪ঠা তারিখে তখনকার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার ফেরার তাঁহার চিকিৎসার্থ আহূত হন। যাহা হউক সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার নীলমাধব ও ফেরারের চিকিৎসায় তিনি রোগমুক্ত হন। ২১শে সেপ্টেম্বর ডাক্তারেরা তাঁহাকে সুস্থ বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

পরদিন ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি কয়েক জন বন্ধু ও ডাক্তার বিহারী লাল ভাতুড়ীর সহিত গঙ্গায় জলভ্রমণে বাহির হন। ২৮শে তারিখে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর ৩০শে তারিখে আবার বাহির হন এবং ৪ঠা অক্টোবর প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর ১১ই অক্টোবর তারিখে তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাত্রা করেন এবং ১৫ই তারিখে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর ডাক্তার পেন তাঁহাকে বলেন, আপনি যদি স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে চান তাহা হইলে পাথুরিয়া ঘাটার বাটী ত্যাগ করিয়া অন্য কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করুন। তাহার পর তিনি চৌরঙ্গীতে একটী বাটী দেখেন। ডাক্তার পেন সেই বাটী তাঁহার বাসের উপযোগী বলিয়া মত প্রকাশ করিলে তিনি ১২ই নভেম্বর সেই বাটীতে সপরিবারে উঠিয়া যান। এই বাটীতে বাস করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

এতদিন অনুকূলচন্দ্র জুনিয়র সরকারী উকিল ছিলেন এবং বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় সিনিয়র সরকারী উকীল বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষের পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে কালীবাবুর মৃত্যু

হইল। গভর্ণমেণ্ট ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাবু জগদানন্দকে ঐ পদে পাকা করিয়া দিলেন।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

মার্চ্চ মাসের ১০ই তারিখে মিঃ রিভাস্ টমসন তাঁহাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, তিনি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে সম্মত আছেন কি না। পরদিন অনুকূলচন্দ্র এই পত্রের উত্তরে তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার ইহাতে সম্মতি আছে। ১৯শে তারিখে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করিলেন। এই প্রথম বার হাইকোর্টের একজন দেশীয় উকীল বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইলেন। এতদিন বাঙ্গালার দেশীয় অভিজাত-সমাজের মুখ্য ব্যক্তিগণকে ছোটলাট ব্যবস্থাপক সভার সদস্য প্রদান করিতেন। কিন্তু অনুকূলচন্দ্রকে সদস্য মনোনীত করাতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে স্বাধীনতা, তেজস্বিতা ও মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই অনুকরণ-যোগ্য। তিনি সদস্য থাকিবার সময়ে 'হোয়ারফ বিল', 'চৌকীদারী চাকরান বিল' 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস বিল', 'ঢাকা বিল' এবং 'পোর্ট বিল' আইনে পরিণত হইয়াছিল।

হাইকোর্টের জজ।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর বড়লাটের সেক্রেটারী তাঁহাকে এক পত্র লিখেন। সেই পত্রে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাহার অভিমত জানিতে চাহেন। অনুকূলচন্দ্র গভর্ণমেণ্টকে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তিনি নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হন। বিচারপতির পদ গ্রহণ করিয়া তিনি ১লা ডিসেম্বর বাঙ্গালার

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করেন। ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি বিচারপতি হইবার শপথ গ্রহণ করেন; কিন্তু ঐ দিন এজলাসে বসেন নাই। পরদিন ৭ই তিনি বিচারপতি মান্যবর জ্যাকসনের সহিত এজলাসে বসেন।

বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র ১৫ বৎসর কাল হাইকোর্টে ওকালতি করিয়াছিলেন। তিনি ধীর, স্থির ও মেধাবী ছিলেন। আপনার বক্তব্য সোজা কথায় প্রকাশ করিতেন। ভাষার চটকে নিজের বক্তব্যকে কখনও জটিল করিতেন না। তাঁহার যুক্তি-বিন্যাস অতি সুন্দর ছিল। তাই তিনি যাহা বলিতেন তাহা বিচারপতিগণ মনোযোগ দিয়া শুনিতেন। তাহার আত্মসম্মানজ্ঞান অতীব প্রখর ছিল। তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিলেই তিনি সিংহবিক্রমে দণ্ডায়মান হইতেন। অনুকূলচন্দ্রে বিনয়ের যেমন প্রাচুর্য্য ছিল, দৃঢ়তাও তেমনই অসাধারণ ছিল। আত্মশক্তিতে তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া অপরকে তিনি কখনও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। তিনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন; আপন যোগ্যতায় ও গুণে তিনি সুখ্যাতির সৌধশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। অনুকূলচন্দ্র শান্তপ্রকৃতির ছিলেন এবং কখনও সমব্যবসায়ী উকীল বা ব্যারিষ্টারকে রূঢ় বা কঠিন কথা প্রয়োগ করেন নাই। যে মামলা তিনি গ্রহণ করিতেন, সেই মামলা পরিচালনের জন্য অর্থাৎ মক্কেলের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সাধুতা ও চরিত্রবলের প্রশংসা সকলেই করিতেন। তিনি যাহা মুখে বলিতেন, কাজেও তাহা করিতেন। তাঁহার কথার নড়চড় ছিল না। ওকালতীতে শেষ পাঁচ বৎসর তাঁহার এতদূর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যে, তিনি উকীল-সম্প্রদায়ের নেতৃপদ অধিকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার সময়ে হাইকোর্টে মোক্তারদিগের প্রতাপ যথেষ্ট ছিল। সকল মামলাই মোক্তারদিগের হাতে থাকিত। মোক্তারেরা যে উকীলকে পছন্দ করিতেন, তাঁহাকেই মামলা দিতেন। ইঁহাদের আইনজ্ঞান কেন ছিল বলিতে পারি না; তবে ইহারাই তখন উকীলদের যোগ্যতার যাচাই করিতেন। তাঁহাদের পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই উকীলের প্রতিষ্ঠা হইতে বিলম্ব হইত না। যদি কোনও মোক্তার কোন নূতন উকীলকে একটী মামলা দিতেন এবং সেই উকীল আইনে সবিশেষ অভিজ্ঞ হইলেও যদি কোনও কারণে সেই মামলাটীতে পরাজিত হইতেন তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে পশার-লাভ সুদূরপরাহত বা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িত। তখনকার দিনকাল উকীলের পক্ষে এরূপই বিপজ্জনক ছিল। এমন দিনে অনুকূলচন্দ্রের পক্ষে হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যে কত দূর যোগ্যতার পরিচায়ক, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তিনি যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার নিজের গুণে। ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ও অধিকারের কথা গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না। পনের বৎসর ওকালতী করিয়া তিনি সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, হাইকোর্টের বিচারাসনে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিলে সে আসন অলঙ্কৃত হইত গভর্ণমেণ্টও ইহা বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য দেশের ধর্ম্মাধিকরণে বিচারাসন গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

অনুকূলচন্দ্রের বহুদিনের সাধ ছিল তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হইবেন। তাঁহার আনন্দ—সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল; আর দেশবাসীর আনন্দ যে, তাঁহারা তাঁহাদের অভিলষিত ব্যক্তিকেই বিচারপতিরূপে পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ অনুকূলচন্দ্রের নিয়োগে দেশবাসী অতীব সন্তুষ্ট

হইয়াছিলেন। বিচক্ষণ আইনবিশারদগণ এই নিয়োগে প্রীত হইয়া তাঁহাকে যে সকল পত্র দিয়াছিলেন, তাহাদের সকলগুলির স্থান এখানে হইবে না। ইহাদের মধ্যে মাত্র তিনখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

1

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ এটর্ণী ল্যাটি সাহেবের পত্র।

142, Gresham House,
Old Broad Street, E.C.,
London, January I3th. 1871

The Hon'ble justice Onoocool Chunder Mookerjee.

Dear Sir,

I see from the public papers that the Indian Government has appointed you to a judgeship in the High Court—Allow me to cenvey my very best congratulations to you—I only trust that the appointment which is, I nnderstand, an acting one may be followed by your *pucca* appointment as judge of the High Court.

* * * *

Believe me to be,
my Dear Sir,
Yours faithfully,
(Sd.) Roh Tho Latty.

2

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মান্যবর মার্কবি সাহেবের পত্র।

Dear Baboo Onoocool,

I cannot leave Calcutta without sending you one word of congratulation. I am thoroughly glad that you are appointed, and I am sure, you will do good work.

Yours sincerely,
(Sd.) W. Markby.

November 30th, 1870.

3

বাবু শ্রীপ্রসন্নদেবের পত্র।

High Court Office.
Allahabad, 3rd December, 1870.

Dear Sir,

I most respectfully congratulate you on your promotion to the Highest Judicial Tribunal in India, though the Calcutta Bar will lose one of its ablest members, but your elevation in the Bench is a national honour, national pride and national glory.

I cannot express how happy I have been, since I have had this news from your worthy brother Oprokash Baboo ; your appointment to the judgeship has, I believe, given him universal satisfaction.

I sincerely pray that you may long enjoy the honour, and that your conscientious opinion may always be held with favourable view by your honourable colleagues,

With profound submission,

Believe me,
Yours very obediently,
(Sd,) Sree Proshanno Deb,

হাইকোর্টের জজ হইয়া অবধি বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র ও বিচারপতি জ্যাকসন প্রায় একই এজলাসে বসিয়া বিচার করিতেন। লোকে ইঁহাদের এজলাসকে বলিত—"বিচারপতি জ্যাকসন ও মুখার্জ্জির এজলাস।" বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র অন্যান্য বিচারপতি ও হাইকোর্টের পরলোকগত প্রধান বিচারপতি মান্যবর নরম্যান সাহেবের সহিতও এজলাস করিতেন। তিনি রেগুলার, স্পেশ্যাল ও ক্রিমিন্যাল-সেসন

এবং আপীল মামলারও বিচার করিতেন। আট মাস কয়েক দিন তিনি হাইকোর্টের বিচারাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এই অল্প সময়েই তিনি অশেষ যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন এবং দেশবাসীর প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিচারপতি ফিয়ার ও দ্বারকানাথ মিত্রের এজলাসে একটী মামলার শুনানী হয়। তাঁহারা এই মামলা পুনর্বিচারের জন্য নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠাইয়া দেন। কিন্তু নিম্ন আদালতের জজ এই মামলা খারিজ করিয়া দেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে ইহা পুনরায় হাইকোর্টে বিচারিত হইবার জন্য আসে। বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র ও জ্যাকসনের এজলাসে মামলাটীর বিচার হয়। কিন্তু দুই জন বিচারপতিই দুইটী স্বতন্ত্র রায় দেন। কাজেই মামলাটী পুনর্ব্বিচারের জন্য ফুল বেঞ্চে প্রেরিত হয়। ফুল বেঞ্চে বিচারপতি জ্যাক্‌সন (এই নামের অপর একজন বিচারপতি), বিচারপতি ফিয়ার এবং বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর এই মামলার বিচার করেন এবং বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের রায়ই বাহাল রাখেন।

ফুল বেঞ্চে এই মামলার শুনানীর সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ উড্‌ফ (আপীলকারীদের তরফের ব্যারিষ্টার) বলিয়াছিলেন,—'আমার মক্কেলদের পক্ষ সমর্থনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যুক্তি মাননীয় বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের রায়েই আছে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার রায় পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের বিচারশক্তির প্রশংসা ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে! ফুলবেঞ্চের প্রধানতম বিচারপতি মাননীয় মিঃ এল এস জ্যাকসনও তাঁহার সুবিচারের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ফুল বেঞ্চে এই মামলার শুনানী শেষ হইবার পর যখন বিচারপতিগণ রায় দেওয়া শেষ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মান্যবর নরম্যান সাহেবের হত্যা সংবাদ হাইকোর্টে পৌঁছিয়াছিল। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আদালতের কাজকর্ম্ম তখনই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

দয়া-দক্ষিণ্য।

বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার দানও যথেষ্ট ছিল। গুরুপুরোহিত মাসিক সাহায্য ত পাইতেনই, তাহার উপর অন্যান্য হিসাবেও তাঁহারা অনুকূলচন্দ্রের নিকট বেশ দুই পয়সা পাইতেন। চারিজন ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটীতে অবস্থান করিতেন এবং তিনি তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতেন। বহু দরিদ্র আত্মীয়ের সংসার তাঁহার সাহায্যে চলিত। অনেক বিধবা রমণী তাঁহার নিকট মাসোহারা পাইতেন। অর্থাভাবে যে সকল ছাত্র লেখাপড়া শিখিতে পারিত না, তাহারা তাঁহার নিকট দুরবস্থার কথা জানাইলে তিনি তাঁহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতেন। অনেক নিরুপায় ছাত্র তাঁহারই অর্থে মেডিক্যাল কলেজে এবং অন্যান্য কলেজ স্কুলে পাঠাভ্যাস করিত। এই ত গেল তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মিত দান। ইহা ব্যতীত অর্থীর অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে বিস্তর দান করিতে হইত। এ সকলের হিসাব পত্র ছিল না।

ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিনয়।

অনুকূলচন্দ্র খাঁটি হিন্দু ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের শাসন-বিধি মানিয়া চলিতেন। তিনি নিষ্কলঙ্কচরিত্র ছিলেন। জীবনের প্রথম হইতে মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাব একই রকমের ছিল। বড় উকীল

হইয়া পরে জজ হইয়া, প্রভৃত যশঃমানের অধিকারী হইয়াও তাঁহাকে কেহ গর্ব্বিত দেখে নাই। তিনি ফলভারাবনত তরুর ন্যায় নতি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অমায়িক ও মিষ্ট ছিল।

শরীরের অবস্থা।

ছেলেবেলায় অনুকূলচন্দ্র খুবই রোগা ছিলেন। সেই কৃশ শরীর বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমে স্থূলাকার ধারণ করে। শেষে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল সোমবার তাঁহার শরীরের ওজন হইয়াছিল, তিন মণ সাড়ে তিন সের। অনেক বড় বড় ডাক্তার তাঁহার এই মেদবৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে সতর্ক হইতে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে তিনি এই সময় হইতে ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পোষাক-পরিচ্ছদ।

বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের পোষাক-পরিচ্ছদ খুবই সাধারণ ছিল। তিনি ধুতি ও চাদর পরিতেন। আদালতে যাইবার সময়ে, কোনও ইউরোপীয় ভদ্রলোককে দেখিতে যাইবার সময়ে অথবা কোনও পার্টিতে যাইবার কালে তিনি ইজের চাপকান পরিতেন। নহিলে ধুতি-চাদর পরিয়াই সর্ব্বত্র তিনি বিচরণ করিতেন। নিমন্ত্রণ-সভায় বা সামাজিক অন্য কোনও উৎসব-সভায় তিনি ধুতি-চাদর পরিয়াই যাইতেন। তাঁহার পোষাকে জাঁকজমক ছিল না। এসকল তিনি পচ্ছন্দ করিতেন না।

মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি বাড়ীতে পর্য্যন্ত পেণ্টালুন পরিয়া থাকিতেন। কারণ তাঁহার পেট খুব মোটা হইয়াছিল। মেদবৃদ্ধিহেতু ভুঁড়ি ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছিল। এইজন্য ডাক্তারের পরামর্শক্রমে তিনি বাড়ীতেও পেণ্টালুন পরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মৃত্যু।

১২৭৮ সালের ২রা ভাদ্র, ইংরেজী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪২ বৎসরের অধিক হয় নাই। পক্ষাঘাত ও হঠাৎ শোণিতাধার blood-vessel ফাটিয়া যাওয়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি বিচারকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন এবং ঐদিন একটী মামলার রায়ও দিয়াছিলেন। রায় দিয়া তিনি জলযোগের জন্য বিশ্রাম-গৃহে আসেন। একটু পরেই তাঁহার মাথা ধরে। ক্রমে মাথাধরা বাড়িতে থাকে। শেষে যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, তিনি বিচারপতি মিত্রকে অতি কষ্টে বলেন,—"আমাকে আমার চৌরঙ্গীর বাসায় পাঠাইয়া দিন এবং আমার সঙ্গীয় বিচারপতি জ্যাকসনকে বলিবেন, আমি কাল আসিয়া তাঁহার সহিত বিচার করিতে বসিব।" কিন্তু সে 'কাল' আর আসিল না! বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রকে ভব-সাগরের পারে চলিয়া যাইতে হইল।

বেলা আন্দাজ আড়াইটার সময়ে হাইকোর্ট হইতে তিনি চৌরঙ্গীর বাটীতে উপস্থিত হন। বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার একবার দাস্ত হয়। ইহার পর তিনি এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে, তাঁহাকে আর উপরের ঘরে লইয়া যাইতে পারা যায় নাই। তিনি একতলার বৈঠকখানার ঘরে একটি সোফার উপর শুইয়া রহিলেন। এই সময়ে গোঁসাই নামে তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেবল তাঁহার নিকটে ছিলেন। ইঁহার পরিবার-বর্গকে তিনি প্রতিপালন করিতেন। ইঁহারই সহিত তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েকটী কথা কহিতে পারিয়াছিলেন। সে কথা গুলির মর্ম্ম এই:—

অনুকূলচন্দ্র।—গোঁসাই আমার এখনকার অবস্থা কেমন দেখ্‌ছ?

গোঁসাই।—কিছুই নয়—আপনার সামান্য একটু শরীর খারাপ হ'য়েছে।

অ।—বন্ধু হে! তোমাকে কত কি বলেছি, সে সব ভুলে যাও, আর আমাকে ক্ষমা কর।

গ।—আপনি কি বল্‌ছেন? আপনার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে?

অ।—না, আমার মাথা খারাপ হয়নি। আমি যা বল্‌ছি ঠিকই বল্‌ছি। তোমাকে ১৫ দিন আগে বলেছি, তা' কি ভুলে গেলে?

গ।—না, আপনি কি বল্‌ছেন আমি বুঝতে পার্‌ছিনে।

অ।—আমার পিতার মৃত্যুর কথা।

গ।—(কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া) তা'তে কি হ'য়েছে? ঈশ্বর তা' কর্‌বেন না।

অ।—ভাই গোঁসাই, তোমাকে ১৫ দিন আগে বলেছিলাম যে, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ঠিক আমার মত বয়সেই আমার পিতা স্বর্গে গিয়েছিলেন। সেই জন্যে আমিও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতেম্ তিনি যেন ঠিক তাঁর বয়সেই আমাকে ডেকে নেন। আমি জানি, আমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না। তিনি আমায় ডাক্‌ছেন।

গ।—আপনার পিতার মৃত্যু হয়েছে ব'লে সেই সময়ে আপনারও মৃত্যু হবে এমন কোনও কথা নাই। আপনি যে রোজ রাত্তিরে বলেন '—হরি বল দিন গেল' ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, ভগবানে আপনার বিশ্বাস আছে।

অ।—হরি বল, দিন গেল।

এই কথা কয়টী বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন। আর তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না, তাঁহার অধরোষ্ঠ পুনরায় কম্পিত হইল না।

তখনই কলিকাতার বড় বড় ডাক্তারদিগকে ডাকা হইল। ডাক্তার

পেন, ফেরার, নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সে সময়ে খুবই নাম-ডাক, তাঁহারা সকলেই আসিলেন। কিন্তু অনুকূলচন্দ্রের বাক্যস্ফূর্তি আর হইল না! তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ তাঁহার শেষ কথা আর শুনিতে পাইলেন না! কয়েক ঘণ্টা এইভাবে বাক্‌শক্তিশূন্য থাকিয়া সন্ধ্যা ৬ টার সময়ে তিনি পরলোক গমন করিলেন। সবই ফুরাইল!

ডাক্তারেরা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন। পত্নী ভূমিতে আছাড় পাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রকন্যাগণ কেহ বা কাঁদিতে লাগিল, কেহ বা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বন্ধু-বান্ধবেরা বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিদায় হইলেন। এমন কি ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিবারই কথা। তিনি যে সকলেরই প্রিয় ছিলেন!

বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ প্রকাশ্য এজলাসে তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আপীল ও আদিম বিভাগের আদালত-সমূহ তাঁহার মৃত্যুর জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছিল। বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের মৃত্যু প্রসঙ্গে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি ফিয়ার মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখের "হিন্দু পেট্রিয়ট" হইতে উদ্ধৃত করিলাম। এই সঙ্গে "হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকীয় মন্তব্যও উদ্ধৃত হইল:—

"The Court will not sit to-day in consequene of the death of our lamented colleague, Mr. Justice Onoocool Chunder Mookerjee. I am sure that I speak the sentiments of every one of my brethren on the Bench, when I say that I feel that in losing him, the Government have lost

a most valuable public servant, a Judge devoted to his duties, most calm, and conscientious, laborious, thoughtful and considerate of the interests and feelings of everybody who came before him, whether suitor or advocate. For myself personally, I have known him and esteemed him ever since I came to the country. From the time I first sat in this Court, I remember well, being struck by his clear intellect and his lucid statement of a case, a statement on which the Court could always implicitly depend. To say that he was truthful is but a small thing. He was perfectly candid, he never would overstate his case, he never would put a false colour or misrepresent facts. Independent and couragious in the highest degree, he never shrank from contending against the opinion of the Court, however strongly it might be expressed against him, if he felt that the interests of justice or of his client required that he should maintain his position. His character was marked by frankness, simplicity and entire freedom from affectation. As a friend, those who knew him esteemed him most. I have the authority of Mr. Justice Elphinstone Jackson, who has just left the Court, for saying that during the last seven or eight months that he had sat with him, he never had a difference with him, and that he was learning day by day to value him more and more for his independence, his integrity, and that which he possessed in an eminent degree, that quality which Englishmen value above all others, the feelings of a perfect gentleman and a man of honour. I can speak of my personal intercourse and friendship with him; our

conversation was always upon the same footing as if hehad been of the same blood and the same education as myself ; I always felt most through and complete sympathy with him in everything. I know, gentlemen, that you share in the grief which I feel for the loss we have sustained, and you at the Bar who knew him better must have loved him best, it is with deep regret that I have to make this announcement to you. Out of respect to his memory, the Court will not sit to-day."

Mr. Justice Phear similarly closed the Court on the Original side, and made the following remarks with much feeling :

"Mr. Lowe, by the melancholy death of Mr. Justice Mookerjee, the Bench has lost an able Judge, and the Bar a distinguished Member ; I feel too, that I have been deprived of a personal friend for whom I had a high regard. I think it will be only a proper mark of respect for the memory of my late colleague that this Court should be closed for to-day."

"Nothing could be more honourable that these noble testimonies to the worth of the departed. Baboo Onoocool Chunder's presence on the Bench, though only for a short time, was not without some influence on his colleagues. It is said that to him was to be traced the change in the current of decisions in enhancement suits, which for some time used to be summarily dismissed without rhyme or reason. If Onoocool Chunder was an ornament to the Bar and the Bench, he was also an ornament to the society to which he belonged. Possessed of

unassuming manners, an affable disposition, and a genial and a kind heart, he was always the same man to his friends whether working a humble Nazir at Howrah or dispensing justice from the bench of the Highest Tribunal in the land. Peace be to his ashes !"

—Hindu Patriot.

অনুকুলচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ বনীয়াদী বংশ এবং ইহা পাথুরিয়াঘাটার মুখুজ্যে বংশ নামে খ্যাত। অনুকূলচন্দ্র এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন

নিম্নে এই বংশের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল :—

বংশ-তালিকা।

যজ্ঞেশ্বর
রাধারমণ
রায়বল্লভ
ভুবনমোহন
লক্ষ্মীকান্ত
গোপালচন্দ্র
সহস্ররাম
চন্দ্রশেখর
অযোধ্যারাম
বীরেশ্বর
রামকেশব
মুক্তারাম
রাধারমণ
রামপ্রসাদ
(অন্যান্য বহু সন্তান)
বৈদ্যনাথ
(এক কন্যা
লক্ষ্মীনারায়ণ
রাজনারায়ণ
নরনারায়ণ
শ্রীনারায়ণ
(এক কন্যা)
হরিশচন্দ্র
ভগবানচন্দ্র
অবিনাশচন্দ্র
অনুকূলচন্দ্র
(এক কন্যা)
অপ্রকাশচন্দ্র
রাজেন্দ্র
হরেন্দ্র
৺শিবচন্দ্র,
সত্যভূষণ বি. এল,
সত্যশরণ
শরদিন্দু এম. এ বি. এল
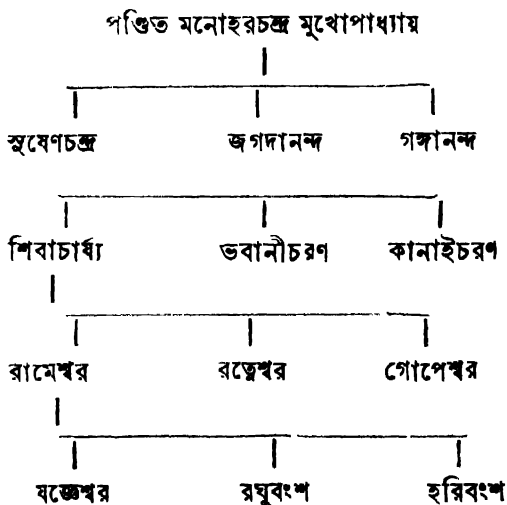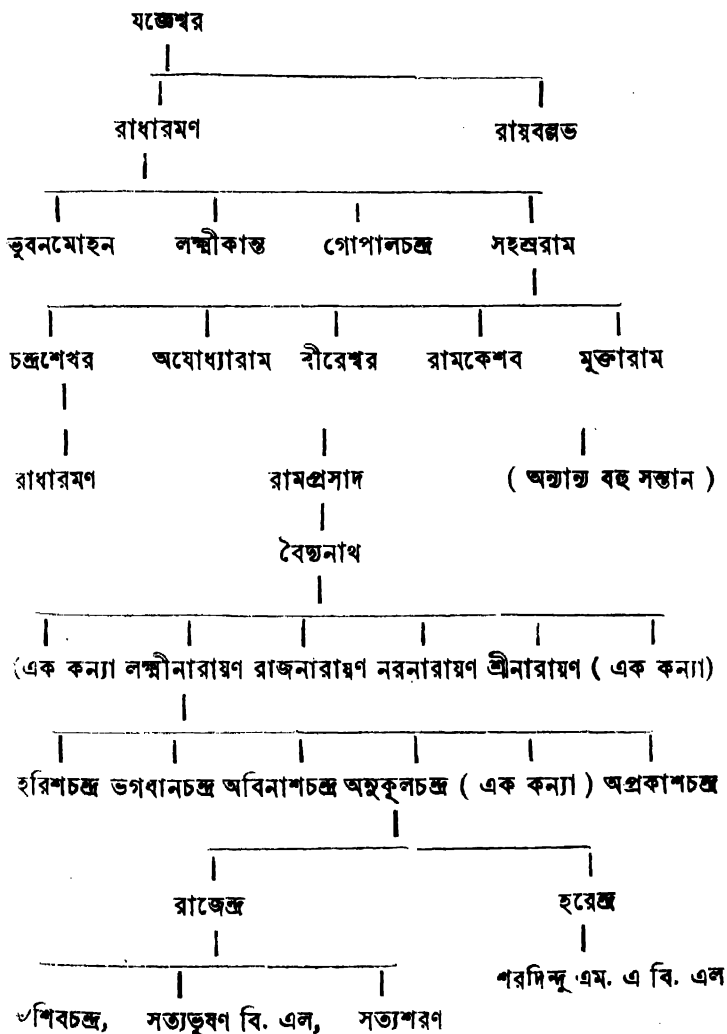
স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভ।

জন্ম ও শৈশব।

ধান্যকুড়িয়ার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, মুক্তহস্ত দানবীর, পরোপকারী, দরিদ্র-বান্ধব এবং পল্লীর কল্যাণসাধনে সততব্রতী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত সেখপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে সচ্চাষী। এই গ্রামে অতি প্রাচীনকাল হইতে এক সচ্চাষী পরিবার বসবাস করিতেন; তাঁহাদের সামান্য কিছু জমি-জমা এবং কলিকাতার উল্টাডিঙ্গি অঞ্চলে তামাকের আড়ত ছিল। মতিরাম বল্লভ মহাশয় এই পরিবারভুক্ত ছিলেন। ইনি শ্যামাচরণ বাবুর উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ।

পারিবারিক অশান্তি ও গণ্ডগোলের জন্য ইহাদের তামাকের আড়ত ও জমিজমা নষ্ট হয়। অতঃপর তাঁহাকে দারিদ্র্য ও অভাবের পীড়নে পড়িতে হয়। এই সময়ে তিনি বালক মাত্র।

এই পারিবারিক অশান্তি ও বিচ্ছেদের ফলে শ্যামাচরণের অগ্রজ তিন ভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ গঙ্গারাম, দ্বিতীয় ভুবন এবং তৃতীয় রাম অকালে পরলোক গমন করেন। শ্যামাচরণের স্কন্ধে ইঁহাদের কৃত ঋণভার উত্তরাধিকার-সূত্রে পতিত হয়। তিনি বিপদের ঘনান্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইলেন বটে; কিন্তু সাহস ও আশা ত্যাগ করিলেন না। বয়সে ছোট হইলেও তিনি অভিজ্ঞতায় ছোট ছিলেন না। বিপদে স্থৈর্য্যাবলম্বন করিতে তিনি অতি শৈশব হইতেই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই দুরবস্থার হস্তে নিশ্চেষ্ট-ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া নিষ্পেষিত হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না।

ভগবান তাঁহাকে ভিন্ন ধাতুতে গঠিত করিয়াছিলেন। প্রতিকূল অবস্থার ভীষণতা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শ্যামাচরণও ততই আত্মরক্ষা ও আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। শ্যামাচরণের মাতা ও তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। এই বিপদ-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার ভার ভগবান তাঁহারই উপরে ন্যস্ত করিয়াছেন। এখন হইতেই এ জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

বাল্য ও কৈশোর।

এই পারিবারিক কর্ত্তব্যের দায়িত্ব-বুদ্ধি তাঁহাকে বাল্যকাল হইতেই জীবন-সংগ্রামে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিল। ক্ষুরধার বুদ্ধি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, পরিশ্রমশীলতা, স্বাভাবিক ব্যবসায়-জ্ঞান এবং অধ্যবসায় যাঁহাদের মূলধন, উন্নতি তাঁহাদের করতলগত হইয়াই থাকে। এরূপ গুণশালী ব্যক্তির সম্মুখে অবস্থার প্রতিকূলতা বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারে না। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক প্রতিকূল অবস্থার তিরোধান ঘটেই।

শ্যামাচরণ বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলেন। ব্যবসায়ী হইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে ক্রমেই জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু মূলধন কোথায়? তিনি আপনাকে নিতান্ত নিঃসহায় ভাবিয়া নিরাশ হইয়া পড়িলেন। আত্মশক্তিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন না; বুদ্ধিমানের মত তিনি সুযোগ ও অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্যামাচরণের মাতা ধান্যকুড়িয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ গায়েন-বংশের কন্যা। গায়েনদিগের অবস্থা তখন স্বচ্ছল। ইঁহারা সেই সময়ে মাতা পুত্রকে আপনাদের নিকট আনয়ন করিলেন। শ্যামাচরণ মাতুলালয়ে

আসিলেন। এখন তাঁহার চারিদিকে নূতন ও অপরিচিত লোক; নূতন গ্রাম, নূতন অবস্থা, নূতন ব্যবস্থা; সকলই নূতন, সকলই অপরিচিত।

এই নূতনের মধ্যে পড়িয়াও শ্যামাচরণের আত্মবৈশিষ্ট্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। শ্যামাচরণের মুখে গাম্ভীর্য্য ও প্রফুল্লতা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিত; প্রৌঢ়ের স্থৈর্য্য ও কিশোরচাপল্য দুইয়ের সংমিশ্রণ তাঁহাতে দৃষ্ট হইত; বিস্ফারিত নয়ন-যুগল প্রতিভার আভায় সমুজ্জ্বল ছিল। ইহার উপর তাঁহার আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র বড় মধুর ছিল। তিনি পরিশ্রমী ছিলেন, আলস্য তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাঁহার শরীর যেমন সুদৃঢ় ও সুগঠিত তাঁহার মনও তেমনই উদার ও উন্নত ছিল। তাঁহার বিশাল বক্ষের ভিতর যে হৃদয় অবস্থান করিত, তাহা যেমন সমুন্নত তেমনই সহানুভূতি-প্রবণ ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই শ্যামাচরণের সহিত সকলের আলাপ হইল; অপরিচিতের সহিত তিনি পরিচয় স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে এই জাতির ভিতর লেখাপড়ার তেমন চলন ছিল না এবং গ্রামে গ্রাম্য পাঠশালা ব্যতীত ইংরাজী স্কুলও ছিল না। কাজেই পাঠশালায় যতদূর লেখাপড়া শিখিবার ততদূর শিখিয়া তাঁহাকে তখনকার রীতি অনুসারে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। ব্যবসায়ই তখন এই সচ্চাষী জাতির প্রধান অবলম্বন ছিল।

শ্যামাচরণ বাল্যকাল হইতেই ব্যবসায়ের মূলতত্ত্ব শিখিয়াছিলেন। এই মূলনীতির সহিত যেন তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয় ছিল। এ কথা বলিতেছি এইজন্য যে, তাঁহাকে এ তত্ত্ব কেহ কোনও দিন হাতে ধরিয়া শিখাইয়া দেন নাই। এখানে আসিয়া শ্যামাচরণ অনুসন্ধিৎসু হইলেন। এই জেলার কোথায় কোন্ জিনিষ উৎপন্ন হয়, কোথায়

কোন্ জিনিষ তৈয়ারী হয়, কোথায় কোন্ জিনিষ সস্তায় অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায় এবং মহকুমার বাহিরে কোথায় সেই জিনিষ বেশী দরে বিক্রয় হইয়া থাকে, এ সকল বিষয়ে তিনি জ্ঞান-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। কোথায় কোন্ জিনিষ সংগ্রহের জন্য আড়ত স্থাপন করিলে সুবিধা হইবে, সেই সকল জিনিষ কোন্ স্থানের মহাজনের হাতে দিলে লাভ বেশী হইবে, ইহা তিনি মনে মনে একরূপ স্থির করিয়া লইলেন।

শ্যামাচরণের মাতুলগণের বাদুড়িয়া গ্রামে একটী আড়ত ছিল। ইহা ধান্যকুড়িয়া হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বাদুড়িয়া গ্রাম এতদঞ্চলের লোকেরই ব্যবসায়ের স্থান ছিল। এখানকার আড়তে তিনি মাতুলগণের সহিত যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার ব্যবসায়-শিক্ষার হাতে খড়ি এই আড়তেই হইয়াছিল।

ধান্যকুড়িয়া গ্রামটীর নাম-ডাক ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে বা শিল্প-ব্যাপারে উচ্চস্থান অধিকার না করিলেও সে সময়ে ইহা নিতান্ত নগণ্য গ্রাম ছিল না। অল্পবিস্তর ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাচীন বদান্য মুন্সী পরিবার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত টাকীরোড নামক পাকা রাস্তার পার্শ্বেই এই গ্রাম অবস্থিত। কলিকাতা সহরের শ্যামবাজার অঞ্চল হইতে ইহার দূরত্ব ১৫।১৬ ক্রোশের অধিক নহে এবং বসিরহাট মহকুমা-সদর হইতে ইহা মাত্র ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই গ্রামের চারিদিকের ভূমি নামাল, এজন্য প্রায় অধিকাংশই জলা ও বিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য-সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা-জল্পনা তিনি করিতেন; তাঁহার কল্পনা কবির কল্পনা ছিল না, অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিশিষ্ট জ্ঞানের উপর তাহার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠিত হইত। এই কল্পনার আলোকে তিনি তাঁহার জীবনে নব-ঊষার অরুণ-রাগ দেখিয়া আপনিই বিভোর হইয়া থাকিতেন। তিনি আপনার পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর

করিয়া এই কিশোর বয়স হইতে ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পদ্ধতি মনে মনে নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন।

ধান্যকুড়িয়া গ্রামে এই সময়ে পতিতপাবন সাউ মহাশয় বাস করিতেন। তিনি যেমন বুদ্ধিমান তেমনই উচ্চহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন এবং ধর্ম্মচিন্তা করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি ধীর এবং বিচার-বুদ্ধি অনন্যসাধারণ ছিল। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এমন তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি মানুষের হৃদয় পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেন, গ্রামের লোকেরা ইঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। কাহারও সহিত কাহারও কোনও বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে ইনি তাহা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন এবং তাঁহার নিষ্পত্তি বা মীমাংসা সকলেই মাথা পাতিয়া মানিয়া লইত। তিনি কেবল যে সাত্ত্বিক-স্বভাব ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার হৃদয়ও সমুন্নত ছিল। তাঁহার প্রকৃতিতে ভাবুকতা যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তিনি অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানেরই প্রয়োগ করিতেন, ভাবুকতার প্রয়োগ করিতেন না। তিনি জ্যোতির্ব্বিদের মত কেবল নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়াই পথ অতিক্রম করিতেন না, পথে যে কূপ আছে তাহার দিকেও তাঁহার লক্ষ্য থাকিত।

কিশোর শ্যামাচরণ যখন এই পতিতপাবন সাউ মহাশয়ের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন, তখনই তিনি বুঝিলেন যে, শ্যামাচরণ সাধারণ লোক নহেন; ইহাতে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সকল লক্ষণই যে ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাতে একদিন না একদিন ইনি বড় হইবেনই। পতিতপাবনের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি শ্যামাচরণ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা করিয়া লইল এবং তাঁহার কিছুদিন পরেই তিনি আপনার এক মাত্র কন্যার সহিত শ্যামাচরণের বিবাহ দিলেন। এই বিবাহ সূত্রে ধান্যকুড়িয়া গ্রামের প্রধান দুই ব্যবসায়ীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

কলিকাতা সহরে পতিতপাবনবাবুর এবং গোবিন্দচন্দ্র গায়েন মহাশয়ের তিসি, সরিষা, ঘৃত প্রভৃতির ব্যবসায় ছিল। বিবাহের পরেই ব্যবসায়ের সম্পর্কে তাঁহার ডাক পড়িত এবং তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যাইতে হইত। তিনি কলিকাতায় শ্বশুরের কর্ম্মস্থলে যাইতেন বটে, কিন্তু দর্শক হিসাবেই তখন যাইতেন এবং চলিয়া আসিতেন।

অতি সত্বরই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, গুড়, চিনি বা তিসি, সরিষা প্রভৃতির ব্যবসায় অপেক্ষা পাটের ব্যবসায়ে লাভ অধিক। এ সিদ্ধান্ত তাঁহার মনেই রহিল, ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার মত সঙ্গতি তাঁহার কোথায়? কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহের সম্মুখে প্রতিবন্ধকতা তিষ্টিতে পারে না। শ্যামাচরণ অচিরেই তাঁহার স্বগ্রাম সেখপুরার ব্যবসায়ীদিগের সংস্পর্শে আসিলেন। ইহারা সে সময়ে বেলগেছিয়া অঞ্চলে অল্প স্বল্প রকমে আল্‌গা পাটের ব্যবসায় করিতেন। শ্যামাচরণ ইহাদের সহিত যোগদান করিলেন। কিন্তু মূলধনের অভাবে তিনি তাঁহার ব্যবসায় 'ফালাও' করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ তিনি দেখিতেছিলেন যে, পাটের ব্যবসায়ে লাভ যথেষ্ট। সামান্যভাবে পাটের ব্যবসায় করিয়া তাঁহার লাভ হইতে লাগিল। কিন্তু এ ভাবে পাটের ব্যবসায় করিতে তাঁহাকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত পদে পদে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। পাটের ব্যবসায়ে যে লাভ যথেষ্ট, তাহা তিনি নিজে বুঝিলেও প্রথমে পতিতপাবনবাবু ও গোবিন্দচন্দ্র-বাবুকে বুঝাইতে পারেন নাই, এবং তাঁহারাও প্রথমে এ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হন নাই। পরিশেষে পাটের ব্যবসায়ে শ্যামাচরণ বাবুকে লাভবান হইতে দেখিয়া ইহারা পাটের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলেন। তখন এই দুই জনের সম্মিলিত মূলধনে এবং শ্যামাচরণের

অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধি ও কৃতিত্বে পাটের ব্যবসায় 'ফালাও' হইয়া পড়িল এবং ক্রমে লাভও যথেষ্ট হইতে লাগিল। ইহার পর তিনি এই ফারমের অংশীদার হইলেন। ক্রমশঃই ব্যবসায়ী মহলে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। তিনি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবসায়-কার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন নাই, কিন্তু তিনি হাতে কলমে ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে সহিষ্ণুতা, সংযম, কঠোর পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, উদ্যম, উদ্যোগ, সাধুতা, প্রভৃতি গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। ইহার উপর যদি প্রকৃতিগত ব্যবসায় বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে ত কথাই নাই। বলা বাহুল্য, শ্যামাচরণের এই সকল গুণ যথেষ্টই ছিল। সেই জন্যই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ব্যবসায়ে এরূপ অদ্ভুত সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি আল্‌গা পাটের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পাটের গাঁইটের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলেন। এই সময়ে পতিতপাবনবাবুর মৃত্যু হয় এবং তৎপূর্ব্বে গোবিন্দবাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। গাঁইট বাঁধিয়া বিদেশে পাট রপ্তানি করিতে পারিলে লাভ বেশী হয়, এজন্য তিনি এই নূতন ব্যবসায়ে ব্রতী হইলেন। তাঁহাদের ফারমের নাম হইল—পি জি ডব্লিউ সাউ। সে সময়ে কলিকাতাতে পাটের গাঁইটের দেশীয় ব্যবসায়ী বড় বেশী ছিলেন না; যে কয়জন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সূর্য্যকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্যামাচরণের ব্যবসায়ের মূল নীতি ছিল—সাধুতা। তিনি যখন প্রথম পাটের গাঁইটের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন সেই সময়ে তিনি গোলাবাড়ী হাইড্রলিক প্রেস নামক গাঁইট বাঁধিবার কলটী ভাড়া লইয়াছিলেন। এই কলে আল্‌গা পাট হইতে

গাঁইট বাঁধা হইত। ইহার পর তিনি ঝিল প্রেস নামক একটী নূতন কল স্থাপিত করেন। সেই সময়ে পাটের গাঁইট বাঁধিবার কল যতদূর আধুনিক রীতি-পদ্ধতি অনুসারে তৈয়ারী হইতে পারে, তাহা তিনি করিয়াছিলেন। কলের চারিপার্শ্বে বিস্তর খোলা জমি রাখিয়া কাশীপুর অঞ্চলে গঙ্গাতীরে তিনি এই কল স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহাদের মার্কা পাটের গাঁইটের সুনাম এতই অধিক, যে কেবল ভারতের বাজারে নহে, ইউরোপ, আমেরিকার বাজারেও প্রথম শ্রেণীর পাটের গাঁইট অপেক্ষা সেগুলি উচ্চতর মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এক্ষণে পাট-রপ্তানির ব্যবসায়ে তাঁহাদের অপরিমিত অর্থ লাভ হইতে লাগিল এবং স্বয়ং শ্যামাচরণ সাফল্য, গৌরব ও প্রশংসার সমুচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি কখনও সত্য ও সাধু-পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই ; ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইহাই তাঁহার প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

শ্যামাচরণ কেবল যে সুতীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে ; তিনি যে হৃদয় লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন তাহা সুগভীর সহানুভূতি ও ঔদার্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। অর্থ তিনি যেমন অজস্র উপার্জ্জন করিতেন, সদ্ব্যয়ও তাঁহার তেমনই ছিল। তিনি ইদানীং ধান্যকুড়িয়া গ্রামেই বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বার যখনই তিনি কর্ম্মস্থল হইতে বাটীতে আসিতেন, তখনই তিনি বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রতিবেশীদের নিকট গ্রামের স্বাস্থ্যের সংবাদ লইতেন ; কে কেমন আছে, কাহারও দুঃখ-কষ্ট হইয়াছে কি না প্রভৃতি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের নিকট জানিতেন। কাহারও দুঃখ-দৈন্যের কথা শুনিলে তিনি অশ্রু মোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু শ্যামাচরণ কেবল অশ্রুমোচন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না ; তাঁহাতে ভাবুকতার সহিত কর্ম্মপ্রবণতার

মধুর সংযোগ হইয়াছিল। তিনি যেমন ভাবুক তেমনই কর্ম্মী ছিলেন। তাই পরের দুঃখ-দৈন্যের কথা শুনিলেই তিনি যেমন কাঁদিয়া ফেলিতেন, তেমনই দুঃখ-দৈন্যে-পীড়িত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ দান করিতেন। কিন্তু এ দান বড় নিভৃতে হইত। যাহাকে দান করিতেন সে জানিত এবং যিনি দিতেন তিনি জানিতেন; তৃতীয় ব্যক্তির প্রায় তাহা জানিবার উপায় থাকিত না।

শ্যামাচরণ যেমন অতি বড় কঠোর কর্ম্মী ছিলেন, তেমনই অতীব কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। ব্যবসায়-সূত্রে তাঁহার কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছিলেন তাঁহারই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ের সুবিশাল ক্ষেত্রে তাঁহার সুনাম যথেষ্টই হইয়াছিল! সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত তাঁহার সুযশের পরিব্যাপ্তি ঘটিয়াছিল। অনেকে বলিতেন, তিনি নিজের দেশে যতদূর পরিচিত না ছিলেন, ততদূর পরিচিত ছিলেন ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবসায়ী সমাজে। তবে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণ তাঁহার কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাইয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছে তাঁহার স্বগ্রামবাসীরা। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত জাতির কল্যাণের প্রকৃত উপায় নাই। এই সময়ে বাবু উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয় ধান্যকুড়িয়াতে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বলা বাহুল্য, শ্যামাচরণেরও এই অনুষ্ঠানে পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তিনি ব্যবসায়ের ভিতর হইতে স্কুল পরিচালনার জন্য এমন ভাবে স্থায়ী মূলধন এবং জমিদারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া তাহার আয় এই সৎকার্য্যে বিনিয়োগ করিলেন যে, তাহাতে ভবিষ্যতে স্কুলটী স্থায়ীভাবে পরিচালিত হইবার সুবিধা হইল।

এই বিদ্যালয়ে বালকেরা একরূপ বিনা বেতনেই বিদ্যা-শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। বিদ্যালয়-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে ছাত্রদিগের

আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে; দরিদ্র ছাত্রেরা এখানে বিনামূল্যে থাকিতে ও আহার করিতে পারে; অপর ছাত্রেরা অতি সামান্য ব্যয়ে এই ছাত্রাবাসে থাকিবার সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে।

ধান্যকুড়িয়ার স্কুল হইতে যে সকল দরিদ্র ছাত্র কলিকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আসিত এবং যাহারা অর্থাভাবে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিত না, তাহাদিগকে কলিকাতার বাটীতে তিনি আহার, বাসস্থান, কলেজের বেতন ইত্যাদি দিতেন। অদ্যাপি তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার সে সদনুষ্ঠান বজায় রাখিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষের সময় অনশন-ক্লিষ্ট নর-নারীর দুঃখ-মোচন-কল্পে শ্যামাচরণ এক অন্নসত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই অন্নসত্রে প্রত্যহ ছয় সাত হাজার দরিদ্র-বুভুক্ষু ব্যক্তি উদর পূরিয়া আহার করিত। এই অন্নশালা তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে তদঞ্চলের বহু অনাহারগ্রস্ত ব্যক্তি অনশন-জনিত অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। শ্যামাচরণের ধান্যকুড়িয়ার বাটীর সংলগ্ন একটী অতিথিশালা আছে। সেখানে অতিথিদিগকে অন্নদান করা হয়।

স্বজাতীয় ব্রাহ্মণগণের শিক্ষার জন্য তিনি ধান্যকুড়িয়াতে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বা টোল স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সুযোগ্য অধ্যাপকের অধীনে ছাত্রগণ সংস্কৃত শিক্ষা করে। টোলের ছাত্রগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছেন।

তিনি জীবিত কালে ২৪পরগণা, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলায় বহু জমিদারী খরিদ করিয়া গিয়াছেন। বসিরহাট মহকুমা-সদরে তাঁহার নামে তাঁহার পুত্র রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর একটী হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন।

শ্যামাচরণ দীর্ঘজীবী হন নাই। তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধের সাত দিবস পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি পরম মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতৃবিচ্ছেদ বেশীদিন সহ্য করা তাঁহার ভাগ্যে লেখা ছিল না; এজন্যই বোধ হয় তিনি শীঘ্র শীঘ্র মাতৃক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ইঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর, মধ্যম শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ বল্লভ এবং কনিষ্ঠ শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বল্লভ।

শ্যামাচরণ বাবু যে পাটের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত তিনটী পরিবার সম্পর্কিত। এই যৌথ ব্যবসায় আজ প্রায় এক শত বৎসরকাল সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় যে পাটের গাঁইটে বৃত্তের মধ্যে বল্লভ মার্কা দিতেন ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে তাহার খুবই সুনাম আছে।

রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর।

স্বর্গীয় শ্যামচরণ বল্লভ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথ বল্লভ ত্বদীয় পিতার ব্যবসায় বুদ্ধি, কার্য্যতৎপরতা ও দানশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণ পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়াছেন। স্কুলে পঠদ্দশায় অল্প বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম ও অত্যন্ত শ্রম সহিষ্ণুতার বলে পিতার যাবতীয় ব্যবসায় ও লোকহিতকর অনুষ্ঠানাদি কেবল যে অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, অনেকাংশে তাঁহাদিগের যথেষ্ট প্রসারও বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বিগত পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের কালে ইঁহাদের প্রধান ব্যবসায় পাটের কার্য্য প্রায় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল, তাহার উপর ভারত গবর্ণমেণ্ট কাশীপুর "সেলফ্যাক্টরীর" সীমা বাড়াইবার জন্য ইঁহাদের "ঝিলপ্রেস"

রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর।

নামক কলবাড়ী সমস্তই ক্রয় করিয়া লওয়ায় পাটের ব্যবসায় পরিচালনে বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয়। কিন্তু রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে বিচলিত না হইয়া অদম্য উদ্যমে তাহারই সন্নিকটে গঙ্গাতীরে পুনরায় নূতন করিয়া সম্পূর্ণ আধুনিকভাবে আর একটি বৃহৎ কলবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে চাউলের কার্য্য বিশেষ লাভজনক বুঝিয়া উল্টাডিঙ্গি নূতন খালের নিকট একটি নূতন চাউলের কল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্বগ্রামের স্কুলের সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অন্যান্য অংশীদিগের সম্মিলনে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া যে স্কুল বাড়ী ও ছাত্রাবাস আদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে তাহার তুলনা বিরল। দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য নিজব্যয়ে একটি সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। বসিরহাটে স্বদীয় স্বর্গীয় পিতার স্মরণার্থে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে ও দানশীলতায় মুগ্ধ হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের (Bengal National Chamber of Commerce), সদস্য, কলিকাতা গ্লাস ফ্যাক্টরীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের পরিদর্শক এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কমিটির সদস্য। তিনি এবম্বিধ বহু সদনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করিয়া এবং কায়মনোবাক্যে দেশের সেবা করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ঝামাপুকুরের মজুমদার-বংশ।

প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া চিত্রপুরের প্রসিদ্ধ ‘দে’ বংশ (যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এক্ষণে “দেব” উপাধিতে সুপরিচিত) কলিকাতা নগরীর ঝামাপুকুর নামক পল্লীতে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা মৌলিক কায়স্থ। গোত্র—“আলম্যান।”
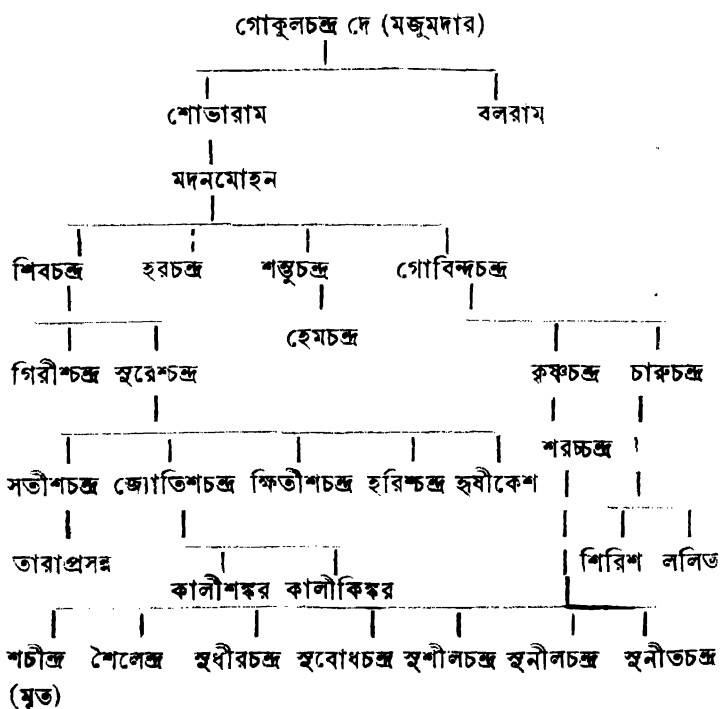
কলিকাতাস্থ ঝামাপুকুর পল্লীতে বসবাস করিবার পূর্ব্বে ইহারা বহুকাল চিত্রপুর হইতে আসিয়া গোবিন্দপুরে (গুরুগোবিন্দপুরে) বসবাস করিয়াছিলেন এবং তথাকার প্রতাপশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন। মোগল বাদসাহগণের রাজত্বকালে এই বংশের জনৈক বংশধর কোন বাদসাহের নিকট "মজুমদার" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ও সেই অবধি এই বংশ "দে" পদবীর পরিবর্ত্তে "মজ্‌মুয়াদার" বা "মজুমদার" পদবীতে জনসাধারণে পরিচিত। আকবর বাদসাহের রাজত্বকাল হইতে এই "মজমুযাদার"-পদের সৃষ্টি। "মজমুযাদার" অর্থাৎ "রেভিনিউ কলেক্টাটের" পদ আকবর বাদসাহের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রথম ভবানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত ও ও জ্ঞানানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "মজমুযাদার"গণ "রাজা" উপাধি ও "পাঁচ-হাজারি" সৈন্যের নায়কতার ভার পাইতেন।

মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুর যখন "ফোর্ট উইলিয়াম" দুর্গ নির্ম্মাণকল্পে গোবিন্দপুরের অধিবাসিগণকে "রেষ্টিটিউসান মানি" প্রদান করিয়া সুতানুটী গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বলেন, তখন গোকুলচন্দ্রের পুত্রদ্বয় শোভারাম ও বলরাম গোবিন্দপুরের বাস ত্যাগ করিয়া সুতানুটী গ্রামে নিজ আবাস ভবন নির্ম্মাণ করেন। এই গোবিন্দপুর সুতানুটী ও কলিকাতা নামক ক্ষুদ্র গ্রামত্রয় মিলিয়াই এক্ষণে সুবৃহৎ কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে।

পিতা গোকুলচন্দ্র যেরূপ প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন, পুত্রদ্বয় পিতা অপেক্ষা ক্ষমতায় কোনও অংশে হীন ছিলেন না। পুষ্করিণী খনন, দেব-দেবীর মন্দির-স্থাপন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে শোভারাম যেরূপ অর্থ ব্যয় করিতেন, সেরূপ ইদানীং অল্পই দৃষ্ট হয়।

শোভারামের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মদনমোহন তাঁহার মাতামহ গৃহে সাদরে প্রতিপালিত হয়েন। শোভারাম সিমলার বিখ্যাত "মিত্র'-

বংশে বিবাহ করেন। মদনমোহনের মাতামহ মদনমোহন ঠাকুরের অতিশয় ভক্ত ছিলেন। তৎকারণ তাঁহার পুত্রের ও উভয় কন্যার ঔরস ও গর্ভজাত সন্তানগণের নাম 'মদন মোহন' রাখিয়াছিলেন। যথা, পৌত্রের নাম মদনমোহন মিত্র; ইনি সিমলার মিত্রবাটীর সুপরিচিত ও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের নাম মদনমোহন দত্ত, ইনিই সুবিখ্যাত হাটখোলার দত্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কনিষ্ঠ দৌহিত্রের নাম মদনমোহন মজুমদার; ইনিই ঝামাপুকুর মজুমদার বংশের আদি-পুরুষ। এই কনিষ্ঠ দৌহিত্র মাতামহের অতি প্রিয়পাত্র থাকায় মাতামহ গৃহে অতি সাদরে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পিতাকে পরগৃহে বাস করিতে দেখিয়া ও পিতার মানসিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ম্মিষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র মাতামহ-গৃহ হইতে বসবাস পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হন।

শিবচন্দ্র "মেসার্স ফেয়ারলি ফার্গুসন্ এণ্ড কোম্পানীর" হৌসে "বুক কিপারের" কার্য্য করিতেন। তৎকালে "বুক কিপারের" কর্ম্ম অতীব মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিল। শিবচন্দ্রের কার্য্যকুশলতায় হৌসের শ্বেতাঙ্গ অংশীদারগণ কেবল যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, মাননীয় "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী"র তদানীন্তন কর্ম্মচারীগণও মোহিত হইয়াছিলেন। মাননীয় "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" পূর্ব্বে জজিয়তী ও অন্যান্য রাজ্যসংক্রান্ত বড় বড় পদ "বুককিপার"গণকে প্রদান করিতেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহারা শিবচন্দ্রকে জজিয়তী-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নির্ব্বাচন করেন। কিন্তু শিবচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলে বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন ভাবিয়া হৌসের শ্বেতাঙ্গগণ শিবচন্দ্রকে ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করেন এবং এ কারণ বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন।

শিবচন্দ্র তাঁহাদিগের কথা এড়াইতে না পাড়িয়া উক্ত কুঠিতে

স্থায়ীভাবে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন। শিবচন্দ্র জজিয়তী পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া ও "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" অনুরোধে শিবচন্দ্রের মামাশ্বশুর রসময় দত্ত মহাশয় (যিনি তখন "মেসার্স ডেভিড্‌সন্‌ এণ্ড কোম্পানীর" হৌসে "বুককিপারের" কর্ম্ম করিতেন) উক্ত পদ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার প্রথম বিচারক বলিয়া গণ্য হয়েন। শিবচন্দ্র অবসরকালে হৌস হইতে বহু অর্থ ও বহু মূল্যবান আসবাবপত্র উপহার পাইয়াছিলেন, ঐ গুলির মধ্যে দুই একটী অদ্যাপি পরিবার মধ্যে দৃষ্ট হয়!

নিজ অর্থে নির্ম্মাণ করিয়া শিবচন্দ্র যে কেবল পিতাকে ঝামাপুকুর-ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন তাহা নহে; মাতৃভক্তির চূড়ান্ত পরিচয়ও জীবনে প্রদান করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মাতাকে চিন্তিত ও বিষাদপূর্ণ দেখিয়া ঝামাপুকুরের আবাসভবন সমান চারি অংশে বিভক্ত করিয়া নিজের এক অংশ মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট তিন অংশ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয়কে সমান অংশে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল ভ্রাতৃগণের সহিত অভিন্নহৃদয় ছিলেন, তাহা নহে; দীন-দরিদ্রগণেরও অন্নদাতা ছিলেন এবং বহু আত্মীয়কে নিজ পরিবার মধ্যে স্থান দিয়া পোষণ করিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের পুত্র গিরীশচন্দ্র সওদাগরী অফিসে মুৎসুদ্দি ছিলেন এবং পিতার জীবিতাবস্থাতেই বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। অষ্টবিংশতি বয়ঃক্রমকালে ইনি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া গিরীশচন্দ্রের মাতাও অচিরকাল মধ্যে কালের কবলে পতিতা হয়েন। ভার্য্যা ও পুত্রকে এইরূপে হারাইয়া শিবচন্দ্র পুনরায় দার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিবার পর তাঁহার একপুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম সুরেশচন্দ্র। সপ্তমবর্ষীয় বালক সুরেশচন্দ্রকে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া শিবচন্দ্র ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শিবচন্দ্রের পুত্র সুরেশচন্দ্র সৎস্বভাবাপন্ন, পরোপকারী, সত্যবাদী পুরুষ ছিলেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনে ইনি কখনও অলসভাবে সময় অতিবাহিত করেন নাই। ইনি সময়ের মূল্য কি তাহা সবিশেষ জানিতেন এবং ঘড়ির কাঁটার ন্যায় যে সময়ের যে কার্য্য তাহা সমাধা করিতেন। ইনি অলস ব্যক্তিগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ও বলিতেন, অলস হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা যৎসামান্য বেতনে কার্য্য করা উত্তম। ইনি প্রথমে চার্টার্ড ব্যাঙ্কে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। পরে সওদাগরী অফিসে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিয়া পিতার ন্যায় ৬৩ বৎসর পূর্ণ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

মদনমোহনের মধ্যম পুত্র হরচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। ইনি দেবভক্ত পুরুষ ছিলেন। ইঁহার ন্যায় সরল প্রকৃতির ব্যক্তি অতি বিরল। দিবারাত্র কেবল দেব-সেবাতেই ইনি জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

মদনমোহনের তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র অতি কঠোরপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মানসিক বল অতুলনীয় ছিল; কিন্তু তিনি এইরূপ ক্রোধী পুরুষ ছিলেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণও তাঁহার সম্মুখে আসিতে প্রমাদ গণিতেন। মজুমদার পরিবার হইতে পূজার বলিদান ইনিই উঠাইয়া দিয়া যান। ইঁহার অষ্ট পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে শৈশবেই সপ্ত পুত্রের মৃত্যু ঘটে। অষ্টম গর্ভজাত সন্তান হেমচন্দ্র মজুমদার। সন্তানগণের মধ্যে ইনিই কেবল দীর্ঘ-

স্বর্গীয় হেমচন্দ্র মজুমদার।

জীবনলাভে সমর্থ হয়েন। এই অষ্টমগর্ভজাত পুত্র হেমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত ও যশস্বী পুরুষ হইয়াছিলেন। ১২৩৯ সালের ১১ পৌষ বড় দিনের দিন হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃ-মাতৃ জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত ও মাতুলের স্নেহে পালিত হইয়া; যৌবনে দীনবন্ধু, বিদ্যাসাগর, শম্ভুচন্দ্র, ভূদেব, মহেন্দ্রলাল, জজ দ্বারকানাথ, আশুতোষ ধর, মুরলিধর সেন, ডাক্তার জগবন্ধু, মন্মথনাথ, ও-সি দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সুহৃদ্গণের সহিত আনন্দে মত্ত থাকিয়া, প্রৌঢ়ে হিন্দু সমাজের নেতাস্বরূপ হইয়া ও বার্দ্ধক্যে বহুকাল পেন্সন্ ভোগ করিয়া এবং ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ও দাস-দাসীগণের পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, জীবনে এক পয়সাও কাহারও কাছে ঋণ না করিয়া, পয়সার দুঃখ কেমন ধারা জীবনে না জানিয়া, সুখের ক্রোড়ে কেবল হাসিয়া খেলিয়া, ৮৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। এরূপ ভাবে সমস্ত জীবন সুখভোগে অতিবাহিত করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরাতন হিন্দু কলেজের যে সকল জলন্ত নক্ষত্র একদিন ভারতাকাশে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইংরাজী বিদ্যায় হেমচন্দ্রের অসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব তাঁহাকে তিনবার স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছিলেন। পঠদ্দশায় তিনি অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার পরম সুহৃৎ মিঃ ও, সি, দত্তের নিকট হইতে ফরাসি, ল্যাটিন ও জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একজন পারশিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন শিক্ষকের সাহায্যে উর্দ্দু ও হিন্দি ভাষায় বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। হেমচন্দ্র সঙ্গীতবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি একজন পশ্চিম দেশীয় ওস্তাদের নিকট গান ও বেহালা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি সুপ্রীম্ কোর্টের এটর্ণী নিউমার্চ্চ সাহেবের "আরটিকেলড্" নিযুক্ত হন। পরে ওকালতি লাইন ছাড়িয়া "হিন্দু পেট্রিয়টে"র জন্মদাতা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহকারী হইয়া সামান্য ১৫৲ টাকা বেতনে "মিলিটারী অডিটর জেনারেলে"র আফিসে নিযুক্ত হন ও নিজ কর্ম্মকুশলতা-প্রভাবে এক বৎসরের মধ্যে ১৫০ টাকার পদে উন্নীত হন। "বেঙ্গলীর" জন্মদাতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ "মিলিটারী অডিটার জেনারেলের" অফিসে এই সময় কর্ম্ম করিতেন।

হেমচন্দ্র যত দিবস "মিলিটারী অডিটর জেনারেলের" আফিসে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তত দিবস তিনি "কম্পাশ" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ও শ্রীরামপুরের গোরার হাঙ্গামার সময় "হিন্দু পেট্রিয়টের" জন্মদাতা হরিশ্চন্দ্র বেঙ্গলীর জন্মদাতা গিরীশচন্দ্র এবং "কম্পাশের" জন্মদাতা হেমচন্দ্র যেরূপ সাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং অটল অচলভাবে স্বজাতির মান্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়।

কেবল মাত্র "বঙ্গবাসীর" কথায় বলিতে হয়ঃ—

"* * * "মিলিটারি অডিটর জেনারেলের" অফিসে প্রবেশ করিয়া হরিশ, গিরীশ ও হেম বাঙ্গালার শ্মশান-বক্ষে মন্দাকিনীর উৎস ছুটাইয়া ছিলেন। বাঙ্গালার সে দুর্দ্দিনে, সিপাহী বিদ্রোহের সে দুঃসময়ে "হিন্দু পেট্রিয়টের" জন্মদাতা হরিশ্চন্দ্র, "বেঙ্গলীর" জন্মদাতা গিরীশচন্দ্র ও "কম্পাশের" জন্মদাতা হেমচন্দ্র যেরূপ তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার সহিত লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ এইরূপ অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।"

বড়লাট লর্ড ক্যানিং রাজ্যসংক্রান্ত কোনও জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে হরিশ ও হেমচন্দ্রের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য্য করিতেন না। হরিশ ও গিরীশের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরেই হেমচন্দ্রের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয় ও চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি কোম্পানীর আফিস ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এবং ঐ সময়েই "কম্পাশ" নামক সংবাদ পত্রও তুলিয়া দেন। কিয়ৎকাল পরে দৃষ্টিশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়ায় (যদিও এক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়) সওদাগরী আফিসে ২৫০৲ টাকা বেতনে প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল মধ্যে নিজ কৃতিত্ব প্রভাবে চারি শত টাকা বেতনে একজন ইংরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। হেমচন্দ্রের অতুল ক্ষমতা দেখিয়া সওদাগরগণ পরে তাঁহাকে ম্যানেজারের পদে বরণ করিয়া লন।

পূর্ব্বে সওদাগরী আফিসে মুৎসুদ্দির পদ জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত সম্মানের পদ ছিল। ধনীর পুত্রেরা কেবল অর্থবলে ঐ পদ লাভ করিতেন। ১৮৬২ সালে বঙ্গদেশে একা হেমচন্দ্র কেবল বিদ্যা ও চরিত্রবলে উক্ত পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত "সাতসাহেবের মুৎসুদ্দি" ললিতমোহন দাসের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া মাসিক বিপুল অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই পদে হেমচন্দ্র পঞ্চবিংশতি বর্ষ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

হেমচন্দ্র "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের" ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ও "বেথুন সোসাইটীর" একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। সওদাগর আফিসে সর্ব্ব দায়িত্ব তাঁহার মস্তকে পতিত হওয়ায় তিনি "অনারারি মেজিষ্ট্রেট" "মিউনিসিপাল কমিশনার" প্রভৃতি পদগুলির মায়া ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সওদাগরী আফিসে হেমচন্দ্র কেবল মুৎসুদ্দীর পদ অধিকার করিয়াই তৃপ্ত হন নাই। "উইলিয়ামসন্ ব্রাদার্স" যখন আফিস তুলিয়া দেন

হেমচন্দ্র তখন "জর্জ্জ হেণ্ডার্সান-এণ্ড কোম্পানী"র আফিসে পুনরায় ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হন। পরে "সেলমাষ্টার" এর পদে উন্নীত হইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সওদাগরী অফিসে হেমচন্দ্র যেরূপ মান ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঐরূপ মান ও ক্ষমতা লাভ বোধ হয় উহাই প্রথম ও শেষ। জর্জ্জ হেণ্ডার্সান্ কোম্পানীর আফিসে পূর্ণ দ্বাদশ বর্ষ কর্ম্ম করিয়া ও পরে প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ পেন্‌সন্ ভোগ করিয়া হেমচন্দ্র গত ৩১শে জানুয়ারী ১৯১৮ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দানবীর হেমচন্দ্র অপুত্রক ও বিপত্নীক হওয়ায় যাহা আজীবন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন দুই হাতে বিলাইয়া দুঃখীর পুত্রগণকে নিজ বাটীতে আশ্রয় দিয়া জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভৃত্যগণকে নিজ পুত্রের ন্যায় দেখিতেন, পল্লীবাসীগণের সহিত ভ্রাতার অনুরূপ ব্যবহার করিতেন। তিনি যে কত বিধবার অন্নদাতা ছিলেন এবং বন্ধুতনয়াগণের বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তিনি এরূপ গুপ্তভাবে দান করিতেন যে দক্ষিণ হস্তে যাহা প্রদান করিতেন তাঁহার বাম হস্ত তাহা জানিতে পারিত না। হেমচন্দ্রের জীবনে স্পষ্টবাদিতা, সাধুতা ও সত্যপ্রিয়তা গুণ বিশেষরূপে বর্ত্তমান ছিল। তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য-সাধনে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। হেমচন্দ্রের কোনও সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ না করায় দুই হস্তে তাঁহার অতুল ধনরাশি আজীবন বিতরণ করিয়াছিলেন। অজস্র অর্থব্যয় করিতে দেখিয়া বন্ধুগণের মধ্যে যদ্যপি কেহ টাকা জমাইবার পরামর্শ দিতেন, হেমচন্দ্র হাসিয়া বলিতেন, "কার জন্যে রাখিব, দশজনে যদি প্রতিপালিত হয় তা'র বাড়া আনন্দ আর কি আছে?" ৬২ বৎসর বয়ঃক্রমে হেমচন্দ্র কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও অবসর-গ্রহণের এক মাস পরেই বিপত্নীক হন।

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মজুমদার।

৺যদুনাথ বসু ও স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় হেমচন্দ্রের নিকট কিয়ৎকাল ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন (৺যদুনাথ ও ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ইউনিভারসিটির প্রথম গ্রাজুয়েট। ৺যদুনাথ বসু হেমচন্দ্রের নিকট আত্মীয় হইতেন।)

হেমচন্দ্র ৺ডব্লিউ, সি বন্দ্যোপাধ্যায়কে "কম্পাস" সংবাদপত্র-পরিচালন কার্য্যে বিশেষরূপ উৎসাহিত করিতেন। হেমচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বিখ্যাত মুৎসুদ্দি ললিতমোহন দাসকে মাসিক অর্থ সাহায্য করিতেন।

মদনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার। ইনিও ইঁহার মধ্যম ভ্রাতার ন্যায় কেবল দেবসেবায় কালাতিপাত করিয়া অতি অল্প বয়সে দুই পুত্র রাখিয়া কালের করাল গ্রাসে পতিত হন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ইনি একজন মহা পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পরোপকারিতা ও দানশীলতা পল্লীস্থ এখনও অনেকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র শরচ্চন্দ্র। ইঁহার ন্যায় সরল প্রকৃতি ব্যক্তি অল্প দৃষ্ট হয়। ইনি এখন সওদাগরি অফিসে কর্ম্ম করেন। হেমচন্দ্র মজুমদার ইহাঁকে তাঁহার ষ্টেটের একজন "ট্রাষ্টি ও একজিকিউটর" পদে নিযুক্ত করিয়া সম্পত্তির কিয়দংশ দান করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর সাতটি পুত্র, যথা শচীন্দ্র, শৈলেন্দ্র, সুধীর, সুবোধ, সুশীল, সুনীল, ও সুনীত। ইহাঁর মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্র ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সুরেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্রের অতি অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃবিয়োগান্তে পিতার স্নেহে ও জ্যেষ্ঠতাত হেমচন্দ্রের পত্নীর যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া সাবালকত্ব-প্রাপ্তিতে জ্যেষ্ঠতাতের সম্পত্তির মালিক এবং "ট্রাষ্টি ও একজিকিউটর" পদে নিযুক্ত হন। হেমচন্দ্রের পর

ইনিই আবার পূর্ব্বগৌরব আনয়ন করিয়া মজুমদার-বংশের নাম সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। স্বাবলম্বন-বৃত্তির উপর ইঁহার পূর্ণ অনুরাগ বশতঃ কাহারও বিনা সাহায্যে অতি অল্প বয়সে দুই দুই বার ইংরেজ সওদাগরী ও এটর্ণি আফিসে কর্ম্ম সংগ্রহ করেন। বেতন সামান্য হইলেও ঐ বয়সে তাঁহার মত প্রতিপত্তি লাভ অতি অল্পলোকের পক্ষে সম্ভব হয়। 'অস্‌লার, কোম্পানীর ম্যানেজার অনারেবল কর্ণাল এলওয়ার্দ্দি সাহেব ইঁহাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। অস্‌লারের অফিসে চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় সতীশচন্দ্র সুবিখ্যাত ইংরেজ এটর্ণি ডব্লিউ, জে সিমন্স, এফ্, আর, এ, এসের নিকট নিযুক্ত হয়েন। কর্ণাল এলওয়ার্দ্দি বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই ভিক্ষাস্বরূপ সিমন্স সাহেবের নিকট সতীশচন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিমন্স সাহেব সে প্রার্থনা মঞ্জুর না করায় ভগ্নমনোরথ হইয়া এলওয়ার্দ্দি সাহেব সতীশচন্দ্রকে কেবল আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। সিমন্স্ সাহেবের আফিসে সতীশচন্দ্র যেরূপ তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার সহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং শ্বেতাঙ্গের হৃদয়জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্দর্শনে উক্ত আফিসের ম্যানেজার ও ক্যাসিয়ার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় (ইনি সতীশ-চন্দ্রের অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী এবং একমাত্র অন্তরঙ্গ সুহৃদ) সতীশচন্দ্রকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেন "আমি বুঝিতে পারি না আপনি কোন্ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সাহেবের সহিত এরূপভাবে বাক্যালাপ করেন"? সতীশচন্দ্রের তেজস্বীতার পরিচয় পাইয়া এটর্ণি সিমন্স সাহেব সতীশ-চন্দ্রের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভয় পাইতেন। এইরূপ নির্ভীকতা ও স্বাবলম্বন বৃত্তিপ্রভাবে ও পরে জ্যেষ্ঠতাত হেমচন্দ্রের আর্থিক সাহায্যে সতীশচন্দ্র বহু সম্পত্তির মালিক হইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সিমন্স সাহেবের আফিস ছাড়িবার সময় এটর্ণি সিমন্স সাহেবকে

পুত্রশোক সহ্য করিতে হইয়াছিল। যদিও বিধি-বিড়ম্বনায় ইউনিভার-সিটি পরীক্ষায় সফলতা-লাভে সতীশচন্দ্র প্রথম জীবনে অসমর্থ হন, তথাপি ইংরাজী, বিশেষতঃ মাতৃভাষা অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। ইনি সর্টহ্যাণ্ড পরীক্ষায় এ্যাট্‌কিন্‌সন্‌ স্কুলে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। ইঁহার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। সিমন্স্‌ সাহেবের আফিসে যখন কর্ম্ম করিতেন, সমস্ত ক্লান্তিদায়ক পরিশ্রম তুচ্ছ করিয়া মেট্‌কাফ হলে ইনি ম্যাজ সাহেবের সহিত একত্র বসিয়া ইতিহাস-পাঠে ও আলোচনায় অবসরকাল অতিবাহিত করিতেন এবং পুনরায় বাটী আসিয়া রাত্রি ১১টার পর যদি কোন নূতন বিদ্যা শিক্ষার একখানি পুস্তক পাইতেন কাহারও বিনা সহায়তায় শিক্ষা করিব এই প্রতিজ্ঞায় সারারাত্রি সেই পুস্তকপাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপে অতি অল্প দিবসের মধ্যেই জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইনি ব্যুৎপন্ন হয়েন। মাতৃভাষায় অনুরাগ থাকায় বাল্যকালে সতীশচন্দ্র বাঙ্গালা রচনা অতি উত্তমরূপে করিতে পারিতেন এবং বিদ্যালয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইতেন। দ্বাদশবর্ষ কাল হইতেই ইনি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে বহু নাটক ও নভেল লিখিয়া মাতৃভাষার সেবা করিয়াছিলেন। এযাবতকাল তাঁহার একখানিও মুদ্রিত করেন নাই; সম্প্রতি বন্ধুবর্গের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এক্ষণে তাঁহার রচিত 'শক্তিপরীক্ষা' নামক নাটক ছাপিতে দিয়াছেন। সতীশচন্দ্র দানে এইরূপ মুক্ত হস্ত যে, কখনও কোন সাহায্য-প্রার্থী তাঁহার নিকট বিমুখ হন নাই এবং পাছে পুত্র, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন জানিতে পারিলে দানকার্য্যে বাধা প্রদান করে, এই ভয়ে তিনি অতি সন্তর্পণে ও গোপনে দান করিয়া থাকেন। আত্মীয় স্বজনের দুঃখ দূরীকরণার্থে অর্থদান করিয়া বহুলোককে বহু দায় (মাতৃদায়,

পিতৃদায়, কন্যাদায় প্রভৃতি) হইতে মুক্ত করিয়া, সকলকে সরল কথায় সন্তুষ্ট করিয়া, পরকে আপনার করিয়া ইনি চিত্তের যে বিশালতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা জগতে আদর্শ। ইঁহার জীবনের প্রধান গুণ ক্ষমা। যদি কেহ কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া নিজ অপরাধের জন্য পরিতাপ করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, ইঁনি সে ব্যক্তির শত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করেন। পরম শত্রুকেও ইনি ক্ষমাদ্বারা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ জগতে কয়জন এমন আছেন বন্ধুগণের বিপদে বিনা সুদে বা কোনরূপ রসিদ না লইয়া অর্থ কর্জ্জ দিতে সমর্থ হন? এমন অনেক ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটে যে তাঁহার নিকট পাছে ঋণী ব্যক্তি তাঁহার দর্শন-প্রাপ্তিমাত্রই টাকা সময় মত না দিতে পারায় লজ্জিত হন, বিশেষ প্রয়োজন থাকিলেও কেবল ঐ কারণবশতঃ সতীশ সে ব্যক্তির সম্মুখে কখনও উপস্থিত হন না। ঘটনাচক্রে যদি কখনও পরস্পরের মিলন ঘটে, তবে অল্প কথা কহিয়াই সতীশচন্দ্র তাঁহার নিকট হইতে সত্বর চলিয়া যান।

সতীশচন্দ্রের জীবনে আর দুইটী প্রধান গুণ দৃষ্ট হয়, যথা :—মানীর মান রক্ষা করা ও অহঙ্কার দূরে রাখিয়া সকলের সহিত সমান ব্যবহার করা। মহাশত্রুকেও ইনি আপনার করিয়া বহু অর্থ তাহাদের অসময়ে দান করিয়াছেন। সতীশচন্দ্রের হৃদয় কেবল যে দানশীলতায় পূর্ণ তাহা নহে। তিনি এরূপ অচল ও অটল যে, একদিন সর্ব্বস্বহারা হইয়াও তিনি জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, উহা অতুচ্চ হিমাদ্রি শিখরের ন্যায় ধীর ও স্থির। একটী ব্যবসায় প্রায় ৫০,০০০৲ লোকসান দিয়া তিনি দণ্ডেকের জন্যও সেই অর্থের জন্য চিন্তিত বা বিমর্ষ হন নাই। বরং ৫০,০০০৲ গিয়াছে বলিয়া তাঁহার উৎসাহ এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, আবার সেই ৫০,০০০৲ পুনরায় প্রাপ্ত হইবার জন্য পূর্ণ উদ্যমে নানারূপ পন্থার

অবলম্বন করেন, কিন্তু লাভ হওয়া দূরে থাক্ লক্ষ টাকার উপর দেনা হইয়া যায়। তথাপি অদম্য উৎসাহে তিনি নিজের অভীষ্টপথে চলিতে থাকেন ও পরে জয়ী হইয়া অতুল সম্পত্তির অধিকারী হন। বিখ্যাত পটলডাঙ্গা-নিবাসী "বসু" বংশে ইনি ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করেন। হিন্দুগৃহে ঐরূপ ধর্ম্মপ্রাণা স্বামীসোহাগিনী রমণী যদিও বিরল নহে, তথাপি তাঁহার ন্যায় দানে মুক্তহস্তা, স্বামীসেবায় তৎপর ভার্য্যা অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সতীশচন্দ্রের একমাত্র পুত্রের নাম তারাপ্রসন্ন।

প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর সতীশচন্দ্রের পিতা সুরেশচন্দ্র পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করে। যথা :— জ্যোতিশচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্র, হরিশচন্দ্র ও হৃষীকেশ। জ্যোতিশচন্দ্র বি·এ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া এক্ষণে সওদাগরি আফিসে কর্ম্ম করিতেছেন। ইহাঁর দুই পুত্র, কালীশঙ্কর ও কালীকিঙ্কর। ক্ষিতীশ এবং হরিশ ও সওদাগরি অফিসে কর্ম্ম করিতেছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র চারুচন্দ্র। ইনি উদারচেতা ব্যক্তি ছিলেন এবং পিতার ন্যায় অতি অল্পবয়সে কালের করাল কবলে পতিত হন। ইঁহার দুই পুত্র গিরিশচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র; ইঁহারা এক্ষণে সওদাগরি আফিসে কার্য্য করিতেছেন। গিরিশচন্দ্রের দুই পুত্র এবং ললিত চন্দ্রেরও দুই পুত্র।

নিমতিতার জমিদার চৌধুরী বংশের
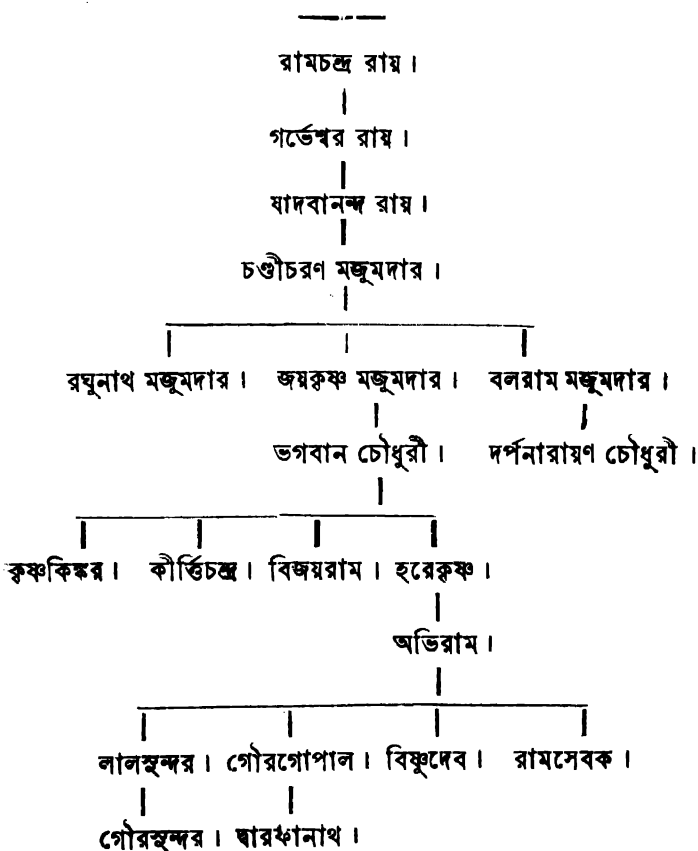
(গৌরসুন্দরের সন্তান)

উপেন্দ্রনারায়ণ প্রিয়সখী গোষ্ঠসখী সুরেন্দ্রনারায়ণ কাদম্বিনী ননীবালা
(নিঃ মৃত)

রাধাগোবিন্দ সবিতারাণী
(নিঃ মৃত) স্বামী ফণীভূষণ মজুমদার রংপুর

(দ্বারকানাথের সন্তান)

মহেন্দ্রনারায়ণ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ

যোগরাণী ভোলানাথ রেণুকা

প্রভাতকুমার প্রতিভাকুমার রাধানাথ

রামচন্দ্র রায় হইতে এই বংশের গণনা পাওয়া যায়। রামচন্দ্র রায় গৌড়ের বাদসাহ সরকারে কার্য্য গ্রহণ করিয়া নিজ বাসগ্রাম পাবনা জেলার অন্তঃপাতী পোতাজিয়া হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী তাণ্ডা নগরীতে বাস স্থাপন করেন। কালক্রমে তাণ্ডা নগরী হইতে গঙ্গা তীরে সরিয়া গেলে এই বংশীয়গণ তাণ্ডা হইতে রঘুনাথপুর, রঘুনাথপুর হইতে নহলামারী ও পরে বর্ত্তমান নিমতিতা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বর্ত্তমান নিমতিতা হইতে এক্ষণে গঙ্গা ১৷৷০ মাইল দূরে

প্রবাহিত। গৌরসুন্দর চৌধুরী ও দ্বারকানাথ চৌধুরী হইতে এই বংশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। চৌধুরী বাবুদিগের বিস্তৃত জমিদারী ইহাদের দ্বারাই অর্জ্জিত। গৌরসুন্দর দ্বারকানাথ ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য এতদঞ্চলে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত এবং তাঁহারা উভয়ে সহোদর ভ্রাতা বলিয়াই সাধারণের ধারণা। বর্ত্তমানে এরূপ ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য বিরল। গৌরসুন্দর ও দ্বারকানাথ সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বহরমপুরে ওকালতি করিতেন, সেই সময় তাঁহার সহিত উভয় ভ্রাতার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল; গৌরসুন্দর জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন, কিন্তু শোকে কখন অভিভূত হন নাই; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ জন্মাবচ্ছিন্ন বিকৃতমনা ছিলেন; দুই কন্যা প্রিয়সখী ও গোষ্ঠসখী তাঁহার জীবদ্দশাতেই বিধবা হন। বাঙ্গালা ১২৯৬ সালের চৈত্র মাসে গৌরসুন্দরের মৃত্যু হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রনারায়ণ একটী পুত্র ও এক-কন্যা রাখিয়া ১৩২০ সালের ভাদ্র মাসে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে কাল-কবলিত হন। সুরেন্দ্রনারায়ণের নাবালক পুত্র রাধাগোবিন্দের অভিভাবকস্বরূপে দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণের এই বিস্তৃত জমিদারীর পরিচালনা করিতে থাকেন এবং মহাধুমধামে ১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসে রাধাগোবিন্দের ও নিজ পুত্র প্রভাতকুমারের বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৩২৫ সালের ৭ই বৈশাখ নাবালিকা পত্নীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া ২০ বৎসর বয়সে রাধাগোবিন্দ অকালে স্বর্গারোহণ করেন। সুরেন্দ্রনারায়ণের পত্নী এই দারুণ পুত্রশোক সহ্য করিতে পারিলেন না, ১৩২৫ সালের কার্ত্তিক মাসে তিনিও স্বামী-পুত্রের অনুগমন করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছেন।
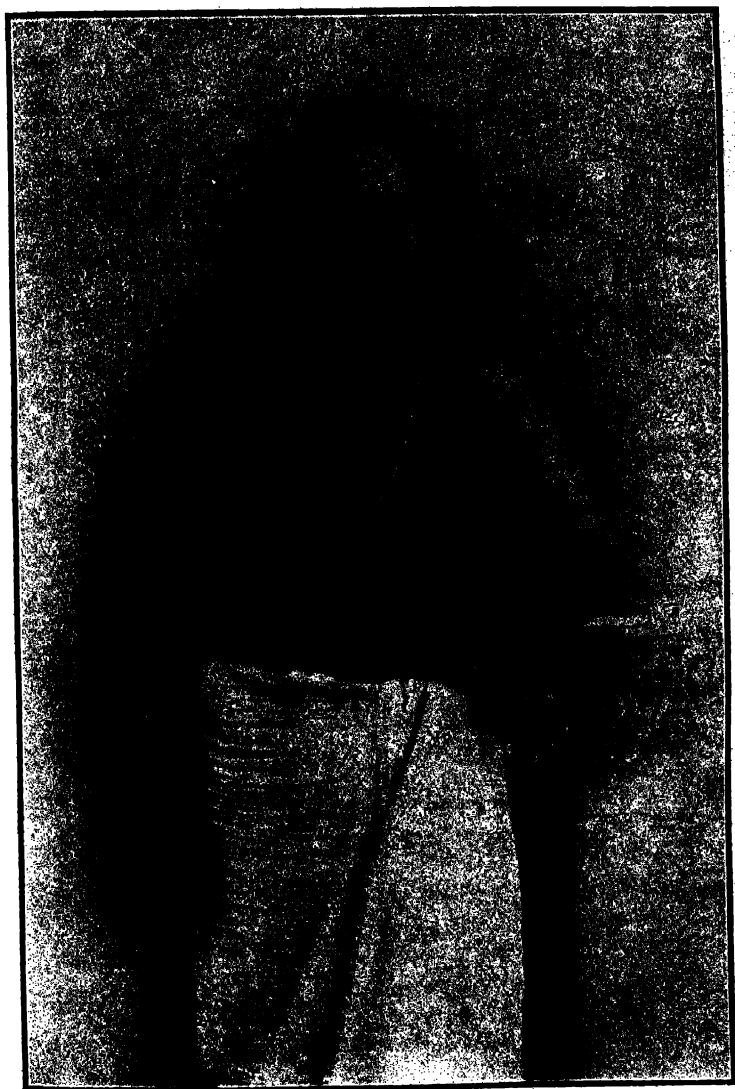
শ্রীযুত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

দ্বারকানাথ সর্ব্ববিষয়েই জ্যেষ্ঠের অনুরূপ ছিলেন। জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ ও আইনে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। আমরা দেখিয়াছি, অনেক দীন-দরিদ্রের কঠিন কঠিন পীড়া কেবল মাত্র পাচন ও মুষ্টিযোগ-প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কোন অর্থশালী লোককে তিনি পাচন মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা দিতেন না। ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বসন্তরোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার চিকিৎসার জন্য কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় আহূত হইয়াছিলেন।

গৌরসুন্দর ও দ্বারকানাথ জীবদ্দশায় বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান। তন্মধ্যে গোবিন্দজিউ বিগ্রহ ও গোপেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা এবং অতিথি সেবা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের অতিথি সেবার ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। বহু নিরন্নকে ইঁহারা অন্নদান করিয়া থাকেন। গ্রামের সমস্ত অনাথা বিধবা ইঁহাদের ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইয়া থাকেন।

দ্বারকানাথের সুযোগ্য পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নিমতিতা মধ্য ইংরাজী স্কুলটীকে উচ্চ ইংরাজী স্কুলে উন্নীত করিয়া বহু দরিদ্র বালককে বিনা ব্যয়ে বিদ্যা দান করিতেছেন। ইঁহাদিগের গৃহবিগ্রহ গোবিন্দদেবের দোলযাত্রা উৎসব এতদঞ্চলের একটী বিখ্যাত পর্ব্ব এবং এতদুপলক্ষে বহু দূরস্থান হইতে যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে।

মহেন্দ্রনারায়ণ জমিদারী কার্য্য পরিচালনা করেন এবং কৃতবিদ্য জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন।

রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ।

বাঙ্গালার দানশীল, পরোপকারপরায়ণ ও সদনুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরলোকগত রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয়ের নাম সসম্মানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি দরিদ্রের বন্ধু, আর্ত্তের সহায় এবং বিপন্নের আশ্রয়স্থল ছিলেন। দেশে শিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল আদর্শ হইয়া থাকিবে।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১৬ই তারিখে জেলা চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া গ্রামে উপেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—স্বর্গীয় পতিতচন্দ্র সাউ। ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন পাট-রপ্তানিকারক মেসার্স পি, জি এণ্ড ডব্লিউ সাউ কোম্পানীর প্রধান অংশীদার ছিলেন। বাবু পতিত চন্দ্র সাউয়ের তীব্র ব্যবসায়বুদ্ধি, অসামান্য সাধুতা, কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের জন্যই এই কোম্পানীর সুনাম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অনেকের ধারণা ভাগ্যলক্ষ্মী হঠাৎ পতিতচন্দ্রের উপর সুপ্রসন্না হইয়া রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রায় তাঁহার গৃহভাণ্ডার ভরাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্ত ইহা কথার কথা মাত্র। পতিত বাবু প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া ব্যবসায়ে সাফল্য ও সেই সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন।

সাউ-বংশকে অতিঘোর দারিদ্র্য, অভাব ও প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করিতে হইয়াছিল। খ্যাতি প্রতিপত্তি ও বিপুল অর্থ হঠাৎ একদিনে আসে নাই। ইহা বহুদিনের সাধনা ও একাগ্র অধ্যবসায়ের ফল। কেমন করিয়া অতি দারিদ্র্যের

রায় ৺উপেন্দ্রনাথ সাহু বাহাদুর

নিম্নতম অবস্থা হইতেও ধনের ও মানের উচ্চতর সোপানে উন্নীত হইতে হয়, সাউ-বংশই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ধান্যকুড়িয়ার সাউ-পরিবার জাতিতে সচ্চাষী। ইঁহারা প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্ম ও ব্যবসায় করিয়াই থাকেন। ইঁহারা পরম বৈষ্ণব। বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য, এখনও এখানে কায়িক শ্রম ও স্বাধীন ব্যবসায়ের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজী পড়িয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু একটা উপাধি লাভ করিয়া আপনাদিগকে বড় মনে করেন, এবং কায়িক শ্রমের স্বাধীন কার্য্যকে অসম্মান-সূচক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন; যাঁহাদিগের নিকট লেখাপড়া শিখিয়া চাকরী করাই পরম সম্মানের কার্য্য, তাঁহারা সাউদিগকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। ইঁহাদের স্বজাতীয়গণ বিদ্যার বড় একটা ধার ধারেন না, অথচ ব্যবসায় ও কৃষিকর্ম্ম-দ্বারা লক্ষ্মীশ্রী লাভ করিতেছেন, ইহার জন্য অনেকে ইঁহাদিগকে নিন্দা পর্য্যন্ত করিতেন। এখনও যে এ অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নহে, তবে ক্রমশঃই এই ভাব দেশবাসীর হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে।

সাউ-বংশের আদিপুরুষ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, মোগল-শাসনের শেষ দশায় দেশের অবস্থা অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে দেশে দস্যু-তস্করেরও যেমন উপদ্রব, বর্গীরও তেমনই হাঙ্গামা। মাধবরাম সাউ ও যাদব রাম সাউ—এই দুই ভাই ২৪ পরগণা জেলার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী গোবরডাঙ্গার নিকটস্থ কানোপুর গ্রামে বাস করিতেন। বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে তাঁহারা গ্রাম ও বাস্তু ছাড়িয়া পুত্র-কন্যা এবং দুই পাঁচখানা তৈজস পত্র ইত্যাদি সহ দক্ষিণদিকে পলাইতে আরম্ভ করেন। এই জেলার দক্ষিণ অঞ্চল খাল-বিল এবং জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সে সময়ে

যাতায়াতের ও পথ-ঘাটের খুবই অসুবিধা ছিল। সেই অসুবিধার মধ্যে তাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বড় বড় ধনী জমিদারদিগের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই বিপদে কেহই তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন না।

বহুদিন একাহারে, অর্দ্ধাহারে, বৃক্ষতলে অবস্থান করিয়া তাঁহারা জীবনভার নিতান্ত দুর্ব্বহ মনে করিলেন এবং বসিরহাটের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে সুন্দরবনের নিকটে বস-বাস আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ও বিপদের তখনও শেষ হয় নাই। এক ভাইকে বাঘে ধরিয়া লইয়া গেল। তখন অপর ভাইটী সপরিবারে প্রাণ লইয়া উত্তরদিকে পলায়ন করিলেন এবং ধান্যকুড়িয়ায় উপস্থিত হইলেন। এই গ্রাম বসিরহাট হইতে মাত্র দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী। তখন এই গ্রাম খুবই ক্ষুদ্র ছিল। এখানকার মণ্ডলগণ সাউগণের স্বজাতি, তাঁহারা ইঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। তাঁহাদেরই সাহায্যে সাউপরিবারের আদিপুরুষ সপরিবারে এখানে বস-বাস স্থাপন করিবার জন্য ভূমি পাইলেন। কিন্তু এতদিন নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিয়া তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিদিন আহার জুটিত না। এই অতিঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহারা কঠোর জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। বংশপরম্পরায় তাঁহারা অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের বংশধর বাবু পতিতচন্দ্র সাউ মহাশয়ের সময়ে সাউ পরিবারের সৌভাগ্যের সূচনা হইল। পতিত বাবু ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে কলিকাতায় আসিলেন। এখানে বহু পরিশ্রমে তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন এবং তাহা মূলধন-স্বরূপ লইয়া তিনি দেশী চিনি, তিসি এবং পাটের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ধান্যকুড়িয়ার ব্যবসায়ী বাবু গোবিন্দচন্দ্র গাইন পতিত বাবুর স্বজাতি।

তিনি পতিত বাবুকে সাহায্য করিলেন, দুইজনের উপার্জ্জন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কয়েক বৎসরের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে পতিত বাবু সাউপরিবারের ললাট হইতে দারিদ্র্যের কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া ফেলিলেন। পতিত বাবু যে ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার উপর সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, কমলা দুই হাতে তাঁহাকে সম্পদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের একদিন কুঠির-নির্ম্মাণের সামর্থ্য ছিল না তাঁহাদেরই বংশধর পতিতচন্দ্র ধান্যকুড়িয়ায় জমিদারী ক্রয় করিলেন। এই জমিদারী পূর্ব্বে আড়বেলিয়ার জমিদারদিগের সম্পত্তি ছিল। এ ঐশ্বর্য্যভোগ পতিতচন্দ্রের ভাগ্যে বেশী দিন ঘটিল না, শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন।

উপেন্দ্রনাথ পিতার জীবদ্দশায় ধান্যকুড়িয়ার গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কৃষিজীবিগণের সন্তানদিগের সহিত একাসনে তাঁহার অক্ষয়-পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত না যে, তাঁহার সহপাঠীদের তাঁহার সহিত কোনরূপ পার্থক্য আছে ; পোষাক-পরিচ্ছদে হাবভাবে সকল রকমে তিনি তাঁহার সহপাঠীদের সমতুল্য ছিলেন। বাহিরটা এক হইলেও বিধাতা কিন্তু উপেন্দ্রনাথের ভিতরটাকে ভিন্নভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পাঠশালার পাঠ তাঁহার অধিকংাশ সহপাঠী যথেষ্ট ও প্রচুর মনে করিত ; কিন্তু ইহাতে উপেন্দ্রনাথের তৃপ্তি হইত না। তিনি আরও শিখিবার জন্য, আরও জানিবার জন্য, প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার পিতা কলিকাতা হইতে মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে আসিতেন। তিনি বলিতেন, কলিকাতায় কয়েকটী ইংরেজী স্কুল হইয়াছে। সেই স্কুলগুলিতে

লেখাপড়া শিখিবার জন্য ছেলেরা দলে দলে ভর্ত্তি হইতেছে। পিতার মুখে কলিকাতার স্কুলের গল্প শুনিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিবার জন্য আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ব্যবসায়ের সম্পর্কে দুই চারিজন ইংরেজের সহিত পতিতচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাঁহারা উপেন্দ্রকে কলিকাতার স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিবার জন্য পতিত বাবুকে পরামর্শ দিলেন। পতিত বাবু বালক উপেন্দ্রনাথকে কলিকাতায় আনাইয়া ডফ কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। বালক উপেন্দ্রনাথ স্কুলে পড়াশুনায় আশ্বর্য্য রকম উন্নতি করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় আসিয়া বালক উপেন্দ্রনাথ দেখিল এস্থান সত্য সত্যই কর্ম্মভূমি, প্রায় সমস্তক্ষণই এখানকার লোক কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত; গ্রামের নীরবতা এখানে নাই; কর্ম্ম-কোলাহলে সমস্ত সহর যেন সজীব হইয়া থাকে।

পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতায় অবস্থানকালে সহরের জনশ্রেষ্ঠগণের পুত্র ও অল্পবয়স্ক আত্মীয়-স্বজনের সহিত উপেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ পরিচয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহাদের মুখে উপেন্দ্রনাথ প্রায়ই শুনিতেন যে গবর্ণমেণ্ট ও সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিতেছেন, চারিদিকে জ্ঞানের আলোক প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। বালক উপেন্দ্রনাথ ভাবিত, কলিকাতায় এত স্কুল হইতেছে, লোকে জ্ঞান-অর্জ্জনের সুবিধা পাইতেছে, আমার ভাগ্যে কি এমন দিন আসিবে না, যে দিন আমি আমার গ্রামবাসীর অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য ও তাহাদিগকে জ্ঞান-অর্জ্জনের সুবিধা দিবার জন্য জন্মভুমি ধান্য-কুড়িয়া গ্রামে একটী স্কুল স্থাপন করিতে পারিব না?

তাঁহার পিতার ব্যবসায় ক্রমশঃই উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল, কিন্তু তাঁহার আয় এত অধিক হয় নাই যে, তদ্দ্বারা একটী উচ্চ ইংরজী স্কুল স্থাপন করিতে পারা যায়; কিন্তু উপেন্দ্রনাথ ইহাতে নিরাশ হইলেন না,

তিনি তাঁহার পিতাকে বলিয়া কহিয়া ধান্যকুড়িয়ায় একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিলেন। এ ব্যাপারে তাঁহার পিতার অংশীদার ও কয়েক জন গ্রামবাসী সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই সময়ে উপেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু হইল। উপেন্দ্রনাথকে পিতার সম্পত্তি ও জমিদারী দেখিবার জন্য স্বগ্রাম ধান্যকুড়িয়ায় যাইতে হইল। তখন উপেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। কলিকাতার ব্যবসায় তাঁহার আত্মীয় বাবু শ্যামাচরণ বল্লভ এবং অপর অংশীদার গাইন বাবুরা দেখিতে লাগিলেন। বয়সে তরুণ হইলেও তিনি জমিদারীর কার্য্য বিশেষ অভিজ্ঞ লোকের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। প্রজাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে যেমন তাঁহার লক্ষ্য ছিল, জমীদারীর আয় বৃদ্ধি করিতেও তেমন তাঁহার মনোযোগ ছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে জমিদারীর আয় যেমন বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পাইল, তেমনি শ্যামা-চরণ বাবুর অধ্যক্ষতায় কলিকাতার ব্যবসায়ে অজস্র লাভ হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে কোন দেশীয় সওদাগরের ভাগ্যে ব্যবসায়ের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে নাই। ইঁহারা বিদেশে অর্থাৎ ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে পাট রপ্তানি করিতেন। প্রথমে পরের কলে গাঁট বাঁধিয়া পাট রপ্তানি করিতে হইত; কিন্তু রপ্তানির কাজ ক্রমশঃ এতই বিপুল আকার ধারণ করিল যে, প্রভূত অর্থ ব্যয়ে ইঁহারা গাঁট বাঁধিবার কয়েকটী কল পর্য্যন্ত স্থাপন করিলেন। ইঁহাদের ব্যবসায়ে সাধুতা এরূপ ছিল যে, ইয়ুরোপ আমেরিকার বাজারে ইহাঁরা প্রভূত সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৮৯৮ খৃঃ বাবু শ্যামাচরণ বল্লভের মৃত্যু হইল। উপেন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া কলিকাতায় ব্যবসায় দেখিতে আসিলেন। জমিদারীর কাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং কলিকাতার ব্যবসায়ও

অতিমাত্রায় বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। দুইটী কর্ম্মই বিরাট। উপেন্দ্রনাথও বিরাট কর্ম্মী পুরুষ। তিনি উভয় কর্ম্মই একযোগে তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ইহার উপর জনহিতকর বহু অনুষ্ঠানের তিনি অনুষ্ঠাতা ছিলেন, এবং সেগুলিও তাঁহাকে দেখিতে হইত। অক্লান্তভাবে তিনি এই সকল কর্ম্ম করিয়া যাইতেন।

ধান্যকুড়িয়াতে অবস্থানকালে তিনি বসিরহাট বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি Smoke Nuisance Commissionএর সদস্য মনোনীত হন। ইহা ব্যতীত তিনি Bengal National Bankএর Director এবং Bengal National Chamber of Commerceএর সদস্য ছিলেন।

গুরু পরিশ্রমের জন্য শীঘ্রই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। চিকিৎসক ও বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন, কিন্তু তিনি বলিতেন, 'যতদিন পারিব কর্ম্ম করিব যখন শরীর বহিবে না তখন বাধ্য হইয়াই নিষ্কৃতি লইতে হইবে।' তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, কর্ত্তব্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান জ্ঞান করিতেন। তিনি সদা প্রফুল্ল ছিলেন; তাঁহার মুখে বিরক্তি বা ক্রোধের চিহ্ন খুব কমই দেখা যাইত।

অতিরিক্ত কর্ম্মভারে তাঁহার বহুমূত্র রোগ হয়। এই রোগের জন্যই পায়ের গোড়ালিতে বিষাক্ত ক্ষতের সঞ্চার হয়। শেষে ইংরেজী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। রোগশয্যায় শায়িত থাকিবার কালে তিনি পণ্ডিতগণের মুখ হইতে শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে যখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছিল, তখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথ ধর্ম্মপ্রাণ এবং পরম বৈষ্ণব

ছিলেন। জীবনে হরিকথা ও হরি সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে বড় ভাল-বাসিতেন। তাই তাঁহার চিরপ্রিয় হরিসংকীর্ত্তন এবং সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের মুখনিঃসৃত ঘন ঘন হরিধ্বনি শুনিতে শুনিতে তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কর্ম্মবীর, দানবীর, শিষ্টাচারের আদর্শ উপেন্দ্রনাথের জীবন-কথা ১৯১৫ সালের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখের "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা ভাষান্তরিত করিয়া আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম :—

"বাঙ্গালার আর একজন নীরব কর্ম্মী, বঙ্গ-জননীর আর একজন যোগ্য সন্তান গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইঁহার নাম—রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সাউ। কলিকাতার শ্যামবাজার-স্থিত বাস-ভবনেই ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বসিরহাট—ধান্যকুড়িয়ার বিখ্যাত জমিদার এবং কলিকাতা শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধনকুবের বলিয়া ব্যবসাদারমহলে পরিচিত ছিলেন।

ইনি ব্যবসায়ীদিগকে সুবিধাজনক সুদে এবং অল্প অল্প করিয়া পরিশোধ করিবার সর্ত্তে টাকা ধার দিতেন; এই জন্য ব্যবসায়ীরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার বিপুল অর্থ তিনি জনহিতকর অনুষ্ঠানে নিয়োগ করিতেন; এই কারণে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন লোকের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

উপেন্দ্রনাথ যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও নগণ্য ছিল, যে জাতিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সে জাতিতে নিরক্ষরের সংখ্যাই অধিক ছিল এবং সামান্য ব্যবসা ও চাষ-বাসই সেই জাতির প্রধান উপজীবিকাস্বরূপ ছিল। যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে দূর পল্লীগ্রামে জনহিতকর অনুষ্ঠান ছিল না বলিলেই চলে। তিনি

গ্রামের কল্যাণের জন্য যে উচ্চ লোকহিতের আদর্শ স্থাপিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা তখন কেহ কল্পনাতেও আনিতে সাহস করিতেন না। তথাপি কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথ সামান্য অর্থ লইয়া বিরাট জনহিতকর অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবিত কালের অতি ক্ষুদ্র পরিসরে বিপুল অর্থব্যয়ে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

পল্লীগ্রামে শিক্ষার বিস্তার, ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যে উৎসাহদান, পথ ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ, উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত এবং দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা এই অনুষ্ঠানগুলিকে উপেন্দ্রনাথ জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই কর্ত্তব্যগুলি সুন্দররূপে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। বাবু শ্যামাচরণ বল্লভ, বাবু নফরচন্দ্র গাইন এই সকল অনুষ্ঠানে উপেন্দ্রনাথের প্রভূত সাহচর্য্য করিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। এইজন্য ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানের দিকেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, পল্লীবাসীর পারত্রিক কল্যাণের জন্য তিনি একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই মন্দিরে রাধাকান্ত জিউর বিগ্রহ বিদ্যমান। এই মন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরে কথকতা ও নিত্য সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। এই মন্দিরসংলগ্ন আর একটী বাটী সাধুদিগের বসবাসের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দেবসেবা ও সাধুসেবার জন্য তিনি বিস্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

কারবারের অর্থে এবং শ্যামাচরণ বাবুর চেষ্টায় ধান্যকুড়িয়াতে আর একটী টোল তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই টোলে ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। ছাত্রগণকে আহার বাসস্থানের ব্যয় দিতে হয় না।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র বাটীতে ৮০ জন মাত্র ছাত্র লইয়া উপেন্দ্র বাবু ধান্যকুড়িয়া গ্রামে একটী মধ্যইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন; অবসর সময়ে তিনি সেই স্কুলে স্বয়ং শিক্ষকের কার্য্যও করিতেন। সেই ক্ষুদ্র স্কুল এক্ষণে সুবৃহৎ ইরেজী স্কুলে পরিণত হইয়াছে। স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা ৫০০ শত। যে বাটীতে এই স্কুল ও স্কুলের ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছে তাহা সুবৃহৎ। স্কুলের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ, পুষ্করিণী এবং এই বিশাল বাটী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় লক্ষ টাকার কাছাকাছি খরচ পড়িয়াছে। এত বড় স্কুল-বাটী বাঙ্গালা দেশে আর কোথাও নাই। স্কুলটীতে অবৈতনিক ছাত্রসংখ্যা অধিক; দরিদ্র ছাত্রদিগকে অন্ন বস্ত্র পুস্তক দিয়া সাহায্য করা হয়। কোন কোন ছাত্রকে পরীক্ষার ফিও দেওয়া হইয়া থাকে। প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ কলিন এই নূতন বিদ্যালয়ের বাটীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া ধান্যকুড়িয়ায় আসিয়াছিলেন; তিনি স্কুলের বাটী দেখিয়া বলেন— "আমি অনেক জেলা দেখিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কোথাও ইহা অপেক্ষা প্রশস্ততর বাটীতে স্থাপিত অধিকতর উৎকৃষ্টভাবে পরিচালিত উচ্চ ইংরেজী স্কুল দেখি নাই।"

পল্লীবাসীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা যখন তিনি আরম্ভ করেন তখন সে অনুষ্ঠান সামান্যই ছিল; কয়েক ঝুড়ি ঔষধ, ক্যাম্বেল হইতে পাশ করা ডাক্তার ইহাই তাঁহার সম্বল ছিল, এবং এই ক্ষুদ্র সম্বল লইয়া তিনি পীড়িতের পার্শ্বে উপস্থিত হইতেন ও শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। সে অনুষ্ঠান এক্ষণে বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরিণত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়-পরিচালনের ভার মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ জনৈক ডাক্তারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত একজন পাশ করা কম্পাউণ্ডারও এখানে আছে। এক্ষণে এই দাতব্য চিকিৎ-

সালয়ে প্রত্যহ শত শত রোগী চিকিৎসিত হইতেছে। উক্ত বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিপোষণ ও রক্ষাকল্পে উপেন্দ্রনাথ নগদে ও ভূসম্পত্তিতে বিপুল অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

উপেন্দ্রনাথ দান-বীর ছিলেন; কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সাহায্য চাহিতে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিত না। কোন গ্রন্থকার বা কোন পণ্ডিত তাঁহার নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন।

বঙ্গদেশের জমীদারগণের বিবরণীতে 'গবর্ণমেণ্ট ধান্যকুড়িয়ার জমিদারগণের প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। বিরাট দান ও জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য গবর্ণমেণ্ট উপেন্দ্রনাথকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন।

উপেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে বটে; কিন্তু কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

রায় বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুর।

বঙ্গদেশে দানবীর, পরোপকারপরায়ণ, স্বদেশহিতানুষ্ঠাননিরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে রায় বাহাদুর বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিঃস্ব জনের একান্ত বন্ধু, আর্ত্তের সহায় এবং বিপন্নের আশ্রয়স্থল। স্বদেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে তিনি যাহা করিতেছেন তাহা চিরকাল আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

রায় বিজয় নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুরের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত ইটাচোনা গ্রামে। ইনি জাতিতে উগ্র ক্ষত্রিয়। ১২৬৭ সালের (ইং ১৮৬০-১) ২৭শে কার্ত্তিক তারিখে শুভলগ্নে পিতার তাৎকালিক কর্ম্মস্থান বিহারের অন্তর্গত আরা জিলা-সদরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকাল হইতেই ইঁহার পিতার আর্থিক ও অপরাপর বিষয়ে সংসারে শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে থাকে। ইনি বাল্যকাল হইতেই দৃঢ়কায়, সবল ও অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। হুগলিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি কলিকাতায় সিটিকলেজে প্রবিষ্ট হন। ইনি স্বভাবগুণে সকল শিক্ষকের ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন এবং সহপাঠীরাও বিজয়নারায়ণকে উদারচিত্ত দেখিয়া অত্যন্ত ভালবাসিত। ইনি ইং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২২ বৎসর বয়সে বোম্বাই প্রদেশে পিতার কন্‌ট্রাক্টরী কার্য্যে যোগদান করেন, এবং অসীম অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন। ১৯০১ খ্রীঃ তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হুগলি, বর্দ্ধমান, সাঁওতাল পরগণা, কলিকাতা ও হাবড়া জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত জমিদারীর তত্ত্বাবধারণ জন্য দেশে প্রত্যাগমন করেন।

ইঁহার আদিপুরুষ প্রথমে আগ্রা (পশ্চিম দেশ) হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। এই বংশের আদিপুরুষ ৺ধর্ম্মদাস কুণ্ডু মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক তদীয় অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীর সৈন্যদলের একভাগের সেনাপতিরূপে বাঙ্গালাদেশে প্রেরিত হন। বাঙ্গালা বিজয়ের পর মহারাজা মানসিংহ তাঁহাকে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী জায়গীর দান ও রাজা উপাধিতে সম্মানিত করেন। তদানীন্তন অন্যান্য নয় জন সেনানায়কও এইরূপে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভগবান দেবাদিদেব শিবের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনার্থ তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত করুরী গ্রামে একটী 'মেলা'র ব্যবস্থা করেন ও তথায় শ্রীধর নারায়ণের একটী সুদৃশ্য সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহা বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত দেবালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও তৎসম্বন্ধীয় পূজা-উৎসবাদির স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য তিনি স্বীয় জায়গীরের কিয়দংশ দেবোত্তররূপে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তথায় যথারীতি পূজা ও উৎসবাদি সম্পাদিত হইতেছে। এই প্রসিদ্ধ বংশের পরবর্ত্তী বিখ্যাত বংশধর ৺চৈতন্যচরণ কুণ্ডু মহোদয় তৎকালে বাঙ্গালা দেশ হইতে চৌথ বা রাজস্বের চতুর্থাংশ দাবীকারী মহারাষ্ট্রগণের অত্যাচার হইতে বর্দ্ধমান-রাজের জমিদারী সকল রক্ষণার্থ হুগলী জেলার অন্তর্গত ইটাচোনা গ্রামে অধিষ্ঠিত হন। তদবধি পরবর্ত্তী বংশধরেরা ইটাচোনাতে বাস করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র ৺তুলসীরাম কুণ্ডু মহাশয় তাঁহার অনতিবিলম্বে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইঁহার প্রপৌত্র দেশহিতব্রত দয়াবীর ৺সাফল্যরাম কুণ্ডু ইং ১৭৭৩।৭৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের যাবতীয় জমিদারীর অন্তর্গত প্রজাগণকে অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষকালে দুঃস্থ দারিদ্র্যনিপীড়িত প্রজাগণের সাহায্য-

স্বর্গীয় শ্রীনারায়ণ কুণ্ডু।

দান কার্য্য দেখিয়া বর্দ্ধমান-রাজ অতীব প্রীত হইয়া তাঁহাকে হুগলী জেলায় লাখরাজ দান করেন। এই ভূসম্পত্তিটী অদ্যাপি ইঁহাদের বংশধরদিগের অধিকারে রহিয়াছে। ৺সাফল্যরাম কুণ্ডু মহোদয় ইটাচোনায় ৺শ্রীধরের আর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন ও একটী সুবৃহৎ অতিথি ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। এই অতিথিশালায় অদ্যাবধি অভ্যাগত অতিথিসকল যথারীতি খাদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, পল্লীবাসিগণের স্নান-পানাদি ব্যবহার জন্য নিজ অধিকারের মধ্যে ও অপরাপর গ্রামেও অনেক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রও বর্দ্ধমান-রাজের কোন একটী কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববংশীয়গণের প্রথানুসারে কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিয়া সুখ-শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরলোকগত হন। তাঁহার পৌত্র ৺নীলমাধব কুণ্ডু মহাশয় হুগলীর আদালতে ব্যবহারাজীবীর কার্য্য করেন ও অল্পদিনের মধ্যে কার্য্যকুশলতার সহিত যথেষ্ট সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺শ্রীনারায়ণ কুণ্ডু মহোদয় পিতৃপিতামহের প্রথানুসারে সকল কার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন এবং গভর্ণমেণ্টের অধীনে সার্ভেয়ারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। পিতার মৃত্যু হইলে সরকারী কার্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক নিজ জমিদারীর তত্ত্বাবধান জন্য স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত রায় বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুর তাঁহারই পুত্র। পূর্ব্বপুরুষের অনুষ্ঠিত দেশের লোকের দুঃখদূরীকরণার্থ একটী অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, অনাথ আশ্রম, ধর্ম্মশালা, রাস্তা ঘাট প্রভৃতি বদান্যতামূলক সৎকর্ম্ম সকলের বিশেষরূপে সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং ইটাচোনার নিকটবর্ত্তী তদীয় জমিদারীর অন্তর্গত গ্রামসমূহে পরস্পর সংযুক্ত সুন্দর সুপ্রশস্ত বৃক্ষশ্রেণীপরিশোভিত ১৩

ক্রোশ বা ২৬ মাইল পরিমিত পথ প্রস্তুত করিয়া আপামর সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ধনী দরিদ্র জনসমূহের পুত্রগণ বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে, দীনহীন রুগ্ন লোক সকল হস্‌পিটলে থাকিয়া সুপথ্য ও ঔষধাদি লাভে সুচিকিৎসিত হইতেছে, অনাথ আশ্রমে ও ধর্ম্মশালায় নিঃস্ব ব্যক্তিগণ নিত্য যথারীতি খাদ্যাদিলাভে সন্তুষ্ট হইতেছে, নানাবিধ উপায়ে জমিদারীর প্রজাগণ উপকৃত হইতেছে ও সন্তানগণকে বিনাব্যয়ে সুশিক্ষিত করিতেছে। নিজগ্রামে ও তৎসন্নিহিত পল্লীতে আরও অনেক সোপান-পরম্পরা-শোভিত সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সরোবরগুলির পঙ্কোদ্ধার পূর্ব্বক উক্ত গ্রামসমূহের বহুল পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানপূর্ব্বক বিশেষভাবে স্বর্গীয় পিতার পদাঙ্কানুসরণ করতঃ সকল বিষয়েরই স্থায়ী সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, নিজগ্রামে কৃষকদিগের কৃষিশিক্ষার সৌকর্য্যার্থে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। আজকাল দেশের সর্ব্বত্র গোজাতির বিশেষ অবনতি পরিলক্ষিত হয়, গোজাতির অবনতি-নিবন্ধন কৃষিরও অবনতি হইতেছে। পূর্ব্বে হিন্দুরা গোজাতিকে দেবতাস্বরূপ দেখিতেন ও যথেষ্ট ভক্তির সহিত গোসেবা করিতেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে গোজাতির উন্নতির দিকে লোকের আদৌ লক্ষ্য নাই। কিন্তু সদাশয় রায় বাহাদুর মহাশয় যাহাতে এতদ্দেশে গোজাতির উন্নতি হয় তজ্জন্য চেষ্টিত আছেন। স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট জমির বিনিময়ে নিকৃষ্ট জমি সকল লইয়া বা জমি সকল অতিরিক্ত মূল্যে খরিদ করিয়া গোচর সংস্থাপন করিয়াছেন। গোপাল ও গো-পালকদিগের রৌদ্র বৃষ্টি হইতে আশ্রয়স্থল-স্বরূপ উক্ত গোচরগুলির মধ্যে মধ্যে অশ্বত্থাদি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন। দূরদূরান্তর হইতে সমাগত শবদাহকারী ব্যক্তিগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য

প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরস্থ পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীতে এক সুবৃহৎ শ্মশানঘাট ও তথায় উক্ত যাত্রিগণের অবস্থানের জন্য গৃহ প্রস্তুত করিয়া জনসাধারণের বিশেষ হিতানুষ্ঠান করিয়াছেন। উক্ত মহানুভব প্রজাগণের হিতকল্পে কয়েকটী সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং আপামরসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধানার্থ বাৎসরিক ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, এইরূপ সৎকার্য্যসমূহ ১৪।১৫ বৎসর ব্যাপিয়া সুসম্পন্ন হইতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া অনেক সৎকার্য্য আরম্ভ করা হইতেছে। ইঁহার মহানুভবতা ও দেশহিতৈষিতা কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট (Certificate of Honour) প্রদান করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন ও ইহার দুই বৎসর পরে বদান্যতা ও দেশহিতৈষিতার জন্য ইঁহাকে আরও একখানি (Certificate of Honour) প্রদান করেন। ইনি গভর্ণমেণ্টকে ও বর্দ্ধমান রাজকে বাৎসরিক ৫০০০০ হাজার টাকা রাজস্ব দান করেন। ইঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান বিষ্ণুনারায়ণ কুণ্ডু পণ্যাদির বিদেশ হইতে আমদানী ও দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানির কার্য্যে নিযুক্ত আছেন ও অল্প বয়সে বাণিজ্যবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। আশা করা যায়, ইনি ভবিষ্যতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক বংশের পূর্ব্ব-গৌরব বজায় রাখিয়া যশস্বী হইবেন।

৺শ্রীনাথ দাস

৺শ্রীনাথ দাস স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহার নাম বঙ্গদেশে জানে না এরূপ লোক বিরল। স্বীয় অধ্যবসায় ও মেধার গুণে মানুষ আপনাকে যে কত উন্নত করিতে পারে, তাহা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে বুঝা যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর "সময়" পত্রে যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হয় তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

ইংরাজী ১৮২৯ সালের ৯ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা নগরে শ্রীনাথবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রামলোচনবাবু হালিসহর হইতে আগমন করিয়া কলিকাতায় বসবাস করেন। নয় বৎসর বয়সে শ্রীনাথবাবু বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। তখনকার প্রথা মত অতি অল্প বয়সেই অর্থাৎ একাদশ বর্ষ মাত্র বয়সে শ্রীনাথবাবুর বিবাহ হয়। অল্প বয়সে বিবাহ করায় তাঁহার আয়ু হ্রাস হয় নাই বা তাঁহার সন্তান-সন্ততিবর্গ ক্ষীণজীবি হয় নাই। বিবাহের পর শ্বশুর মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। স্বীয় অসামান্য মেধা-প্রভাবে তিনি পাঁচ বৎসরে সহপাঠীদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করেন ও কলেজের যাবতীয় পুরস্কার গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে তিনি তৎকালীন সর্ব্বোচ্চ মাসিক ৪০ টাকা বৃত্তিলাভে সমর্থ হন এবং প্রতি বৎসর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পাঁচ বৎসর কাল সেই বৃত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

শ্রীনাথবাবুর অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার ছিল এবং বরাবরই তিনি অঙ্কে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য

স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস
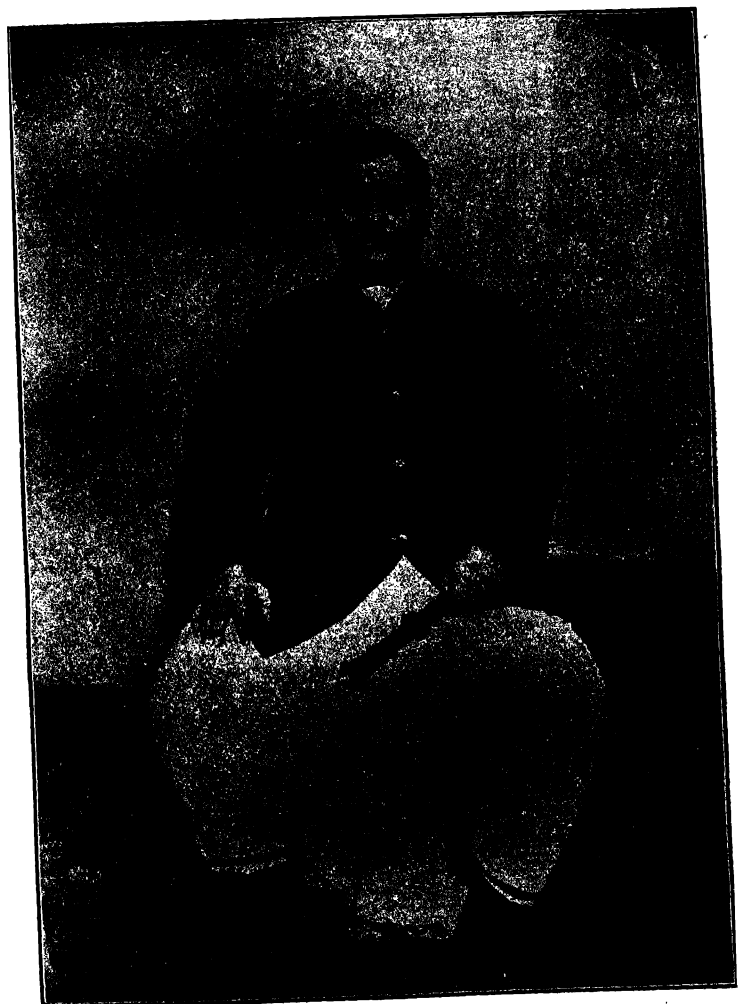
বিষয়েও তিনি প্রথম স্থান লাভ করিতেন। তখন কলেজের ভাল ভাল ছাত্রের পরীক্ষার উত্তর প্রকাশিত করিবার নিয়ম ছিল, শ্রীনাথবাবুর উত্তরও এই নিয়মানুসারে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'নেশন'-সম্পাদক বলেন, "গণিত বিদ্যায় র‍্যাঙ্গলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকেরা যে সকল অঙ্কের সমাধান করিতে না পারিতেন, শ্রীনাথবাবু তাহা সমাধা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন।" শিক্ষকেরা তাঁহার গভীর জ্ঞানের এত প্রশংসা করিতেন যে, তাঁহাকে ছাত্রাবস্থাতেই কিছু দিনের জন্য কলেজের শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সময়ের ছাত্রদিগের মধ্যে মাননীয় বিচারপতি স্বর্গীয় স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ অন্যতম উল্লেখযোগ্য।

কলেজে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর সহিত শ্রীনাথবাবুর পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় স্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নিকট সেক্সপীয়র অধ্যয়ন করিতেন এবং তিনিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে শ্রীনাথবাবু কলেজ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কমিসেরিয়েট অফিসে হিসাব-রক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষকতা কার্য্যে তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং উচ্চপদস্থ ও অধীনস্থ সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় জজ বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের পরামর্শে শ্রীনাথ

ওকালতী পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হন এবং ঐ বৎসরই সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল শ্রেণীর মধ্যে স্থান লাভ করেন। এই সময়ে স্বর্গীয় বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং দ্বারকানাথ মিত্রদ্বয়ও উকীলশ্রেণীভুক্ত হন। ওকালতী কার্য্যে শ্রীনাথবাবুর অসাধারণ স্ফূর্ত্তি হয় এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই ইনি উকীলদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন।

বিগত ইং ১৮৬২ সালে কলিকাতা হাইকোর্ট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রীনাথবাবুও তথায় ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। এই হাইকোর্টে তিনি চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল ওকালতী করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার বার্ণেশ পিকক মহোদয়ের শ্রীনাথ-বাবুর প্রতি উচ্চ ধারণা ছিল এবং মোকদ্দমার রায়েও তাঁহার বহু প্রশংসা করিতেন। শ্রীনাথবাবু ইচ্ছা করিলে এই সময়ে হাইকোর্টের জজীয়তী গ্রহণ করিতে পারিতেন। শ্রীনাথবাবুর তর্কফলে অনেকগুলি আইনের নজীর হইয়াছে। জরিপ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় শ্রীনাথবাবুর সহিত কেহই প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন না। তাঁহার স্মরণশক্তি এতদূর প্রবল ছিল যে, অত্যন্ত জটিল ও সুবৃহৎ মোকদ্দমাতেও তিনি কিছুই লিখিয়া রাখিতেন না। হাইকোর্টে তাঁহার চরিত্রের বিশেষ সুখ্যাতি বাহির হয়, তিনি কখনও ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন না এবং তাঁহার মক্কেল প্রভৃতির সহিত কর্কশ ব্যবহার করেন নাই।

মাননীয় বিচারপতিদ্বয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সারদাচরণ মিত্র শ্রীনাথবাবুর সহিত একত্রে কার্য্য করিতেন এবং অনেক সময়েই তাঁহার সহকারী উকিলরূপে মোকদ্দমা চালাইতেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার কোমর পিথরামের নিয়োগ অনুসারে শ্রীনাথবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য

নিযুক্ত হন। শ্রীনাথবাবু বিশেষ যত্নসহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য দেখিতেন এবং তিনি সিণ্ডিকেটের আইনের বিশেষ সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

৫০ বৎসর ওকালতী করিবার পর ১৯০৬ সালে শ্রীনাথবাবু অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ে হাইকোর্টের উকীলবর্গ তাঁহার ওকালতীর জুবিলি বা পঞ্চাশৎ বার্ষিক মহোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় জজ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি প্রধান প্রধান জজ এবং উকিলগণ এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার এক বৎসর পরে ১৯০৭ সালে তিনি ইহজগৎ হইতে মহাপ্রস্থান করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৮ বৎসর ৩ মাস ১ দিন বয়স হইয়াছিল। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না এবং উপার্জ্জনের তৃষ্ণাও সকলের মিটে না—কিন্তু শ্রীনাথবাবু তৃপ্তিসহকারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে তাঁহার পরিষ্কার জ্ঞান ছিল। কোন একজন উকিল তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে তিনি নানা উপদেশ দিয়া এই আশীর্ব্বাদ করেন যে, "ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।"

শ্রীনাথবাবুর চরিত্র বড়ই মনোহর। তিনি অত্যন্ত দয়াবান এবং সাধ্যানুসারে সতত পরদুঃখমোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন। দেবসেবায় বৎসর বৎসর তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন এবং মৃত্যুর পরও যাহাতে দেবসেবা প্রভৃতি নিত্যপূজা চলে তাহার জন্য বহু সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, দুর্গাপূজায় বৎসর বৎসর ছাগ বলি হইত; একবার একটী ছাগ বলি হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া আশ্রয় লওয়াতে তিনি ছাগবলি বন্ধ করিয়া দেন। যাত্রা ও গান বাজনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। খেলার মধ্যে তিনি দাবাবড়ের বিশেষ

পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণাতুর কখনও তাঁহার দ্বারে বিমুখ হয় নাই। পূজার সময় তাঁহার দ্বার অবারিত থাকিত, এখনও লোকে অবারিত বলিয়া জানে। তিনি এক দিকে যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, অপর দিকে তাহা সেইরূপ অকাতবে ব্যয় করিয়াছেন। তিনি কত নিঃস্ব আত্মীয়েব ভবণ-পোষণেব ভার বহন করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া জানাইয়া দান কবা তাঁহার স্বভাব ছিল না, যদি তিনি নিজেব সুখ্যাতির জন্য লালায়িত হইতেন, তাহা হইলে অর্থব্যয় করিয়া গভর্ণমেণ্টেব নিকট অনেক সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তিনি নিজেব নাম প্রচার করিবাব জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন নাই।

শ্রীনাথবাবু যেরূপ বংশ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন তাহা সচরাচব দেখা যায় না। তাঁহাব জীবিতকালে অনেকগুলি বংশধবের মৃত্যু হইলেও তিনি যাহা বাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাও বড় কম নহে। যথা-পুত্র কন্যা ৮, পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী ৩৫, প্রপৌত্র প্রপৌত্রী, প্রদৌহিত্র প্রদৌহিত্রী ৩৫, সর্ব্বশুদ্ধ ৭৮। ইহা ব্যতীত বিবাহসূত্রে বাহির হইতে আনীত ২১ জন বর্ত্তমান ছিল। পুত্রবধূ ৪, পৌত্রবধূ ৭, জামাতা ২, নাতি জামাতা ৭, প্রনাতি জামাতা ১ এই উভয় শ্রেণীতে প্রায় ১০০ ব্যক্তি হইয়াছিল। নিম্নে বংশাবলীর কুর্চিনামা দেওয়া গেল :—

রামলোচন দাস

শ্রীনাথ দাস

শ্রীনাথ বাবু—নয় পুত্র এবং ছয় কন্যার পিতা। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ৪ জনের অল্পবয়সে মৃত্যু হয় এবং পাঁচ জন যশঃ উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার নাম উজ্জ্বল করেন।

তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উপেন্দ্র বাবুকে অনেকে শ্রীনাথ বাবুর প্রথম পুত্র বলিয়া জানেন। ইনি অতি সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন। ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রেম অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি নির্ভীক চিত্তে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন এবং Indian নামে একটী খবরের কাগজ চালাইতেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ লোক লাগাইয়া রাখিতেন। বাঙ্গালা ভাষায়ও উপেন্দ্র বাবুর বিশেষ দখল ছিল। তিনি, "দাদা ও আমি", "সুরেন্দ্র বিনোদিনী", এবং "শরৎ সরোজিনী" নামে তিনখানা পুস্তক লিখেন। থিয়েটারেও তাঁহার খুব সখ ছিল এবং

যাহাতে সুরুচিসম্পন্ন মার্জ্জিত লোকের হস্তে থিয়েটার চালিত হয় তাহাব চেষ্টা কবিয়াছিলেন। ১৮৯৫ সালে কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে লোকে দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া জানেন। ইনিও পিতার ন্যায় পরদুঃখকাতর। তাঁহার নিকট দরিদ্রের কাতর প্রার্থনা কখনও ব্যর্থ হয় না। তিনিও একজন স্বদেশভক্ত। 'সময়' নামে সাপ্তাহিকপত্র বাহির কবিয়া নীরবে দেশের কার্য্য করিতেছেন। বিদ্যালয়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতাগণ সহজেই প্রথম স্থান অধিকাব করিতেন এবং প্রতি বৎসব পারিতোষিক ও বৃত্তিলাভ করিতেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু এম্, এ পরীক্ষায় সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকাব করেন, পরে আইন পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ওকালতীতে তাঁহার মন যায় নাই। পাঠ্যাবস্থা শেষ কবিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে মাতিয়া যান।

স্বনামপ্রসিদ্ধ হাইকোর্টেব এটর্নী সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্র ইনিও ভ্রাতাদিগের ন্যায় নির্ভীক ও স্বদেশহিতৈষী। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে সহজেই কলেজে বৃত্তি লাভ করিতেন। এম্, এ, পাশ করিয়া এটর্ণী আফিসে ভর্ত্তি হন। প্রথমে এটর্ণী হইয়া তিনি পরে উকিল হন। এটর্ণী ব্যবসায়ে প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করেন। সুরেন্দ্র বাবু ইংবাজী ভাষায় "Depreciation of silver" নামে একটী পুস্তক লিখেন এবং Nation প্রভৃতি নানা কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতেন।

দেবেন্দ্র বাবু বিলাত-প্রত্যাগত প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপক বা প্রফেসার ডি, এন, দাস নামে খ্যাত। তিনি কিঞ্চিৎ উগ্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন এবং কাহারও বশীভূত হইয়া থাকিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডে গিয়া তিনি আই সি এস্ পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করেন। পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিলেও ভাগ্যদোষে সেবার অল্পসংখ্যক লোক নিযুক্ত হওয়াতে

তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। ভারতবর্ষে আগমন করিয়া তিনি অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং পরে নিজে একটী স্কুল স্থাপন করেন। তাঁহার স্ত্রী ৺ কৃষ্ণভাবিনী দাসী এই কার্য্যে তাঁহার সাথী ছিলেন এবং বিলাতে গমন করিয়া তাঁহার কষ্টের লাঘব করিয়াছিলেন। তিনি "ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলা" নামে একখানি পুস্তক লিখেন। তাহা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিষ নয়নে পতিত হইয়া বাজেয়াপ্ত হয়। ১৩১৪ সালে দেবেন্দ্র বাবুর মৃত্যু হইলে, কৃষ্ণভাবিনী স্বদেশবাসিনী ভগিনীদিগের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহারই, চেষ্টায় ও যত্নে "ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল" স্থাপিত হয়। ১৯১৯ সালে তাঁহার ইহলীলা অবসান হয়।

কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্র বাবু ন্যায়বান ও ধার্ম্মিক ছিলেন। লেখা পড়ায় তিনি বিশেষ কোন খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে না পারিলেও সকল সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। কোন দরিদ্র ভিক্ষুক এক দিনের জন্য তাঁহার দ্বার হইতে বিমুখ হয় নাই। কেহ কখনও তাঁহার রাগ দেখে নাই। তিনি গুণীর আদর করিতেন এবং বহু ধর্ম্ম পুস্তক ক্রয় করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার করিতেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রীনাথ বাবুর দেবোত্তর সম্পত্তির প্রথম সেবায়েত হন এবং ধুমধামের সহিত পূজা যাগ যজ্ঞ করেন। ১৯১৩ সালে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীনাথ বাবুর পৌত্রদিগের মধ্যে যোগেন্দ্র বাবু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, ইনি সুরেন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বি, এল পাশ করিয়া ইনি শ্রীনাথ বাবুর সহিত এক সঙ্গে ওকালতী করেন। কিয়দ্দিবস পরে স্বদেশীর প্রবল বন্যায় আইন পরিত্যাগ করিয়া নূতন কাপড়ের কল স্থাপন করেন। শ্রীনাথ বাবুর নাম হইতে ঐ কলের নামকরণ হয়। শ্রীনাথ মিল্ হইতে যে সকল কাপড় বাহির হয় তাহার সুখ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হয়। রাজেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর ইনি দ্বিতীয় সেবায়েত হন এবং অতি বিচক্ষণতা সহকারে

দেবোত্তরের কার্য্য সম্পাদন করেন। বঙ্গের শেষ সাইক্লোন ও দুর্ভিক্ষে ইনি প্রায় ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দান করেন। সুরেন্দ্র বাবুর মধ্যম পুত্র অরুণকুমার দাস ও তৃতীয় পুত্র তপনকুমার দাস জমিদারী কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সুরেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ভুবনমোহন দাস। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী হন। এটর্ণী হইবার পূর্ব্বেই তিনি বাঙ্গালা ভাষায় "ভারতবর্ষের ভাগ্য পরিবর্ত্তন" নামে পুস্তক বাহির করেন।

শ্রীনাথ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্রদ্বয় দ্বিজেন্দ্রনাথ দাস ও দীনেন্দ্রনাথ দাস বিষয়-কার্য্যে মনোনিবেশ ও সুনিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ৺রাজেন্দ্রনাথ দাসের চতুর্থ পুত্র ফণীন্দ্রনাথ দাস Indian Defence force-এ যোগদান করেন।

দৌহিত্রদিগের মধ্যে বাবু বিপিনচন্দ্র মল্লিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ৺প্রকাশচন্দ্র মল্লিকের মধ্যম পুত্র। এম, এ, বি, এল পাশ করিয়া বিপিন বাবু শ্রীনাথ বাবুর সহিত ওকালতী করিতেন। ক্রমে মিউনিসিপ্যাল কমিশনর হন। মিউনিসিপ্যাল-আইনে তিনি অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু প্রফুল্ল মল্লিক একজন স্বনামখ্যাত ডাক্তার, পাশ করিয়াই তিনি ইডেন হাঁসপাতালে Resident Surgeon নিযুক্ত হন। অতি অল্প দিনেই তাঁহার হাতযশ ঘোষিত হয়। ইনি তাঁহার পিতার নামে একটি ডিসপেন্সারী স্থাপন করিয়াছেন।

৺ অক্ষয়কুমার মিত্রের পুত্র নিরঞ্জন চন্দ্র মিত্র শ্রীনাথ বাবুর আর এক দৌহিত্র। ইনি ডাক্তারি পাশ করিয়া মিউনিসিপালিটীর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। সিমুলিয়া-নিবাসী নগেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র রবীন্দ্রনাথ বসু আর একজন দৌহিত্র। ইনি পশু-চিকিৎসক। ইনি শ্রীরামপুরে চিকিৎসা করেন।

রায় নিশিকান্ত ঘোষ বাহাদুর

রায় নিশিকান্ত ঘোষ বাহাদুর।

জন্ম।

রায় নিশিকান্ত ঘোষ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২৭২ সনে ২৩শে ভাদ্র তারিখে জিলা ঢাকার মুন্সীগঞ্জ সব ডিভিসনের এলাকাধীন বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ময়মনসিংহের খ্যাতনামা উকিল ও মিউনিসিপালিটীর প্রথম নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত ঘোষ। রায় বাহাদুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

বংশ-মর্য্যাদা।

রায় বাহাদুর সম্রান্ত কায়স্থ-কুলোদ্ভব ও ইদীলপুরের সুপ্রসিদ্ধ কুলজ্ঞ শ্রেষ্ঠ কমলনারায়ণ রায় চৌধুরীর বংশধর। ইঁহারা ঘোষ বংশ ও রায় চৌধুরী উপাধিযুক্ত। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদীলপুর দাসের জঙ্গল ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস ছিল। চার পাঁচ পুরুষ হইল তথা হইতে বজ্র-যোগিনী গ্রামে আগমন করিয়া বর্ত্তমান আবাস সংস্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের বর্ত্তমান বজ্রযোগিনীর বাড়ী 'রায়ের বাড়ী' বলিয়া খ্যাত। মকরন্দ ঘোষ হইতে রায় বাহাদুর ছাব্বিশের পর্য্যায় ও কমলনারায়ণ চৌধুরী হইতে মাত্র ১১ পুরুষ ব্যবধান।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা।

রায় বাহাদুর পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে পিতার কার্য্যস্থল ময়মনসিংহ নগরে আগমন করেন ও প্রথমতঃ ময়মনসিংহের হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয়ে

শিক্ষালাভ করেন। পরে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৫ সনে ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউসন হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া কলেজের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় গমন করেন ও তথা হইতে এল্, এ; বি, এ পাশ করিয়া ১৮৯৭ সনে রিপন কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়ন সমাপন করেন। কলেজে অধ্যয়ন সময়ে ১৮৯১ সনে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং নানা সাংসারিক ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হওয়া সত্বেও তিনি অধ্যবসায়গুণে তৎসমুদয় অতিক্রম করতঃ পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন।

ওকালতি ব্যবসায়।

ওকালতি পাশ করিয়া তিনি পিতার কর্ম্মস্থানে ময়মনসিংহ সহরে জজ কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ে তিনি পিতার আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেওয়ানী-সংক্রান্ত মোকদ্দমাদিতে ব্যবসায়ের সীমা নিবদ্ধ রাখিয়া অল্প দিনেই তাহাতে পসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হন ও ফৌজদারী আদালতে ব্যবসা করিতে বিরত থাকেন। পিতার ন্যায় ওকালতি ব্যবসায়ে তেমন প্রতিপত্তি লাভ না করিলেও তাঁহার সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা সর্ব্বত্র বিদিত। অর্থোপায়ের জন্য তিনি ব্যবসায়ে কখনও নীচতা অবলম্বন করেন নাই। ন্যায়বান পিতার উপযুক্ত পুত্ররূপে তিনি পিতার সুনাম ও ব্যবসায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কর্ম্মজীবন।

ওকালতি আরম্ভ করিবার ২।৩ বৎসর পরেই রায় বাহাদুর স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। বংশানুক্রমিক মিউনিসিপ্যাল কার্য্যকলাপে অনুরাগই তাহার প্রধান কারণ এবং এই

জন্যই তিনি প্রথম জীবনে ব্যবসায়ে বহু ক্ষতি স্বীকার, শারীরিক পরিশ্রম ও স্বাস্থ্যহ্রাস ও জনসাধারণের কার্য্যে তিনি বহু সময় ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি ১৮৯৯ সনে প্রথম মিউনিসিপাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হন এবং ২২ বৎসর যাবত তিনি তৎপদে অবস্থিত ছিলেন।

১৯০৩ সনে তিনি প্রথমতঃ ভাইস চেঁয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন ও ক্রমান্বয়ে দুইবার ঐ পদে নির্ব্বাচিত হইয়া দক্ষতার সহিত ৬ বৎসর কাল উক্ত কাজ পরিচালনা করার পর ১৯০৯ সনে তিনি ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান পদে নির্ব্বাচিত হন এবং ৩ বৎসর অতিশয় দক্ষতার সহিত কার্য্য করার পর ১৯১২ সনে পুনরায় দ্বিতীয় বার উক্ত চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে ৬।৭ বৎসর কাল উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অতি দক্ষতা ও প্রতিপত্তির সহিত মিউনি-সিপালিটীর শাসনকার্য্যভার পরিচালনা করিয়া ১৯১৫ সনে চেয়ারম্যান পদ ত্যাগ করেন। মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে রায় বাহাদুরের বিচক্ষণতা, একাগ্রতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং উৰ্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারিগণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। জনসাধারণও একবাক্যে তাঁহার সুশাসন ও কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করিয়া থাকেন।

মিউনিসিপাল কার্য্যে সুনাম ও দক্ষতা হেতু ১৯১১ সনে দিল্লীর রাজদরবারে চেয়ারম্যানস্বরূপ রায় বাহাদুর নিমন্ত্রিত হন এবং রাজকীয় অতিথিস্বরূপ রাজব্যয়ে তিনি দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ সম্মান রায় বাহাদুর ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের আর একটী মিউনিসি-প্যালিটীর চেয়ারম্যানকে মাত্র প্রদর্শন করা হইয়াছিল। ঐ সময় তিনি দিল্লী দরবার "মেডেল" প্রাপ্ত হন ও মিউনিসিপালিটীর কার্য্যদক্ষতার জন্য বিশেষ ময়মনসিংহের জলের কলের উন্নতি-সাধনের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাকে এক 'সার্টিফিকেট অব অনার' প্রদান করেন।

মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান থাকা সময়ে তিনি নগরের উন্নতিকল্পে ১৯১১—১২ সালে ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে জলের কলের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ১৯১৪—১৫ সনে তিনি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে ৯০ হাজার টাকা ইষ্টিমিটে সহরের একটী ড্রেনেইজ স্কীম্ (পয়ঃপ্রণালী-সংস্কার প্রস্তাব) ও জলের কলের আয় বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য ৯৭ হাজার টাকা ইষ্টিমিটে এক ওয়াটার ওয়ার্কস ইম্প্রুভমেণ্ট স্কীম্ প্রস্তুত করিয়া যান; প্রায় ৬ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া মিউনিসিপালিটীর যে সুন্দর আফিস বিল্ডিং প্রস্তুত হইয়াছে তাহা রায় বাহাদুরের নিজ অশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের ফল।

মিউনিসিপাল কার্য্যে তাঁহার বহুদর্শিতা, একাগ্রতা, স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ মাননীয় ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯১৬ সনে জুন মাসে সম্রাটের জন্মদিন উৎসবে তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানগণ মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এইরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর পক্ষেও ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

মিউনিসিপালিটীর কার্য্য ব্যতীত তিনি ময়মনসিংহের অন্যান্য বহু জন-হিতকর কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

(ক) মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর অভ্যর্থনা কমিটীর সম্পাদক।

(খ) ১৯১০ সনে ময়মনসিংহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সম্পাদক।

(গ) সাউথ আফ্রিকার সাহায্য সমিতির কোষাধ্যক্ষ।

(ঘ) সূর্য্যকান্ত মেমোরিয়েল কমিটীর সম্পাদক।

(ঙ) ময়মনসিংহে করোনেশন দরবার উৎসব কমিটীর সম্পাদক

(চ) ইম্পিরিয়েল ভারতযুদ্ধ সাহায্য-ভাণ্ডারের সম্পাদক।

(ছ) আনন্দমোহন কলেজ কাউন্সিলার।

(জ) কাশীকিশোর টেকনিকেল স্কুল কমিটীর মেম্বর।

(ঝ) ময়মনসিংহ হাঁসপাতাল ম্যানেজিং কমিটীর সভ্য এবং বর্ত্তমান নূতন হাঁসপাতাল স্কীমের একজন আদি প্রস্তাবক ও উদ্যোক্তা।

(ঞ) ডিষ্ট্রিক্ট শাসনবিভাগ সম্বন্ধে যে কমিশন আইসে তৎসমীপে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

(ট) বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার সম্বন্ধে যে কমিশন আইসে তাহার নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেন।

(ঠ) ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব সারস্বত সমিতির একজন সভ্য।

(ড) বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলের ময়মনসিংহ পরিদর্শন সময়ে ১৯১২ সালে যে অভ্যর্থনা কমিটি হয় তাহার সম্পাদক।

মিউনিসিপাল কার্য্যকলাপে তাঁহার বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা অপরিসীম। তিনি ময়মনসিংহের ড্রেনেইজ স্কীম্ ও ওয়াটার সাপ্লাই বিষয়ে দুইখানি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় যথেষ্ট রহিয়াছে। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষা লাভ না করিলেও এই সকল টেক্‌নিকেল বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা কম নহে। জলের কলের কলকারখানা ও যন্ত্রাদি সম্বন্ধে তিনি এরূপ সুচারুরূপে অভিজ্ঞ যে, মফঃস্বল মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানগণ মধ্যে এইরূপ লোক কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। পাবলিক ওয়ার্কস্ সম্বন্ধেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

তিনি ২১ বৎসর কাল যথেষ্ট পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া মিউনিসিপালিটীর জন্য আন্তরিকতা ও বিবেকানুযায়ী কর্ত্তব্য

সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা বঙ্গীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে কম গৌরবের বিষয় নহে।

রায় বাহাদুরের সময়ে নানারূপে ও নানাভাবে সহরে উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে। কৃতবিদ্য ও খ্যাতনামা বেসরকারী মফঃস্বল মিউনিসিপাল চেয়ারম্যানগণ মধ্যে রায় বাহাদুর নিশিকান্ত ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য।

পারিবারিক সংবাদ।

রায় বাহাদুর এল, এ পাশ করিয়া ১২১৩ সনে বিক্রমপুর, মালখা-নগরনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কুলীন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বসু ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্তা শ্রীমতী সুরমা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী সাহিত্য-জগতে অপরিচিতা নহেন। স্ত্রী-কবিদিগের মধ্যে তিনি উচ্চাসন পাইবার উপযুক্তা। 'সঙ্গিনী' ও 'রঙ্গিনী' নামীয় তাঁহার দুইখানা শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ আছে। ইনি একজন সমাজ সংস্কারক এবং বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী। সম্প্রতি ইনি তাঁহার বিধবা কন্যার সহিত ভূতপূর্ব্ব বিভাগীয় কমিশনার মিঃ বিঃ দের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার মিঃ এচ্, কে, দের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন।

বংশ-তালিকা।

১৬। কমলনারায়ণ রায় চৌধুরী

|

১৭। রঘুনাথ রায় চৌধুরী (সাং পাতলা)

|

১৮। রমাবল্লভ রায়।

১৮। রমার্দ্ধকান্ত রায়।

|

১৯। কৃষ্ণচরণ রায়।

|

২০। কৃষ্ণদেব রায় ·

ওরফে রমানাথ রায়

|

২১। জনার্দ্দন রায়

|

২২। সাতুরাম রায় (আগত বজ্রযোগিনী)

|

২৩। ভগবান চন্দ্র রায়।

|

২৪। কৃষ্ণকান্ত রায়

|

২৫। চন্দ্রকান্ত রায়

|

২৬। শ্রীনিশিকান্ত রায়।

শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ মিত্র।

পূর্ব্ব পরিচয়—মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তাঁহাদের সহিত পাঁচজন কায়স্থও আগমন করেন। ৺কালি দাস মিত্র এই পাঁচজন আগত কায়স্থগণের অন্যতম। ইঁহারা টে কা সমাজভুক্ত। ইঁহার উর্দ্ধতম দ্বাবিংশতি পুরুষ ৺গৌর মোহন মিত্র হুগলী জেলার অন্তর্গত বেজড়া গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতার আহিরীটোলায় বাস করিতে থাকেন। ইনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড লাট লর্ড মিণ্টোর দেওয়ান ছিলেন। ইঁহাকে আহিরীটোলার মিত্র বংশাবলীর আদিপুরুষ বলা হয়। ইঁহার তিন পুত্র, জেষ্ঠ ৺চণ্ডী চরণ মিত্র, মধ্যম রামধন মিত্র, তৃতীয় ৺গঙ্গা নারায়ণ মিত্র। রামধন মিত্র মহাশয় দোরহাটা রেশমের কুঠীর দেওয়ান ছিলেন এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সমস্ত রাস্তাদি প্রস্তুতের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। আদিম কলিকাতার সমস্ত রাস্তা তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ৺রামধনের ছয় পুত্র ছিল—প্রথম মিউনিসিপালিটীর কণ্ট্রাক্টর ৺রাধা নাথ মিত্র, দ্বিতীয় ৺রাধা মাধব মিত্র, ইনিও মিউনিসিপালিটির কণ্ট্রাক্টর ছিলেন, তৃতীয় ৺রাজেন্দ্র নাথ মিত্র, ইনি হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। রাজেন্দ্র নাথ মাত্র ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কালগ্রাসে পতিত হন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত রাজেন্দ্র নাথের পরম বন্ধুত্ব ছিল। চতুর্থ ৺মহেন্দ্র নাথ মিত্র এবং পঞ্চম যদুনাথ মিত্র উভয়ে কণ্ট্রাক্টর ছিলেন, যদুনাথের পুত্র ভূত নাথ মিত্র সন ১৩১৪ সালে আহিরীটোলা বাটীতে সঙ্গীত মিত্রালয় স্থাপন করেন এবং পুরীতে সঙ্গীত আলোচনার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় ও উৎসাহ প্রদান করেন। তৃতীয় রাজেন্দ্র নাথের পুত্র ক্ষীরোদ গোপাল মিত্র স্বোপার্জ্জন দ্বারা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছেন। ইংরেজ ও জর্ম্মণ রণতরী সমূহের ইনি একমাত্র কলিকাতার

শ্রীযুত ক্ষীরোদগোপাল মিত্র

শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ মিত্র

এজেণ্ট। ইনি সালিখায় নিজ বাটীতে পিতৃ স্মৃতি স্মরণার্থ রাজেন্দ্রেশ্বর শিব স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ দেশবিখ্যাত শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণ মিত্র। ইনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ ৺কালী কৃষ্ণ মিত্র। কালীকৃষ্ণ অকালে ৩০ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ মিত্র—কুমার কৃষ্ণ বাবু স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়গুণে সমাজে মাননীয় ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছেন। ইনি দেশ জননীর একজন অকৃত্রিম সেবক। ভারতের লুপ্ত গৌরব আয়ুর্ব্বেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা মানসে ইনি অকাতরে বহু অর্থব্যয়ে "আয়ুর্ব্বেদ বিস্তার সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "গণেশ ক্লথ মিল" স্থাপনও ইঁহার একটি দেশ বাৎসল্যের পরিচয়। কলিকাতায় স্বদেশী মেলা স্থাপনেরও ইনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। সততা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও উদ্যোগীতার জন্য কুমার কৃষ্ণ বাবু সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইনি নিজের অধ্যবসায় গুণে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। দরিদ্রকে দান করিতে ইনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। অনেক দরিদ্র ছাত্র ইঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। ইঁহার উপার্জ্জিত অধিকাংশ অর্থই দুঃস্থ, অসহায়ের সাহায্যকল্পে ব্যয়িত হয়। ইনি অতি সামাজিক। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। কুমার বাবু সেই বিবাহ উপলক্ষে ১০,০০০সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া শ্যামবাজারে Widows Home প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধবা স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার ও আহার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। Widows Home সুচারুরূপে চলিবার জন্য উহার তত্ত্বাবধানের ভার District Charitable Societyর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। অভ্রের ব্যবসায়ে ইনিই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কুমার বাবু টালিগঞ্জের নিকট Regent park নামক নূতন সহর প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

শ্রীযুত দুর্গা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী ও অরডিগ্ নাম কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার শ্রীযুত দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল মহোদয়ের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রামশরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকা জেলার বিক্রমপুর হইতে বর্দ্ধমান জেলার জোগ্রাম নামক গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রাম নিধি বন্দোপাধ্যায় জোগ্রাম হইতে হুগলীর অন্তর্গত গুরোপ গ্রামে বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। তিনি গুরোপে শ্রীশ্রী৺কালী মাতার একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রপিতামহ ৺কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায় গুরোপেই বাস করিতেন। পণ্ডিত বলিয়া তৎকালিক সমাজে রামনিধি ও কৃষ্ণ মোহনের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। পিতামহ কালীকুমার হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল গ্রামের নিকটবর্ত্তী দলপতিপুর নামক গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তদনন্তর কালী কুমার বাবু ও তদীয় ভ্রাতা বিশ্বেশ্বর কলিকাতা কুমারটুলীতে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। দুর্গা চরণ বাবুর পিতা ৺রাম নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় রেলওয়ে পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টে মিলিটারী একাউণ্ট্স্ অফিসে কর্ম্ম করিতেন এবং শেষে তিনি অর ডিগ্ নাম কোম্পনীর ম্যানেজিং এসিস্ট্যাণ্ট্ নিযুক্ত হন। তিনি ১৩২৬ সালের ৪ঠা শ্রাবণ স্বর্গারোহণ করেন।

দুর্গাচরণ বাবু ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারী হইতে প্রবেশিকা, ডফ্ কলেজ হইতে এফ্ এ, বি এ ও এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি এ ও এম্ এ পরীক্ষায় তিনি
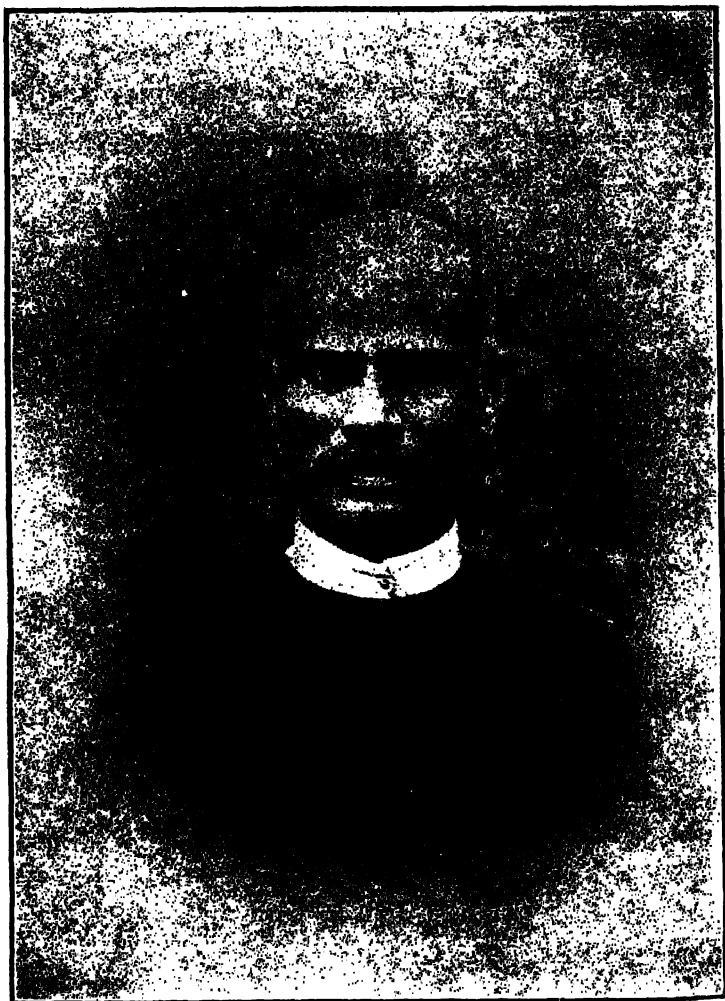
স্বর্গীয় রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্ব্বোক্ত অর ডিগ্‌নাম কোম্পানীর অফিসে আর্টিকেল ক্লার্ক রূপে প্রবিষ্ট হন। তথা হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এটর্ণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের এটর্ণী শ্রেণীভুক্ত হন। আজও পর্য্যন্ত তিনি উক্ত অর ডিগনাম কোম্পানীর অফিসেই এটর্ণীর কার্য্য করিতেছেন। তিনি উক্ত কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার। ইহার পূর্ব্বে কোন দেশীয় লোক কোন বিলাতী এটর্ণী অফিসের অংশীদার হন নাই। ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে দুর্গাচরণ বাবু মিউনিসিপাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হন। তিনি কানাইলাল ধর বালিকা বিদ্যালয়, কম্বুলিটোলা ইন্‌ষ্টিটিউট্‌, ইউনাইটেড্‌ রিডিং রুম প্রভৃতির সহকারী সভাপতি। তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর। তিনি বড়বানী কোল কোম্পানী, নর্থ পরেশ কোল কোম্পানী, চণ্ডীলাল ফ্যাক্টরী, ছোটনাগপুর গালা ফ্যাক্টরী, মতিধর টী কোম্পানী প্রভৃতির ডিরেক্টর। তিনি নানা সভা সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি রেজিষ্ট্রেশন আইন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি একজন সাহিত্যসেবী, অনেক মাসিক পত্রে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ রাজা ৺জ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ কন্যার সহিত হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্‌ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে।

নিম্নে তাঁহার বংশতালিকা প্রদত্ত হইল—

রাজবল্লভ,

|

রামশরণ
রামনিধি
কৃষ্ণমোহন
কালীকুমার
বিশ্বেশ্বর
রামনারায়ণ
শিবনারায়ণ
দেবনারায়ণ
দুর্গাচরণ
জগদ্ধাত্রী কুমার
শচীন্দ্র কুমার
শিশু
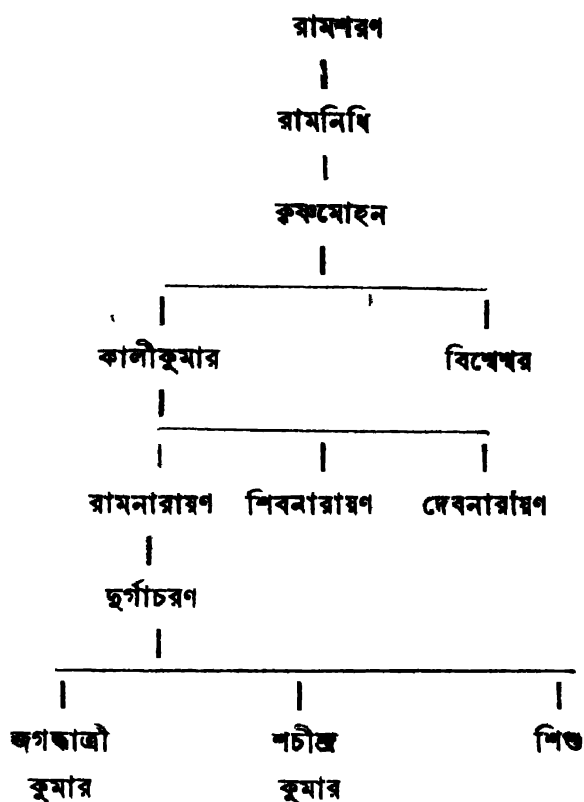
শ্রীযুত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গীয় রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর।

স্বর্গীয় রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর।

রায় বাহাদুর স্বর্গীয় শ্রীনাথ পাল বি-এ মহাশয় বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে যে বৎসর সিপাহী বিদ্রোহ হয়, সেই বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রধানতঃ কলিকাতা সহরেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এল পরীক্ষাও তিনি এই কলেজ হইতে দিয়াছিলেন এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেই তিনি বহরমপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিন চারি বৎসর ওকালতি করিবার পর তিনি কাশিমবাজারের স্বনামপ্রসিদ্ধা মহারাণী স্বর্ণময়ী সি-আই মহোদয়ার বিশাল জমিদারীর পরিচালক-সংঘের সদস্য নিযুক্ত হন। পুণ্যবতী মহারাণী পাল মহাশয়ের মাতৃস্বসা ছিলেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইনি মূর্ত্তিমতী করুণারূপিণী ছিলেন। ইনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। ইঁহার নিকট হইতে প্রার্থী বিমুখ হইয়া ফিরিত না। বাঙ্গালা দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতা ইঁহার নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করিত। এক কথায় বলিতে গেলে ইনি প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী রমণী ছিলেন। শাস্ত্রোচিত ক্রিয়া-কাণ্ড ও সদনুষ্ঠান ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

কিছুদিন পরে মহারাণী রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরকে স্বীয় এষ্টেটের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। ইনি ছয় বৎসরকাল বহরমপুর

মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ইনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং একাকী বিচার করিবার ক্ষমতা ইঁহার ছিল।

কাশিমবাজার রাজষ্টেটের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করায় এবং জনহিতকর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দানে সম্মানিত করেন।

প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় বহরমপুরে জলের কল স্থাপিত হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মহারাণী স্বর্ণময়ী পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইনি কাশিমবাজার রাজষ্টেটের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। তাহার পর হইতে ইনি কলিকাতায় বসবাস করিতে থাকেন।

বাঙ্গালার কয়েকটী প্রধান জেলায় ইঁহার জমিদারী আছে। ইনি কয়েকটী কয়লা ও অভ্রের খনির স্বত্বাধিকারী। ইঁহার মাল আমদানি রপ্তানির ব্যবসায় আছে। ইনি প্রসিদ্ধ মেসার্স ওয়াই আরটিন কোম্পানীর মালিক ছিলেন। ইনি প্রতিবৎসরই জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ দান করিতেন। কলিকাতায় একটী বৃহৎ বীমা কোম্পানীর ইনি ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার্স অফ কমার্সের অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পাল সাত্ত্বিক প্রকৃতি ছিলেন; এজন্য তাঁহার দানও সাত্ত্বিক ছিল। তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দান করিতেন। ব্যবসায়-কর্ম্মে ইঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল এবং ব্যবসায়ের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতেও ইনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ইঁহার স্বভাব নির্ম্মল ছিল। ইনি বিনয়ী ও শিষ্টাচারসম্পন্ন ছিলেন। ইনি পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া পদগৌরব ইঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ইনি সকল শ্রেণীর লোকের সহিতই দেখাশুনা করিতেন। ইঁহার

শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ পাল

দ্বার সকলের জন্য অবারিত ছিল। ইনি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সাহায্যকারী ও পরমোপকারক ছিলেন।

রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর গৌরচরণ নন্দীর পৌত্রীকে বিবাহ করেন। গৌরচরণ নন্দী, কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের পিতৃব্য-পুত্র ছিলেন। রাজা কৃষ্ণনাথ মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের মাতুল।

রায় বাহাদুরের দৌহিত্রীর সহিত রাণাঘাটের জমীদার শ্রীযুত সরোজনাথ পাল চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে।

রায় বাহাদুরের এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ পাল। ইনি ১৩০২ সালের ১৬ই কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অনারেবল মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের জামাতা। সত্যেন্দ্র এক্ষণে জমিদারী ও ব্যবসায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর সকল শ্রেণীর লোকেরই প্রিয় ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি লোকান্তর গমন করেন।

রায় বাহাদুর শ্রীনাথ পাল যে বংশ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন সেই বংশের আদিপুরুষ জগন্নাথ পাল। ইনি বর্দ্ধমান জেলার পালিস গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহার পৌত্র রামধন পাল বিস্তৃত ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া ঐ জেলারই ভাটাকুল গ্রামে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। ইনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর কনিষ্ঠা ভগিনী মধুসুন্দরীকে বিবাহ করেন। ইঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম ভোলানাথ ও শ্রীনাথ।

বংশ-তালিকা।

জগন্নাথ পাল
হরিনাথ পাল
রামধন পাল
মোক্ষদাসুন্দরী
ভোলানাথ
শ্রীনাথ
ক্ষেত্রনাথ
সুরমা
সরোজিনী
সত্যেন্দ্রনাথ
শৈবলিনী
সুধীন্দ্রকুমার
অশোককুমার
দেবযানী
অরবিন্দ
কমলা
বীণাপাণি

শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ পাল

(শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ পালের পুত্র)

শ্রীযুত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ।

ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার লেপ্টেনান্ট কে, সি, নাগ এম-বি-ই ; বি-এ মহাশয়ের সম্পূর্ণ নাম শ্রীযুত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ। ইহার পিতার নাম বাবু পূর্ণচন্দ্র নাগ। ইনি অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর। ইনি যে সময়ে চট্রগ্রামে পটিয়া সহরে কার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে খগেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয়। কটকের রাভেন্‌সা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ইনি প্রথমে শিক্ষালাভ করেন। পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্‌সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লণ্ডনের লিনকন্‌স ইনে ব্যারিষ্টারী শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হন ও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-শ্রেণীভুক্ত হন। ইহার পর তিনি ময়মনসিংহে ব্যারিষ্টারী করিতে থাকেন। গত ১০ বৎসরকাল ইনি ময়মনসিংহে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন। ফৌজদারী মামলা পরিচালনায় ইঁহার খুব সুনাম হইয়াছে। ইঁহাকে এক্ষণে ময়মনসিংহের ব্যবহারাজীব সমাজের অন্যতম অগ্রণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি দেশহিতকর সকল প্রকার আন্দোলনে যোগ দিয়া থাকেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইনি ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান-পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন্ জজ পদে নিয়োজিত হইয়াছেন।

বিগত ইউরোপীয় মহাসমর সংঘটিত হইলে যখন 'বাঙ্গালী পল্টন' গঠিত হয় সেই সময়ে বাঙ্গালী পল্টনে সেনা সংগ্রহের জন্য ইনি আত্ম-নিয়োগ করেন। এই কর্ম্মে তিনি মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর এই কুরুক্ষেত্রে বাঙ্গালার শিক্ষিত যুবকদল সাম্রাজ্য ও দেশরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়া আপনাদের ললাট হইতে ভীরুতার কলঙ্ক অপনোদন করিতে চেষ্টিত হন। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে বাঙ্গালীকে সৈনিক করিতেন না। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের সময়ে তাহাদিগকে সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইবার সুযোগ ও অধিকার প্রদান করেন। গবর্ণমেণ্টের এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার পর বহু স্বদেশপ্রাণ কর্ম্মী বাঙ্গালী সৈনিক-বাহিনী-গঠনে প্রবৃত্ত হন। এই সৈনিক-সংগ্রহ-ব্যাপারে গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্যারিষ্টার খগেন্দ্রচন্দ্র অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহাকে আর্থিক ক্ষতিও যথেষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিলেও দেশবাসীর ও গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মে প্রীত হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভারতীয় স্থল-সৈনিক-বাহিনীর অনারারী সেকেণ্ড লেপ্টেনাণ্ট করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এম-বি-ই উপাধিতে ভূষিত হন এবং স-কৌন্সিল গবর্ণর বাহাদুর তাঁহাকে একখানি 'সার্টিফিকেট অফ্ অনার' বা সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। ব্যারিষ্টার খগেন্দ্রচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয় সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ময়মনসিংহ জেলা হইতেই বাঙ্গালী পল্টনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সৈনিক সংগৃহীত হইয়াছিল।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে খগেন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ হয়। তিনি পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী পরলোকগত রায় বাহাদুর

শ্রীযুত খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম-বি-ই

অ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট জজ, আলিপুর।

মোহিনীমোহন বৰ্দ্ধনের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। রায় বাহাদুর মোহিনীমোহন বৰ্দ্ধনের নাম এখনও পৰ্য্যন্ত পূৰ্ব্ববঙ্গের লোকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন।

খগেন্দ্রচন্দ্র ঢাকা জেলার বারদী গ্রামের প্রসিদ্ধ নাগ-বংশ-সম্ভুত। বারদীর নাগেরা বিখ্যাত জমিদার; ঢাকা এবং ত্রিপুরা জেলায় তাঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী আছে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম নয়ানন্দ নাগ। প্রায় দুই শতাব্দী হইল, ইনি বরিশাল্ জেলার কোরাপুর গ্রাম হইতে আসিয়া এখানে বসবাস স্থাপন করেন। নাগ-বংশের এষ্টেট ও ত্রিপুরা জেলার একটী পরগণা ইঁহারই নামানুসারে নয়াবাস এষ্টেট ও নয়াবাদ পরগণা নামে অভিহিত হইয়াছে।

বারদীর নাগ-বংশীয়গণ সুশিক্ষা ও উচ্চপদের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছেন। এই বংশের বাবু রোহিনীকান্ত নাগ বাঙ্গালীর মধ্যে সৰ্ব্বপ্রথম চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য্য শিক্ষা করিবার জন্য ইটালী দেশে গমন করিয়াছিলেন। ইনি চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য্যের পরীক্ষায় ইটালীর রাজধানী রোমনগরীতে সৰ্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং ইটালীর গবর্ণমেণ্ট এজন্য তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইঁহার অঙ্কিত কয়েকটী চিত্র বারদীতে এবং কলিকাতার ঠাকুর বাড়ীতে রক্ষিত আছে। ইটালী হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রায় দুই সপ্তাহ পরে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

এই বংশের বাবু শঙ্করচন্দ্র নাগ পূৰ্ব্ববঙ্গবাসীদিগের মধ্যে সৰ্ব্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি সবজজ ছিলেন।

খগেন্দ্রচন্দ্রের কনিষ্ঠ পিতৃব্য বাবু শ্যামাকান্ত নাগ এম-এ, বি-এল মহাশয় বিখ্যাত সবজজ ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণের পূৰ্ব্বে পাবনায় ছিলেন।

খগেন্দ্রচন্দ্রের পিতামহের অন্য ভ্রাতা বাবু শিবচন্দ্র নাগ, বি-এল মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

রায় বাহাদুর রেবতীকান্ত নাগ বি-এল মহাশয় খগেন্দ্রচন্দ্রের অন্যতম পিতৃব্য। ইনিও সবজজ ছিলেন।

প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী নাগ মহাশয় খগেন্দ্রচন্দ্রের আর এক পিতৃব্য। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক।

বারদী নাগবংশের অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের নাম :—

(১) অধ্যাপক শ্রীযুত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্-এ; ইনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-মন্দিরের ডাইরেক্টর।

(২) শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, ইনি ম্যাঞ্চেষ্টারের বি-এস্-সি উপাধিধারী; এক্ষণে জেমসেদপুরে টাটার লৌহকারখানায় উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন।

(৩) অধ্যাপক শ্রীযুত জে সি নাগ; ইনি কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস-সি উপাধিধারী; এক্ষণে প্রেসিডেন্‌সি কলেজে অধ্যাপনা করেন।

(৪) অধ্যাপক এন কে নাগ; ইনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। ইনি বি-এ (ক্যাণ্টব) উপাধিধারী।

(৫) শ্রীযুত এন কে নাগ এবং (৬) শ্রীযুত নির্ম্মলকান্ত নাগ ব্যারিষ্টার।

(৭) ডাক্তার এস কে নাগ, এম-ডি (চিকাগো) কলিকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

শ্রীযুত বেচারাম লাহিড়ী।

নদীয়া-কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত বেচারাম লাহিড়ী মহাশয়ের নাম একরূপ সর্ব্বজনপরিচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি বাঙ্গালা ১২৮২ সালের ৯ই বৈশাখ শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা পরলোকগত রামময় লাহিড়ী মহাশয় জমিদার ছিলেন; বর্ত্তমানে এখনও ইঁহাদের জমিদারী আছে।

লাহিড়ী পরিবার যে অতীব প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ শান্তিপুরের বহুমানাস্পদ গোস্বামী-বংশ লাহিড়ী-পরিবারের কোনও পূর্ব্বপুরুষকে কন্যা দান করেন। অতঃপর লাহিড়ী-গণ শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। সে আজ প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বকার কথা।

লাহিড়ীবংশের শেষ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন—স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়। ইনি শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, সাধুতা ও ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থ অর্জ্জন করেন এবং ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া জমিদার হন। ইনি শান্তিপুর ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন। শান্তিপুরের খ্যাতনামা জমিদার স্বর্গীয় মতিলাল রায় মহাশয় ইঁহার নিকট হইতে টাকা ধার করিতেন এবং অন্যান্য সাহায্যও লইতেন। ইনি অতি প্রাচীন বয়সে পুত্র-পৌত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইঁহার বাটীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত এবং ইঁহার সুন্দর পূজার দালান নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতবৃন্দে পরিপূর্ণ থাকিত।

ইঁহার প্রপৌত্র স্বর্গীয় বাবু রামরাজা লাহিড়ী কুসীদব্যবসায় দ্বারা

যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিল না; মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী, একটী বিধবা কন্যা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত বেচারাম লাহিড়ী প্রভৃতিকে রাখিয়া যান।

ইঁহার বিধবা পত্নী ও বিধবা কন্যা শ্রীযুত বেচারাম লাহিড়ী মহাশয়ের সাহায্যে ১২ হাজার টাকা কৃষ্ণনগরের দরবারের সময়ে বাঙ্গালার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেলের হস্তে প্রদান করেন এবং এই টাকায় শান্তিপুর হাঁসপাতালে যাহাতে একটী ফিমেল ওয়ার্ড বা মেয়ে রোগীদের চিকিৎসা বিভাগ স্থাপিত হয়, তদ্রূপ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই টাকা এখনও পর্য্যন্ত শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের হস্তে রহিয়াছে। বিধবা কন্যা নিজ নামে শান্তিপুরে "দুর্গামণি পাঠশালা" নামক একটী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং বিধবা পত্নী একটী সুন্দর ইমারত শান্তিপুরে ধর্ম্মশালা স্থাপনের জন্য দান করিয়াছেন। শান্তিপুরে ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মশালা একটীও ছিল না; ইনি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া শান্তিপুরের সে কলঙ্ক বিদূরিত করিয়াছেন। এই ধর্ম্মশালার নাম হইয়াছে—"রামরাজা ধর্ম্মশালা।" শান্তিপুরবাসীগণের উপকারার্থে এই দুই মহিলা দুইটী কূপও খনন করাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুত বেচারাম লাহিড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগরের উকীল সমাজের সুপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। ইনি কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর ব্রাহ্মণ-সভার অন্যতম প্রধান সদস্য। ইনি শান্তিপুর 'বন্ধু-সভা'র অধিনায়ক। এই সভা দরিদ্র-নারায়ণ-সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত এবং শান্তিপুরে ইহা সুষ্ঠুভাবেই কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। ইনি নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট এসোসিয়েসন ও কৃষ্ণনগরকরদাতৃ-সভার সম্পাদক। ইনি এইরূপ বিবিধ সদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া দেশের নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনীতিক কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

বেচারামবাবু নদীয়া জেলার স্বর্গীয় কৃষ্ণগোপাল সান্ন্যাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণগোপালবাবু যুক্তপ্রদেশের মৈনপুরী জেলা আদালতের প্রধান উকীল ছিলেন। তিনি সেখানে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

বেচারামবাবুর দ্বিতীয়া কন্যার সহিত রাজসাহীর জমিদার জন-নায়ক শ্রীযুত কিশোরীমোহন চৌধুরীর তৃতীয় পুত্রের বিবাহ হইয়াছে।

বেচারামবাবুর ভ্রাতা শ্রীযুত কেনারাম লাহিড়ী কলিকাতায় পাটের দালালী করেন এবং এই ব্যবসায়ে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

বেচারাম ও কেনারামবাবুর পুত্রগণ এক্ষণে পড়াশুনা করিতেছে।

বংশ-তালিকা।

- রামতনু লাহিড়ী (শান্তিপুরের জমিদার)
  - রামনন্দন লাহিড়ী
    - রামময় লাহিড়ী
      - বেচারাম লাহিড়ী
      - কেনারাম লাহিড়ী
    - রামরাজা লাহিড়ী
    - রামহৃদয় লাহিড়ী

শ্রীরামপুরের দে বংশ।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার সন্নিহিত দমদমার নিকটবর্ত্তী গাঁতী নামক গ্রামে এই বংশের আদিম বাসস্থান ছিল, পরে ইঁহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সহর শ্রীরামপুরের সংলগ্ন রিষিড়া গ্রামে বাস করেন। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই বংশের জনৈক পূর্ব্ব-পুরুষ রামভদ্র দে মহাশয় ব্যবসায় উপলক্ষে শ্রীরামপুরে উঠিয়া আসেন, তদবধি তাঁহার বংশধরগণ শ্রীরামপুরেই বাস করিয়া আসিতেছেন।

ইঁহারা জাতিতে "তিলী" শ্রেণী ও পর্য্যায় "দ্বাদশ ও মহেষ বিষয়।"

উক্ত রামভদ্র দে মহাশয়ের একখানি মুদীর দোকান ছিল, পরে তাঁহার পুত্র ৺সাফলীরাম দে মহাশয় তুলার ব্যবসাও করিয়াছিলেন এবং ব্যবসার ক্রমোন্নতি হিসাবে তৎকালীন শ্রীরামপুরের ডিনেমার কোম্পানীর আনীত নানারূপ পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ও কিছু কিছু করিতেন। ৺সাফলীরামের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বনামধন্য ৺রামচন্দ্র দে মহাশয় পিতার সামান্য ব্যবসায়ে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা সুদূর পরাহত ভাবিয়া পিতাকে কিছু না বলিয়া কোনরূপ উচ্চশ্রেণীর ব্যবসার দ্বারা স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হন এবং অল্প বয়সেই কলিকাতার হাটখোলাস্থিত কোন আত্মীয়ের লবণের ব্যবসায়ে শিক্ষানবীসরূপে প্রবেশ করেন। যুবক রামচন্দ্র অল্পকাল মধ্যেই নিজ কার্য্যদক্ষতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায় বুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় প্রদানে উক্ত আত্মীয়ের সন্তোষ সাধন করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে উক্ত হাটখোলায় যে সমস্ত ধনী মহাজন ব্যবসার জন্য বাস করিতেন তাঁহাদের সকলেরই মনোযোগ

আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই তরুণ যুবকের অসাধারণ ব্যবসায়বুদ্ধি ও ধর্ম্মভীরুতা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ক্রমশঃ সেই সমস্ত ধনী মহাজনবর্গের উৎসাহে রামচন্দ্র উক্ত হাটখোলা মোকামেই নিজনামে পৃথকভাবে এক লবণের কারবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এই উপলক্ষে রাণাঘাটনিবাসী সুবিখ্যাত পাল চৌধুরী মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য, কারণ তাঁহাদের তৎকালীন পূর্ব্ব পুরুষ রামচন্দ্রকে নানারূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতির সহিত রামচন্দ্রের কারবার শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে মুর্শিদাবাদ, ভগবানগোলা, কালনা-কাটোয়া, ভদ্রেশ্বর, গৌরহাটী, মেদিনীপুর, ঘাটাল ও আমতা প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র উক্তরূপ ব্যবসার উন্নতির সময়েই কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে কতকগুলি ভূমি সম্পত্তিও খরিদ করিয়াছিলেন, এবং শ্রীরামপুরে পৈতৃক বাস্তুভিটার পরিসর বৃদ্ধি ও উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণেও সেই বাস্তুভিটাতেই বসবাস করিতেছেন। ইহার পরিমাণ প্রায় ৫০/০ বিঘা জমি এবং তাহার মধ্যে বাটী বাগান ব্যতীত ৭।৮টী সুবৃহৎ পুষ্করিণী এখনও আছে।

রামচন্দ্র কেবলমাত্র অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। অপিচ অর্থের সদ্ব্যয়কল্পে হিন্দুর "বার মাসে তের পর্ব্ব" এই প্রচলিত কথার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার বংশধরগণের অর্থ রাজদত্ত উপাধি বা প্রশংসা অর্জ্জনে ততদূর ব্যয়িত না হইলেও ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং দূর ও নিকটবর্ত্তী আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে ও জাতিনির্ব্বিশেষে প্রতিবেশীবর্গের অভাব মোচনে চিরকালই ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে।

রামচন্দ্রের দুই সহোদর ভ্রাতা ও তিন ভগিনী ছিলেন। তাঁহার নিজ চেষ্টায় সমস্ত ধন অর্জ্জিত হইলেও তিনি স্বেচ্ছায় দুই সহোদরকে

অর্জ্জিত ধনের অংশ দিয়াছিলেন ও ভগ্নি ভাগিনেয়ী এমন কি তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণ অবস্থার ন্যূনতা অনুসারে রামচন্দ্রের বাটীতে সমাদরে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। মধ্যম সহোদর নিঃসন্তান হওয়ায় তিনি তাহার অংশ রামচন্দ্রের পুত্রগণের সানুকূলে ত্যাগ করেন। কনিষ্ঠ সহোদরের বংশধর জনৈক নাবালক এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন ও নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিটায় বাস করিতেছেন।

বাঙ্গালা ১২৩০. সালের আষাঢ় মাসে রামচন্দ্র জাহ্নবীতীরে পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া পরলোক গমন করেন, তাঁহার সাবিত্রী সদৃশী সহধর্ম্মিণী- তাঁহার পদানুসরণপূর্ব্বক সহমৃতা হইয়াছিলেন। তৎকালে সহমরণ প্রথা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ না হইলেও সমাজে বিশেষতঃ শূদ্রজাতিব মধ্যে অধিক ঘটিত না। কিন্তু এই পুণ্যবতী সতীসাধ্বীকে পুত্র কন্যার মায়া, পরিজনবর্গের উপদেশ, এমন কি রাজপুরুষগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কিছুতেই বিরত করিতে পারে নাই। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত ঐ সময়ের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "Friend of India" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ডেনিস গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন গভর্ণব সাহেব বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই সতীসাধ্বীকে স্বামী সহমৃতা হইবার দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপদেশ ও যুক্তি প্রদান করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রামচন্দ্রেব বংশধরগণ এই পুণ্যবতী নারীর মহিমায় আপনাদিগকে সতী বংশসম্ভূত বলিয়া বিশেষ গর্ব্বান্বিত মনে করেন। উক্ত সংবাদপত্র পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, রামচন্দ্র ও তাঁহার সহধর্ম্মিনীর আদ্য-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। তৎকালীন সমস্ত দ্রব্যাদির মূল্য যেরূপ সুলভ ছিল সেই বিবেচনায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কোন অংশে ন্যূন বলিয়া মনে হয় না। রামচন্দ্রও তাঁহার পত্নীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধও

যথেষ্ট ব্যয়ের সহিত সম্পন্ন হওয়াতে এই স্বনামধন্য মহাপুরুষ ও পুণ্যবতী সতী সাধ্বীর নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ এক হিন্দু পরিবারভুক্ত থাকিয়া একত্রে লবণের ব্যবসাদি চালাইতেন এবং ক্রমশঃ তাঁহারা সহর কলিকাতা ও উপকণ্ঠে এবং জেলা হুগলী, মেদিনীপুর, ও চব্বিশ পরগণায় এবং শ্রীরামপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বহুতর ভূমি সম্পত্তি খরিদ করিয়া এ অঞ্চলের এক মাননীয় জমিদার বংশ হিসাবে চলিয়া আসিতেছেন। হুগলী জেলায় তাঁহাদের জমিদারী এত সুবিস্তৃত যে শ্রীরামপুর হইতে দামোদর নদের পরপার আরামবাগ মহকুমা পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইতে হইলে অপর কোন জমিদারের জমী স্পর্শ করিতে হয় না। এমত বিস্তৃত জমিদারীর অধিকারী হইলেও অন্যান্য জমিদারগণের ন্যায় ইঁহারা কখন নিজ জমিদারীতে যান না বা প্রজাগণের নিকট কোনরূপ বাজে আদায় করেন না। তাঁহাদের বংশের ধারণা প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধির উপর জমিদারের দৃষ্টিপাত শুভজনক নহে। শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী মাহেশ গ্রামের ।৵০ আনা অংশের মালিক হিসাবে উক্ত মাহেশ গ্রামের দেশবিখ্যাত শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর এই বংশের জনৈক প্রতিনিধিকে উক্ত গ্রামের ॥৵০ আনি জমিদার মহাশয়গণের সহযোগে ৺দেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা সম্পাদন করাইতে হয়। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে উক্ত উভয় কার্য্যই সমাধা হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে একটী ঈর্ষা প্রণোদিত বিবরণ তদানীন্তন "Calcutta Review" পত্রে প্রকাশিত হইয়া পরে Toynbee সাহেবের হুগলীর ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। বিবরণটী এইভাবে লিখিত আছে যে, দে বংশ সামান্য ফেরীওয়ালা ও নীচ জাতিসম্ভূত, কিছু অর্থ সঞ্চয় করি। হঠকারিতা প্রযুক্ত মাহেশ গ্রামের আংশিক মালিক

হইয়া তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ সেওড়াফুলীর দশ আনি জমিদার মহাশয়-দিগকে অবজ্ঞা প্রদর্শন অভিপ্রায়ে তাঁহাদের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এক বৎসর শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা সমাধা করাইয়াছিলেন এবং সেইজন্ত ৺দেবের সেবাইতগণ দশ আনী জমিদার মহাশয়গণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা এই যে এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ সেওড়াফুলীর ।৵০ আনি জমিদারদিগের অংশ খরিদ করিয়া তাহাদের সত্বে স্বত্ববান হইয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ-দেবের স্নান ও রথযাত্রা সম্বন্ধে দশ আনি জমিদারদিগের সহিত তুল্য অধিকারলাভ করাতে এবং সেবাইতগণ সেই অধিকার স্বীকার করাতে দশআনী জমিদাররা ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া সেবাইতদিগের উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হন। এবং অদ্যাবধি সে বংশ সেওড়াফুলীর দশআনী জমিদারদিগের উপস্থিত স্থলাভিসিক্ত জমিদারগণের সহিত এই অধিকার সমানভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সে বংশের হটকারিতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের কথা কোন শত্রুপক্ষীয় লোকের কথা মাত্র।

রামচন্দ্রের বংশধরগণের নিজ ভদ্রাসন বাটীর অনতিদূরে শ্রীশ্রী৺কালী-মাতার পূজার জন্য এক সুবৃহৎ পাকা মণ্ডপ নির্ম্মিত আছে। ইঁহারা বৈষ্ণব তন্ত্রের উপাসক বিধায়ে বৎসর বৎসর এই স্থানে জনৈক ব্রাহ্মণের নামে সঙ্কল্প হইয়া শ্রীশ্রী৺মাতার পূজা হয় এবং সেই উপলক্ষে কয়েকদিন-ব্যাপী মহাসমারোহ দর্শন অভিপ্রায়ে বহুদেশ বিদেশ হইতে বহুলোকের সমাগম হইত। ইহা এ অঞ্চলের একটী মেলার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বংশের তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে এক ইতিহাস আছে তাহাও এই স্থানে উল্লেখ যোগ্য। সে সময় রেলগাড়ী না হওয়াতে তীর্থ যাত্রা সহজ সাধ্য

ছিল না। লোকে উইল করিয়া তীর্থ যাত্রা করিত। এই বংশের তৎকালীন কর্ত্তা ও কয়েকজন এবং শ্রীরামপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতি প্রায় দুইশত লোক সমভিব্যাহারে বহু বজরা ও নৌকাযোগে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। কথিত আছে গয়াধামে ইহাদের কার্য্যে তথাকার লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল এবং কাশীধামে শ্রীশ্রী৺শিব-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এত অধিক অর্থব্যয় হইয়াছিল যে কাশীতে অদ্যাবধি এই বংশকে "তিলী রাজার" বংশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। কাশীর বহুসংখ্যক দলের কথা সকলেই অবগত আছেন। সেই সমস্ত দলের সকল লোককে একত্রে সমাবেশপূর্ব্বক ভোজনাদি করানই উক্তরূপ সুখ্যাতির কারণ এবং সেইজন্য বংশের তৎকালীন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে পাদুকাশূন্য পদে সকল লোকের নিকট বিনয় সহকারে গমন করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে ইহা দেখিয়া কাশীর তৎকালীন মহারাজা বাহাদুর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং এই বংশের সহিত সখ্যতা করিয়াছিলেন।

এই বংশের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ প্রাচীন কালের হিন্দুর ন্যায় অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে জন্য ইহাদের নিকট কখন ইংরাজ জাতির বা ইংরাজী ভাষার অনাদর নাই। উচ্চপদস্থ ও স্থানীয় মিস্‌নরি কলেজের বহু সংখ্যক ইংরাজদের ইহাদের বাটীতে গতিবিধি চিরকালই আছে। ইংরাজী ভাষা শিক্ষাও এই বংশে বহু পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই বংশে হাইকোর্টের উকিল ও ইউনিভারসিটির graduate আছেন।

দেশের সাধারণ হিতকর কার্য্য সকল এই বংশের সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। দিনেমারদিগের আমলে ইহারা রাস্তা ঘাটাদি সৎকর্ম্ম জন্য "চতুর্ধুরীন" খেতাব পাইয়াছিলেন। কথিত আছে,

ইংরাজের আমলে কোন হাকিম ইহাদের নামে রাস্তার জমী লওয়ার জন্য শমন দেওয়াতে উচ্চপদস্থ কোন পূর্ব্ববর্ত্তী হাকিম বলিয়াছিলেন যে, এই বংশ রাস্তার জন্য এত অধিক জমী দিয়াছেন যে তাহা জানিলে এ মোকদ্দমা করা হইত না।" বলা বাহুল্য মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের দাতব্য চিকিৎসালয় ও সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে এই বংশ বিশেষ উৎসাহ প্রদান ও অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় সম্বন্ধেও ইহাদের উৎসাহ ও অর্থ সাহায্যের ফল স্বরূপ বিদ্যালয় এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এমন কি মিসনরি কলিজিয়েট স্কুলেও ইহাদের অর্থ সাহায্যে কয়েকটী দুঃস্থ বালক বিনা বেতনে পাঠাভ্যাস করিত। বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির সোপান স্বরূপ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন বহু পূর্ব্বে ইহারা করিয়াছিলেন। ইহাদের শ্রীরামপুরে উত্তমরূপে চালিত দুইটী মুদ্রাযন্ত্র ছিল ও তাহার একটী হইতে—"Indian Reformer" নামে একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র ও অন্যটি হইতে "বিজ্ঞান মিহিরোদয়" নামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রকাশ হইত। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কার্য্য অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে, পরে মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত সম্পূর্ণ মহাভারত নীলকণ্ঠ প্রভৃতি টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ ইহাদের বংশ দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাধারণ জনহিতকর কার্য্যেও এই বংশ প্রথম হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামপুরে প্রথম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লোক্যাল কমিটি স্থাপিত হইলে এই বংশের রাজকৃষ্ণ দে মহাশয় তাহার মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। "Honourary Magistrate" পদ সৃষ্টি হইলে এই বংশের বিপ্রদাস, হরিশ্চন্দ্র ও মদনমোহন দে ক্রমশঃ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ও অন্নদাপ্রসাদ দে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন ইহা স্থির হইবার অব্যবহিত পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মদনমোহন স্থানীয়

মিউনিসিপালিটীর কমিশনর ছিলেন। পরে বরদাপ্রসাদ দে প্রায় ১৪ বৎসর মিউনিসিপাল কমিশনর, ৫ বৎসর ভাইস চেয়ারম্যান ও ১০ বৎসর চেয়ারম্যানরূপে এখনও কার্য্য করিতেছেন। তিনি হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বরও প্রায় ২০ বৎসর আছেন। ইহা ভিন্ন শুনা যায় যে, একবার কলিকাতায় দেশীয় ব্যবসাদারগণের, পক্ষে একজন শ্রীযুক্ত লাট সাহেবের সভায় মেম্বর হইবার প্রস্তাব হইলে এই বংশের বিপ্রদাস দে মহাশয়কে হাটখোলা হইতে ঐ পদে বরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তিনি উক্তপদে কার্য্য করিতে পারেন নাই।

রামচন্দ্রের পাঁচপুত্র ছিল, তন্মধ্যে মধ্যম সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্তান হইয়াছেন, এবং কনিষ্ঠের বংশে একমাত্র বিধবাবধূ বর্ত্তমান আছেন। অপর তিন পুত্রের বংশধরগণ শ্রীরামপুরের ভদ্রাসন বাটীতে বাস করিতেছেন। মদনমোহন দে এক্ষণে বয়োজ্যেষ্ঠ কর্ত্তারূপে প্রায় ৮১ বৎসর বয়সে সবল দেহে বর্ত্তমান আছেন। ইনি রামচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। প্রথম পুত্রের বংশে বরদাপ্রসাদ ও সুশীলকুমার বর্ত্তমান আছেন। বরদাপ্রসাদ হুগলি জিলার সমুদয় হিতকর কার্য্যে সংশ্লিষ্ট আছেন। ইনি একজন নীরব কর্ম্মী। বরদাবাবু হুগলি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন। চতুর্থ পুত্রের বংশে সুরেশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান আছেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক আছেন।

এই বংশের পরিবারবর্গ বহুদূর জ্ঞাতিত্বে বিস্তৃত হইলেও সহোদর ভ্রাতার ন্যায় একত্রে এক পরিবারভুক্ত হইয়া এক কর্ত্তার অধীনে পরিবারবর্গের সকলের সকল প্রকার ব্যয় সমানভাবে এক তহবিল হইতে দিয়া আদর্শ হিন্দু পরিবাররূপে সুখে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে এক সরিকের বিধবা পত্নী কর্ত্তৃক

কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে বিভাগ বণ্টন ও হিসাব নিকাশের এক মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত ২০ বৎসর কাল বহু অর্থ নষ্ট হইয়া এবং পরস্পরে পৃথক হইয়া পূর্ব্বশ্রী লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

রায় প্যারীলাল দাস বাহাদুর

রায় প্যারীলাল দাস বাহাদুর, বি, এল্, এম্, বি ই, এম্, এল্, সি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা জাতিতে বারেন্দ্র শ্রেণীর সাহা। ইঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় সুখলাল দাস; ইনি উকীল ছিলেন। ঢাকা সহরের ৩৬-৩৮ নং রূপ চাঁদ লেনে ইঁহাদের বাস ভবন।

রায় বাহাদুর প্যারীলাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, বি-এল্ উপাধিধারী। ইঁহাদের জমি-জায়গা ও বাড়ী এবং তেজারতির ব্যবসায় আছে।

গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাদুর ও এম-বি-ই উপাধি প্রাপ্ত হন।

রায় বাহাদুর প্যারীলাল দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত আছেন। তিনি ঢাকার মূক-বধির বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির, বিধবা আশ্রমের ও নর্থব্রুক হলের সদস্য। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার পদে বিরাজ করিতেছেন। ১৮৯৪ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ঢাকার সমর-ঋণ সমিতির সেক্রেটারী ছিলেন। ঢাকা সহরে 'আওয়ার ডে" ফণ্ডের যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তিনি সেই কমিটীর জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে ব্রিটিশ জাতি বিজয়ী হইলে বিজয়োৎসবের জন্য দেশের সর্ব্বত্র আয়োজন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে নগরীতে "ভিক্টরী সেলিব্রেশন

কমিটী” গঠিত হইয়াছিল এবং রায় বাহাদুর প্যারীলাল দাস সেই কমিটীর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি “ব্যাঙ্ক অফ ঢাকা লিমিটেড” নামক নব প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর এবং এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী ছিলেন। ইনি নব গঠিত বেঙ্গল লেজিসলেটীভ কাউন্সীলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি বিশ্রামের সময় গীত বাদ্যে অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

রায় বাহাদুর প্যারীলাল দাসের দুই পুত্র এবং একটী কন্যা।

ভাসলদির গুহবংশ।

আদি নিবাস—যশোহর।

স্থাপিত—বিক্রমপুরস্থ ভাসলদি গ্রামে।

ভাসলদির গুহবংশের বর্ত্তমান নিবাস বিক্রমপুরস্থ পাইকপাড়া গ্রামে। বিক্রমপুর কায়স্থ সমাজে ইঁহারা ভাসলদির গুহ নামে সুপরিচিত। ইঁহারা যশোহরের বিখ্যাত বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্যের বংশধর। বিক্রমপুর কাঠালিয়া গ্রামনিবাসী কুইদত্ত নামক জনৈক ভদ্রলোকের চেষ্টায় বীরভদ্র গুহ যশোহর হইতে আনীত হইয়া সোনার দেউলের মজুমদার বংশে বিবাহিত ও ভাসলদি গ্রামে স্থাপিত হন। তদবধি গুহবংশ ভাসলদি গ্রামেই বাস করিতে থাকেন। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই ভাসলদি গ্রাম পদ্মানদীর কুক্ষিগত হইলে গুহবংশ কিয়দ্দূরে আর একটি আবাসস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া তাহারও নাম ভাসলদি রাখিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই নূতন ভাসলদি কাঁচাদিয়া গ্রামের অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। কাঁচাদিয়ার সেনবংশের সহিত গুহবংশের অত্যন্ত সখ্যভাব বিদ্যমান ছিল। প্রায় ৫০ বৎসর হইল এই ভাসলদিও পুনরায় পদ্মার উদরসাৎ হয়। অতঃপর গুহবংশ কিছু কালের জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অস্থায়ী-ভাবে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহে বাস করিতে থাকেন। পরে সকলে সমবেত হইয়া মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান ক্রয় করিয়া প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর যাবৎ তথায় আসিয়া বাস করিতেছেন।

এই নূতন স্থানে আসা অবধি ইঁহাদের উত্তরোত্তর বিস্তর উন্নতি

হইয়াছে। ধনগৌরবে, সম্মানে, শিক্ষায় চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের মধ্যে ইঁহারাই বিশেষ বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য।

এই গুহবংশ হইতে ৺গোলকচন্দ্র গুহের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্র গুহ জাপান যাইয়া সাবান প্রস্তুতের প্রক্রিয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম শিক্ষা করিয়া আসেন। ইঁহারই চেষ্টায় কলিকাতা "বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরী" স্থাপিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশে এরূপ কোনও কারখানা ছিল না। ঢাকার বুল বুল সোপ-ফ্যাক্টরীও ইঁহার দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল। অধুনা ইনি "লাকি সোপ ফ্যাক্টরীর" সত্ত্বাধিকারী। এই কারবারটী বিশেষ লাভজনক।

৺গোলকচন্দ্র গুহের পৌত্র ও শ্রীযুক্ত জগদীশ গুহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ এখানে বি, এ পাশ করিয়া বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধুনা কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় করিতেছেন।

৺চণ্ডীপ্রসাদ গুহের পৌত্র ও শ্রীযুক্ত কালিনাথ গুহের ৪র্থ পুত্র শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন গুহ আমেরিকা হইতে ইনজিনিয়ারিং বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এখন টাটা আইরণ ওয়ার্কসে সম্মানিত পদে চাকুরী করিতেছেন।

ভাসনদির গুহবংশে যদিও অনেক কৃতবিদ্য লোক প্রফেসার, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন, তবু বাঙ্গালীর আদর্শ স্থানীয় প্রসিদ্ধ জুট মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত জগদীশ গুহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত জগদীশ গুহের পিতা ৺গোলকচন্দ্র গুহ আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্ণকুমার মজুমদারের পরম বন্ধু ছিলেন। ইঁহার মত সাধু ও সচ্চরিত্র লোক কচিৎ দেখা যায়। ইনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী ছিলেন। লেখাপড়া
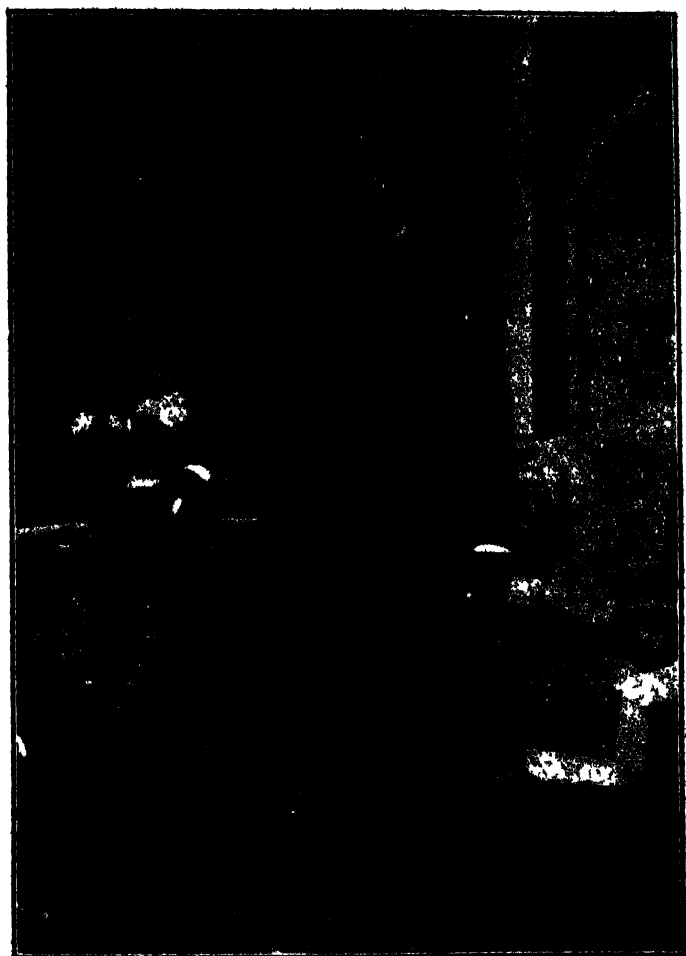
শ্রীযুত জগদীশ গুহ
চেয়ারম্যান ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটি

সমাপন করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে ইনি উদাসীন হন। ৭ বৎসর কাল আহোরাত্র নির্জ্জন গৃহে থাকিয়া কেবল মাত্র ফলমূল ভক্ষণে ১ লক্ষ শিব পূজা সমাপন করিয়া লোকালয়ে বহির্গত হন। এই ৫ বৎসর মধ্যে ইনি ধর্ম্মজীবনের উচ্চ সীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দৈনিক পূজা অর্চ্চনার আর আবশ্যকতা মনে করিতেন না। নিরাকার ঈশ্বরোপাসনাকেই তখন প্রশস্ত ধর্ম্মাচরণ মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, পৌত্তলিকতা উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মজ্ঞান লাভের সোপান স্বরূপ, কিন্তু একবার এই সোপান সাহায্যে সেই উচ্চস্থানে আরোহণ করিতে পারিলে সোপানের আর আবশ্যকতা থাকে না। তিনি বলিতেন, উপাসনার বিশেষ সময়নির্দ্দেশের আবশ্যকতা নাই। কারণ তাহা হইলে উপাসনা পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। সকল সময়ই উপাসনার প্রশস্ত সময়। ইঁহার মত কৃতবিদ্য লোক সেকালে গভর্ণমেণ্টের মধ্যে নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার সত্যনিষ্ঠা এত বলবতী ছিল যে শিক্ষকতা কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কাজে সত্য অটুট রাখিয়া কাজ করা অসম্ভব মনে করিয়া যাবজ্জীবন পবিত্র শিক্ষকতা কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজ করিতে কদাচও সম্মত হন নাই।

শ্রীযুক্ত জগদীশ গুহ তাঁহার পিতার নিকটই প্রথম বিদ্যাভ্যাস করেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজী পড়িবার জন্য বিদেশে গমন করেন। ফরিদপুর ও খুলনায় কিছুকাল থাকিয়া পরে ঢাকা আসিয়া পড়েন। যখন এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়েন তখন ইঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার অভাবে সংসারের ভার ইঁহার উপরে পড়ে। সুতরাং পড়া চলিবার আর সম্ভাবনা রহিল না। ইতিমধ্যে ইঁহার ভগিনী সংসারের ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলে তিনি নিজ চেষ্টায় ও

অপরাপরের সাহায্যে বি এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বি এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া শিক্ষকতা কার্য্য লইয়া পরিবারের ভার গ্রহণ করেন। কিছুকাল শিক্ষকতা করিলে পর ইঁহার এক বন্ধুর উপদেশে ও সহায়তায় নারায়ণগঞ্জ পাটের আফিসে ৪০৲ টাকা বেতনে এক চাকুরী গ্রহণ করেন। ২ বৎসর এই চাকুরী করিয়া মনিবের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ায় চাকুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। দুই এক মাস ধরিয়া থাকার পরই রংপুর জিলার সদর মহকুমার স্কুল সবইন্‌স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করেন। ৮।১০ মাস এই কাজ করিলে পর জনৈক বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে পুনরায় পাটের আফিসে ফিরিয়া আসেন। কারবারের উপর ইঁহার আন্তরিক একটা টান ছিল, তাই কারবার করিবার সুযোগ পাইলে তাহা অবহেলা করা অসঙ্গত মনে করিতেন। তিন বৎসর কাল কাজ করিবার পর ময়মনসিংহস্থ একটি ক্ষুদ্র যৌথ কারবারের অংশী ও ম্যানেজার হইয়া কাজ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। স্বাধীনভাবে কাজ করিবার প্রথম সুযোগ কদাচও উপেক্ষনীয় নহে, সুতরাং তিনি অবিলম্বে অংশী হইবার উপযুক্ত মূলধন ২০০০৲ টাকার মধ্যে নিজ সঞ্চিত ৯৮০৲ টাকা ও অপর দুইটী বন্ধু হইতে ঋণপ্রাপ্ত ১০০০৲, টাকা একুনে ১৯৮০৲, টাকা জমা দিয়া উক্ত যৌথ কারবারের অংশী হইলেন। ৩ বৎসর কাজ করিবার পর অপর অংশী উপযুক্ত অর্থাভাবে কারবারের উন্নতি হওয়া ও আশানুরূপ লাভবান হওয়া সুকঠিন দেখিয়া কারবারটি উঠাইয়া দেওয়ার অভিমত প্রকাশ করেন। এই সময় জগদীশবাবু অনন্যোপায় হইয়া একাই তাঁহার নিজ অংশের মূলধনের সাহায্যে ও নিজ দায়ীত্বে কারবারটী চালাইতে-চাহিলে অপর অংশী তাহাতে সম্মত হন। দুঃখের বিষয় যে মূলধন দিয়া কারবার চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা ঘটনাচক্রে অপর

অংশীর হস্তগত থাকায় কার্য্যকালে সে ঐ টাকা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিল। এই নূতন ও অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হওয়ায় কারবারটী বজায় রাখিবার আর কোনই সম্ভাবনা রহিল না। জগদীশবাবু বিপদে কদাচও অধীর হইবার লোক নহেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের নিকট সকল বাধা বিঘ্নই পরাস্ত হয়। তাঁহার অদম্য চেষ্টায় অচিরেই বন্ধুগণের সাহায্যে ২৫০০৲ টাকা মূলধন সংগৃহীত হইল।

এই সামান্য মূলধনে ২।৩ মাস কাজ করার পরই আশাতীত লাভ দেখা গেল। এই সময় তাঁহার পূর্ব্ব অংশীদার, লাভের মাত্রা বেশী দেখিয়া পুনরায় অংশীভাবে কাজ করিতে মত প্রকাশ করেন। জগদীশ বাবু এইরূপ অস্থিরচিত্ত লোকের সহিত কাজ করা বিপজ্জনক হইলেও তাঁহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান না করিয়া ইতিপূর্ব্বে যে লাভ হইয়াছে তাহা ব্যতীত ভাবী কাজের লাভ লোকসানের অংশী হইয়া তাঁহাকে পুনঃ গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ইহাতে তিনি অসম্মত হইয়া জগদীশ বাবু যৌথ কারবারের নাম ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং গোলা গুদামেরও ⅙ অংশ মাত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন বলিয়া জেদ করেন। জগদীশবাবু ইহাতেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া ভূতপূর্ব্ব অংশীর নির্দ্দেশানুযায়ী কারবার চালাইতে সম্মত হন। এই সময় হইতেই কারবারের নাম জে গুহ এণ্ড কোম্পানী রাখা হইল। বৎসরান্তে জগদীশবাবুর মোট লাভ ১০০০০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। ইহার পর বৎসরও ১১০০০৲ টাকা লাভ হয়। এই সময় হইতেই তাঁহার কারবারের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। এখন মৈমনসিংহের মধ্যে তাঁহার কারবারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি এখন বৎসরে ১৫।১৬ লক্ষাধিক টাকার কারবার করিয়া থাকেন। ইহার কারবারের লাভও যথেষ্ট। কোন কোন বৎসর লক্ষাধিক টাকাও লাভ হইয়াছে। জগদীশবাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত

শিশিরকুমার গুহ এখন এই কাজের ম্যানেজার। ইনিও কারবারে বিশেষ শিক্ষিত ও বিচক্ষণ। জগদীশবাবুর উপদেশমত প্রায় সমস্ত দায়ীত্বপূর্ণ কাজই ইনি করিতে সক্ষম। আজ ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল হইতে জগদীশবাবু স্বাধীনভাবে কারবার চালাইতেছেন। ইনি বলেন, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কোন বৎসরই নিকাশে ইঁহার লোকসান দাঁড়ায় নাই। দুই এক বৎসর লাভ লোকসানে সমান সমান হইয়াছে বটে, কিন্তু কদাচও লোকসানের মাত্রা লাভের মাত্রা অতিক্রম করে নাই। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে গত ৩০ বৎসরের মধ্যে বড় বড় মূলধন নিয়া অনেক পাটের কারবার স্থাপিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। সুদক্ষ কারবার পরিচালকের অভাবেই অধিকাংশ কারবার অকালে বিলুপ্ত হইয়াছে। জগদীশবাবু বলেন, অনভিজ্ঞ, অসংযত চরিত্র, অপরিণাম-দর্শী ও অত্যন্ত লোভী ব্যক্তি ব্যবসায় চালাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কলুষিত চরিত্র লোক অন্যান্য দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কদাচ ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারেন এইরূপ তিনি বিশ্বাস করেন না। ইঁহার চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠা সর্ব্বোপরি প্রশংসনীয়। এখন ইঁহার বয়স ৫৯ বৎসর। এই বয়সেও যুবকের মত উদ্যম ও উৎসাহের সহিত দৈনিক ১৫।১৬ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন। মোটরকার, গাড়ি প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও প্রাতে ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত দ্বিচক্রযান (বাইসাইকেল) আরোহণে ইতস্ততঃ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়ান। ইঁহার চাল, চলন, আচার, ব্যবহার অর্থাগমে কিছু মাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও যাহা ছিল এখনও ঠিক তদ্রূপ। ইনি অত্যন্ত পাঠানুরাগী। এখনও রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকেন।

মৈমনসিংহ এড্ওয়ার্ড স্কুল ইঁহার তত্ত্বাবধানে ও বহু অর্থব্যয়ে পরিচালিত হইতেছে। এই স্কুলের জন্য প্রায় ২৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে

একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহার অধিকাংশ ব্যয়ই ইনি বহন করিতেছেন। স্থানীয় অন্যান্য জুট মার্চ্চেণ্টগণও এই স্কুল পরিচালনের জন্য সাধ্যোচিত সাহায্য করিতেছেন।

নয়াপাড়া ঘোষ বংশ।

আজ যে স্থানে নয়াপাড়া গ্রাম অবস্থিত, সেই স্থান দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পাঠানডাঙ্গার মাঠ বলিয়া অভিহিত হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুবিখ্যাত খান জাহান আলী নয়াপাড়ার অদূরবর্ত্তী বাগেরহাটের সন্নিকটে আসিয়া যখন স্বীয় হাবেলী অর্থাৎ বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, তখন হইতে আমাদের এই অঞ্চল পাঠানদিগের লীলাভূমি হয়। পিলজঙ্গ শব্দের ব্যুৎপত্তিসূচক অর্থ, কাড়াখালি গ্রাম, ধনখোলার মাঠ, পাঠানডাঙ্গার মাঠ প্রভৃতি শব্দ এই অঞ্চলে পাঠানদের কার্য্যকলাপ ও বসবাসের পরিচয় দেয়। নয় পুরুষ পূর্ব্বে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নয়াপাড়ার বিখ্যাত ঘোষবাবুদের পূর্ব্বপুরুষ রামজীবন লখপুর ও পিলজঙ্গ গ্রামের মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলাকীর্ণ পাঠানডাঙ্গার মাঠে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া গৃহ ও ইমারতাদি নির্ম্মাণ করেন। তৎপূর্ব্বে রামজীবনের পিতা জানকীবল্লভ নয়াপাড়ার পার্শ্ববর্ত্তী লখপুর গ্রামে আসিয়া প্রথমে বাস করেন। লখপুর এই অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভদ্রপল্লী। জানকীবল্লভ যশোহর জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম বিদ্যানন্দকাঠী নিবাসী ছিলেন। তথা হইতে ভৈরব তীরবর্ত্তী বাসড়ীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি লখপুরের বসু-চৌধুরীবংশের পূর্ব্বপুরুষ পরশুরামের সহিত লখপুরে আসিয়া বসবাস করেন। ইহাদের আগমনের অল্পকাল পূর্ব্বে লখপুরের কাশ্যপ চৌধুরী বংশ লখপুরে আসিয়া বাস করেন। যতদূর জানা যায়, এই সময় হইতে এই অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা বসবাস আরম্ভ করেন। পরশুরাম হোগলা ও বাজিত-

পুর পরগণাদ্বয় পুত্র রামপ্রসাদের নামে বন্দোবস্ত লইয়া হোগলা পরগণান্তর্গত লখপুরে আসিয়া বাস করেন। জানকীবল্লভের পুত্র রামজীবনের সহিত রামপ্রসাদের কন্যা কুমারীর বিবাহ হয়। জানকী বল্লভের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামজীবন লখপুরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত যোগীখালির অপর পারবর্ত্তী জঙ্গলাকীর্ণ পাঠানডাঙ্গার মাঠে উঠিয়া যাইয়া বাস স্থাপন করেন এবং এই নূতন স্থানকে নয়াপাড়া নামে অভিহিত করেন। জানকীবল্লভের গৃহাদি লখপুরে বর্ত্তমানেও বিদ্যমান আছে। লখপুরে অবস্থানকালে রামজীবনের সহধর্ম্মিণী কুমারী তথায় একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এই মন্দিরটী অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। কুমারী নয়াপাড়ায় আসিয়াও একটী শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং পানীয় জলের নিমিত্ত একটী বিখ্যাত পুষ্করিণী খনন করেন। রামজীবনও নয়াপাড়ায় আসিয়া একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির-শিরোজাত বৃক্ষ গুল্মাদির প্রকোপে মন্দিরটী বর্ত্তমানে প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। এই সময়ে রামজীবনের শ্বশুরবংশ অর্থাৎ লখপুরের বসু চৌধুরীবংশ এই অঞ্চলের প্রতাপান্বিত জমিদার। লখপুরে এই সময়ে আর এক ঘর জমিদার বাস করিতেন; ইঁহারা লখপুরের কাশ্যপ চৌধুরী বংশ। ইঁহারা ক্ষুদ্র জমিদার ছিলেন।

রামজীবনের পুত্রদের সময় হইতে নয়াপাড়া ধনে মানে এদেশে খ্যাতিযুক্ত হয়। শ্রীফলতলা ও পেড়ীখালি নামক বিস্তৃত তালুকদ্বয়ের অধিকারী হইয়া তাঁহারা এদেশে তালুকদার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এতদ্ব্যতিরেকে উত্তরোত্তর আরও বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বসুচৌধুরীদিগের জমিদারীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা বিশেষ প্রতাপ-শালী হন। সবে মাত্র তিন পুরুষ জমিদারী উপভোগের পর বসু চৌধুরীরা গৃহ বিবাদে জমিদারী হারাইলেন। নয়াপাড়ার ঘোষ-পরিবার

বসু চৌধুরীদের প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। তখনকার তালুকদারগণ ক্ষুদ্র জমিদারগণের সমকক্ষমতাপন্ন ছিলেন। প্রতাপান্বিত বলিয়া এই ঘোষ-পরিবার গত দুই শত বৎসরাবধি এই অঞ্চলে সমধিক প্রসিদ্ধ।

রামজীবনের পঞ্চপুত্র, তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রামরাম ও সর্ব্বকনিষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ নিঃসন্তান। অবশিষ্ট তিনপুত্র শ্যামরাম, কৃষ্ণরাম ও ও ব্রজরামের সন্তানসন্ততি লইয়া বর্ত্তমানে নয়াপাড়া ঘোষ-বংশ গঠিত। রামরাম মাতুলদিগের কার্য্যোপলক্ষে মুর্শিদাবাদে নবাব-দরবারে থাকিতেন। তদ্‌কনিষ্ঠ শ্যামরাম অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। শ্যামরামের চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ তিনপুত্র নিঃসন্তান; সর্ব্বকনিষ্ঠ দর্পনারায়ণ অতিশয় ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন; লোকে ইঁহার "দয়ালগাজি" নাম দিয়াছিল। শ্যামরামের মধ্যমপুত্রের স্ত্রী ৺কাশীধামে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বৃত্তিধারী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দ্বারা এই শিব লিঙ্গটী অদ্যাবধি পূজিত হইতেছে।

শ্যামরাম, কৃষ্ণরাম, ও ব্রজরামের পঞ্চদশ পুত্র। ইঁহাদের সময় নয়াপাড়া বিস্তৃতি লাভ করে। ভ্রাতাগণ প্রায় সকলেই পৃথকান্নভুক্ত ছিলেন, তন্নিবন্ধন অনেকগুলি পৃথক্ পৃথক বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া ঘোষ পরিবার গ্রামে ছড়াইয়া পড়েন। এই পঞ্চদশ ভ্রাতা বিষয়-সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন; ইঁহাদের সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশের বিখ্যাত দশশালা (১৭৯৩ খ্রীঃ) বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্তের ফলে পুরাতন জমিদার শ্রেণীর একরূপ লোপ হইল। বড় বড় জমিদারীর স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন স্বত্ত্ববিশিষ্ট ষ্টেটের অভ্যুদয় হইল। বুদ্ধিমান কর্ম্মকুশল ব্যক্তিবর্গের পক্ষে এই পরিবর্ত্তনের ফল বিশেষ লাভজনক হইল। উপরিলিখিত পঞ্চদশ ভ্রাতার পুত্রবর্গ এই পরিবর্ত্তনের যুগে পৈতৃক সম্পত্তিতে জমিদারী এবং অন্যান্য স্বত্ত্ববিশিষ্ট বিষয়াদি যোগ করিয়া স্বীয় অবস্থার সমধিক উন্নতি সাধন

করেন। এই পঞ্চদশ ভ্রাতার পুত্রবর্গের মধ্যে বনমালী, ভগবান, স্বরূপ চন্দ্র, রামদয়াল, দীননাথ, শ্রীনারায়ণ ও গঙ্গাপ্রসাদ ; এবং পৌত্রবর্গের মধ্যে যদুমণি, গদাধর, লক্ষ্মণ, দেবেন্দ্রনাথ, রাধামাধব, মধুসূদন, দেবনাথ, ফুলবিহারী, জগমোহন, রাজেন্দ্রকুমার, এবং প্রপৌত্রবর্গের মধ্যে দীনবন্ধু, শশধর, কালীপ্রসন্ন, বসন্তকুমার সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের বংশধরগণ বর্ত্তমানে ছোট বড় অনেকগুলি ষ্টেটের অধিকারী ও ঐশ্বর্য্যশালী।

ধনী বলিয়া এই ঘোষ পরিবার এই জেলায় চিরপ্রসিদ্ধ। অর্থের সদ্ব্যবহারে ইহাঁরা চিরদিনই মুক্তহস্ত। ইহাদের দান ধ্যান, শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাসন, পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতি বরাবরই খুব জাকজমকের সহিত সমভাবে হইয়া আসিতেছে। এই বংশের দানসাগর শ্রাদ্ধগুলি এই দেশে অতুলনীয়। বারমাসের তের পার্ব্বণ ইহাদের গৃহে গৃহে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই জেলায় এইরূপ সমারোহ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। সৎকার্য্যে ইহারা কোন দিনই ব্যয়কুণ্ঠ নহেন এবং স্বদেশের হিতকার্য্যে ইহারা চিরদিনই মুক্তহস্ত ; এমন কি গত দশ বৎসরের মধ্যে এই পরিবার সাধারণের হিতকার্য্যে প্রায় লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন। স্বগ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পানীয় জলের নিমিত্ত বিস্তৃত জলাশয়াদি খনন দ্বারা ইহারা দেশের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর বর্ত্তমান খুলনা জেলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই গ্রামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বাগেরহাটে প্রথম মহকুমা স্থাপিত হইবার পর ৺গৌরদাস বসাক যখন তথাকার প্রথম মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া আসেন, তখন তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নয়াপাড়ায় একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদানীন্তন কালে এদেশের মধ্যে এই স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া গৌরদাস নয়াপাড়ায়

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত করেন। গৌরদাসের ভ্রাতা কানাইলাল বসাক এই বিদ্যালয়ের প্রথম হেড মাষ্টার ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মাষ্টার ও হেড পণ্ডিত ছিলেন; তন্মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অমৃতবাজার পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহোদয় একসময়ে এই বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার ছিলেন এবং 'সদ্ভাবশতক' প্রণেতা সুবিখ্যাতকবি ৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার একজন হেড পণ্ডিত ছিলেন।

এই পরিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গ্রাজুয়েট আছেন; ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও উকিলের অভাব নাই। মোগল রাজত্বের সময়ে এবং কোম্পানীর আমলে এই পরিবারে তখনকার চলিত আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন বহু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বনমালী ও গদাধর সমধিক প্রসিদ্ধ, বনমালী সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষায় বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল; জ্যোতিষশাস্ত্রেও ইঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। কোম্পানীর আমলে ইনি প্রথমে মুন্সেফ ও পরে সদরওয়ালা পদে উন্নীত হন। নড়াইলের ৺রামরতনবাবুর ভগ্নীকে ইনি বিবাহ করেন। গদাধরও আরবী ও পার্শী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি কোম্পানীর আমলে যশোহরে ওকালতী করিতেন। দেশে গদাধরের অসীম প্রতিপত্তি ছিল।

এই প্রাচীন ঘোষ পরিবারের একটী বিশেষত্ব আছে, যাহা এই জেলায় অন্যান্য প্রাচীন বংশে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। বিগত দুই শত বৎসরাধিক ইঁহারা এই গ্রামে বাস করিতেছেন; সেই সময় হইতে অদ্যাবধি ভাগ্যলক্ষ্মী ইঁহাদের গৃহে অচঞ্চলা। মোগল রাজত্বের সময়ের বহু জমিদার ও তালুকদারবংশ এই জেলায় আছেন, কিন্তু সেই সমস্ত বংশ

রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ
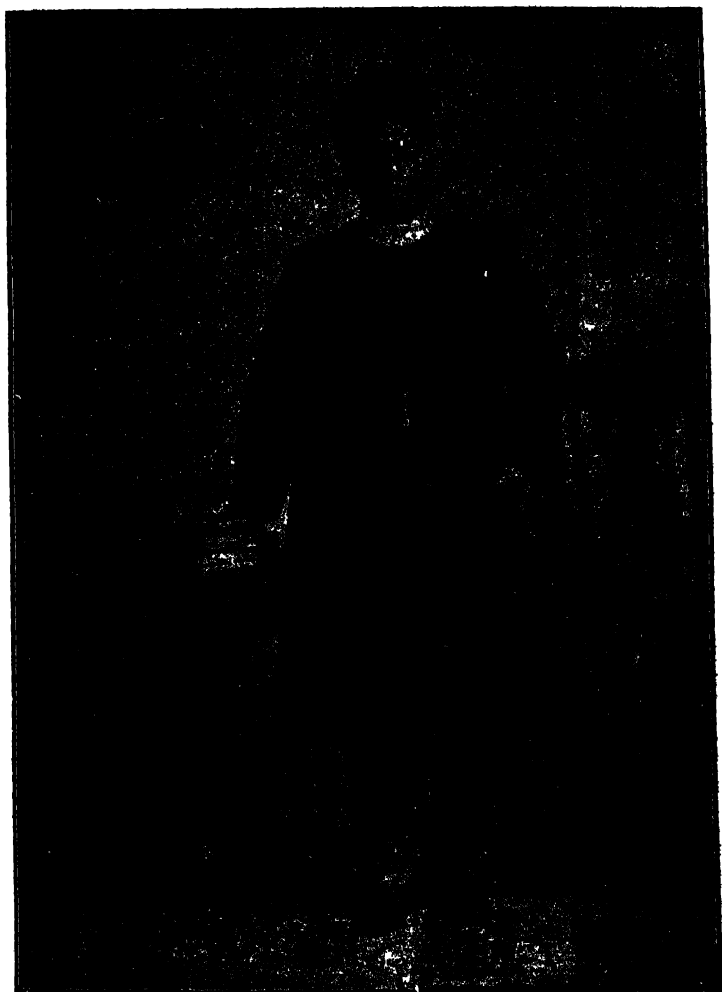
বর্ত্তমানে প্রায়ই অবস্থাহীন ; বহুকাল হইতে এই সমস্ত বংশের প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু এই ঘোষবংশ নয়াপাড়ায় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা হইতে অদ্যাবধি সমভাবে প্রতিপত্তিশালী ও ঐশ্বর্য্যশালী।

এই বংশ বর্ত্তমানে অনেকগুলি পরিবারে বিভক্ত, তন্মধ্যে আবার কয়েকটী পরিবার সমধিক প্রসিদ্ধ। ভগবানের বংশ ইঁহাদের অন্যতম। ভগবান দর্পনারায়ণের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। পিতার আদর্শে ভগবানের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। এতদ্দেশে ভগবান তখন সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন। নগদ মুদ্রার সমষ্টি ইঁহার এত অধিক ছিল যে, লোকে তাহা "ভগবানী গোলা" আখ্যায় অভিহিত করিত। "ভগবানী গোলার" নাম বর্ত্তমানেও এতদঞ্চলে শ্রুত হয়। ধনী অপেক্ষা ধার্ম্মিক বলিয়া ভগবানের নাম অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি রজতকাঞ্চনের দাস ছিলেন না, তদপেক্ষা ধর্ম্মই তাঁহার প্রাণের অতিশয় আদরণীয় বস্তু ছিল ; দয়া-দাক্ষিণ্যে ভগবান যেরূপ অতুলনীয় ছিলেন, আবার পরাক্রমেও তিনি সেইরূপ অমিত ছিলেন। তৎকালে এই দেশ খুলনার নিকটবর্ত্তী নেহালপুরের দুর্দ্দান্ত নীলকর জমিদার রেণী সাহেবের ভয়ে সর্ব্বদা থরহরি কম্পিত হইত। ভগবান ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বনমালী এই নীলকুঠীয়ালের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রেণী সাহেবের সহিত ইঁহাদের দাঙ্গাহাঙ্গামা সর্ব্বদাই চলিত। এক সময়ে রেনী সাহেব ইহাঁদের সতেরটী ধান্যপূর্ণ গোলা লুঠ করিয়া লন। কোন পক্ষই কম ছিলেন না। ভগবানের প্রতাপ এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল ; যাহা হউক, ধার্ম্মিক বলিয়া ভগবানের অধিকতর সুযশঃ ছিল। পিতৃপুণ্যফলে আজ রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রকুমার খুলনা জেলায় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

ভগবানের চারি পুত্র, তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশিষ্ট তিন পুত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যদুমণি অতিশয় মেধাবী

ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং মধ্যম কুঞ্জবিহারী দেবদ্বিজভক্ত ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। কিন্তু কিঞ্চিদধিক ত্রিংশ বর্ষ পার হইতে না হইতে ইহাঁরও সপ্তদশ বর্ষবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্রকুমারের হস্তে দুইটী নিতান্ত শিশু পুত্র এবং চতুর্দ্দিকে বিপজ্জালজড়িত বিষয়াদি অর্পণ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ভগবানের তৃতীয় পুত্র রাজেন্দ্রকুমার বাঙ্গলা ১২৫৭ সালের ৪ঠা ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন ও ক্লাসের পরীক্ষায় প্রতি বৎসরই প্রথম হইতেন। ১৮৬৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার টেষ্ট পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বপ্রথম হইয়া পাশ করেন; কিন্তু ভীষণ আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। উপর্য্যুপরি জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে তাঁহাকে শিক্ষার সমাপ্তি করিতে হইল। পিতৃহারা নিতান্ত শিশু ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়কে লইয়া রাজেন্দ্রকুমারকে বাধ্য হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইল। এই ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যদুমণির পুত্র বসন্তকুমারের বয়স তখন চারি বৎসর এবং কুঞ্জবিহারীর পুত্র হেমন্তকুমারের বয়স ছয় মাস মাত্র। ভ্রাতাদ্বয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে রাজেন্দ্রকুমার যে ভীষণ বিপজ্জালে বিজড়িত হইলেন, সেই জাল ছিন্ন করিতে তাঁহার জীবনের অধিকাংশই কাটিয়া গেল। রাজেন্দ্রকুমার যখন সংসার-সমুদ্রে যাত্রা করিলেন তখন ঝটিকা আরম্ভ হইয়াছে, সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ দেখা দিয়াছে, বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার ক্ষুদ্র তরী বুঝি চিরতরে এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে মগ্ন হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দুর্দ্দান্ত রেণী সাহেব বনমালীর ও ভগবানের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। পেড়ীখালি নামক একটী তালুক হইতে রেণী সাহেব ইহাদিগকে যে বেদখল করিয়া দিয়াছিলেন তাহা লইয়া

বংশানুক্রমে বিবাদ বিসম্বাদ ও মামলা-মোকদ্দমা চলিয়া আসিতেছিল। রাজেন্দ্রকুমার যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন জেলা কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালতে, রেণী সাহেবের সহিত ইঁহাদের বহু মোকদ্দমা চলিতেছিল। এই সময়ে হোগলার জমিদারের সহিত এই পরিবারের বিখ্যাত প্রিভিকাউন্সিলের মোকদ্দমা বিচারাধীন ছিল। যদুমণি এই মোকদ্দমায় আপীল করিয়াই কালগ্রাসে পতিত হন। যদুমণি ও কুঞ্জবিহারীর জীবিতাবস্থায় জ্ঞাতিগণের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিপত্তিযুক্ত ব্যক্তি মস্তক অবনত করিয়া বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা এই দুই ভ্রাতার মৃত্যুর পর সুযোগ পাইয়া অপরিণত-বয়স্ক বালক রাজেন্দ্রকুমারকে দংশন করিতে উদ্যত হইলেন। সুতরাং সংসারানভিজ্ঞ বালক রাজেন্দ্রকুমারের সমূহ বিপদ সমুপস্থিত হইল। ক্রমেই বিপদ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশ শত্রুকরতলগত হইল। বাস্তভিটা পর্য্যন্ত শত্রুর দাপে ঝাঁজিয়া উঠিল। গোবরডাঙ্গার বাবুদের মধুদিয়া পরগণার প্রজাদের মধ্যে ভগবানের বহু অর্থ দাদন ছিল, উক্ত বাবুদের কার্য্যকারকদিগের সহিত মনোমালিন্য হেতু এবং পৈতৃক সম্পত্তি পরহস্তগত হওয়ায় ভগবানের তেজারতির বহু অর্থ নষ্ট হইল। গৃহ হইতেও বহু অর্থ অপহৃত হইল। আবার নানা কারণে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে বিখ্যাত "ভগবানী গোলা" যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হইল। বিপক্ষ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া প্রজাগণ বিদ্রোহ ভাব ধারণ করিল। এইরূপ ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রাজেন্দ্রকুমারের প্রথম বয়স কাটিয়া গেল। রাজেন্দ্র কুমার বিপদে অসীম ধৈর্য্যশীল, সংকল্পে তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অটল। রাজেন্দ্রকুমার প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন; তাহাতে যদি তাঁহাকে কপর্দ্দকহীন হইয়া দেশত্যাগী হইতে হয় তাহাও

তিনি বরণ করিবেন, তথাপি তিনি শত্রুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন না। রাজেন্দ্রকুমারের হৃদয় দৃঢ় সঙ্কল্পের লৌহ বর্ম্মে আচ্ছাদিত। তিনি চিরদিনই উদ্যমশীল পুরুষ। বর্ত্তমান সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম কালেও তিনি যুবকের ন্যায় উদ্যমশীল। আলস্য, অবহেলা, কিংবা দীর্ঘসূত্রতা বিন্দুমাত্র ইঁহার শরীরের মধ্যে স্থান পায় নাই। নানা বিপদের মধ্যে পড়িয়া রাজেন্দ্র কুমারের তিলমাত্র অবসর রহিল না; তিনি চক্রাকারে বাগেরহাট, যশোহর, কলিকাতা, ও মফঃস্বল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আহারের কিংবা বিশ্রামের সময় ছিল না। শরীরের উপর দিয়া যে কত কষ্ট গিয়াছে! কতদিন যে কার্য্যের ও বিপক্ষের তাড়নায় অনাহারে কাটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজেন্দ্রকুমার অতীব কষ্টসহিষ্ণু। ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে রাজেন্দ্রকুমার ক্রমশঃই কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন। এদিকে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র বসন্তকুমার যখন বিষয়কর্ম্ম পরিচালনে খুল্লতাত রাজেন্দ্র কুমারের সহায়ক হইয়া উঠিলেন, তখন হইতে উন্নতি আরও দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল। কিন্তু হায়! বসন্ত কুমারের দিনগুলি অতি শীঘ্রই ফুরাইয়া আসিল! তিনটী পুত্র রাখিয়া বসন্ত কুমার অকালে ভগবানের কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন। স্বীয় জীবনাপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ বসন্তকুমারের মৃত্যু রাজেন্দ্র কুমারের বক্ষে দারুণ শেলসম বিদ্ধ হইল। কর্ত্তব্যের আহ্বানে সতত উদ্যত রাজেন্দ্রকুমার কিন্তু দীর্ঘ সময় শোকাভিভূত হইয়া রহিলেন না। কর্ম্মই ইঁহার জীবন; কর্ম্মই ইঁহার ধর্ম্ম। আবার পূর্ণ উদ্যমে অবশিষ্ট ভ্রাতুষ্পুত্র হেমন্তকুমারকে সঙ্গী করিয়া রাজেন্দ্রকুমার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। বহু চেষ্টার ফলে রাজেন্দ্রকুমার পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকাংশ উদ্ধার করিলেন; কিন্তু কয়েকটী ভাল সম্পত্তি চিরতরে হস্তচ্যুত হইল। পঞ্চাশ বৎসরের

উপরে তিনি সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘকালের মধ্যে হস্তচ্যুত সম্পত্তির উদ্ধারের জন্য তিনি কত মামলা-মোকদ্দমা করিয়াছেন, বহু সাধারণ সম্পত্তি পার্টিশনের দ্বারা পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু এতদিনও বিপক্ষের কবল হইতে সমস্ত সম্পত্তি পৃথক্ করিতে রাজেন্দ্রকুমার সম্মত হন নাই। নানা ঝঞ্ঝাটে সময়মত সমস্ত বিষয়ের পার্টিশান মোকদ্দমা রাজেন্দ্রকুমার করিতে পারেন নাই। তাই ভবিষ্যতেও রাজেন্দ্রকুমারের আরও অনেক পার্টিশানের মোকদ্দমা করিতে হইবে। রাজেন্দ্রকুমার যে কেবল পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার করিয়া ষ্টেটের ভাগ্য ফিরাইয়াছেন তাহা নহে; অনেক নূতন নূতন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ষ্টেটের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় ষ্টেট্ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছ। আজীবন ঐকান্তিক সাধনার ফলে ও পিতৃপুণ্যবলে স্থিরলক্ষ্য রাজেন্দ্রকুমার জীবন-সংগ্রামে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং বিপদার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু কি মন্ত্রবলে চতুর্দ্দিকে বিপদবেষ্টিত ও সহায়হীন সপ্তদশবর্ষীয় বালক রাজেন্দ্রকুমার জীবনের অপরাহ্ণকালে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অনুধাবনের বিষয়। রাজেন্দ্রকুমার সরলচিত্ত, নিরহঙ্কারী, স্পষ্টবাদী ও ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। কর্ত্তব্য ব্যতীত জীবনে ইনি আর কিছুই চিনেন না। বার্দ্ধক্যেও রাজেন্দ্র কুমার যুবকের ন্যায় অভাবনীয়রূপে উদ্যমশীল, তাই চঞ্চলা লক্ষ্মী ইঁহার কৈশোরে প্রস্থানে উদ্যত হইয়াও পুনরায় তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিতেছেন। এরূপ কর্ম্মী পুরুষ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। রাজেন্দ্রকুমার যে কেবল স্বীয় পরিবারবর্গের মঙ্গল কামনা করেন তাহা নয়; স্বদেশের হিতকামনায় তিনি চিরদিনই অগ্রগণ্য।

দেশে শিক্ষাবিস্তারের ইনি বিশেষ পক্ষপাতী। শিক্ষার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় এবং টেক্‌নি-

ক্যাল স্কুলে ইনি বহু সহস্র অর্থ দান করিয়াছেন। বহু নিঃস্ব ছাত্রদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। দেশের অভাব-অভিযোগ-দূরীকরণে ইনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। স্বগ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ইনি সুন্দর একটী ইমারত প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। প্রায় সপ্ত সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ইনি পানীয় জলের নিমিত্ত স্বগ্রামে একটী সুবৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া দিয়াছেন। রাজেন্দ্রকুমারের দানশীলতা সর্ব্বজনপরিচিত। তিনি দেশের কার্য্যে চির উৎসাহী ও মুক্তহস্ত। রাজেন্দ্রকুমারের স্বদেশ হিতকর কার্য্যাবলীর জন্য আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। রাজেন্দ্র-কুমারের ঐকান্তিক ও অবিচলিত রাজভক্তি তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষত্ব। গত মহাযুদ্ধে তিনি রাজভক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। রাজেন্দ্রকুমার বহু যুদ্ধ ফণ্ডে (fund) বহু সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। নিজে যুদ্ধঋণ ক্রয় করা ব্যতীতও দেশের মধ্য হইতে যুদ্ধঋণ উঠাইবার জন্য রাজেন্দ্র কুমার অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। খুলনায় মহিলাবর্গের মধ্য হইতে রাজেন্দ্রকুমার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী অন্যূন বিংশতি সহস্র মুদ্রা যুদ্ধঋণ উঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র কুমারের খুলনা বাড়ীতে সহরস্থ মহিলাদিগকে গাড়ী করিয়া আনাইয়াছেন এবং পাঠাইয়া দিয়াছেন। খুলনা জেলা হইতে সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপারে রাজেন্দ্রকুমার স্বেচ্ছায় অগ্রগামী হইয়া প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদের গুণগ্রাহী গবর্ণমেণ্ট সৈন্য-সংগ্রহে সাহায্যের জন্য রাজেন্দ্রকুমারকে একখানি "অনার সার্টিফিকেট্" (honour certificate) দিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট রাজেন্দ্রকুমারকে যুদ্ধে সাহায্য করা হেতু একটী যুদ্ধ পদক (war badge) প্রদান করিয়াছেন।

এইরূপে রাজেন্দ্রকুমার পিতৃবংশকে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে

সমাসীন করিয়া বংশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন। রায় রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ বাহাদুর সাধারণ হিতকর কার্য্যে অনেক অর্থদান করিয়াছেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—(১) নয়াপাড়ার উষাময়ী চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের ব্যয় বাবদ ৫৮০০৲, (২) ঐ চিকিৎসালয়ের ড্রেণ নির্ম্মাণে ১৯৫৲, (৩) নয়াপাড়ায় একটি পুষ্করিণী খননে ৬৭০৯, (৪) খুলনা করোনেশন বালিকা বিদ্যালয় গৃহ-নির্ম্মাণে ৫০০০৲, (৫) যুদ্ধ ফণ্ডে ২৭৫৲, (৬) য়্যাম্বুলেন্স কোরে ২৫০৲, (৭) এরোপ্লেন ফণ্ডে ৩০০০৲, (৮) নয়াপাড়া জর্জ্জ করোনেশন হাইস্কুলে ১২৭০০৲, (৯) আওয়ার ডে ফণ্ডে ১০০৲ (১০) খুলনা ইউরোপীয়ান ক্লাবে ১৫০০৲, (১১) খুলনা ইউনাইটেড্ ক্লাবে ১০০০৲, (১২) রিক্রুইটমেণ্ট ফণ্ডে ৩০০০৲, (১৩) খুলনা করোনেশন টেক্‌নিকাল স্কুলে ২০০০৲, (১৪) খুলনা উর্ডবরণ হাঁসপাতালে ১০০৲, (১৫) শান্তি উৎসবে ২৭৫৲, (১৬) এম্পায়ার ডেতে ২৫৲ (১৭) বাগেরহাট হাই স্কুলে ১০০৲। মোট ৪২০২৯৲ টাকা।

মহামান্য বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর রাজেন্দ্র কুমার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—That your family has long been prominent in the district in which you live and you have fully maintained its reputation by your generous support of works of public utility, your liberal contributions to war funds and your substantial encouragement of recruiting."

রায়সাহেব নীলমণি ভট্টাচার্য্য।

নানাবিধ জনহিতকর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া শ্রীযুত নীলমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরের অধিবাসিবর্গের সুখ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি ১২৮০ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে বহরমপুর সহরে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধিধারী। ১৯২২ সালের নববর্ষ দিনে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে রায় সাহেব উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় জেলা আদালতের উকীল ছিলেন।

ইঁহারা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশধর এবং কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশের অধস্তন দশম পুরুষ। ইঁহারা অন্যূন দশ পুরুষ ধরিয়া বহরমপুরে বসবাস করিতেছেন। ইঁহারা জমিদার; জমিদারীর বার্ষিক আয় ৬০০০৲ টাকা।

ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকাংশই প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ ছিলেন। তন্মধ্যে কমললোচন সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাণী ভবানী তাঁহাকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি বিস্তর ভূমি ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বংশের প্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র বিশারদ শ্রীরাম শিরোমণি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসবের সময়ে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই উপাধি সেই সময়েই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণি নীলমণিবাবুর জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য ছিলেন।

নীলমণিবাবুর পিতা হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় খুব পশারওয়ালা উকীল ছিলেন এবং সাধারণে তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।
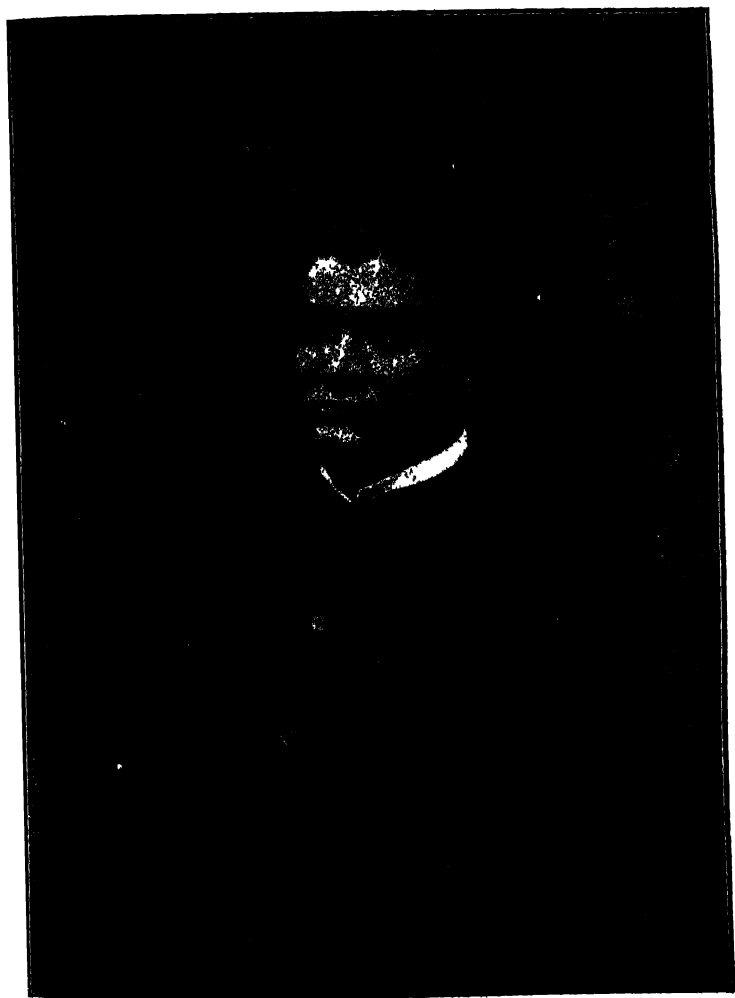
রায় সাহেব নীলমণি ভট্টাচার্য্য

তিনি কিছুদিন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং ২৫ বৎসর কাল মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার-পদে বিরাজ করিয়াছিলেন। ৬ বৎসর ইনি মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ইনি কৃতী পুরুষ ছিলেন; ইঁহার কার্য্যে সকলেই প্রীতিলাভ করিতেন।

নীলমণিবাবুর এক ভ্রাতা সবডেপুটী কলেক্টর এবং আর একজন এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া বহরমপুর জজ-আদালতে ওকালতী করিতেছেন।

ভট্টাচার্য্য-পরিবার বহরমপুরের প্রাচীনতম অধিবাসী বলিয়া ইঁহাদের নিকট বহু প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ এবং কাগজপত্র আছে। সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া সিবিলিয়ান মিঃ ডব্লিউ এস মিল্‌নে সেগুলির চিত্র নিজ পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নীলমণিবাবু সাধারণের হিতকর বহু কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি ৫ বৎসর কাল বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন, ১৩ বৎসর কাল বহরমপুর ওয়াটার ওয়ার্কস কমিটী বা জলের কলের সমিতির সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; ১৪ বৎসর কাল মিউনিসিপ্যাল কমিসনারের কার্য্য করিতেছেন; দুই বৎসর কাল জেলা-বোর্ডের সদস্য-পদে আসীন রহিয়াছেন; ৫ বৎসর কাল সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন; বহরমপুর কারাগারের বে-সরকারী পরিদর্শকের পদে ৪ বৎসর কাল এবং সদর মহকুমার কারাগার-স্থিত রাজনৈতিক বন্দীদিগের বে-সরকারী পরিদর্শকের পদে ২ বৎসর কাল নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বহরমপুর দাতব্য চিকিৎসালয়, বেঙ্গল হোম ইণ্ডাষ্ট্রিস্ এসোসিয়েসন এবং বহরমপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেশন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী; বাণ্ডেটিয়া প্রদর্শনীর সহকারী সেক্রেটারীর কার্য্য ২৪ বৎসর কাল করিতেছেন; কলিকাতার

প্রভিন্সিয়াল ফেডারেশনের তিনি জনৈক ডাইরেক্টর; জেলা কৃষি-সমিতির সদস্য, বহরমপুর সদর বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট; মুর্শিদাবাদ এসোসিয়েসনের সদস্য; স্বর্গীয় রায় এম এন বর্ম্মণের বিধবাপত্নী ও সন্তানগণের ট্রষ্টি; পরলোকগত নন্দলাল রায় মহাশয়ের সাধারণ ফণ্ডের এষ্টেটের ট্রষ্টি।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর সিংহাসনাধিরোহণের সময়ে নীলমণিবাবু গবর্মেণ্টের নিকট হইতে সম্মানসূচক সার্টিফিকেট (Certificate of Honour) প্রাপ্ত হন।

নীলমণিবাবুর একটী মাত্র পুত্র; পুত্রটী এখনও শিশু।

শালঙ্কায়ণগোত্র দাস বংশ।

পঞ্চপ্রবর, ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জমদগ্নি, আপ্লুবান।

প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বীরবর সদানন্দ দাস পূর্ব্ববঙ্গের পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যু দমনের জন্য প্রেরিত হন। তাঁহার বীরপণায় সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে 'রাজা সংগ্রামসিংহ' উপাধি প্রদান করেন। এই 'রাজা সংগ্রামসিংহ' উপাধিকে কেহ কেহ 'রাজা সংগ্রাম সাহ' উপাধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সদানন্দ দাসকে কেহ বা সনাতন সিংহ নামে আবার কেহবা নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, উক্ত সদানন্দ দাস মহোদয় চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি রাঠোর রাজপুত বংশীয় ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যোধপুরে বাস করিতেন। এই শালঙ্কায়ণ বংশের উপাধি ভায়া, লালা ইত্যাদি হিন্দুস্থানী উপাধির অনুরূপ। সদানন্দ দাসের পুত্র মহাত্মা বলভদ্রদাস, ইনি রাঢ় হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এই বংশে কুলজীর উপরিভাগে বর্ণিত নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বলভদ্রদাস রাজপুত হইলেও কালের কুটিলচক্রে নিপতিত হইয়া তিনি প্রথমে গৌড়দেশে, তৎপর রাঢ়দেশে অতঃপর রাঢ়দেশ হইতে এই মগধস্থিত বঙ্গরাজ্যে অর্থাৎ চট্টগ্রাম আগমন করিয়াছিলেন।

"গৌড়দেশে স্থিতঃ পূর্ব্বং রাঢ়ায়াঞ্চ ততঃ পরং।
মগধস্থিতে বঙ্গরাজ্যে বলভদ্রোহি দাসকঃ॥"

চট্টগ্রামের অন্তর্গত ছনদণ্ডী গ্রামেই তিনি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র দুর্গাদাস খাঁ ও গোবিন্দ দাস। দুর্গাদাস খাঁ দিল্লীর রাজদরবারে খাঁ উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ভায়া মণিরাম, লালা যোগীরাম, লালা নন্দরাম, লালা শ্যাম সুন্দর এই বংশের খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইংরেজ আমলে দেওয়ান গৌরীচরণ, দেওয়ান কালীচরণ, দেওয়ান চণ্ডীচরণ, দেওয়ান বৃন্দাবন, রামদুলাল কানুনগো, রামকিশোর কানুনগো, লালা রামহরি, নন্দকিশোর কানুনগো এবং হরিদাস কানুনগো যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালি ও শ্রীহট্ট প্রদেশে এই বংশের বহুকীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। বাখরগঞ্জের সংগ্রামগড় চিরপ্রসিদ্ধ। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ বারটী বাড়ী ও তেরটী খামার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এই সুপ্রসিদ্ধ বংশে বহু স্বনামখ্যাতা রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাণী দুর্গাবতী, প্রভাবতী ঠাকুরাণী, অম্বিকাসুন্দরী, সর্ব্বমঙ্গলা, করুণাসুন্দরী ইত্যাদি। মহাতীর্থ চন্দ্রনাথ ও আদিনাথ ধামে এই বংশের খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত বহু মন্দির এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বংশের বহু ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রদত্ত বহু দেবদেবীর মঠ, অনেক দীঘি, জলাশয় এবং সেতু চট্টগ্রামের নানাস্থানে পরিশোভিত রহিয়াছে। ইহাদের নামে কত হাট, ঘাট ও বাজার প্রতিষ্ঠিত এবং কত প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এই বংশের কীর্ত্তিমান পুরুষ ভায়া মণিরামের নামানুসারেই চট্টগ্রাম সহরের বাগমণিরাম অভিহিত। এই বংশের ধার্ম্মিক প্রবর শরৎবাবু সমগ্র মহিষখালি দ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথের মোহান্ত গোমতীবন বাবাজী তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। মোহান্ত গোমতীবন বাবাজী ও শরৎবাবুর যোগবল সম্বন্ধীয় বহু অলৌকিক ঘটনা চট্টলের প্রতিগৃহে এখনও ঘোষিত হইয়া

রায় প্রসন্নকুমার রায় বাহাদুর।

থাকে। শরৎবাবুর পুত্র কৈলাস বাবু বিচক্ষণ লোক ছিলেন। কৈলাস বাবুর পুত্র জমিদার রায় প্রসন্নকুমার বাহাদুর বর্ত্তমানে এই বংশের কুল-তিলক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি উদারহৃদয়, দানশীল, পরদুঃখকাতর, অতি সজ্জন, বিদ্বান ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। বহুবৎসর ধরিয়া তিনি চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যানের কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। তদীয় সহধর্ম্মিণী দানশীলা ৺শরৎশশী রায় তাঁহার জীবদ্দশায় বহু সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তিনি রমণী সমাজে আদর্শ স্থানীয়া। প্রসন্ন বাবুর তিন পুত্র—প্রথম শ্রীযুক্ত বিনোদলাল রায় জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট; দ্বিতীয় পুত্র ৺দীনেশচন্দ্র রায় কয়েক বৎসর হইল অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। দীনেশ বাবু পরৈযোড়া কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি, চট্টগ্রাম বিদ্যাবিনোদিনী সভার সম্পাদক ও চট্টগ্রাম সাহিত্য সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। জমীদারী শাসন কার্য্যে তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায় তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন; তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মিত্র জমিদার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর এবং মিউনিসিপাল কমিশনার। শালঙ্কায়ন বংশ চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরৈযোড়া, ধোরলা ও ছনদন্দী এই তিনটী প্রসিদ্ধ গ্রামে সম্প্রতি বসবাস করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন কালবিপর্য্যয়ে এই প্রাচীন বংশের কেহ কেহ পাটনীকোঠা, নয়াপাড়া, ফতেয়াবাদ, দেবগ্রাম, রঙ্গণীয়া, গুয়াতলী, সুচিয়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন দেখা যায়। পরৈযোড়া গ্রামের শালঙ্কায়ণ বংশই বিশেষ উন্নত। জমিদার রায় বাহাদুর প্রসন্নবাবু ব্যতীত এই বংশে আরও অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম করা যাইতে পারে। এই বংশের রাজা রাজবল্লভ কানুনগো মহাশয়ের নাম চট্টগ্রামে সর্ব্বত্র পরিচিত।

তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা চট্টলের সর্ব্বত্র লোকমুখে শুনা যায়। তাঁহার দুই পুত্র—দামোদর কানুনগো ও বলভদ্র কানুনগো। রাজা রাজবল্লভের বহু কীর্ত্তি ছিল। কাল বিপর্য্যয়ে সে কীর্ত্তি ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। রাজা রাজবল্লভের রাজবাটী ও দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও পরৈযোড়া গ্রামে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। নিয়তির বিধানে তাঁহার বংশধরেরা এক্ষণে সামান্য চাকুরীমাত্র অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। এই বংশের পুণ্যবতী রমণী সম্পূর্ণা ঠাকুরাণীর প্রাচীন শিবমন্দির এখনও পরৈযোড়া গ্রামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বংশে সেরেস্তাদার গোবিন্দবাবু একজন ধার্ম্মিক ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুকবি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সবরেজিষ্টার; তিনি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র রায় বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের পার্শনেল এসিষ্টাণ্ট। এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও সুকবি শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত বি এ, বি, টী মহাশয় কলিকাতা ট্রেণিং স্কুলের ভাইস প্রিন্‌সিপাল। তিনি কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত 'পরাগ' প্রভৃতি সাহিত্য জগতে সুপরিচিত। এই বংশের রামকমল চৌধুরী অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং বহু বৎসর ব্যাপিয়া রাঙ্গামাটী উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস, বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন; তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর দাস, বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ধোরলা গ্রামে এই বংশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ৺ভবানীচরণ ভবাই সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। উক্ত গ্রামের মধ্যভাগে "ভবাই দীঘি" এখনও

শ্রীযুত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী।

বিদ্যমান রহিয়াছে। হরির দীঘি, গোবিন্দরাম চৌধুরীর দীঘি, চৌধুরীর বড় দীঘি উক্ত গ্রামের শোভা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। ধোরলা গ্রামের শালঙ্কায়ণ বংশের বহু দানধর্ম্ম, কীর্ত্তিকলাপ চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই বংশে বহু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বহু বিপ্রকে জলাশয় ও জমিসহ বাড়ি ভিটা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধি আছে কানুনগো পাড়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্ববিদ্যাবংশ ধোরলা গ্রামের শালঙ্কায়ণ বংশের স্থাপিত ব্রাহ্মণ। এই বংশের কয়েক জন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চৌধুরী—শ্রীমৎ পরমানন্দ পরমহংস নাম ধারণ করিয়া বৃন্দাবনধামে ৺রাধাকুণ্ডের পায়ে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি নিরুদ্দেশ। এই গ্রামে এই বংশের দুর্গাদাস চৌধুরী, বৈষ্ণব চরণ চৌধুরী, কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী এবং মুরলীধর চৌধুরী বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। ৺মুরলীধর চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র সংস্কৃতজ্ঞ শ্রীযুক্ত দিগম্বর চৌধুরী কবিরাজ মহাশয় চট্টগ্রামের একজন বহুদর্শী প্রধান আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রামের একজন কৃতি সন্তান। তিনি স্বদেশবৎসল সুবিদ্বান, তেজস্বী, পরদুঃখকাতর ও উন্নতহৃদয় ব্যক্তি। চট্টগ্রামের যাবতীয় সদনুষ্ঠানে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

(১) অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনার, চট্টগ্রাম
(মিউনিসিপাল করদাতা সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)

(২) চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি।
(চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)

(৩) চট্টগ্রাম নাইটস্কুল কমিটীর সম্পাদক।

(৪) চট্টগ্রাম হিত-সাধন-মণ্ডলীর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ।

(৫) চট্টগ্রাম আর্য্য সঙ্গীত সমিতির সভাপতি।

(৬) চট্টগ্রাম এসোসিয়েসনের ধনাধ্যক্ষ।

(চট্টগ্রাম এসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক)

(৭) চট্টগ্রাম টাউনহল বিল্ডিং কমিটীর সম্পাদক।

(৮) চট্টগ্রাম কটন কমিটীর সম্পাদক ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরা বাবু চট্টগ্রাম মহালক্ষ্মীবেঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার এবং ধোরলা, কানুনগোপাড়া কো-অপারেটিভ বেঙ্কের সভাপতি। তিনি বহু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের মেম্বর ও সভাপতিরূপে কার্য্য করিতেছেন। তিনি প্রতিবৎসর চট্টলের বিভিন্ন গ্রামের সভাসমিতিতে সভাপতিত্ব করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য জননায়কদের ন্যায় শুধু চট্টগ্রাম সহরে তাঁহার কার্য্য সীমাবদ্ধ নহে। তিনি গ্রামের অভ্যন্তরে কার্য্যসীমা বিস্তার করিয়াছেন। তিনি একজন সাহিত্যিক; ভারতবর্ষ, সুপ্রভাত প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অনেক সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন। এই বংশের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরীর সাময়িক পত্রিকায় অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি প্রবাহিকা, নিমীলন প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

ছনদণ্ডী গ্রামে এই বংশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি—লক্ষর দাস সরকার। তিনি সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। তাঁহার নামে দীঘি, রাস্তা ও শিবমন্দির উক্ত গ্রামে আছে। রাজা রাজবল্লভ কানুনগো মহাশয়ের দীঘিও উক্ত গ্রামে দেখা যায়। এই গ্রামে এই বংশে বৃন্দাবন চৌধুরী, ত্রাহিরাম চৌধুরী, রাধামোহন দাস, নূতনচন্দ্র দাস, চন্দ্রকুমার দাস ও চন্দ্রকান্ত দাস বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত কালীকুমার দাস কবিরাজ মহাশয় চট্টগ্রাম সহরে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ছনদণ্ডী গ্রাম শালঙ্কায়ন বংশের আদি নিবাস হইলেও

এক্ষণে এই গ্রামে এই বংশের অনেকটা অবনতি হইয়াছে। ইহাদের অনেকেই কালবিপর্য্যয়ে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। এই বংশের শ্রীযুক্ত রমণীরমণ চৌধুরী বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

এই শালঙ্কায়ণ বংশ যদিও দাস উপাধি দ্বারা ভূষিত, তথাপি অনেকে রাজসম্মানে ভূষিত হওয়ায় কেহ বা রায়, কেহ বা 'লালা,' কেহ বা 'কানুনগো,' কেহ বা 'চৌধুরী,' উপাধি লিখিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে আবার কেহ বা 'দাস গুপ্ত'ও লিখিতেছেন, এই শালঙ্কায়ণ গোত্র দাস চট্টগ্রামে প্রথম শ্রেণীর বৈদ্যজাতি।

স্বর্গীয় গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী।

যে সকল মহানুভব কর্ম্মবীর এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বদেশকে ধন্য এবং জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন, পরলোকগত গোলাপচন্দ্র সরকার তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাঁকুড়া জেলায় এতাবৎকাল তাঁহার মত যশস্বী আর কেহ হইতে পারেন নাই। ইঁহার পিতার নাম শম্ভুচন্দ্র। গোলাপচন্দ্র পিতার তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন। কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নটবর সরকার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া এম, বি উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সার্জ্জারি (ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যায়) প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইন্দাসের সরকার পরিবার বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশ বলিয়া চিরকাল পরিচিত। গোলাপচন্দ্র কলিকাতায় বাল্যকাল হইতে শিক্ষিত হন এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষার প্রতি অনুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় এবং গণিতে ইঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের এম, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী ইঁহার সতীর্থ। ইনি তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কাওয়েল (Cowell) সাহেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং গুরুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তিনি তাঁহার প্রণীত হিন্দু আইন (Hindu Law) কাওয়েল সাহেবের নামে উৎসর্গ করেন।
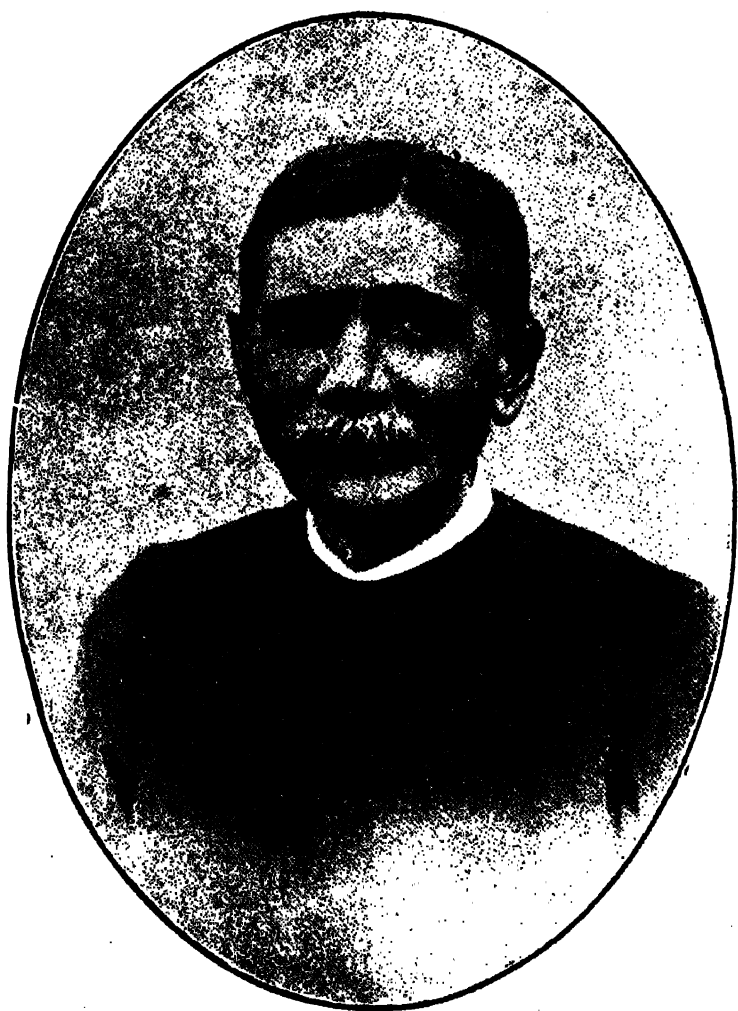
স্বর্গীয় গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২রা এপ্রেল হাইকোর্টের উকিল শ্রেণীভুক্ত হন, এবং দুই এক বৎসরের মধ্যে তিনি ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়েন। তিনি হিন্দু আইন সম্বন্ধে প্রামাণ্য (authority) বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং হিন্দু আইন তাঁহার এক প্রকার একচেটিয়া হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন উকিল হাইকোর্টে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। দেশে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত থাকিলেও তাঁহারা আইনজ্ঞ ছিলেন না এবং আইনজ্ঞ উকিল সংস্কৃত ভাষায় এবং শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং হিন্দু আইন, প্রধানতঃ এই ইংরাজী আমলের হিন্দু বিধিব্যবস্থা কিরূপ আকার ধারণ করিবে তাহা কেহই সুচারুরূপে নিরূপণ করিতে পারিতেন না। তাই যেন ভগবান গোলাপচন্দ্রকে পাঠাইলেন। গোলাপচন্দ্রের পাশ্চাত্য আইনে যেরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল, শাস্ত্রেও তদনুরূপ গভীর পাণ্ডিত্য ছিল; সুতরাং এই উভয়ই তাঁহাতে যেন মণিকাঞ্চন যোগ হইল এবং তাঁহার প্রণীত হিন্দু আইন এবং তাঁহার মুখোচ্চারিত হিন্দু আইনের বিধি (legal opinion) অভ্রান্ত এবং প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার যশোরশ্মি সমগ্র ভারতবর্ষে উদ্ভাসিত হইল। তিনি মান্দ্রাজ হাইকোর্টে পক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত দুইবার এবং নাগপুর মধ্য প্রদেশের বিচারালয়ে একবার আহূত হন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শেষোক্ত আদালতে আর একবার আহূত হন। কিন্তু সেখানে কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ভিজিগাপাটামে তিনি আর একটি মোকদ্দমাসূত্রে নিযুক্ত হন। সময়ে সময়ে হাইকোর্টের Original Sideএ ও লেটারস পেটেন্টের (Letters Patent) বিশেষ নিয়ম অনুসারে হিন্দু আইনের কতিপয় কূট এবং জটিল বিষয় মীমাংসার

নিমিত্ত তাঁহার সাহায্য প্রার্থিত হয়। হিন্দু আইন সম্বন্ধে তাঁহার মত এত প্রবল হইয়াছিল যে, বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় জজেরাও তাঁহার মত উদ্ধৃত করিতেন এবং কোন কারণে মতদ্বৈধ হইলেও তাঁহার প্রতি সম্মানসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। লর্ড ষ্টেনলে (Lord Stanley) তাঁহাকে এই সময়ে জুডিসিয়াল কমিটি সংক্রান্ত এসেসর (Assessor) পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাত যাইতে তাঁহার আপত্তি ছিল বলিয়া তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন।

গোলাপচন্দ্রের যশঃ যে শুধু তাঁহার আইন-জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে; তাঁহার সকল বিষয়েই অগাধ পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা ছিল; এবং সেইজন্য শিক্ষা বিভাগেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক মেট্রপলিটন ল কলেজ (Law College) এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং যতদিন এই Law College বর্ত্তমান ছিল ততদিন তিনি সুখ্যাতি ও পারদর্শিতার সহিত আইন অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই সময়ে তিনি ছাত্রদিগকে যে নোট্ দিতেন তাহাই তাঁহার বন্ধুদিগের অনুরোধে হিন্দু আইনে পরিণত হয়। বিদ্যাসাগরের পরলোক গমনের পর মেট্রপলিটন কলেজের যখন পতনাবস্থা হয় তখন তিনি তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন এবং কলেজ কাউন্সিলে সেক্রেটারী পদ স্বীকার করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কলেজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ল কলেজ স্থাপিত হইল, তখন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে প্রিন্সিপালের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং অধ্যাপকের কার্য্য নির্ব্বিরোধ এবং শান্তিপূর্ণ বলিয়া তাহাই গ্রহণ করেন। অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন যে,

সুপরিচালিত স্বতন্ত্র (Private) ল কলেজের পরিচালন-প্রণালী ১৮৯২ সালে তাঁহারই মস্তিষ্ক হইতে প্রথম উদ্ভূত হয়। কিন্তু নানা বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ল কলেজ স্থাপিত হইলে তিনি ডিন (Dean) পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তিনি তাঁহার পরামর্শ এবং সাহায্য-দানে আইন শিক্ষা প্রণালীর চরম উৎকর্ষ সাধিত করেন। এতদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আরও অনেক সম্মানপ্রাপ্ত হন। তিনি Fellow, Syndicate-এর মেম্বর, ডিন, উচ্চ পরীক্ষার পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হইয়া শিক্ষা কার্য্যের যথেষ্ট পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঠাকুর আইনের লেকচারার (Tagore Law Lecturer) নিযুক্ত হন এবং সেই সময় দত্তক আইন (Law of Adoption) সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণাপূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা দত্তক আইনের চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া এখনও গৃহীত হয়। পরে উহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া Law of Adoption নামক পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেকানেক হিন্দু শাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ভারতবর্ষকে ঋণী এবং বঙ্গবাসীকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। বীরমিত্রোদয়, দায়তত্ত্ব, দায়ভাগ, বিবাদরত্নাকর প্রভৃতি অত্যাবশ্যক হিন্দু আইনের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া হিন্দু আইনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ফলতঃ গোলাপচন্দ্র বর্ত্তমান হিন্দু আইনকে নবজীবন দান করিয়াছেন। প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এবং প্রভূত সম্মানে ভূষিত হইয়া তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২৪শে আগষ্ট মঙ্গলবারে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র সকলেই মনে করিলেন ভারতাকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র অন্তর্হিত হইল। চারিদিকেই শোকসভা হইতে লাগিল। হাইকোর্টে যে শোকসভা

হইয়াছিল, তাহাতে (প্রধান বিচারপতি) Chief justice Sir Lawrence Jenkins যাহা বলিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"একজন বিচক্ষণ আইনজ্ঞ এবং ধীমান্ পণ্ডিত আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন! তাই অদ্য আমরা গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্য শোক করিতেছি! প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শক্তির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার মত আইনজ্ঞ পণ্ডিত এবং প্রকৃত শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু আইনকে বুঝাইতে আর দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না। তাহার পর হইতে তাঁহার বন্ধুগণ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, যদিও তাঁহার মেধা পূর্ব্বের ন্যায় তীক্ষ্ণ ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া আসিতেছিল। তথাপি তিনি যে এত শীঘ্র মারা যাইবেন, তাহা কেহ ভাবেন নাই এবং তাঁহার মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। কেবল মাত্র গত কল্য কোন মোকদ্দমায় তাঁহার রচিত যুক্তি তর্কে (Sec 19 C W N 1181) তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণতা দেখাইয়াছেন তাহা আমি আলোচনা করিবার অবসর পাইয়াছি। অসুস্থতানিবন্ধন তিনি বিচারালয়ে আসিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন নাই, সেজন্য তাঁহার পুত্র সেই কার্য্য তেজস্বিতা ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি আমরা যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছি। তাঁহার সহিত আমরাও শোক করিতেছি এবং যদিও আমাদের দুঃখ তাঁহার মত নহে তথাপি তাঁহার ন্যায় বন্ধুর বিয়োগে যে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা কাঙ্গাল হইলাম তাহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি। কারণ তাঁহার পাণ্ডিত্যে, আত্মোৎকর্ষে এবং অকলঙ্ক চরিত্রে আমরা সম্মান এবং প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারি নাই।"

গোলাপচন্দ্রের জীবনে আমরা এই একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, ইংরাজী বিদ্যার চরম শিখরে আরোহণ করিয়া, প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াও এবং ইংরাজরাজের প্রিয়পাত্র হইয়াও তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক হন নাই। তিনি সাহেব সাজেন নাই, তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতায় গা ঢালিয়া দেন নাই। তিনি নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিয়া যান নাই। তিনি যে হিন্দু সন্তান ছিলেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই হিন্দু সন্তানই ছিলেন। তিনি হিন্দুজাতিসুলভ সরলতা পোষাক-পরিচ্ছদে আড়ম্বরশূন্যতা, চালচলনে অভিমানহীনতা এবং স্বসমাজে, স্বধর্ম্মে দৃঢ়তা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং এরূপ দীনভাবে থাকিয়াও তিনি যথেষ্ট সম্মান এবং যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠতা সম্বন্ধে তাঁহার প্রণীত হিন্দু আইন (Hindu Law Chap. III p, 89) হইতে কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—

"অনেকেই পাশ্চাত্য জাতিদিগের ঐহিক সভ্যতা এবং রাজনীতিক উন্নতি দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া আপনাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং ধর্ম্মকে তাহাদের সামাজিক নিয়মপ্রণালীর তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করে। খ্রীষ্টানদিগের পরস্পর সম্মতিক্রমে বিবাহপদ্ধতিটা তাঁহাদিগের চক্ষে বড়ই ভাল লাগে, এবং হিন্দুদিগের অন্য প্রকার বিবাহপ্রথা তাঁহাদের নিকট সভ্যতাবিরুদ্ধ এবং জঘন্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু প্রকৃত হিন্দুগণ বলিবে যখন তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী অথবা অন্য অন্য আত্মীয় তোমার নির্ব্বাচিত নহে, তখন তোমার স্ত্রীটি কেবল তোমার নির্ব্বাচিত হইবে ইহা কি প্রকার? মা, বাপ, ভাই, ভগিনী যদি তোমার নির্ব্বাচিত না হইয়াও তোমার প্রিয় হইতে পারে, তখন তোমার স্ত্রী তোমার মাতা পিতা বা অপর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াও তোমার মনোমত হইবে না কেন? এরূপ স্ত্রী যে প্রিয় হইতে পারে তাহা হিন্দু সমাজে স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। পরস্পর সম্মতিক্রমে

উদ্বাহপ্রথা যে দোষাবহ তাহা খ্রীষ্টান সমাজে ডাইভোর্স বা বিচ্ছেদের বাহুল্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, এবং এরূপ বিবাহ যে সাংসারিক সুখের সমীচীন পথ নহে তাহাও বুঝা যাইতেছে। আবার দেখা যায় যে, রাজনীতিক উন্নতি এবং ধর্ম্মোন্নতি পরস্পরবিরুদ্ধ, ইহা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মত, কারণ কোন জাতি রাজনীতিক উন্নতি প্রাপ্ত হইতে গেলে অনেক সময়ে অন্য জাতির ধ্বংসের কারণ হয়, ইহা অবশ্যই ধর্ম্মবিরুদ্ধ।"

এইরূপ Hindu Law এবং তাঁহার Law of Adoption এ গোলাপচন্দ্র হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং মূল মন্ত্র সাহেব এবং সাহেবিয়ানা হিন্দুদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার Law of Adoption এর দ্বিতীয় লেকচার সকল হিন্দুরই পাঠ করা উচিত। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া আমরা হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দু সমাজের মূলমন্ত্রগুলি একে একে ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি এবং তাহাদিগের পরিবর্ত্তে একে একে বিজাতীয় ভাবগুলি আনয়ন করিয়া আমাদিগের অধোগতির পথ পরিষ্কার করিতেছি। তাঁহার Law of Adoption Lecture II, p, 37, হইতে কয়েক পংক্তির নিম্নে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

"বৈদেশিকগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না কি প্রকারে হিন্দু সমাজে দারিদ্র্যপীড়িত গরিব দুঃখিগণ সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করে। তাঁহারা জানেন না যে, ধর্ম্মের গভীর তথ্যসকল তাহাদের অস্থিমজ্জাগত থাকাতেই তাহারা ঐহিক সুখকে ভ্রুক্ষেপ করে না এবং সেই জন্যই প্রফুল্ল থাকে।"

হিন্দু আইন লিখিয়া গোলাপচন্দ্র যে দেশের কি মহৎ উপকার করিয়াছেন অনেকেই তাহা অবগত নহেন। তৎকালে মেন (Mr,

Mayne) কোলব্রুক (Mr, Colebrooke) প্রভৃতি সাহেব-রচিত হিন্দু আইন প্রচলিত ছিল এবং তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইত। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, হিন্দুর সনাতন আইন তাহাদের হস্তে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ ইংরাজী ছাঁচে নূতন করিয়া গড়া হইতেছিল। এরূপ সঙ্কট সময়ে গোলাপচন্দ্র না দাঁড়াইলে হিন্দুদিগের যে দুর্গতি হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি মেন, কোলব্রুক, মেকনাফটেন প্রভৃতি কৃত হিন্দু আইনের পঙ্কোদ্ধার করিয়া এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে মূল গ্রন্থ হইতে বিধি উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া হিন্দু আইনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছেন। তিনি এই মহৎ কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য কত পরিশ্রম, কত স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার বিষয় নহে এবং বিজাতীয় বিচারকর্ত্তাদিগের ভুল ও পাশ্চাত্যপ্রিয়তাদোষ দেখাইতে যে তিনি কি প্রকার সৎসাহস, ন্যায়পরায়ণতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার রচিত হিন্দু আইন যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনিই অবগত আছেন। সাহেব-বিচারকগণ যখন হিন্দু স্ত্রীজাতির স্বত্ব ক্রমশঃ সঙ্কোচ করিয়া আসিতেছিলেন তখন তিনি তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে পাঠক-পাঠিকা বুঝিতে পারিবেন :—

"কি দায়ভাগ, কি মিতাক্ষরা উভয় মতেই স্ত্রীজাতি-সংক্রান্ত আইন তাহাদিগের বিপক্ষে অর্থ করা হইয়াছে। ঐহিক সভ্যতায় হীন ভারতবর্ষের মত দেশেও যে হিন্দু রমণীগণ বিলাতি রমণীগণ অপেক্ষা উচ্চতর অধিকার ভোগ করিবে ইহা সাহেব আইনজ্ঞদিগের ধারণার অতীত ছিল।" প্রকৃত স্বদেশপ্রেম ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা না থাকিলে তিনি কখনই এ মহৎকার্য্য করিতে পারিতেন না।

গোলাপচন্দ্র নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন কি প্রকারে স্কুল কলেজের শিক্ষালব্ধ বিদ্যাকে স্বদেশের কার্য্যে, স্বদেশের সেবায় উৎসর্গ করা যাইতে পারে। তিনি M, A, B, L, পাশ করিয়া হাইকোর্টের উকিল হইয়াই তাকিয়া আশ্রয় করেন নাই। তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আইন, গণিত ব্যতীত, দর্শন, ইকনমিক্স, পলিটিক্যাল ফিলসফি, য়্যানাটমি, ফিসিয়লজী প্রভৃতি সকল বিষয়েরই চর্চ্চা করিতেন এবং তাঁহার বিশাল পুস্তকাগার তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই সকল পুস্তকে তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত টীকাটিপ্পনী এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বিদ্যা "পুস্তকস্থাপিতা" ছিল না। তিনি যাহা পাঠ করিতেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাহা নিয়োজিত করিতেন। এইরূপ করিতেন বলিয়াই তিনি বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি এবং পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিলেন এবং হিন্দু আইনের মত একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ লিখিয়া আপনাকে এবং দেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। গোলাপ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ সরকার, দ্বিতীয় পুত্র সতীন্দ্র নাথ সরকার, বি, এ, তৃতীয় পুত্র ৺জগদিন্দ্র নাথ সরকার বি, এ, পরলোক গমন করিয়াছেন। গোলাপবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ঋষীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ, বি, এল হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। ইনি সম্প্রতি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউনসিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত ঋষীন্দ্রনাথ সরকার

টেপার জমিদার বংশ।

পরগণা টেপা পূর্ব্বে ফতেপুর চাকলার অধীন ছিল। উক্ত ফতেপুর চাকলা, কাকিনা, বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ সহকারে কোচবিহার রাজ্যের অংশভুক্ত ছিল। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সেনানী এবাদৎ খাঁ রংপুর আক্রমণ করতঃ চাকলা কাকিনা ও ফতেপুর অধিকার করেন, কিন্তু তাঁহার সৈনিকগণ কোচবিহারাধিপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায় অন্যান্য চাকলা অধিকারভুক্ত করিতে পারেন নাই। প্রায় পঞ্চবিংশ বর্ষ যাবৎ মুসলমানগণ কোচবিহার অধিকারভুক্ত করিবার আশায় ভীষণ যুদ্ধ করেন। অবশেষে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার রাজের ভ্রাতা শান্তনারায়ণের পরাক্রমে মুসলমানদিগকে সন্ধিসূত্রে বাধ্য হইতে হয়। উক্ত সন্ধি অনুসারে চাকলা বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ নামমাত্র মুসলমানদের অধীন করিয়া শান্তনারায়ণ ঐ সকল চাকলা কোচবিহার রাজের পক্ষে ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

তুষভাণ্ডার ও কাকিনার ন্যায় টেপার তৎকালীন জমিদারগণও মুসলমানগণের আমলের পূর্ব্বে কোচবিহারাধিপতি রূপনারায়ণের অধীনে বর্ত্তমান করদ মিত্র রাজগণের মত করদ ভূস্বামী (Feudatory) ছিলেন। তখন কোচবিহারের রাজা ছিলেন তথাকার Paramount Chief, আর বর্ত্তমান জমিদাররা ছিলেন feudal nobles. ইউরোপের মধ্যযুগের মত তখন জমিদারগণের অবস্থা। মুসলমানগণ এই প্রদেশ যখন প্রথম আক্রমণ করেন, তখন টেপার বর্ত্তমান জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মহাদেব রায় অরাতি সৈন্যগণকে বাধা প্রদান

করিয়াছিলেন। কিন্তু এবাদৎ খাঁর সুশিক্ষিত বিপুল বাহিনীর নিকট পরাভূত হন। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক তাঁহার সম্পত্তি অধিকৃত হইলে তখন বাধ্য হইয়া তিনি মুসলমান সেনাপতির সহিত সন্ধি করেন। এবং এবাদৎ খাঁ তাঁহাকে মুসলমানদিগের অধীনে জমিদার বলিয়া স্বীকার করেন। এই সময় হইতে টেপার অবস্থা করদ ভুস্বামী হইতে জমিদাররূপে পরিণত হয়। ১৭৬৫ খ্রীঃ হইতে ইংরাজ অধিকার পর্য্যন্ত টেপার জমিদারগণ জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন।

মুসলমান অধিকার হইতে টেপার জমিদার-বংশের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহাদেব রায় এবাদৎ খাঁর সহিত প্রথম বন্দোবস্ত করেন। তিনি এবং পরে তাঁহার পুত্র মনোমোহন রায় চৌধুরী মুসলমানগণের আমলে জমিদারগণের সম্পূর্ণ অধিকার পরিচালনা করিয়াছেন; মুসলমানেরা তাহাতে কোন বাধা প্রদান করেন নাই। বরং মনোহর রায়কে "চৌধুরী" উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই হইতে "রায় চৌধুরী" উপাধি চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানদের এবং ইংরাজদের সহিত বন্দোবস্ত-কালের যে সব ফরমান কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ ছিল তাহা ১৩০৩ সালের ভূমিকম্পে দালান চাপা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। টেপার তৎকালীন ভূস্বামীগণের বিচারালয় ছিল এবং প্রজাদের মধ্যে যে সমুদয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা হইত তাঁহার নিষ্পত্তি তাঁহারাই করিতেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী জয়মণি চৌধুরাণী মহাশয় জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় এই প্রদেশে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১৮৪ বঙ্গাব্দে যখন সমুদায় জেলার ইজারা বন্দোবস্ত হয় তখন টেপার এবং অন্যান্য জমিদার বংশের অত্যন্ত দুঃসময় বলিতে হইবে।

স্থানীয় জমিদারদিগের দাবী উপেক্ষা করিয়া বর্দ্ধিত হারে অন্যান্য ইজারাদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করায় জমিদারগণ তৎকালে অতি দুঃখে পতিত হইয়াছিলেন। জমিদারগণ কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী প্রাপ্তির বহুপূর্ব্ব হইতে ভূমির পুরুষানুক্রমিক অধিকারী ছিলেন। এক্ষণে ঐ সকল ইজারদার জমিদারদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জমিদারগণ মুসলমানদিগের রাজত্বকাল হইতে এ পর্যন্ত অর্দ্ধ স্বাধীন ছিলেন; এক্ষণে তাঁহাদের কিছুই থাকিল না। ইজারদারগণ বর্দ্ধিত খাজনা, দড়িভিন্না এবং কোচবিহারের নারায়ণী মুদ্রার প্রচলন রহিত করিয়া প্রজাদের নিকট হইতে ফরাশী আর্কট টাকার বাট্টা প্রভৃতি নানারূপ আবওয়াব আদায় করিয়া লইত এবং নানারূপ অত্যাচার করিয়া কৃষকগণকে ভূমি হইতে বিতাড়িত করিত। এই প্রকার অত্যাচারে দেশের সর্ব্বত্রই প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল; পরন্তু কোন কোন ক্ষুদ্র জমিদার ঐ বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর এই দুঃসময়ে টেপার জমিদারগণ বিদ্রোহে লিপ্ত হন নাই এবং তাঁহাদের এলাকায় পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহীগণের আক্রমণ হইলেও তাঁহারা কখনও তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন নাই, পরন্তু পূর্ব্বাহ্নে গভর্ণমেন্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। ১৭৮২—৮৩ খৃঃ টেপার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসময়। এই সময়ে একদল বিদ্রোহী টেপায় উপস্থিত হইয়া তথাকার নায়েব এবং আরও ৭।৮ জন কর্ম্মচারীকে হত্যা করে। (Vide Rungpur District Gazetteer by Mr, Glazier) তৎকালে টেপার বাড়ীতে কেবল মাত্র ৺জয়মণি চৌধুরাণী মহাশয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহস সহকারে বিদ্রোহীদিগকে নিজ বাড়ী হইতে দুরীভূত করেন। এখানেই তাঁহার দুঃখের পর্য্যবসান

হয় নাই। পুনরায় দেবী সিংহের লোকজন (vide Rungpur District Gazetteer by Mr. Glazier ও মুর্শিদাবাদ কাহিনী by নিখিলনাথ রায়) (সম্ভবতঃ ইহারা স্ত্রী সৈন্য হইবে) বলপূর্ব্বক টেপার বাড়ীতে প্রবেশ ও জুলুম করিয়া তাঁহার নায়েব ইজারদারকে বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিবার একরারনামা দিতে বাধ্য করে। অতঃপর স্বর্গীয়া জয়মণি চৌধুরাণীর সহিত দশশালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই সময় হইতে পরগণার দুঃখদারিদ্র্য দূরীভূত হইল।

৺জয়মণি চৌধুরাণী মহাশয়া বদান্যতাগুণে সর্ব্বত্র সুপরিচিতা ছিলেন, এবং স্বগ্রাম টেপা মধুপুরে ৺শিব ও কালী দেবীর অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; পরে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ কর্ত্তৃক আরও কয়েকটী মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই কালী বাড়ীতে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ আছেন। প্রবাদ যে বর্ত্তমান টেপা পরগণায় পূর্ব্বে লস্কর উপাধিধারী এক বংশ ছিল। এখনও টেপা গ্রামে "লস্কর পাড়া" বলিয়া একটা পাড়া আছে; কিন্তু লস্কর বলিয়া কেহ নাই এবং অবস্থাপন্নও কেহ নাই, কোনও রূপ ধ্বংসাবশেষ চিহ্নও নাই; তবে কাছে একটী দিঘী আছে, তাহার নাম "চাকীর দিঘী"; এই চাকী কে এবং লস্করদের সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক ছিল জানিবার উপায় নাই। প্রবাদ এ সম্বন্ধে মূক। বর্ত্তমান জমিদার বংশের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত মহাদেব রায় মহাশয় কোচবিহার রাজ্যে চাকরীকালীন যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত লস্করকে ধার দেন। ধার দিবার সময় এই সর্ত্ত হয় যে, নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে টাকা শোধ করিতে না পারিলে বন্ধকী সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হইবে। বলা বাহুল্য, সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে লস্কর টাকা দিতে পারিল না; সম্পত্তি বর্ত্তমান বংশের প্রতিষ্ঠাতার হস্তগত হইল। কোচবিহার রাজও তাঁহাকে করদ ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

রায় অন্নদামোহন রায়চৌধুরী বাহাদুর।

লেপ্টন্যাণ্ট নলিনীমোহন রায়চৌধুরী।

কথিত আছে, জয়কালীমাতা জাগ্রতা। কালীমাতাকে বিনা মিষ্টিতে টক রাঁধিয়া কখনও ভোগ দেওয়া হয় না। শুনা যায়, এক দিন বিনা মিষ্টিতে টক ভোগ দেওয়া হয়। রাত্রিকালে প্রতিষ্ঠাতা জয়মণি চৌধুরাণী মহাশয়া স্বপ্নে দেখিলেন কালীমাতা বলিতেছেন "দেখ আজ আমাকে টক দেওয়া হইয়াছিল তাতে একটুও মিষ্টি ছিল না, আমার দাঁত ট'ক গিয়াছে।" সেই হইতে নিয়ম হইয়াছে বিনা মিষ্টিতে টকভোগ দেওয়া হইবে না। আর একবার নাকি একটী ঘটনা ঘটে, সকাল বেলা পূজারী উঠিয়া দেখিলেন, কালীমাতার পায়ের চুট্‌কী নাই, অমনি হুলস্থুল পড়িয়া গেল, কালী মাতাকে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কে স্পর্শ করিবার সাহস করে! ব্রাহ্মণদেরই কাজ—এই মনে করিয়া জমিদারদের তরফ হইতে ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণেরা কিছুতেই স্বীকার করে না। রাত্রিতে একটী ঘরে তাহাদের বন্দী করিয়া রাখা হইল। রাত্রে কালীমাতা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলিলেন, "দেখ্ তোরা মিছিমিছি বামনদের কষ্ট দিচ্ছিস ওরা নেয়নি। আমি রাত্রে পুকুরে ঝাঁপাই খেল্‌তে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছি"। পরদিন পুকুরে চুট্‌কি পাওয়া গেল। এইরূপ আরও বহুপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। কতদূর সত্য কে জানে? বর্ত্তমানে তিনটী শিবমন্দির, একটী কালী মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ আছেন। একটী মন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত। এটী প্রস্তুত করিতে বহু অর্থব্যয় হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য মন্দিরগাত্রে নানামূর্ত্তি খোদিত আছে।

৺জয়মণি চৌধুরাণী মহাশয়ার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আনন্দমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় টেপার জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে তৎসম্পত্তি তাঁহার পত্নী ৺অনঙ্গ মঞ্জরী চৌধুরাণী মহাশয়া ও তাঁহার তিন পুত্র কালীমোহন রায় চৌধুরী, তারিণী মোহন রায়

চৌধুরী ও হরমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় প্রাপ্ত হন। কালীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় ৺জয়মণি চৌধুরাণী মহাশয়ার প্রতিষ্ঠিত কালী বাড়ীর সংস্কার করেন।

১২৩৯ সালের পৌষ মাসে ৺তারিণী মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় স্বর্গগমন করিলে তৎপত্নী ৺গঙ্গাসুন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়া উল্লিখিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। এই সময় কালীমোহন রায় চৌধুরীর সহিত তারিণীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়দের বিধবাদের সম্পত্তি তিনভাগ হইয়া যায়। কালীমোহন রায় চৌধুরী ।/৪ পাই, গঙ্গাসুন্দরী চৌধুরাণী (তারিণী মোহন রায় চৌধুরীর বিধবা পত্নী) ।/৪ ও হরমোহন রায় চৌধুরীর বিধবাপত্নীদ্বয়া ।/৪ পাই। কালীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় পুরাতন বাড়ীতেই থাকেন; অন্য সরিকগণ কিছু দূরে দূরে বাড়ী করেন। ৺গঙ্গাসুন্দরী চৌধুরাণী মহাশয়া ১২৫২ সালের মাঘ মাসে স্বর্গীয় তারামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়কে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তিনিই টেপাপরগণার ।/৪ পাই অংশের বর্ত্তমান মালিক শ্রীযুক্ত রায় অন্নদামোহন রায় চৌধুরী বাহাদুরের পিতা। শ্রীযুক্ত রায় অন্নদামোহন রায় চৌধুরী বাহাদুর মহাশয়ের জননীত্রয়ের গর্ভে ক্রমে ক্রমে চারি ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। অপর তিন ভ্রাতা অতি শিশু অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺কালীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিধবা পত্নী ৺দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন ও হরমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের দুই বিধবা পত্নী ৺সারদামোহন রায় চৌধুরী ও ৺দুর্গামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয়কে পোষ্যপুত্র লয়েন।

৺দক্ষিণামোহন রায় চৌধুরী মহাশয় টেপার জমিদারদিগের মধ্যে প্রথম অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান জীবিত না

থাকায় তিনি শ্রীযুক্ত দক্ষজামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইনিই এক্ষণে টেপা বড় তরফের বর্ত্তমান মালীক।

৺সারদামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের দুই পুত্র; শ্রীযুক্ত অম্বিকা মোহন রায় চৌধুরী ও ৺যোগীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী। শ্রীযুক্ত অম্বিকা মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় জমিদার হইলেও দেশের হিতার্থে প্রেসিডেন্ট্ পঞ্চায়তের কার্য্য করেন।

৺দুর্গামোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিধবা পত্নী ৺জগদম্বা চৌধুরাণী মহাশয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইনিই বর্ত্তমান টেপাপরগণার ৵৮ দুই আনা আট পাই অংশের মালীক। ইহাঁর কোন সন্তানাদি না হওয়ায় জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোষ্যপুত্র লইয়াছেন।

৺তারামোহন রায় চৌধুরীর দুই পত্নী টেপাবস্থিত বাটির নিকট পুষ্করিণী খনন করাইয়া উৎসর্গ করেন। বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুক্ত রায় অন্নদামোহন রায় চৌধুরী বাহাদুর নিজ পিতার নামানুসারে স্বগ্রামে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও জমিদারী মধ্যে ১০।১২টী উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়াছেন এবং মাসিক অর্থদানে তাহাদিগকে সাহায্য করেন। তিনি রংপুর সহরস্থ বালিকা বিদ্যালয় গৃহ ৫৮০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। রংপুর সাহিত্য পরিষদ ও টোলে তাঁহার মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত আছে। তিনি দুস্থ সাহিত্য সেবীদিগের সাহায্যের জন্য রংপুর সাহিত্য পরিষদের হস্তে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা ও রমেশ-স্মৃতি-ভবন (কলিকাতা) নির্ম্মাণ জন্য ৫০০৲ টাকা দিয়াছেন এবং টেপাগ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপত্নীর নামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দুস্থ দরিদ্র রোগীগণের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার বিমাতার নামে রঙ্গপুর হাঁসপাতালে মুমূর্ষু গণের অবস্থিতি জন্য

একটী ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তিনি চেষ্টা করিয়া স্বগ্রামে পোষ্টাফিস ও রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপন করাইয়াছেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া স্বয়ং এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডকে সাহায্য দিয়া জমিদারীর মধ্যে পুল, পুষ্করিণী রাস্তাঘাট তৈয়ারী করাইয়াছেন। তিনি দামোদরের বন্যার সময় ৫০০৲ টাকা ও ১৩১০ সালে রংপুর সহরের বহুলোক ঘূর্ণিবায়ুতে গৃহশূন্য হওয়ায় তাহাদের সাহায্যার্থে ১০০০৲ টাকা, এবং ১৩১৩ সালে রঙ্গপুরের দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে ৮০০৲ টাকা দান করেন। তিনি ১৩১৪ সালে বগুড়া জেলার দুর্ভিক্ষের সময় নিজ প্রজাদিগকে বিনাস্থদে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা ধার দেন এবং রংপুরে ১৩১৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ২০০০৲ দুই হাজার টাকার চাউল অল্প মূল্যে বিক্রয় করেন। তিনি বেঙ্গল এম্বুলেন্স-কোরে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা এবং ভারতীয় সৈন্যগণের সাহায্যার্থে ১০০০৲ হাজার টাকা ও বিগত যুদ্ধে নানা ফণ্ডে নানারূপে অর্থ দিয়া ও ওয়ার লোন ক্রয় করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তিনি রংপুরে কলেজ স্থাপনের জন্য প্রথম লক্ষ টাকা দেন। এই দানের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে রংপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তত্রত্য কলেজ স্থাপন উপলক্ষে বঙ্গের লাট বাহাদুরের সমক্ষে বলেন :—

"It would hardly be an exaggeration to say that the scheme had its birth in the promise of a lakh of rupees made by our public spirited and generous Zamindar and fellow citizen Rai Bahadur Annada Mohan Rai choudhury, whose munificence in all public matters is so well-known both to the Government officials and to the people of the district.

ইনি নিজ জমিদারীর আয় প্রায় দ্বিগুণ করিয়াছেন। ইহার তিন পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান আছেন। একটী পুত্র ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। রংপুরের জমিদারগণের মধ্যে ইহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী সর্ব্বপ্রথমে B, A পাশ করেন। ইহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী ভারতরক্ষী সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বৃটিশ কমিশন পাইয়া লেপ্টেন্যাণ্ট হইয়াছেন।

৺জয়মণি চৌধুরাণী মহাশয়ার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালায় বহু দরিদ্র, নিরন্ন, নিরাশ্রয় লোক আহার করিত। বর্ত্তমান সময়েও পথিকগণ ঐ সকল দেব মন্দিরে আহার ও আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তৎপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা প্রভৃতি অদ্যাপি অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান আছে।

টেপা বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মহাদেব রায় মহাশয় পাবনা জেলার অন্তর্গত কাঁড়াইল গ্রাম হইতে কোচবিহার সরকারে চাকুরী করিতে আগমন করেন। তিনি আর পূর্ব্বগ্রামে ফিরিয়া না যাইয়া টেপাতেই থাকিয়া যান। ইহারা বারেন্দ্র কায়স্থ।

টেপাগ্রাম তত বৃহৎ নহে, লোকবিরল ও মুসলমান প্রধান। এইখানে মানস নামক একটি নদী আছে। ইতস্ততঃ দুই একস্থানে প্রাচীন গড় ও বদ্ধ নদীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্থান খনন করিলে পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ কিছু পাওয়া যাইবে কি না ভগবান বলিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত এইস্থানে দুই চারিটী বিল আছে। মধ্যম তরফের বাড়ীর সন্নিকটে দুইটী পুষ্করিণী আছে, একটীর নাম সান্ন্যালের দীঘি, অপরটির নাম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই দুইটী দীঘির নামকরণের ইতিহাস অজ্ঞাত। মধ্যম তরফের বাড়ীর অদূরে

মানস নদীর তীরে একটী বৃহৎ ভগ্ন মসজিদ আছে। প্রবাদ, মহম্মদ সাহ নামক জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত, এখন ইহা বনাকীর্ণ। মসজিদের সোপান নদীতে নামিয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যতীত এতদঞ্চলে আর কিছু বিশেষ দর্শনযোগ্য নাই।

বংশ তালিকা।
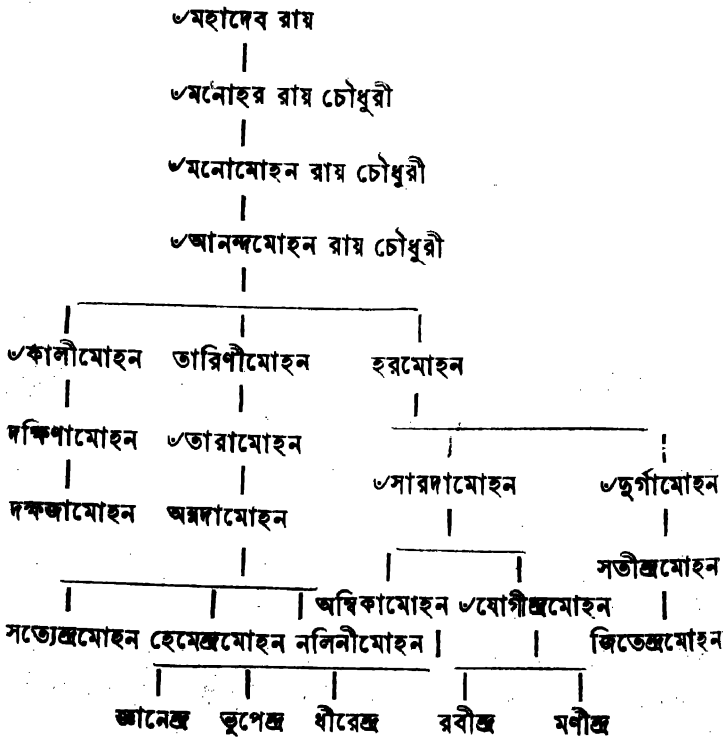
স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল।

যিনি বঙ্গের বাণিজ্য-জগতে সমুজ্জল নক্ষত্ররূপে উদিত হইয়া, স্নিগ্ধ-সুন্দর কিরণরাজি বিকীর্ণ করিয়া স্বনামখ্যাত হইয়াছিলেন—যিনি ব্যবসায়-বুদ্ধি-হীনতার কলঙ্ক বিমোচিত করিয়া, বাঙ্গালী বণিক সমাজের—এমন কি বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, সেই পরলোক গত বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের কর্ম্মময় জীবনের ইতিহাস জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ?

কেবল কলিকাতা নহে, বঙ্গদেশ নহে, ভারতবর্ষ নহে, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও তাঁহার বাণিজ্য ব্যবসায়ের যশঃ বিস্তীর্ণ। তিনি ধনশালী পিতার পুত্র ছিলেন না। কেবলমাত্র ব্যবসায় বুদ্ধি লইয়াই তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই তিক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধিই তাঁহার সম্বল—তাঁহার একমাত্র মূলধন ছিল। সেই মূলধনের বলেই তিনি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া, জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, বাণিজ্য ব্যবসায়বুদ্ধি নাই বলিয়া যে কলঙ্ক কালিমা বাঙ্গালী জাতির ভালে আরোপিত হইয়াছে, তাহা ভ্রান্ত। বটকৃষ্ণ পালের ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মণী এবং আমেরিকার প্রধান প্রধান ঔষধ ব্যবসায়িগণ মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে ব্যবসায়ী বীররূপে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসিগণ যেমন গুণীর গুণ বুঝিতে, গুণীকে মান্য করিতে জানেন, জগতের অন্য প্রান্তের লোকেরা সেরূপ জানেন না।

কি ধনী, কি নির্ধন, যাঁহার জীবনে আমরা সুশিক্ষা লাভ করিতে

পারি, সেই জীবনই আদর্শজীবন এবং সেই আদর্শ মানবই স্বনামধন্যরূপে জগতে গণ্য মান্য হইয়া থাকেন। বটকৃষ্ণ পালের জীবন আদর্শজীবন কিনা, তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে আমরা বাঙ্গালীজাতি সুশিক্ষালাভ করিতে পারিব কি না, সে সম্বন্ধে, তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক নহে কি?

লক্ষপতি, ধনপতি, শ্রীমন্ত, চাঁদ সওদাগর প্রভৃতি বঙ্গের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বণিকগণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রমুখ প্রাচীন কবিগণের অমৃত নিঃস্যন্দিনী লেখনী যাঁহাদিগের অনুক্ষণ কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহাদিগকে অমর করিয়া গিয়াছে, সেই বৈশ্য গন্ধবণিক বংশেই বটকৃষ্ণ পাল আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

গন্ধ বণিক জাতি চারিটী আশ্রমে বিভক্ত—(১) দেশ, (২) শঙ্খ, (৩) আবট এবং (৪) সত্রীশ। গন্ধবণিক জাতির ইতিহাসে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কুলদেবী গন্ধেশ্বরীর শ্রীচরণ হইতে যাঁহারা উৎপন্ন, তাঁহারাই সত্রীশ আশ্রমভুক্ত। সত্র হইতে সত্রীশ শব্দের উৎপত্তি, তাহার অর্থ হইতেছে গৃহপতি, এই চারিটী আশ্রম এক জাতীয় হইলেও চারি আশ্রমের মধ্যে সাধারণতঃ বিবাহের আদান প্রদান অথবা অন্নাহারের প্রথা প্রচলিত নাই। সমাজকে পবিত্রভাবে রক্ষা এবং সমাজস্থ নরনারীর চরিত্র নিষ্কলঙ্কভাবে রক্ষা করিতে গন্ধবণিক জাতি চির চেষ্টিত। সেই জন্যই সত্রীশ আশ্রমভুক্ত গন্ধবণিক সমাজ কঠিন শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আসিতেছেন। বটকৃষ্ণ পাল সেই সত্রীশ আশ্রমভুক্ত। অনুমান তিন শত বৎসর পূর্ব্বে 'পাল' উপাধিধারী সত্রীশ আশ্রমভুক্ত জনৈক গন্ধবণিক বাণিজ্যব্যপদেশে আসিয়া হাওড়ার সন্নিকটে শিবপুর গ্রামে বাস করেন, এই বংশ অত্যল্পকাল মধ্যেই
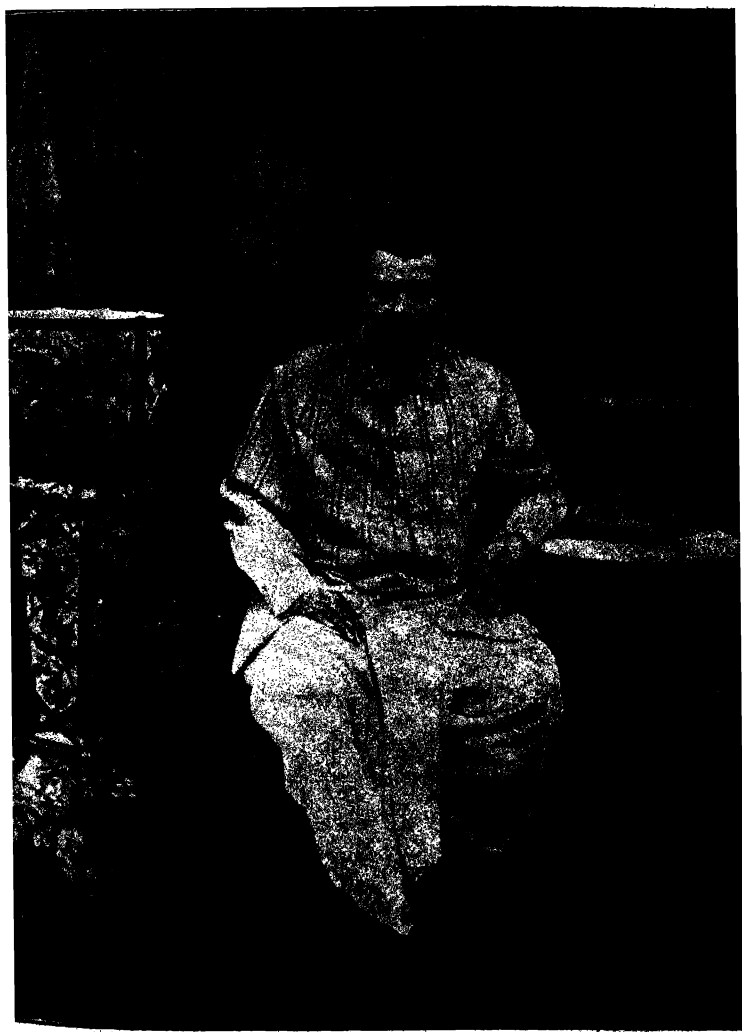
স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল।

শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন পাল।
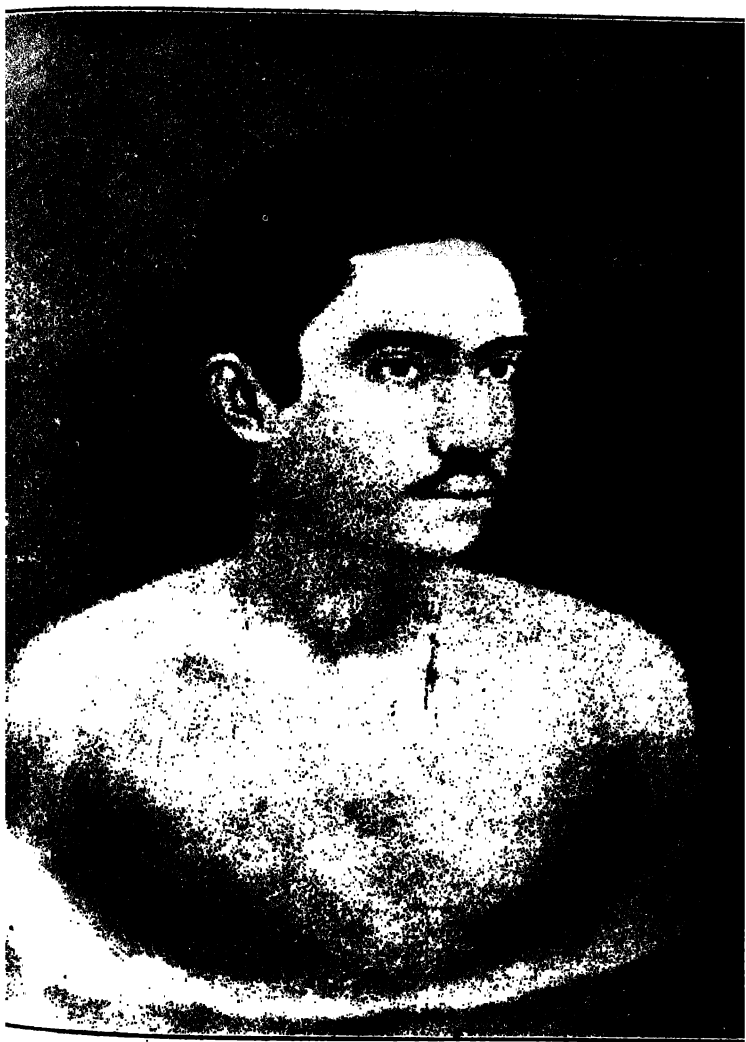
স্বর্গীয় হরিপদ পাল।

শিবপুরের ধনশালী বণিকরূপে গণ্য হন। অবশ্য এই বংশের ভাগ্যে বহুবার উত্থান ও পতন ঘটিয়াছিল। এই বংশে লক্ষ্মী নারায়ণ পালের ঔরসে শ্যামাসুন্দরী দাসীর গর্ভে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বটকৃষ্ণ পাল জন্মগ্রহণ করেন। বটকৃষ্ণের পিতামহের নাম রামজীবন পাল ও প্রপিতামহের নাম বৈদ্যনাথ পাল। বটকৃষ্ণ পিতার তৃতীয় পুত্র। ৺কালীকৃষ্ণ এবং ৺নবীন কৃষ্ণ তাঁহার অগ্রজদ্বয় ও শ্রীযুক্ত অমৃত লাল পাল তাঁহার অনুজ।

বটকৃষ্ণ পাল যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে এই বংশের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি প্রাচীন গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, দুঃখ দারিদ্র্যের বিকট বিভীষিকা তাঁহাকে প্রথম জীবনে নানাপ্রকারে আক্রমণ করিয়াছিল। বাল্যাবস্থাতেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন। কিন্তু বালক বটকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া দারিদ্র্যের ভীষণ ভ্রূকুটীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার একমাত্র সহায় সম্বল—অনন্য সাধারণ প্রতিভা।

পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক বটকৃষ্ণের ভাগ্যে, উচ্চ ইংরাজী শিক্ষালাভের কথা দূরে থাকুক, সামান্য ইংরাজী শিক্ষালাভও ঘটে নাই। সে সময়ে একালের মত, বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামে গ্রামে এরূপ ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ছিল না। সে সময়ে আমাদের প্রাচীন রীতি অনুসারেই পল্লীবালকগণের শিক্ষার ভার গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালাতেই ন্যস্ত ছিল।

বালক বটকৃষ্ণের শিক্ষালাভ এইরূপ পাঠশালাতেই হইয়াছিল। বাল্যকালে তিনি অতিশয় দুরন্ত ছিলেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে গুরুমহাশয়ের তাড়না ভোগ করিতে হইত, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অনন্য সাধারণ

প্রতিভা দেখিয়া গুরুমহাশয় তাঁহাকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। দুঃখের বিষয় তাঁহাকে আব অধিক দিন পাঠশালায় থাকিতে হইল না। দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি পাঠশালা ত্যাগ করিয়া নিজের ভাগ্য পরীক্ষায় অগ্রসর হইলেন। দ্বাদশ বর্ষীয় অনাথ বালক বটকৃষ্ণ তাঁহার মাতুল রামকুমার দের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, রামকুমারবাবু অপুত্রক ছিলেন; তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বটকৃষ্ণকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন।

তাঁহার মাতুল 'বংশ এক সময় অত্যন্ত ধনবান হইলেও, রামকুমাব বাবু তত ধনবান ছিলেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার সংসারে কোনরূপ অসচ্ছলতা ছিল না।

কলিকাতা নূতন বাজারে রামকুমারবাবুব একখানি মসলার দোকান ছিল। ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺গোপাললাল ঠাকুব, ৺মহারাজা রামনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কলিকাতাব অনেকগুলি সম্রান্ত ধনবান আপনাদিগেব নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই এই দোকান হইতে ক্রয় করিতেন। রামকুমারবাবু স্বীয় বালক ভাগিনেয় বটকৃষ্ণকে এই দোকানে ব্যবসা-কার্য্য শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিলেন। প্রবীণ বণিক রামকুমাব বালক বটকৃষ্ণকে সযত্নে ব্যবসা কার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন, মাতুলেব একান্ত যত্নে ও শিক্ষাগুণে, বালক বটকৃষ্ণ শীঘ্রই দোকানের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন।

এই সময় হইতেই আমবা তাঁহার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আভাস পাইয়া থাকি। মাতুলেব দোকানে তাঁহাব মন টিকিল না। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার আভাস পাইয়া, তাঁহার মাতুল কোন বাধা দিলেন না।

ইংরাজী ১৮৪৬ সালে ষোড়শ বর্ষ বয়সে বটকৃষ্ণ স্বীয় মাতুলের দোকান ত্যাগ করিয়া, একাকী জগতে ভাগ্য পরীক্ষায় অগ্রসর হইলেন।
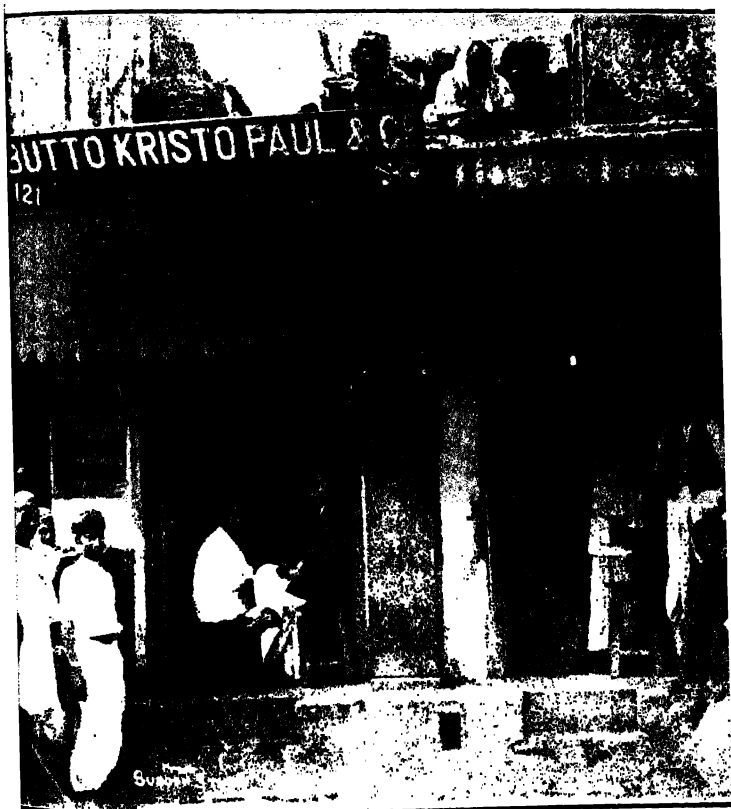
১২০।১২১ নং খোঙ্গরাপট্টী ষ্ট্রীট,
১২৬৫ সালে প্রথম এই দোকানে কার্য্য আরম্ভ হয়

ব্যবসা করিতে হইলেই মূলধন প্রয়োজন, কিন্তু বটকৃষ্ণ সে মূলধন কোথায় পাইবেন? তাঁহার একমাত্র ভরসা ছিল—তাঁহার প্রতিভা, এই প্রতিভা বলেই তিনি এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

মাতুলের দোকান ত্যাগ করিয়া ষোড়শ বর্ষীয় যুবক বটকৃষ্ণ একটি অহিফেনের দোকানে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু এ কার্য্যও তাঁহার মনোমত না হওয়ায়, কয়েক মাস পরে সে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈদ্যবাটীর হাটে পাটের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

যে সময় বটকৃষ্ণ বৈদ্যবাটীর হাটে পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন, সে সময় তিনি একবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। তিনি প্রত্যহ নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া বৈদ্যবাটীতে যাইতেন। এক দিবস দুর্ভাগ্যক্রমে নৌকা জলমগ্ন হইলে তিনি জলমগ্ন হন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সে যাত্রা আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পান।

এই দুর্ঘটনার পরেই তিনি বৈদ্যবাটীতে পাটের কার্য্যও ত্যাগ করেন এবং শীঘ্রই বরাহনগর নিবাসী ৺রাধানাথ পালের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতা খোংরাপটী ষ্ট্রীটে একটি মসলার দোকানে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময় আঠারো বৎসর বয়সে তিনি পটলডাঙ্গা নিবাসী ৺গোলক চন্দ্র নাগ মহাশয়ের বালিকা কন্যাকে বিবাহ করেন, বাস্তবিকই সেই বালিকা গৌরীরূপেই পতিগৃহে আসিয়া পতির ভাগ্য—পতির সংসার উজ্জ্বল করিয়াছেন।

যে সময় তিনি রাধানাথ পালের সহিত খোংরাপটী ষ্ট্রীটে দোকান করিতেন; সেই সময় একবার তিনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বটকৃষ্ণ বাণিজ্য জগতে প্রশংসনীয় অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন,

তাঁহাকে কাল অকালে গ্রাস করিবে কিরূপে? তিনি সে যাত্রাও রক্ষা পাইলেন। যখন তিনি রোগশয্যায় ভূগিতেছিলেন সেই সময় জোড়াসাঁকোর খ্যাতনামা গন্ধবণিক ৺মাধবচন্দ্র দাঁ তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিতেন। বটকৃষ্ণ আরোগ্যলাভ করিলে, মাধব বাবু বলিলেন—"তুমি রাধানাথের দোকানে আর যাইও না, তাঁহার সঙ্গে যে কাজ করে তাহারই এই মত একটা না একটা বিপদ ঘটে। তুমি একটী দোকান খোল আমার যতদূর সাধ্য সহায়তা করিব।" তাঁহার পরামর্শ অনুসারে বটকৃষ্ণ ১২১ নং খোংরাপটী ষ্ট্রীটে স্বয়ং মসলা, মেওয়া, বাতি প্রভৃতির একটি দোকান খুলিলেন।

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত মাধব বাবু তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিয়া থাকেন। বটকৃষ্ণের প্রখর ব্যবসা বুদ্ধি উদ্যম এবং আগ্রহ দর্শনে মাধব বাবু চমৎকৃত হইলেন এবং বটকৃষ্ণকে স্বীয় ব্যবসায়ে অংশীদার রূপে গ্রহণ করিলেন। মাধব বাবুর কারবারের নাম হইল "বটকৃষ্ণ পাল এবং মাধবচন্দ্র দাঁ।"

বটকৃষ্ণের প্রবল পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে তাঁহাদের কারবার অচিরেই লাভবান হইতে লাগিল। বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক বটকৃষ্ণের ব্যবসা বুদ্ধি দর্শনে অন্যান্য দোকানদারগণ বিস্মিত হইয়া পড়িল।

বটকৃষ্ণের ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র ছিল "ক্রেতাকে কখনও প্রতারণা করিব না, অল্পমাত্র লাভেই তুষ্ট থাকিব।" আজীবন এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া ব্যবসা চালাইয়া তিনি জগতে আদর্শ বণিকরূপে পরিচিত হইয়াছেন।

একটি আকাঙ্ক্ষা বহুদিন হইতে বটকৃষ্ণের অন্তরে ছিল। তখন বঙ্গদেশে একালের মত এত বেশী এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহার ছিল না। তখন কলিকাতা সহরে কয়েকটি মাত্র ইংরা

পরিচালিত ডাক্তারখানা ছাড়া কোথাও এলোপ্যাথিক ঔষধ পাওয়া যাইত না এবং ঔষধাদি অত্যন্ত মহার্ঘ্য মূল্যে বিক্রীত হইলেও ক্রেতারা প্রতারিত হইত।

বটকৃষ্ণের মনে এই প্রতারণা নিবারণ করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। তখনও তাঁহার হস্তে এত অর্থ সঞ্চিত হয় নাই যাহা দ্বারা তিনি বিলাত হইতে ঔষধ আনাইয়া নিজে একটী স্বতন্ত্র ঔষধালয় স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন না। অদম্য উৎসাহে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। সন ১২৬৫ সালে তিনি ১২২ নং খোংরাপটী ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র দোকান ঘরে "বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং" নামে বিলাতী ঔষধের একটি দোকান খুলিলেন। এতদিনে তাঁহার আশা ফলবতী হইল।

ব্যবসা ধীর গতিতে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে তুষ্ট হইলেন না। তখন বিলাতী ঔষধ আনাইতে হইলে, কলিকাতায় সেই ঔষধ ব্যবসায়ীদিগের এজেন্টদিগের দ্বারা আনাইতে হইত, তাহাতে ক্রেতাদিগকে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করার সুবিধা হইত না। বটকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে কয়েক বর্ষের মধ্যেই সে অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইলেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ব্যবসায়ের এরূপ প্রসার হইল যে, তিনি নিজে একাকী আর ব্যবসায় চালাইতে সকলদিকে দৃষ্টি রাখিতে অবসর পাইতেন না। সুতরাং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ভূতনাথ পালকে স্বীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীমান ভূতনাথের বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র।

শ্রীমান্ ভূতনাথ শৈশবাবধিই ধীর, স্থির, অচঞ্চল ও স্বল্পভাষী ছিলেন বলিয়া, আত্মীয় স্বজনেরা ভাবিতেন যে, ভূতনাথ মেধাবী নহেন, কিন্তু

প্রতিভাশালী পিতার স্থশিক্ষায় অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভূতনাথের প্রকৃত স্বভাব, চরিত্র এবং মেধা ও প্রতিভা সমুজ্জল বর্ণে প্রকাশিত হইল। পিতাও পুত্রের অসামান্য প্রতিভাবলে, অচিরেই ব্যবসায়ের সফলতার পূর্ণ মূর্ত্তিতে দেখা দিতে লাগিল।

শীঘ্রই ব্যবসায়ের প্রসার এইরূপ বাড়িতে লাগিল যে, ১২২ নং খোংরাপটীর ক্ষুদ্র দোকানে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় নিকটেই কয়েকটি গুদাম ভাড়া লইয়া মাল রাখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও অসুবিধা হইলে অচিরেই বর্নফিল্ডস্ লেনের ৭ নং বাটীতে কার্য্যারম্ভ করা হইল। ক্রমে সে বাটীতেও স্থান না হওয়ায় বটকৃষ্ণ বাবু বনফিল্ডস্ লেনে ১২ নং জমি ক্রয় করিয়া কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ত্রিতল বিশিষ্ট এব বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং তৎপরে ১৬ নং এবং ১৭ নং জমি ক্রয় করিয়া প্রকাণ্ড গুদাম বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণে ৭ নং বাটীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ১৩ নং বনফিল্ডস্ লেনের জমি ক্রয় করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

এক্ষণে উপরি উক্ত সাত খানি বৃহৎ বাটীতে তাঁহার ব্যবসা চলিতেছে। যে অনাথ বালক বটকৃষ্ণ একদিন সামান্য মূলধনের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; আজ তাঁহার ব্যবসায়ের প্রসার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পাশ্চাত্য সমস্ত প্রধান প্রধান পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতারা বি, কে, পাল কোংকে আপনাদিগের একমাত্র এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। আজ তাঁহার ফারমের নাম য়ুরোপের সকল প্রদেশেই ধ্বনিত হইতেছে।

ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বটকৃষ্ণ বাবু একটি রিসার্চ্চ লেবরেটারী স্থাপন করেন। সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ কেমিষ্ট ও ডাক্তারগণ তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। এই লেবরেটারী হইতে নানাবিধ

বাগান বাটী।

ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। তাহার মধ্যে "য়্যান্টি ম্যালেরিয়া স্পেসিফিক" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দরিদ্র ম্যালেরিয়াপীড়িত ব্যক্তিগণকে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে নিজ ঘুঘুডাঙ্গার বাগানবাটীতে এবং ৩০ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটের বাটীতে বিনামূল্যে ঔষধ দান করিতেন, এখনও সে প্রথা প্রচলিত আছে। এলোপ্যাথিক্ ঔষধের বিক্রয়ের প্রসার বাড়িলে, বটকৃষ্ণ বাবু একটী হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ বিক্রয়ের দোকান করিতে ইচ্ছা করেন এবং ১২ নং বনফিল্ডস্ লেনের বাটীতে "গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল" নামক ঔষধালয় স্থাপন করেন। ৩০ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটে ইহার একটী শাখা সংস্থাপিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ এবং কবিরাজী চিকিৎসার প্রতি বটকৃষ্ণ বাবুর চিরকালই অনুরাগ ছিল। যাহাতে সাধারণে অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি প্রাপ্ত হইতে পারেন, সেইজন্য ৩০ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধানে সুবিজ্ঞ কবিরাজ নিযুক্ত করিয়া ঔষধাদি প্রস্তুত করাইতেন এবং এক্ষণে তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ তদ্বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া ঐ কারবার চালাইতেছেন।

বংশ-তালিকা।

মোদ্‌গল্য গোত্র ; প্রবর—উর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।

(১) ৺বৈদ্যনাথ পাল

|

(২) ৺রামজীবন পাল

|

(৩) ৺লক্ষ্মীনারায়ণ পাল

|

(৪) ৺বটকৃষ্ণ পাল

৺ভূতনাথ পাল | ৺হরিপদ পাল | শ্রীহরিশঙ্কর পাল | শ্রীহরিমোহন পাল

পূর্ণচন্দ্র পাল, গৌরহরি পাল, নিতাইচন্দ্র পাল, কানাইলাল পাল, পশুপতি পাল (৺ভূতনাথ পালের পুত্র)

বিমলকৃষ্ণ পাল (শ্রীহরিশঙ্কর পালের পুত্র)

সুবলকৃষ্ণ পাল (শ্রীহরিমোহন পালের পুত্র)

এ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের পরিচয় দিয়া আসিলাম, কিন্তু তাঁহার সুবিমল চরিত্র ও ধর্ম্মময় জীবনের কোন পরিচয় না দিলে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হয় বলিয়া সংক্ষিপ্তভাবে কিঞ্চিৎ প্রকাশ না করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিলাম না। ভগবানের অনুগ্রহে বটকৃষ্ণের পরিবার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া পরম কুশলে সুখশান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। বটকৃষ্ণের সহিত যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার স্বভাব চরিত্র পরম পবিত্র ও নৈতিকজ্ঞানে পূর্ণ ছিল।

বটকৃষ্ণের শৈশব হইতে আজীবন চরিত্র একভাবেই বিদ্যমান ছিল। নিঃস্ব অবস্থা হইতে ধনকুবের অবস্থায় উন্নীত হইলেও তাঁহার স্বভাব প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ঘরে বাহিরে একভাবেই পরিদৃশ্য হইত। স্বভাব কেবল বিনয়-নম্র নহে, নৈতিক সাহসে পূর্ণ, দেহ অপাপবিদ্ধ এবং মন পবিত্র ও উদার ছিল, পৃথিবীস্থ অনেক জাতি যখন তাঁহাকে প্রতিভাশালী পুরুষ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল, তখন তাঁহার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তিনি সরল হৃদয়, অকপট, পরহিত সাধনে চিরনিযুক্ত, সর্ব্বসাধারণের হিতৈষী এবং
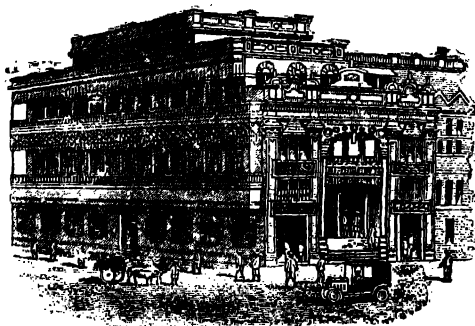
বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

হেড অফিস,—১ ও ৩নং বন্‌ফিল্ডস্ লেন।

নিষ্কামকর্ম্মী ছিলেন। ধনগর্ব্ব এবং অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই। দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা তাঁহার মনে কখনও স্থান পায় নাই। সরল ব্যবহারে তিনি সকলকেই মুগ্ধ এবং সেই সূত্রে সকলকেই বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার এমন একটি অসাধারণ শক্তি ছিল যে, যিনিই তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিতেন, তিনিই সেই অনন্য সাধারণ শক্তির বলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন।

এ জগতে তাঁহার কেহ শত্রু ছিল না। ইহাই তাঁহার সাধুতা, অমায়িকতা এবং সকলের প্রতি সদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত নিদর্শন। তিনি নিজে কখনও কাহারও সহিত শত্রুতা করেন নাই এবং শত্রুতা উৎপাদনের কারণও উপস্থিত হইতে দেন নাই। তাঁহার অভ্যুদয়ে কেহ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছেন শুনিলে, তিনি তাঁহার প্রতি এরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিতেন যে, সে ব্যক্তি নিজে লজ্জিত এবং মর্ম্মাহত হইত।

ধন, যৌবন, স্বাধীনতা এবং স্বাস্থ্য এই চারিটী একত্র সমবেত হইলেই মানুষের স্বভাব বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। বটকৃষ্ণের ভাগ্যে এই চারিটির মধ্যে কোনটিরই অভাব না ঘটিলেও তিনি এই চারিটীর প্রতি আজীবন উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং এই চারিটী কোন দিনই তাঁহার চরিত্রের নৈতিক নির্ম্মলতাকে মলিন করিতে সমর্থ হয় নাই।

ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে পদমর্য্যাদা প্রকাশ জন্য স্বাস্থ্য পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, কিন্তু বটকৃষ্ণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। পরিধানে সামান্য সাদা ধুতি, অঙ্গে একটি ছোট মেরজাই, স্কন্ধে একখানি চাদর, এবং পদযুগলে ঠনঠনের চটিজুতা—কচিৎ পেনালা জুতা এবং শীতকালে গাত্রে সামান্য বালাপোষ, ইহাই

চিরব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ ছিল। প্যাণ্ট, চোগা, চাপকান, পাগড়িরূপ চূড়া পরা দূরে থাকুক তিনি কখনও জীবনে মোজা পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন নাই। শীতকালে গরম কাপড়ের বনাতের জামা ব্যবহার জন্য একসময়ে পুত্রগণ সবিশেষ জিদ করায়, তিনি অগত্যা একদিন তাহা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়েন। বাটীতে অসংখ্য মূল্যবান শাল, আলোয়ান প্রভৃতি থাকিলেও তিনি শীতকালে বালাপোষ ভিন্ন সহজে তাহা ব্যবহার করিতেন না, কেবল কোথায়ও নিমন্ত্রণ রক্ষাকালে— কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পুত্রগণের প্রার্থনামত আলোয়ান বা শাল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন বটে, কিন্তু কার্য্য সমাধার পর তাহা ত্যাগ করিতেন। বটকৃষ্ণের নিকট বেশ সম্বন্ধে ইহাও এক মহাশিক্ষা। বটকৃষ্ণের পিতৃমাতৃ উভয়কুলই পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। এখনকার দিনে পিতামাতা, পুত্রকে বিজাতীয় শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া আপনাদের দায়িত্ব পালন শেষ হইল মনে করেন, কিন্তু ইহাব পূর্ব্বে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন এবং পবে দীক্ষাদাতা গুরুই পরিবারের সকলের ধর্ম্মশিক্ষকের কার্য্য করিতেন, সুতরাং ফল শুভময় হইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অধিকাংশ স্থলেই অস্মদ্দেশীয় যুবকগণ ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়েন। কিন্তু বটকৃষ্ণ কখনও এ শিক্ষার প্রভাবাধীন হন নাই বলিয়া হিন্দুধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত এবং দেব দ্বিজে পরম ভক্ত ছিলেন।

বটকৃষ্ণের পৈত্রিক বাটী শিবপুরে মহাসমারোহে শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি তাঁহার কলিকাতার বেনিয়াটোলার বাটীতে জগদ্ধাত্রী ও স্বরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে তিনি নিজ স্বজাতীয় মণ্ডলীকে এবং অন্যান্য শ্রেণীর বহু কৃতবিদ্য লোককে পরম যত্নে আমন্ত্রণ করিতেন।
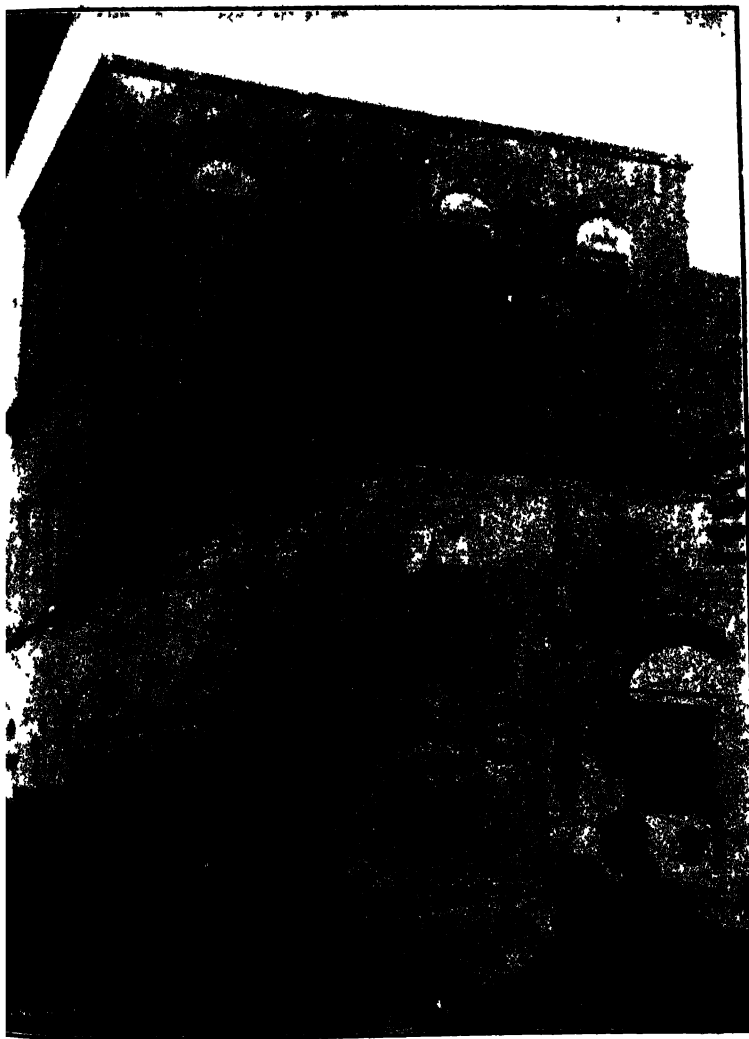
কলিকাতার আদি পুরাতন বাটী।

স্থানীয় এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের দেবদেবী দর্শনে বটকৃষ্ণের বিশেষ তৃপ্তি হইত। তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলার বগড়ীর কৃষ্ণরায়কে দর্শনে তিনি সাতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন।

বটকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ ভক্তির কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। নানা অভিপ্রায়ে বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট প্রার্থীরূপে উপনীত হইতেন। তিনিও সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন। একাদশীর দিনে তিনি সমাগত প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ।০ আনা প্রণামী দিতে আরম্ভ করিলে, ক্রমে বহু ব্রাহ্মণ সমাগত হইতে আরম্ভ করিলেন। বটকৃষ্ণ তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং পরম হৃষ্ট-চিত্তে ।০ আনার স্থলে ॥০ আনা প্রণামী দিবার ব্যবস্থা করিলেন। গঙ্গা স্নান এবং গঙ্গাতীরে বায়ু সেবন উপলক্ষে কলিকাতা এবং নিকটস্থ যাবতীয় স্নান ঘাটের উড়িয়া ব্রাহ্মণগণ বটকৃষ্ণের পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণামী এবং কার্য্যোপলক্ষে সবিশেষ ভুরি ভোজে তৃপ্ত করিয়া স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করিতেন।

১৩২০ বঙ্গাব্দের কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূরবর্ত্তী কামারপাড়া নামক স্থানে পতিতোদ্ধারিনী জাহ্নবী-সলিল-বিধৌত, জনৈক সাধকের আশ্রম ভূমির উপর তিনি এক মন্দির নির্ম্মাণান্তে গন্ধবণিক জাতির কুলদেবী গন্ধেশ্বরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। কোজাগরী পূর্ণিমার দিনে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু পূজার দিন বৈশাখী পূর্ণিমায়। এই গন্ধেশ্বরী পূজোপলক্ষে বটকৃষ্ণ তথায় বহু ব্রাহ্মণ ভোজন ও অতিথি অভ্যাগতের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেন।

পঞ্জিকা ব্যতিরেকে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর তিলার্দ্ধও চলিতে পারে না; কিন্তু সকলেই মূল্য দিয়া পঞ্জিকা ক্রয়ে সমর্থ নন। সুতরাং হিন্দুগণের এই অভাবমোচনার্থে বটকৃষ্ণ নিজ ব্যয়ে উপযুক্ত গণকের দ্বারায় পঞ্জিকা

লিখাইয়া তুলট কাগজে ছাপাইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। পরে, হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁহার নিকট প্রার্থীরূপে উপস্থিত হওয়ায়, তিনি অধিক সংখ্যক পঞ্জিকা ছাপাইয়া সর্ব্বসাধারণকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পাছে অন্যান্য পঞ্জিকা বিক্রেতাগণের ব্যবসায়ের ক্ষতি হয় এই ভাবিয়া, তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে পঞ্জিকা বিক্রেতাগণ নববর্ষের বহু পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসে পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি ব্যবস্থা করিলেন যেন তাঁহার পঞ্জিকা চৈত্রমাসে বাহির হয়।

বটকৃষ্ণ তীর্থদর্শনের সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভারতের অধিকাংশ তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছিলেন। অনেক সময় হয়ত হঠাৎ তাঁহার কোন তীর্থভূমি দর্শনের ইচ্ছা হইত। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় বন্ধুবান্ধবগণ পরিবৃত হইয়া তীর্থ যাত্রা করিতেন। বলা বাহুল্য, তিনিই সকলের ব্যয় ভার বহন করিতেন। কিন্তু তিনি যে শুধু তীর্থ স্থান দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতেন তাহা নহে, পরন্তু তীর্থ স্থানের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম সম্পাদনে তিনি কখনও ত্রুটী করেন নাই।

হরিনাম সংকীর্ত্তনে বটকৃষ্ণের বড় প্রবল অনুরাগ ছিল। বালক বটকৃষ্ণের অন্তর মধ্যে কীর্ত্তনানুরাগের বাসনা প্রথম হইতে নিহিত ছিল। এই বাসনা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুকুল অবস্থার সহায়তায় সবিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছিল। বাল্যকালেই বটকৃষ্ণ মাতুলালয় বেনিয়াটোলায় আগমন করেন। এই বেনিয়াটোলায়, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রধান এবং প্রিয় শিষ্য পরম পূজ্য নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবতংস এক শাখা বহুকাল অবধি বাস করিয়া আসিতেছেন। এই গোস্বামী বংশের, স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সংকীর্ত্তন বিদ্যায় সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই রাজকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট
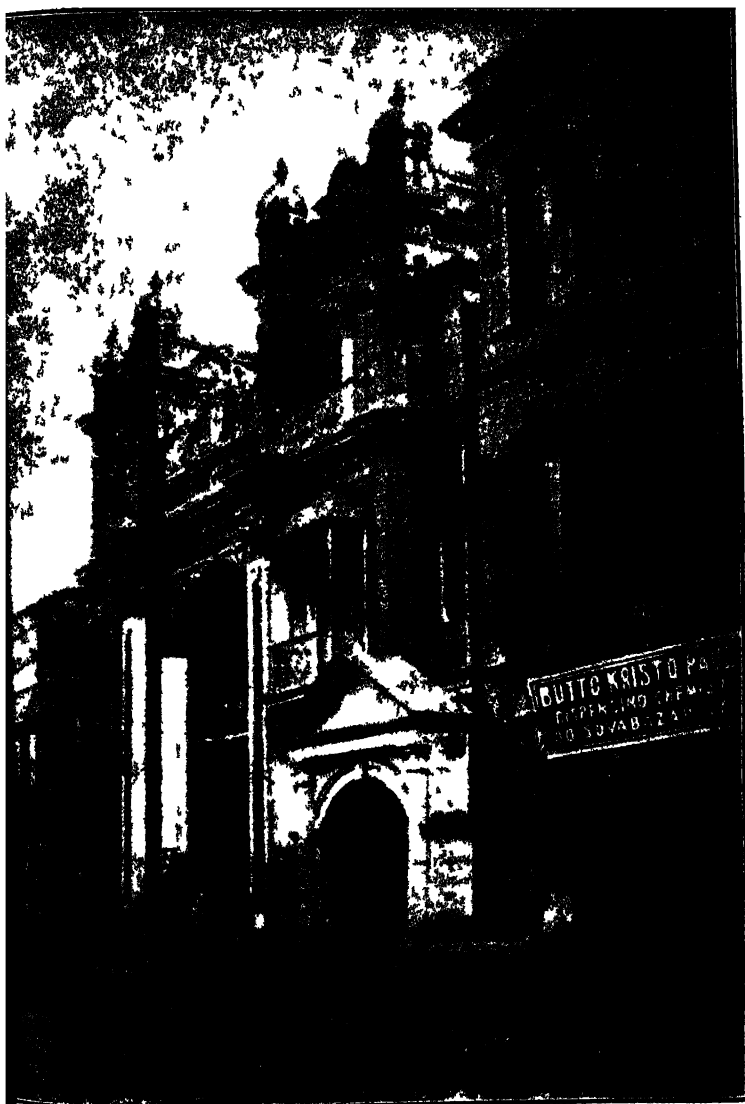
ব্রাঞ্চ—৯২ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট্।

বটকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন শিক্ষা করেন। বেনিয়াটোলার যে স্থানেই সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় গমন করিতেন, বটকৃষ্ণ প্রায়ই তাঁহাদের অগ্রণী থাকিতেন।

শিক্ষা বিস্তারে বটকৃষ্ণের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি উচ্চ শিক্ষা অপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বেনিয়াটোলায় প্রথমে এক পাঠশালা স্থাপন করেন। পরে তাঁহারই যত্নে এবং আনুকূল্যে পরে ঐ পাঠশালা, নিম্ন প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ কোন কোন বালক কোন কোন বৎসর সমগ্র কলিকাতার মধ্যে হয়ত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া থাকে। পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণকে তিনি রৌপ্য পদক এবং পুস্তক ইত্যাদি পারিতোষিক দিতেন। পারিতোষিক বিতরণ সভায় প্রতি বৎসর সভাপতিরূপে বালকগণকে তিনি বিবিধ জ্ঞানগর্ভ সদুপদেশে তৃপ্ত করিতেন। বেনিয়াটোলার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য পাঠশালা এবং বঙ্গবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ তাঁহার নিকট অনেক সময় নানাবিধ সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইতেন।

বটকৃষ্ণের জন্মস্থান শিবপুরে। কোন সময়ে শিবপুরের অধিবাসিগণ তাঁহার নিকট সমবেত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তত্রস্থ বালকগণের শিক্ষার জন্য কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় নাই ; বটকৃষ্ণ এ অভাব মোচনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারেও বটকৃষ্ণ সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। নিজ পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি যাহাতে স্থায়ী হয়, তৎপ্রতি তাঁহার আজীবন লক্ষ্য ছিল। আহিরীটোলা রক্ষাকালী বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিও তাঁহার খুব বেশী যত্ন ছিল। উভয় বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণকালে তিনি নিজ হস্তে বালিকাগণকে পদক এবং স্বর্ণালঙ্কার দান করিতেন।

কাশীধামের স্বীয় বাটীতে বটকৃষ্ণ অন্নসত্র স্থাপন করিয়া তথায় পঞ্চদশটি বেদশিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ বালকের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

বেনিয়াটোলা পল্লীতে স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব অনেক দিন হইতেই পরিলক্ষিত হইত। এই অভাব বিমোচনার্থে বটকৃষ্ণ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। নিজ ব্যয়ে একখানি বাটী ক্রয় করিয়া তথায় একটি টোল স্থাপন করতঃ, তিনি শ্রীযুক্ত রামলাল স্মৃতিতীর্থকে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন।

বটকৃষ্ণের নিকট হইতে কখনও কোন সাহায্যপ্রার্থী ফিরিয়া যায় নাই। কোন কোন লোক তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনার্থে উপনীত হইলে, বটকৃষ্ণ অন্যের শ্রুতি-পথান্তরালে তাঁহার বক্তব্য শ্রবণানন্তর যথাকর্ত্তব্য বিহিত করিতেন। সুতরাং দারিদ্র্য-দুঃখভোগী, পিতৃ, মাতৃ, বা কন্যাদায়গ্রস্ত কাহাকে কখনও বটকৃষ্ণ বঞ্চিত করেন নাই।

বটকৃষ্ণ শুধু নিত্য দান করিতেন না, অন্তঃপুরে কর্ত্রীও অন্যান্য দান ব্যতীত দুই খানি উদ্যান হইতে আহরিত বিবিধ ফল এবং বিল্ব, তুলসী পত্রাদি পাড়া প্রতিবাসী সকলকে বিলাইতেন।

বটকৃষ্ণ, সমুচ্চ প্রতিভা এবং অলোকসামান্য বুদ্ধিবলে স্বীয় অবলম্বিত ব্যবসায়ের চূড়ান্ত উন্নতি সাধন—অচল—অটল—দৃঢ় ভিত্তির উপর ব্যবসায়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষয় যশঃ গৌরব অর্জ্জনপূর্ব্বক পুত্রদিগকে স্বীয় অবলম্বিত মন্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়া, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ যোগ্য হইতে দেখিয়া কিঞ্চিদূণ ৬০ বর্ষ বয়সে ধীরে ধীরে ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে প্রায় বিংশতি বর্ষের অধিককাল তিনি স্বধর্ম্ম, স্বদেশ, স্বজাতি এবং সমাজ লইয়া কি ভাবে জীবনাতিবাহিত করেন তাহা পাঠকগণকে আমরা বিদিত করিয়াছি।

৭৭ নং বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, পুরাতন বসত বাটী।

বটকৃষ্ণের তিরোভাবের অতি অল্প দিন পূর্ব্বে তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হয়। কোন যাতনা নাই, শয্যাশায়ীও নহেন, কেবল অস্থিরতার আবির্ভাব। তাঁহার প্রাণ যেন কি পাইবার জন্য—আকুল—অস্থির। ইহা যে, দেহের রোগ নহে, তাহা কেবল তিনিই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র পরিবারবর্গ আত্মীয় স্বজনগণ উৎকণ্ঠিত হইলেন। বটকৃষ্ণ কলিকাতার সমস্ত খ্যাতনামা চিকিৎসকেরই সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহারা আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে পুত্র পরিবারবর্গ তাঁহার মঙ্গল কামনায় নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিলেন। মৃত্যু সন্নিকট জানিতে পারিয়া তিনি স্বগৃহে বিরাট পাশুপত্যব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক সমুদয় বিষয় বৈভবকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বইচ্ছায় সেই কৈবল্য প্রদায়ক বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক ৺কাশীধামে যাত্রা করেন এবং তথায় নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ নশ্বরদেহ ত্যাগপূর্ব্বক বিগত সন ১৩২১ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ দিব্যধামে প্রস্থান করেন।

প্রায় দুই বৎসর হইল বটকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র ভূতনাথ পাল মহাশয়ও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তদবধি তাঁহার সহোদর শ্রীযুক্ত হরি শঙ্কর পাল তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত হরিমোহণ পালের সাহচর্য্যে বিশাল কারবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ও ইহার পুর্ব্বখ্যাত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা অতি প্রাচীন। ধনে, মানে, দানে, শীলে এই বংশ চিরকালই সুপ্রসিদ্ধ। ইহাঁদের কুলদেবী সিংহবাহিনী দেবী চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণধারিণী, গজসিংহাসনা। ইনি বহুবৎসর যাবৎ এই বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কথিত আছে, এই বংশের আদিবাস ত্রিবেণীতে। একদিন একজন সন্ন্যাসী ইহাঁদের ভবনে আতিথ্য স্বীকার করেন। সন্ন্যাসী পূর্ব্বে কোন দেশের রাজা ছিলেন, পরে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই মূর্ত্তিটিকে গলদেশে ধারণ করিয়া দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরিতেন। এখানে আতিথ্যসৎকারে তুষ্ট হইয়াছিলেন। তৃতীয় দিবসে, দেবীর স্বপ্নাদেশে, এই বংশীয় বনমালী দে মহাশয়ের দুই তিন পুরুষ উর্দ্ধতন সেই অতিথিসেবাপরায়ণ গৃহস্থকে এই মূর্ত্তি দান করিয়া সেই সন্ন্যাসী চলিয়া যান। অপুত্রক বংশে ইহার পূজা নিষিদ্ধ। তদবধি দেবী এই বংশের পূজা অর্চ্চনা পাইয়া আসিতেছেন। মূর্ত্তিটী দেখিতে বড় সুন্দর। যে দিন হইতে বাণিজ্যগতপ্রাণ ইংরাজের অধ্যবসায় ও উদ্যমে কলিকাতা নগরী শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল, সেই দিন হইতে দূরদর্শী, লক্ষ্মীর বরপুত্র সুবর্ণবণিক-সন্তান সপ্তগ্রামের তৎকালীন অতুল বাণিজ্যগৌরব চিরতরে ম্লান হইতেছে নিশ্চিত জানিয়া, প্রথমে হুগলি, তৎপরে জব চার্ণকের নবপ্রতিষ্ঠিত নগরীকে ব্যবসা বাণিজ্যে মুখরিত ও কর্ম্মময় করিবার ইচ্ছায় দলে দলে আসিতে লাগিলেন। আর অচিরকাল মধ্যে তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা ইংরাজের

শ্রীযুক্ত রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর

সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইংরাজের রাজ্য ও বাণিজ্য-স্থাপনে ও সুপ্রতিষ্ঠায় যেমন তাঁহারা প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন, তেমনি তৎকালীন উদার ও কৃতজ্ঞ ইংরাজ ব্যবসায়ী ও রাজপুরুষগণের আনুকূল্যে ও নিজেদের পুরুষকারের বলে তাঁহারা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নগরীতে ঐশ্বর্য্যে, মর্য্যাদায় ও পরোপকারে প্রধান অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; তাই আজও দেখিতে পাওয়া যায় কলিকাতার অধিকাংশ ভূস্বামী ও সওদাগর সুবর্ণ-বণিক-কুল-সম্ভূত।

শুধু যে ইংরাজের দরবারে সুবর্ণ বণিক-সন্তান বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন ও ঔদার্য্যে সম্মানিত ও আদৃত হইয়াছেন তাহা নহে, সেই অতীতকালে ভারত-সম্রাটের সুদূর দিল্লী রাজধানীতে বণিক-সন্তানের গৌরব-কাহিনী গিয়া পৌঁছিত। তাই দিল্লীর সম্রাটের বহু সম্মান প্রদত্ত "মল্লিক" (Lord) উপাধি আজ চারি পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া সুবর্ণবণিকসন্তান উপযুক্ত ভাবে ধারণ করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই উপাধি সম্রাটের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া কম গৌরবের কথা নহে।

রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র বাবুর পূর্ব্ব পুরুষ বনমালী দে মহাশয় সন ৯৭০ সালে অর্থাৎ ১৫৬৩ খ্রীঃ অঃ তৎকালীন দিল্লীশ্বর ভারতের প্রধানতম সম্রাট আকবরের নিকট হইতে বংশানুক্রমিক ভাবে মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। তখনকার ওমরাওদের মত এই পদগৌরব লাভ করিতে বনমালী বাবুকে যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বনমালী বাবুর পুত্র বৈদ্যনাথ মল্লিক সন ১০৪৫ সালে পরলোক গমন করেন। তৎপুত্র কৃষ্ণদাস সন ১০৮৬ সালে, তৎপুত্র রাজারাম সন ১১০৮ সালে, তৎপুত্র দর্পনারায়ণ সন ১১৪৬ সালে, তৎপুত্র নয়নচাঁদ সন ১১৮৩ সালে যথাক্রমে মানবলীলা সংবরণ করেন।

বংশানুগত গুণাবলী তাঁহাদের ছিল, এবং তাঁহারা স্বীয় বংশকে উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধার্ম্মিক, পরোপকারী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। পরে নয়ানচাঁদ মল্লিক মহাশয়ের নিমাইচাঁদ নামক একটী পুত্ররত্ন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিল। বালক প্রতিভাবলে উপযুক্ত শিক্ষায় বিশেষরূপে শিক্ষিত হইয়া পৈতৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলেন। সপ্তগ্রামের ক্রমাবনতি ও কলিকাতার ভবিষ্যৎ উন্নতি সুনিশ্চয় জানিয়া, তিনি ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে তৎকালীন বঙ্গের বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামের পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আসেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর, যৌবনের উদ্যম ও শক্তি শরীরে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" ও অপর সমস্ত সওদাগর-মণ্ডলীর সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিয়া একজন প্রধান সওদাগর ও মহাজন (Banker) বলিয়া পরিগণিত হন। সে সময়ে (Banker) নিমাইচরণ মল্লিকের তোড়ার সৃষ্টি হয়, ঐ তোড়া নোটের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয়াদি ও সমস্ত কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। তিনি এতদূর বিশ্বাস ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, নিমাইচরণ মল্লিকের তোড়া বলিলে কেহ পরীক্ষার প্রয়োজন মনে করিত না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শাসনকালে তাঁহাকেই মল্লিক বংশের আদিপুরুষ বলা যাইতে পারে। তিনি অতি দয়ার্দ্রচিত্ত ও পরোপকারী ছিলেন। যেমন একদিকে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আবার অন্যদিকে ব্যথিত ও অভাবগ্রস্তের দুঃখ-বিমোচনে ও ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার ধনভাণ্ডার সর্ব্বদা মুক্ত রাখিতেন। গঙ্গাস্নানার্থী ব্যক্তিগণের মহা অসুবিধা ও কষ্ট দেখিয়া তিনি বিপুল অর্থব্যয়ে হাবড়া পুলের নিকট একটী প্রকাণ্ড সুন্দর স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। 'আজিও এই সুন্দর বন্দোবস্তের জন্য কত

শত মুক্তিকামী নরনারী নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গাস্নান করিয়া, পূতদেহে নিমাই বাবুর আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া থাকেন।

এই সুদৃশ্য ঘাট আজও "নিমাই চরণ মল্লিকের স্নানের ঘাট" ("Nimai Charan Mullic Bathing Ghat") বলিয়া সুপরিচিত। পুরীতে তীর্থযাত্রিগণের অত্যন্ত কষ্ট ও অসুবিধা দূর করিবার জন্য ধর্ম্মশালা স্থাপন ও তাহাতে তীর্থযাত্রিগণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আজও এই ধর্ম্মশালা তীর্থযাত্রিগণের যথেষ্ট উপকারে আসিতেছে। আবার বৃন্দাবনে যাত্রিদিগের নিবাসের জন্য এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তীর্থযাত্রিদিগের এই আবাস ও আরামের স্থান আজও বৃন্দাবন-যাত্রীকে সাদরে আহ্বান করে। এই তীর্থস্থলসমূহে পান্থশালা স্থাপন ব্যতীত দেব-দেবীর মন্দির-প্রতিষ্ঠাও তাঁহার বড় প্রিয়কার্য্য ছিল। হুগলি জেলাস্থ মাহেশ এবং বল্লভপুরে তিনি প্রকাণ্ড ঠাকুরবাটী স্থাপন ও ২৪ পরগণা জেলায় কাঁচড়াপাড়ায় এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মন্দিরে নিত্য দেবদেবীর পূজার্চ্চনা হয় এবং বহুসংখ্যক দরিদ্র প্রসাদ পাইয়া থাকে। শেষ মহীশূর যুদ্ধে তিনি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বহু অর্থ দ্বারা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

তাঁহার ধনগৌরব ও কীর্ত্তিগৌরবের জন্য তিনি স্বজাতীয় মধ্যে দলপতিরূপে নির্ব্বাচিত ও আ-মরণ মহাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহানুভব নিমাইচরণ ১২১৪ সালের ৯ই শনিবার আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে মানবলীলা সংবরণ করেন। নিমাই চরণ মল্লিক মহাশয়ের ৮টী সন্তান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপাল মল্লিক দলপতি পদে বৃত হন। তিনি দাতা ছিলেন। তিনি কলিকাতার সুরতিবাগানে একটী শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও মন্দির স্থাপন করেন। এই মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা-

উৎসবে তিনি বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে উপযুক্ত দক্ষিণার সহিত এক একখানি শাল উপহার দেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত অভয়চরণ মল্লিকের বিবাহ উপলক্ষে তিনি বহু সংখ্যক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহের ব্যয়ভার সম্পূর্ণ বহন করিয়া তাঁহাদিগকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। বিবাহ-রাত্রে তিনি আনন্দচিত্তে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে মুক্তাহার উপঢৌকন দেন এবং এই উপলক্ষে কতকগুলি ঋণদায়গ্রস্থ, ঋণপরিশোধে অক্ষম বন্দীর ঋণের টাকা পরিশোধ করিয়া তাহাদিগকে কারাগার মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

রামগোপাল মল্লিক মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথের পিতাঠাকুর স্বর্গীয় অদ্বৈতচরণ মল্লিক মহাশয়ও দানধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার দান অনেক প্রকারের ছিল। তিনি খ্রীষ্টীয় ১৮২১ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে তিনি মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করেন। স্বনামধন্য স্বর্গীয় মতিলাল শীল মহাশয় তখন কলিকাতার একজন ধনকুবের। তিনি স্বজাতীয় বনিয়াদী ও প্রধান কুলীন বংশে স্বীয় কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার বাসনা করেন এবং উপযুক্ত বংশের উপযুক্ত বংশধর অদ্বৈতচরণের হস্তে কন্যারত্নকে মহাসমারোহের সহিত সম্প্রদান করিয়া সে বাসনা পূর্ণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের “দলপতি” পদে বরিত হইয়াছিলেন। তিনি “মল্লিক দাতব্য ভাণ্ডারে”র (Mullick Charitable Fund) কার্য্যাধ্যক্ষ (Honorary Secretary) ছিলেন। তিনি বড়ই দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। রামগোপাল মল্লিক মহাশয়ের পালাক্রমে তাঁহার পুত্র অদ্বৈতচরণ সিংহবাহিনী দেবীর সেবার সময়ে দুর্গোৎসব উপলক্ষে বিপুল সমারোহে দেবীর অর্চ্চনা করিতেন এবং পূজার কয়দিন ব্রাহ্মণ, স্বজাতি ও অনাথ দরিদ্রদিগকে

ভূরিভোজন ও অর্থ বস্ত্রাদিদানে আপ্যায়িত করিতেন। সুবর্ণবণিকদিগের ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিদর্শনে তাঁহার দলপতিত্ব স্বীকার করেন। আজ প্রায় একশত ঘর ব্রাহ্মণ এই বংশের দলপতিত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। প্রত্যহ বহুসংখ্যক ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। তিনি নিজ জাতিকে ভুলেন নাই। তিনি জানিতেন, গরীব সুবর্ণবণিককে ধনী সুবর্ণবণিক স্নেহের চক্ষে না দেখিলে, তাহাদের দুঃখ অপর কাহারও দ্বারা দূর হওয়া অসম্ভব। স্বজাতীয়গণের অভাব মোচনার্থ তিনি ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে সুবর্ণবণিক দাতব্য সভা (The Subarna banik Charitable Association) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বনামধন্য মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, সি-আই-ই মহোদয় ইহার প্রথম সভাপতি এবং তিনি সহঃ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। অদ্বৈতবাবুর উপযুক্ত কৃতবিদ্য জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক (এটর্ণী) মহাশয় ইহার প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু এই দাতব্য সভাটীকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া, ইহাকে রেজেষ্টারী করিয়া দেন। তখন ইহা মাসিক চাঁদার উপর চলিত। অদ্বৈত বাবুই প্রথমে সপ্তগ্রামীর ও দক্ষিণ শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদানের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। প্রথমে তাঁহার সহ-দলপতিরা মত দেন নাই। কিন্তু তাঁহার সংকল্প দৃঢ় ছিল; তিনি জাতীয় সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার জন্য তাঁহার রূপগুণসম্পন্ন পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত দক্ষিণ শ্রেণীর দলপতি ৺মথুরামোহন সেন মহাশয়ের পুত্র ৺জীবনকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ দেন। জাতীয় উন্নতির জন্য তিনি রাঢীয় সমাজে আদান-প্রদানেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক যাত্রা করেন।

রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর অদ্বৈত বাবুর পুত্র। তিনি ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মাতামহ মহানুভব মতিলাল শীল মহাশয়ের ভবনে ভূমিষ্ঠ হয়েন। দুইটী কুলীন ও সৎকর্ম্মপরায়ণ বংশের শোণিতধারা দেহে ধারণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথাসময়ে তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস করেন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি তাঁহার শ্রেণীর একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তৎকালেই তাঁহার মহদন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। নানা কারণে তিনি তাঁহার শিক্ষক ও সহপাঠীদিগের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিদ্যালয় হইতে বাটী আসিবার পথে যখনই তিনি অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী, দরিদ্র এবং অন্য অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে দেখিতেন, তখন তাঁহার বালকহৃদয় তাহাদের দুঃখে চঞ্চল হইয়া উঠিত এবং যথাশক্তি তিনি অর্থ দিয়া তাহাদের দুঃখমোচনে আনন্দ বোধ করিতেন। এই সকল কারণে তিনি তাঁহার অভিভাবকের নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ পাইলেও নিজের খরচের জন্য মাসিক যাহা প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও বাজে আমোদ-প্রমোদে ব্যয় না করিয়া অনাথ আতুরের উপকারের জন্য সঞ্চয় করিতেন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে উনিশ বৎসর বয়সে তিনি জোড়াসাঁকো চিৎপুরের বিখ্যাত মল্লিকবংশীয় বাবু হরনাথ শীল মল্লিক মহাশয়ের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। এই মল্লিকবংশও কলিকাতার অপর একটি বহুমান্য ও ধনাঢ্য কুলীন বংশ। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু স্কুল ত্যাগ করিয়া চায়ের ব্যবসা শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার জে টমাস এণ্ড কোম্পানীর আপিসে প্রবিষ্ট হন। তথায় উপযুক্ত জ্ঞান লাভ হইলে তিনি ঐ আপিস ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনভাবে নিজে চায়ের কারবার আরম্ভ করেন। ঐ সময়

স্বর্গীয় অদ্বৈতচরণ মল্লিক

হইতে তিনি চায়ের সওদাগররূপে স্বীয় সমস্ত কর্ম্মকুশলতা নিয়োগ করেন। তাঁহার আপিসের নাম "ডি এন মল্লিক এণ্ড কোং" (Messrs. D. N. Mullick & Co.) রাখা হয়। এই কোম্পানী প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে ভারতীয় চা বিলাতে রপ্তানি করিতেন। তিনিই প্রথমে ভারতীয় চা কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতালে ইহাদের অধ্যক্ষের মারফতে ব্যবহার করাইতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে এই সকল হাঁসপাতালে চীন দেশী চা ব্যবহৃত হইত। একত্রিশ বর্ষকাল এই চায়ের কর্ম্মে কৃতিত্বের সহিত নিযুক্ত থাকিয়া, তিনি প্রভূত ধনোপার্জ্জন করতঃ ১৯০৪ খৃঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি কলিকাতায় জমি ও অট্টালিকা ক্রয়-কার্য্যে মনঃসংযোগ করেন এবং তদবধি এই কার্য্যেই অর্থ নিয়োজিত করিতেছেন। তিনি কতকগুলি প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও বাটী সম্প্রতি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি স্মবর্ণ বণিক সমাজের "দলপতি" নির্ব্বাচিত হন। তিনি এখন স্মবর্ণ বণিক দাতব্যভাণ্ডারের (Subarna banik Charitable Association") অন্যতম সম্পাদক এবং এই ভাণ্ডারের কার্য্যসৌকর্য্যার্থ নিজ বাস-ভবনের একাংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। রায় বাহাদুরের প্রত্যেক কার্য্য পাকা বন্দোবস্তের উপর অনুষ্ঠিত। সাময়িক উত্তেজনায় কোন কার্য্য করিয়া কিছুদিন পরে তাহা বন্দোবস্ত ও অর্থাভাবে লোপ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিতেও তিনি যেন কষ্ট পান। ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহার অনেক কার্য্যে বিদ্যমান। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্মবর্ণ বণিক দাতব্য সভা (Subarna banik Charitable Association) মাসিক চাঁদার উপর চলিত। তিনি অবৈতনিক সম্পাদক হইয়া ইহাকে চিরস্থায়ী করিবার মানসে প্রভূত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিয়া চাঁদা আদায় করতঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন দাঁড়

করাইয়াছেন। এখন ইহা একরূপ স্বাধীন অনুষ্ঠান (Self-Supporting); একেবারে লোপ পাইবার আর আশঙ্কা নাই। এই ভাণ্ডার হইতে হিন্দু বিধবা এবং অনাথদিগকে মাসিক সাহায্য প্রদত্ত হয়। "কলিকাতা অরফ্যানেজ" ও "রেফিউজ" নামক অনাথ-ভাণ্ডারে তিনি সময়ে সময়ে গো-শকট-পূর্ণ চাউল ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকেন। দরিদ্র ছাত্রদিগের প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি কম নহে। তিনি কয়েকটি ছাত্রকে স্কুল ও কলেজে পড়িবার জন্য নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। এই দুর্মূল্যতার দিনে তিনি প্রকৃত অভাবগ্রস্তের দুঃখ-বিমোচনে আনন্দ ও প্রীতি উপভোগ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তির কন্যাদায় মোচনের জন্য বিবাহের সমস্ত ব্যয় স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন। তিনি গোপনে এই সমস্ত দানকার্য্য করিতেই ভালবাসেন। এইরূপে কত আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্র ভদ্র পরিবার গোপনে ও সসম্মানে তাঁহার দানে উপকৃত হইয়াছেন। কলিকাতা রামবাগান অঞ্চলে সাধারণের জন্য একটী রাস্তা করিয়া দিলে লোকের বড় উপকার হয় শুনিয়া রায় বাহাদুর আজ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে রাস্তার নিমিত্ত ৩০০ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া এক খণ্ড জমি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীকে দান করেন। সেই রাস্তাটী অদ্বৈত মল্লিকের রোড (Adwaita Charan Mullick Road) এই নামে খ্যাত হইয়া রায় বাহাদুরের পিতাঠাকুরের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। রায় বাহাদুর তাঁহার পাতিপুকুর দমদমাস্থ 'দেবেন্দ্র-কানন' নামক উদ্যানে একটী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয় ও একশত দরিদ্রকে নিত্য অন্নদানের জন্য একটী অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থানীয় দীন দুঃখী ও অপর অনাথ আতুরদিগের জন্যই তিনি এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং প্রায় ৮।৯ বৎসর সুন্দরভাবে চালাইয়া

যখন শুনিলেন, অন্যত্র ভাল হাঁসপাতাল হওয়ায় তাঁহার ঔষধালয়ের আর প্রয়োজন নাই, এবং তাঁহার অতিথিশালায় স্থানীয় বাগানের মালি, মজুর, হাটবাজারের ফোড়েরা ও অন্যান্য সমর্থ ব্যক্তিগণ আহার করিতেছে, তখন তিনি অতিথিশালার উদ্দেশ্যমত কার্য্য হইতেছে না দেখিয়া এই দুই অনুষ্ঠান তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। তিনি চিরকালই প্রকৃত অভাবগ্রস্তের ও আর্ত্তের বন্ধু। "তেলা মাথায় তেল দেওয়া" তিনি ঘৃণা করেন এবং এই জন্যই বড় বড় লোকদিগের কথা তিনি অনেক সময় রাখিতে পারেন নাই। ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার প্রথম লাট লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের শাসনকালে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে একটী দাতব্য অনুষ্ঠানের বার্ষিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য প্রায় লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একটী অট্টালিকা দেবেন্দ্র বাবু সরকারকে দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে সময়ে গভর্ণমেণ্ট ঐ দান গ্রহণ করেন নাই। অতঃপর ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে একদিন প্রাতঃকালে তিনি বেলগেছিয়ার মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখেন যে, বাহিরের রোগীদের জন্য যে ব্যবস্থা আছে, তাহা বড়ই সামান্য; তজ্জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ সেই গরীব আতুরদিগের জন্য ঐ হাঁসপাতাল-সংলগ্ন ভূমিতেই একটী বৃহৎ দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। তাই অল্পকাল মধ্যে মহাপ্রাণ রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথ অকুণ্ঠিতচিত্তে ১,২০০০০ টাকা ব্যয়ে ঔষধালয় ও ইমারত নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই দাতব্য ঔষধালয়ের পরিচালন ও ঔষধের ব্যয়স্বরূপ বার্ষিক বারশত টাকা পাকা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন। এই মেডিকেল কলেজের জন্য এইটুকু করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। যাহাতে আরও কতকগুলি দরিদ্র রোগী এখানে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে পারে, তজ্জন্য ১৮টী রোগীর শয্যার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ

তিনি মাসিক দুই শত পঁচিশ টাকার স্থায়ী দানেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ভাবে প্রতিশ্রুতিমত আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করিয়া মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় দ্বারা এই কলেজের তিনি কতকগুলি অসুবিধা দূর করিয়া লোকের চিরআশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। বিগত ৬ই এপ্রেল ১৯২০, সালে বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণালড্‌সে এই ঔষধালয়ের দ্বারোদ্মোচন-সভার অধিবেশনে সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু স্বর্ণময় চাবি তাঁহাকে উপহার দিয়া ঐ চাবির দ্বারা দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্মোচন করিতে অনুরোধ করিলেন। বঙ্গেশ্বর দ্বারোদ্মোচন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বক্তৃতাটী দিয়াছিলেন :—

It was my privilege after laying the foundation-stone of the new hospital-block a few minutes ago to perform another ceremony namely, that of opening DEBENDRA NATH MULLICK CHARITABLE DISPENSARY, by his splendid gift which includes not merely the building which I have opened but what is even more important, an endowment which will provide for the carrying on the work of the dispensary. Babu Debendra Nath Mullick has added one more to the many philanthropic work for which the people of Bengal are indebted to him, and has earned for himself an honoured place in the role of benefactors of the institution. We thank him for the gift itself, and thank him even more for the example which he has thus set."

ভূতপূর্ব্ব বড়লাট-পত্নী মহাপ্রাণা লেডি চেমস্‌ফোর্ড মহোদয়া কুষ্ঠরোগীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সংবাদপত্রে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাঠ করিয়া তিনি সানন্দে রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক ওল্ডরিভ (Secretary for the India Mission to Lepers) মহাশয়ের মারফতে ৮০টী কুষ্ঠরোগীর জন্য মাসিক দুই শত মুদ্রা স্থায়ীদানের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে মহামান্যা লেডী চেম্‌স্‌ফোর্ড মহোদয়া ১৯১৯ খৃঃ অব্দের ৩০শে আগষ্ট সিমলাতে কুষ্ঠরোগীদের শুশ্রূষা সভায় (Mission of Lepers in Indiaর এক Meetingএ) কৃতজ্ঞতাভরে বলিয়াছেন—

"A generous citizen Mr. D. N. Mullick has settled property worth a lakh of rupees on the Calcutta branch-work among lepers."

এই সমস্ত দাতব্য কার্য্য যাহাতে সুন্দরভাবে সমাধা হয়, তজ্জন্য বঙ্গদেশীয় সরকারী ট্রষ্টির হস্তে (Official Trustee of Bengal) এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয় শত (১, ৭৫, ৬০০৲) টাকা মূল্যের সম্পত্তির দানপত্র গচ্ছিত রাখিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে তাঁহার মহাপ্রাণতা দেশবাসীকে নিত্য স্মরণ করাইয়া দিবে।

অনেক মহামতি দানশৌণ্ড ব্যক্তি সাধারণ দানের জন্য ন্যাস পত্র (Trust Deed) করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রায় বাহাদুরের ন্যাসপত্রে বেশ একটী নূতনত্ব ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার আভাস পূর্ব্বোক্ত Reportএ দেওয়া হইতেছে। এই সমস্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয় পনের হাজার টাকা (১৫,০০০৲) নির্দ্দিষ্ট আছে। এই টাকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ দ্বারা আবার একটী ফণ্ডের (Reserve Fund) সৃষ্ট হইবে এবং যখন এই Reserve Fund প্রত্যেক পনর বৎসরে

লক্ষ টাকায় পরিণত হইবে, তখন তাহা আবার মূলধনভুক্ত করা হইবে এবং তাহার সুদ হইতে আবার অতিরিক্ত দাতব্য-অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইবে। এই প্রকারে পনর বৎসর অন্তর লক্ষ টাকা করিয়া মূলধন যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, বার্ষিক সুদের পরিমাণ সেইরূপ বৃদ্ধি পাইয়া দীন দরিদ্রের সেবা কার্য্যের আয়তনও ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে, এবং কালে মহাপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথের নাম দেশের দীনদুঃখীরা গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইবে। এইখানেই দানবীর দেবেন্দ্রনাথের দান-কার্য্যের শেষ হয় নাই। রেভারেণ্ড ওল্ডরিভের (Rev. Frank Oldrieve, Secretary for the India Mission to Lepers) মুখে মান্দ্রাজের লোকেরা অন্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা কুষ্ঠরোগে বেশী আক্রান্ত হয় শুনিয়া মান্দ্রাজের লোকের জন্যও তাঁহার কোমল প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠে। তাই সেদিন তিনি মান্দ্রাজের "ভেদাথোরাসলুর" (Vadathoraslur) নামক স্থানে একটী পাকা কুষ্ঠাশ্রম-নির্ম্মাণের জন্য ৬০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক ওল্ডরিভ মহোদয় তাঁহাদের মিসনের ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দের বার্ষিক রিপোর্টে লিখিয়াছেন —

Generous Givers—

"The finest help rendered this last year was that given by Baboo Debenbra Nath Mullick of Calcutta who generously offered to put seme Calcutta property in the hands of the Bengal Official Trustee and from this Fund, the Mission is to receive, in perpetuity a sum of Rs 2400 per annum and Reserve Fund is also being built up from which the sum given to the Mission can be

স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক

এটর্ণী-য়াট্, ল,

increased every ten years. This very splendid action is worthy of great praise and the receipt of a stated amount each year is of great help to the Mission. In addition to this, Mr. Mullick gave a donation of Rs 6000 in order that the Mission might, in co-operation with Madras Government, open a new home for lepers at Vadathorasalur in S. Arcot and to be named "Debendra Nath Mullick home for lepers."

এইরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তি সত্য সত্যই আমাদের দেশের ও জাতির গৌরব। ভগবান তাঁহাকে নিরাময় ও দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের গৌরবভাজন করিয়া রাখুন। তাঁহার পাঁচটী পুত্র—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র, শ্রীযুত গৌরচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ—সকলেই বুদ্ধিমান এবং পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে সদা যত্নবান। তাঁহারাও অমায়িক এবং পিতার ন্যায় পরদুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন। পুত্রগণ সকলেই স্বাধীন ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন। রায় বাহাদুরের বংশ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলনভূমি। তাঁহার নানা সদ্‌গুণের পুরস্কারস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে জুন মাসে "রায় বাহাদুর" উপাধি দ্বারা ভূষিত ও সম্মানিত করিয়াছেন।

৺ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

৺অদ্বৈত কুমার মল্লিক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথের অগ্রজ। ইনি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্কুল হইতে

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি এফ-এ পরীক্ষা দেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। তাহার পর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি বাটীতে পাঠাভ্যাস করেন। অতঃপর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এটর্ণী পিটার এণ্ড কোম্পানীর আফিসে আর্টিকেল ক্লার্ক হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিটার কোম্পানীর আফিস পরিত্যাগ করিয়া হ্যারিস কোম্পানীর আফিসে যোগদান করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি এটর্ণীগিরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্ণী-শ্রেণীভুক্ত হন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "ডেনিস ও মল্লিক" নামে স্বতন্ত্র আফিস খুলেন। ইনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি মতিলাল শী:লর ফ্রি স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮৯০ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি "সুবর্ণবণিক চেরি-টেবেল এসোসিয়েসনে"র অনারারী সেক্রেটারী ও আইন-বিষয়ক পরামর্শ-দাতা ছিলেন। ইনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতার First grade Hony. Pry. Magistrate ছিলেন, ব্রজেন্দ্রবাবুর একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় গত ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জুলাই লোকান্তরিত হন। ব্রজেন্দ্রবাবু স্বজাতিবৎসল ও নীরব কর্ম্মী ছিলেন। লাট প্রাসাদের দরবারে ও লেভিডে তিনি নিমন্ত্রিত হইতেন।

শ্রীযুত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক।

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক মহাশয় রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সন ১২৮৫ সালে ৩০শে কার্ত্তিক ৺কার্ত্তিক পূজার রাত্রিতে তাঁহার মাতুল ৺হরনাথ মল্লিক মহাশয়ের চিৎপুরস্থ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। কার্ত্তিক পূজার দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কার্ত্তিকচরণ রাখা হয়।

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক

ছয় বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতার হিন্দু স্কুলে প্রেরিত হন এবং সেখানে সুখ্যাতির সহিত বিদ্যাশিক্ষা করেন। অধ্যয়নকালে তিনি ডিবেটিং, ফুটবল প্রভৃতি ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন। প্রতি বৎসর তিনি পারিতোষিক পাইতেন। পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতা রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুরের ব্যবসায়ে যোগদান করেন। দেবেন্দ্রবাবু সেই সময়ে চায়ের ব্যবসা করিতেন। ব্যবসায়ে পুত্রকে সহযোগী পাইয়া দেবেন্দ্রবাবুর শক্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল এবং পুত্রও অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পিতার ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্নবান হইলেন।

ইনি ১৮৯৯ সালে "কার্ত্তিকচরণ এণ্ড কোং" নামক একটী নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেয়ার, কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি কার্য্যেও ইনি বিশেষ লাভবান্ হন।

কার্ত্তিকবাবু ১৯০০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চিৎপুরের রাজবংশীয় কুমার কেদারনাথ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। এ সময় তিনি ব্যবসায়ে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যবসায় কার্য্যে সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে ইউরোপীয় শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ারী শিক্ষা করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর জন্য বড় বড় বাটী তৈয়ারি করাইতে আরম্ভ করেন। কলিকাতায় ইহার পূর্ব্বে কার্ত্তিকবাবু যেরূপ ধরণের বাটী (Mansions) তৈয়ারি করেন, সেরূপ বাটী আজ-পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই। আজকাল সাধারণে এরূপ গৃহের পক্ষপাতী, তাই কলিকাতায় এইরূপ বহু গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে।

প্রতিদিন কত ধনী ব্যক্তি কি ধরণে গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন তাহার

জন্য কার্ত্তিকবাবুর সহিত পরামর্শ করিতে আসেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন।

যে সময় ভূতপূর্ব্ব বড়লাট-পত্নী লেডি চেম্‌সফোর্ড কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য সংবাদপত্রের মারফতে ভারতবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেই সময় কার্ত্তিকবাবু ঐ সদুদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পিতাকে লাট-পত্নীর প্রস্তাব অবগত করান এবং কালবিলম্ব না করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কুষ্ঠনিবাসে যাহাতে রোগীরা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে সেইরূপ ভাবে পিতার অনুকরণে অর্থ দান করিয়াছেন। ইনি অনেক দরিদ্র ছাত্রকে প্রতি মাসে গোপনে অর্থ সাহায্য করিয়া এবং অনেক দরিদ্রকে বিপদের সময় অন্যের অজ্ঞাতসারে অর্থদান করিয়া তাহাদের অভাব দূর করেন। কার্ত্তিকবাবু তাঁহার পিতামহের সহিত বাল্যকাল হইতে একত্র থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার নিকট হইতে কার্ত্তিকবাবু ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। কিরূপে সমাজ চালনা করিতে হয়, কিরূপে কাহার সহিত ব্যবহার করিতে হয়, এ সমস্ত বিষয় অতি অল্প বয়সেই উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাই আজও যে সমস্ত গুরুতর প্রশ্ন সুবর্ণ বণিক সমাজে উত্থাপিত হয়, তাহা তিনি সুন্দরভাবে নিষ্পত্তি করিয়া দেন। কার্ত্তিকবাবু লোকপ্রিয় এবং শান্তপ্রকৃতিবিশিষ্ট, সমস্ত দিন কার্য্যসূত্রে তাঁহাকে বিভিন্ন লোকের সহিত কথা কহিতে হয়, কিন্তু তাঁহার কখনও বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায় না। এই ভ্রাতৃবিরোধের দিনে কার্ত্তিকবাবু ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের মধ্যে যে প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অনুকরণ যোগ্য। তিনি যেমন প্রিয়দর্শন, তেমনই সচ্চরিত্র। তিনি অনাড়ম্বর, বিনয়ী ও সদালাপী।

শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মল্লিক

শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মল্লিক।

রায় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র মল্লিক ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার তারিখে ২৫ নং শোভারাম বসাকের লেনে তাঁহার পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শিশুকাল হইতেই তিনি নির্ভীক। কাহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার তিনি কখনই দেখিতে পারেন না। এবং বাল্যকাল হইতেই তিনি পরদুঃখ দূর করিতে সর্ব্বদা যত্নবান। বংশের প্রথানুসারে পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি পাঠশালায় ও পরে হিন্দু স্কুলে প্রেরিত হন। তথায় নিয়মিত ক্লাসে পাঠ অধ্যয়ন করিয়া Doveton College এ প্রেরিত হন। অগ্রজ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের ন্যায় ইনি ডিবেটিং, ফুটবল প্রভৃতি ছাত্রগণের উপকার-প্রদ অনুষ্ঠানে বিশেষরূপে সহায়তা করিতেন। ক্লাসে ইনি একজন ছাত্র মহলে নেতা ও পারদর্শী সভ্য ছিলেন। গণেশ বাবু সাহসিকতা ও সত্যবাদিতার জন্য শিক্ষকগণের নিকট ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন। ইনি বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া উনিশ বৎসর বয়সে চোরবাগানের সুবিখ্যাত রাজা ৺রাজেন্দ্র মল্লিক মহোদয়ের প্রপৌত্রীকে বিবাহ করেন। ঐ সময় হইতে তিনি পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন। কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিয়া তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত বিষয় কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেছেন, তিনি কর্ম্মচারীগণের প্রভু ও বন্ধু, তাহাদের নিকট হইতে কার্য্য আদায় করিতে ও তাহাদের প্রয়োজনে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে ইনি সর্ব্বদা তৎপর। যে কোন দুঃস্থ ব্যক্তি অভাবের কথা জানাইলে তিনি তাহার অভাব মোচনে সর্ব্বদা যত্নবান। কেবল তাহাই নহে, যে কোন সদনুষ্ঠানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি সর্ব্বদা তাহাতে সহানুভূতি করিয়া

থাকেন। এসমস্ত সৎগুণ গণেশ বাবু ও তাঁহার অনুজগণ কার্ত্তিক বাবুর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। ইহারা সকলেই জ্যেষ্ঠের অনুগত। গণেশ বাবু স্বুবর্ণ বণিক দাতব্য ভাণ্ডারের (Suvarna Banik Charitable Association) কার্য্য বিশেষ যত্ন সহকারে করিয়া থাকেন। এ সমস্ত সৎগুণে ভূষিত বলিয়া অল্প বয়সেই তিনি অন্যান্ত সভার সদস্যরূপে গণ্য হইয়াছেন। তাঁহার পিতা দুঃস্থদিগের ও কুষ্ঠ রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত হাঁসপাতাল ও বাসাগার দান করিয়াছেন, সেই সমস্ত কার্য্যভার ইহারই উপর ন্যস্ত আছে। বেলগেছিয়া হাঁসপাতালে রায় বাহাদুরের নামে যে ওয়ার্ড ও দাতব্য ঔষধালয় (Outdoor Charitable Dispensary) আছে, গণেশ বাবু তথাকার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য ও রোগীদিগের পথ্যাদি ঔষধের নিয়ম মত ব্যবস্থা হইতেছে কিনা দেখিবাব জন্য প্রতি সপ্তাহে দুইবার করিয়া যাইয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মল্লিক।

শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র মল্লিক রায় দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক বাহাদুরেব তৃতীয় পুত্র। তিনি ১৮৮৮ সালে কলুটোলা ২৫ নং শোভারাম বসাকের লেনে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেখানে পাঠ সমাপ্ত হইলে হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন। তৎপরে ইংবাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা Doveton college এ Entrance class পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যালয় ত্যাগকরতঃ বিষয় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। একুশ বৎসর বয়সে তিনি ৺কেদার নাথ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতে পরদুঃখ-কাতর, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, বুদ্ধিমান ও সৎগুণে বিভূষিত।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মল্লিক

শ্রীযুক্ত গোরচরণ মল্লিক

শ্রীযুক্ত হরিচরণ মল্লিক

কেহ বিপদে পড়িয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি পিতা মাতা প্রভৃতি সকলের অজ্ঞাতসারে তাহার প্রার্থনা পূরণ করেন।

শ্রীযুক্ত গৌরচরণ মল্লিক।

১৮৯২ খৃঃ অব্দে ৩রা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত গৌরচরণ মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। গৌরবাবু রায় বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র। ইনি পাঁচ বৎসর বয়স হইতে স্থানীয় পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। পরে কলেজে ভর্ত্তি হন এবং তথায় কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ের টেস্থ ষ্ট্যানডার্ড পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অধ্যয়ন কালে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রসিদ্ধ দাতা রাজা ৺রাজেন্দ্র মল্লিক মহোদয়ের পৌত্রীকে ইনি বিবাহ করেন। গৌর বাবু বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রগণের নিকট অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব এখনও শিশুর মত সরল, তাই ছোট ছোট শিশুরা তাঁহার কাছে সর্ব্বদা থাকিতে ভালবাসে। পিতার সকল গুণ পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

তিনি কর্ম্মদক্ষ, পরিশ্রমী ও আধুনিক ব্যায়াম ক্রীড়ায় সুনিপুণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ, নম্র, মিষ্টভাষী ও আশ্রিত-বৎসল।

ধনকুবেরের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অহঙ্কারেব বিন্দুমাত্র আভাস তাঁহাতে দৃষ্ট হয় না।

তিনি সুবর্ণবণিক দাতব্য সভার (Suvarna Banik Charitable Association) সভ্য এবং লাট প্রাসাদের লেভির নিমন্ত্রণভুক্ত সভ্য ও নানা সভার সদস্য।

শ্রীযুত হরিচরণ মল্লিক।

শ্রীযুত হরিচরণ মল্লিক রায় বাহাদুরের পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। সেখানে পাঠ সমাপ্ত হইলে ডভেটন কলেজে, পরে সেখান হইতে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে কেম্‌ব্রিজ সিনিয়র ষ্ট্যাণ্ডার্ড পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বিষয় কার্য্য দেখিতে আরম্ভ করেন। ইনি অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। নিয়মিত পাঠ অভ্যাস করিতেন বলিয়া শিক্ষকগণ ইঁহাকে বেশ ভাল-বাসিতেন। বিদ্যালয় হইতে ফিরিবার সময় প্রত্যহ ভিক্ষুকদিগকে সঙ্গে যাহা থাকিত তাহাই দান করিতেন। গৃহে কেহ সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিলে পিতামাতার অজ্ঞাতসারে তাহাকে অকুণ্ঠিতভাবে সাহায্য করিতেন। সেই জন্য অল্প বয়সেই 'সুবর্ণবণিক দাতব্য সভা'র কর্ত্তৃপক্ষ হরিবাবুকে তাঁহাদের সভার সদস্যরূপে গ্রহণ করেন। কেবল তাহাই নহে, ইনি লাট প্রাসাদের লেভির নিমন্ত্রণ-তালিকা-ভুক্ত ও অপরাপর সভার সদস্য।

রায় দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক বাহাদুরের

বংশ তালিকা।

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম।

৺বনমালী মল্লিক (দে—গৌতম গোত্র)

মৃত ১০১৪ সাল ("মল্লিক" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)

|

৺বৈদ্যনাথ

|

৺কৃষ্ণদাস

মৃঃ ১০৮৬ সাল

|

৺রাজারাম

মৃঃ ১১০৮ সাল

|

৺দর্পনারায়ণ

মৃঃ ১১৪৬ সাল

|

৺নয়ানচাঁদ

মৃঃ ১১৮৩। চৈত্র অশোক ষষ্ঠী

|

৺নিমাইচরণ

মৃঃ ১২১৪। ৯ কার্ত্তিক শনিবার, আশ্বিন-কৃষ্ণাষ্টমী

|

৺রামগোপাল
মৃঃ ১২৪০। ২৩ পৌষ কৃষ্ণা-একাদশী রবিবার

৺অদ্বৈতচরণ
মৃঃ ১৩০৬। ৩০ আশ্বিন

৺ব্রজেন্দ্রনাথ (Attorney at Law) রায় দেবেন্দ্রনাথ বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ
Honorary Presidency Magistrate.
মৃঃ ১৩২৬। ১৬ মাঘ শুক্রবার ভৈমী একাদশী

৺নগেন্দ্রনাথ
মৃঃ ১৩২৬। ১৮ জ্যৈষ্ঠ রবিবার শুক্লা-চতুর্থী

কার্ত্তিকচরণ গণেশচন্দ্র মহেশচন্দ্র গৌরচরণ হরিচরণ

দীনেন্দ্রনাথ

কৃষ্ণমোহন মুরারীমোহন শিশু চৈতনচরণ নিতাইচরণ

দুর্গাচরণ রূপচাঁদ গগনচাঁদ লালচাঁদ শুকময় রসময় জয়রাম শ্রীরাম
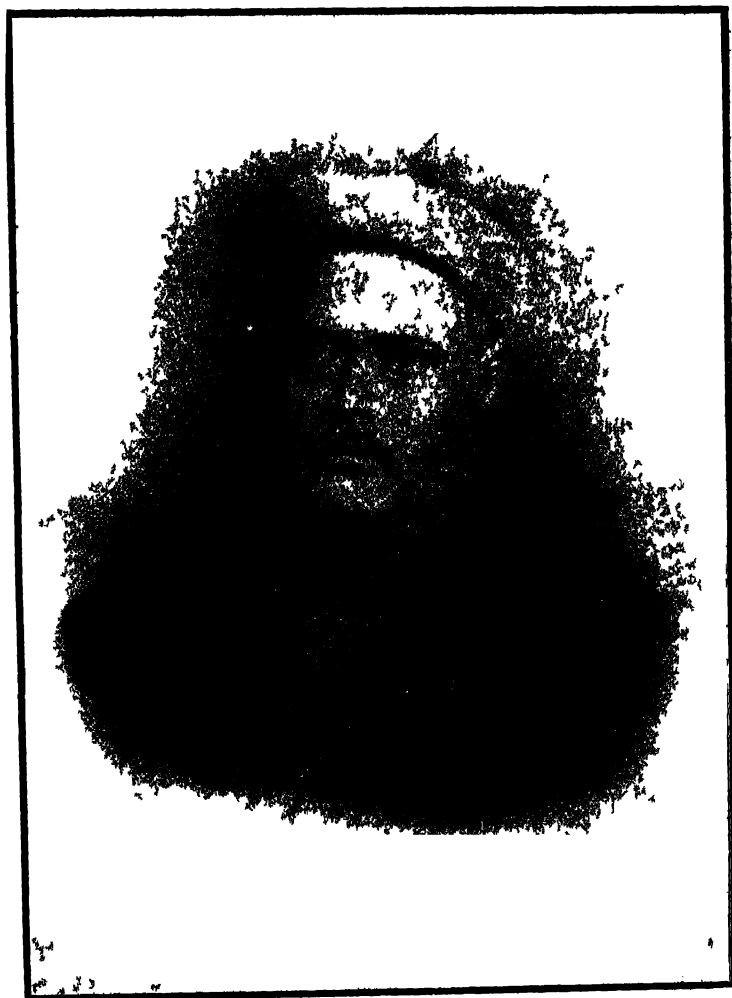
স্বর্গীয় রায় রমণীমোহন রায় চৌধুরী বাহাদুর

তুষভাণ্ডার জমিদার বংশ।

আদি নিবাস—চব্বিশ পরগণা।

বংশ-তালিকা।

মুরারিদেব ঘোষাল ভট্টাচার্য্য
|
মুকুন্দদেব ঘোষাল ভট্টাচার্য্য
|
মধুসূদন ঘোষাল ভট্টাচার্য্য
|
রাজারাম রায় চৌধুরী
(নবাব সরকার হইতে রায় চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত)
(আওরঙ্গজেবের সময়)
|
রামদেব রায় চৌধুরী
|

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী	রাজা নরদেব চৌধুরী
[দত্তক পুত্র]	[ঔরসজাত পুত্র]
স্ত্রী ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী	(সম্রাট্ আওরঙ্গজেব কর্তৃক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন
[স্বামী সহমৃতা হন]	অকালে মৃত্যু হয়)

|
সূর্য্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী (দত্তক)
|

সূর্য্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী

১মা স্ত্রী জয়তুর্গা দেবী
(ইনি স্বীয় স্বামীর সহিত সহমৃতা হন)

২য়া স্ত্রী মৃণ্ময়ী দেবী

কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
(স্ত্রীর নাম ভগবতী দেবী চৌধুরাণী)

রমণীমোহনরায় বাহাতুর
(অপুত্রক)

অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী

১মা স্ত্রী নৃত্যকালী দেবী

২য়া স্ত্রী কৃষ্ণরঙ্গিনী চৌধুরাণী

সত্যেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী

জগন্মোহিনী দেবী
স্বামী স্বকৃত ভঙ্গ কুলীন
শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়

১মা স্ত্রী সরোজিনী
দেবী চৌধুরাণী

২য়া স্ত্রী বিজনবাসিনী
দেবী চৌধুরাণী

বিধুভূষণ স্থরেন্দ্রমোহন প্রমথভূষণ মন্মথভূষণ

(দত্তক পুত্র)
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী
(বর্ত্তমান মালিক)

শ্রীমতী কমলাবালা
দেবী চৌধুরাণী

শোভনাবালা
দেবী চৌধুরাণী

বাগ্দেবী
দেবী চৌধুরাণী

মৃণালিনী
দেবী চৌধুরাণী

স্বর্গীয়া ভগবতী দেবী চৌধুরাণী

তুষ ভাণ্ডারের জমিদার বংশ অতীব প্রাচীন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হইতে এই বংশের গৌরব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই বংশের আদিপুরুষ মুরারিদেব ঘোষাল ভট্টাচার্য্য। কলিকাতা মহানগরীর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় তাঁহার আদি বাসস্থান ছিল। তিনি রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত মহর্ষি ছান্দরের বংশ সম্ভূত ভূ-কৈলাশ রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি এবং একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৺রসিক রায় বিগ্রহকে লইয়া এতদঞ্চলে শুভাগমন করেন। সেই বিগ্রহ এখনও তুষভাণ্ডার জমিদার বাটীতে স্থাপিত আছেন। তিনি ঘটনাক্রমে ইং ১৬৩৪ সনে কোচবিহার রাজধানীতে উপনীত হন। তৎকালে সমগ্র রংপুর কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বর্ত্তমান করতোয়া-নদী পর্য্যন্ত ইহার সীমা ছিল। মুরারিদেব কোচবিহারে উপনীত হইয়া কোচবিহারের তৎকালীন অধীশ্বরীর (যিনি ডাঙ্গর-রাই বলিয়া পরিচিত ছিলেন) নিকটে উপস্থিত হন এবং এতদঞ্চলের বসতি স্থাপনের ইচ্ছা করিয়া কিছু ভূমি প্রার্থনা করেন। মহারাণী তাঁহাকে দেবসেবার জন্য ঘনেশ্যাম, * ছোট খাতা, বামুনীয়া ও সেখসুন্দর এই সমস্ত মৌজা দান

* এই স্থানের বর্ত্তমান নাম তুষভাণ্ডার। মুরারি দেবকে কোচবিহারের মহারাণী জমিদারী দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শূদ্রের দান গ্রহণে অসম্মত হন ও মহারাণীকে তাঁহার প্রদত্ত সম্পত্তির জন্য কিছু খাজনা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। মহারাণী তাঁহাকে বলেন যে, আপনার জমিদারীতে উৎপন্নধান্য হইতে যে সকল তুষ পাওয়া যাইবে তাহাই আমাকে পাঠাইয়া দিবেন, আমি তদ্দারা এখানে যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিব। তদনুযায়ী পূর্ব্বকালে তুষভাণ্ডার হইতে বহু "তুষ" কোচবিহারে প্রেরিত হইত। এই তুষগুলি তুষভাণ্ডারে জমিদার বাটীর পূর্ব্বে অনতিদূরে সংগ্রহ করিয়া স্তুপ করিয়া রাখা হইত। এই জন্যে এ স্থানের নাম তুষভাণ্ডার হইয়াছে। বৃদ্ধ লোকদের মুখে শুনা যায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্তুপ খুঁড়িয়া দেখিলে তুষ বাহির হইত। এখনও জমিদারী কাগজপত্রে তুষভাণ্ডার লিখিত হয়।

করেন। তজ্জন্য উক্ত প্রত্যেকটী মৌজার মধ্যে ৺রসিক রায় দেববিগ্রহের নামে অদ্যাপি দেবোত্তর সম্পত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তদনুযায়ী মুরারিদেব তুষভাণ্ডারে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ তিনি কোচবিহারের রাজএষ্টেটে কোন কার্য্য করিতেন। তুষভাণ্ডারেই তাঁহার বংশাবলী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাঁহারা ক্রমান্বয়ে তুষভাণ্ডারে জমিদারী পরিচালন করিয়াছেন। মুরারিদেব ঘোষাল ভট্টাচার্য্যের পুত্র ৺মুকুন্দদেব ঘোষাল ভট্টাচার্য্য তৎপুত্র ৺মধুসূদন ঘোষাল ভট্টাচার্য্য এবং তৎপুত্র ৺রাজা রাম রায় চৌধুরী।

৺রাজারাম রায় চৌধুরী নবাব সরকার হইতে "রায় চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং এই "রায় চৌধুরী" উপাধিটি ইঁহাদের বংশানুক্রমিক হয়। রাজারামের পুত্র রামদেব রায় চৌধুরী অপুত্রক অবস্থায় অনেকদিন অতিবাহিত করিয়া দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে কিছুদিন পরে তাঁহার ঔরসে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তাঁহার নাম রাজা নরদেব রায় চৌধুরী। তিনি দত্তক-ভ্রাতা দেবী প্রসাদ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া মনোদুঃখে বাদশাহের রাজধানী দিল্লী নগরীতে গমন করেন। তিনি একজন সুগায়ক ও সঙ্গীত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন দিল্লীর রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে যমুনাতটে বসিয়া মনের দুঃখে এক বিষাদ সঙ্গীত গাহিতেছিলেন। সেই সুললিত সঙ্গীততানে দিগন্ত মুখরিত হইতেছিল। বেগম সাহেবা অন্তঃপুর হইতে সেই মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন ও গায়ককে রাজসভায় আনয়ন করিবার জন্য বাদশাহকে অনুরোধ করেন। তদনুযায়ী নরদেব রাজসভায় নীত হইলেন ও বাদশাহ সমীপে স্বীয় জীবন-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। বাদশাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন

এবং তাঁহার সঙ্গে ১০০০ হাজার ফৌজ দিয়া তুষভাণ্ডারে পাঠাইয়া দেন। তৎকালে ঘোড়াঘাট নামক স্থানে বাঙ্গালার সুবেদার বাস করিতেন। বাদসাহ তাঁহার নামে এই মর্ম্মে এক পরওয়ানা দেন যে, প্রেরিত নরদেব চৌধুরী বাদশাহ সরকার হইতে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে ঘোড়াঘাটের নিকটবর্ত্তী সমস্ত ভূমি জায়গীর দেওয়া হইয়াছে, তিনি অদ্য হইতে জমিদার শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন। এ দিকে দেবীপ্রসাদ এই সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন ও তুষভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া তদীয় জমিদারীর অন্তর্গত সিন্দুর্ণা গ্রামে বর্ত্তমান হাতীবান্ধায়) বাড়ী করিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা নরদেব চৌধুরী তুষভাণ্ডারে পৌছিয়াই প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর দেবীপ্রসাদ পুনরায় তুষভাণ্ডারে আসিয়া জমিদারী পরিচালনা করিতে থাকেন। তিনি স্বীয় নামানুসারে দেবীগঞ্জে একটী হাট বসাইয়াছিলেন। তাহা এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে। তিনি অন্দর মহলের মিলান কোঠা প্রস্তুত করেন; তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহাই তুষভাণ্ডার জমিদার বাটীর প্রথম ইষ্টকালয়। দেবী প্রসাদের সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ী দেবী স্বীয় পতিদেবের সহিত সহমৃতা হন। দেবী প্রসাদের দত্তক পুত্রের নাম সূর্য্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী। তিনি ক্রমান্বয়ে রংপুর জেলার অধীন নাওডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী শিবেশ্বর সেহানবীশের দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম ৺জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী এবং দ্বিতীয়ার নাম মৃণ্ময়ী দেবী চৌধুরাণী (অপর নাম পরিজাত দেবী চৌধুরাণী)। জয়দুর্গা দেবীর গর্ভে কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী এবং মৃণ্ময়ী দেবীর গর্ভে একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। সেই কন্যা অকালে কালগ্রাসে পতিতা হয়। জয়দুর্গা দেবীও যথারীতি সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া স্বীয় স্বামীর

সহিত সহমৃতা হন। তৎকালে তুষভাণ্ডারনিবাসী হিসাবিয়ারা তুষভাণ্ডারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা জয়দুর্গা দেবীকে সহমৃতা হইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি শুনিলেন না। তাঁহারা গোপনে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে এই সংবাদ দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তুষভাণ্ডারে আসিয়া জয়দুর্গা দেবীকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনিও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। জয়দুর্গা দেবী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন, "আমি সতী, স্বামীর পদ পূজাই আমার জীবনের ব্রত, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? আমি স্বামীর সহিত নিশ্চয়ই সানন্দে সহমৃতা হইব, তাহাতে আমার একটুও কষ্ট হইবে না।" তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি প্রজ্জ্বলিত অনলে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। হস্ত দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি একটুও কষ্টানুভব করিলেন না, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে সহমৃতা হইতে আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। জয়দুর্গা দেবী হাসিতে হাসিতে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন।

তিনি মৃত্যুকালে পুত্র ও পুত্র বধূকে কয়েকটী উপদেশ দিয়া যান।

(১) ৺বাসন্তী পূজা করিতে পারিবে না।

(২) বাস্তু ভিটায় চৌয়ারী (চারিচাল বিশিষ্ট ঘর) তুলিতে পারিবে না।

(৩) অতিথি ফিরাইতে পারিবে না।

(৪) পান গাছ রোপন করিতে পারিবে না।

(৫) ঢেঁকি করিতে পারিবে না।

(৬) ব্রহ্মোত্তর অপহরণ কিংবা ব্রাহ্মণকে অপমান করিতে পারিবে না।

স্বর্গীয় অনঙ্গমোহন রায়চৌধুরী

যদি এই সকল কথার অন্যথা হয় তবে তোমাদের ভয়ানক অনিষ্ট হইবে এবং তোমরা নির্ব্বংশ হইবে। সূর্য্যপ্রসাদ বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ণ করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মোত্তর দান করেন। তদবধি তুষভাণ্ডারে ব্রাহ্মণগণ স্থায়ীভাবে বাস করিয়া আসিতেছেন। সূর্য্যপ্রসাদ রায় চৌধুরীর পুত্র কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী রাজ্য কোচবিহারের অধীন গোবরাছরা নিবাসী ৺কালী প্রসাদ হিসবিয়া মুস্তোফীর কন্যা ৺ভগবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার নামানুসারে তুষভাণ্ডারের পশ্চিমে অবস্থিত বন্দরের নাম "কালীগঞ্জ" হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার যত্নে তুষভাণ্ডারে একটি টোল স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি গয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ৩২ বৎসর বয়সে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র, রমনীমোহন ও অনঙ্গমোহন। তদীয় মৃত্যুর পর জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসে যায়, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিমতী পত্নী ভগবতী দেবী চৌধুরাণী মহামান্য কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে জমিদারী ইজারা লইয়া নিজেই পরিচালনা করিতে থাকেন। তিনি ১২৯০ সালে একটী রথ প্রতিষ্ঠা করেন। ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত এই রথ পূজা হইয়াছিল। ইহাতে তুষভাণ্ডারে বিশেষ মহোৎসব হইত। তিনি প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে কালীগঞ্জ বন্দরের পশ্চিমে একটি জলসত্র স্থাপন করিয়া পথিকগণকে দধি চিঁড়া বাতাসা প্রভৃতি দ্বারা জলযোগ করাইতেন এবং এই কার্য্যের জন্য তিনি এইখানে একটি পুষ্করিণীও খনন করিয়াছিলেন। উক্ত পুষ্করিণীটী অদ্যাপি জলসত্র দিঘী নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

১২৮৭ সালে তিনি ৺শিবলিঙ্গ, ৺ভবতারিণী ও কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। ৺কালী প্রসাদ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রমণী মোহন রায় চৌধুরী ও কনিষ্ঠের নাম অনঙ্গ মোহন রায় চৌধুরী।

রমনী মোহন রায় চৌধুরীই তুষভাণ্ডারের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি রংপুর সহরের উত্তরস্থ "ধাপ" নামক স্থানে মোহন মঞ্জুরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। রমণী মোহন দান-দক্ষিণায়, জ্ঞান-বুদ্ধিতে, রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনে ও প্রজারঞ্জনে দেবোপম মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ ও গুণগ্রাম বর্ণনাতীত। তিনি নূতন রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং ফল পুষ্পের উদ্যান রচনা প্রভৃতি সৎকার্য্য দ্বারা তুষভাণ্ডারের গৌরব যৎপরোনাস্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮৭২ সালে (বাঙ্গালা ১২৭৮ সাল) তিনি তুষভাণ্ডারে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হাইস্কুল; নাইট স্কুল ও বালিকা স্কুল স্থাপন করেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৮৭৫ সনে তুষভাণ্ডারে একটী সব্ রেজেষ্ট্রী আফিস খোলা হয়। উক্ত আফিস তুষভাণ্ডারেই রহিয়াছে।

তাঁহারই স্থাপিত ৺মদন মোহন দেব বিগ্রহের লীলা উপলক্ষে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে একমাস কালব্যাপী একটি মেলা ও বড় খাতা মহালে তাঁহাদের নামানুসারে রমণীগঞ্জ ও অনঙ্গগঞ্জ হাট নামে পৃথক পৃথক্ দুইটী হাট বসাইয়াছিলেন। তিনি তুষভাণ্ডারে একটি পাঠাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই পাঠাগারে বহু পুস্তক (লাইব্রেরী) সংবাদপত্র ও হস্ত লিখিত পুঁথি ছিল। তিনি রংপুর জেলার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম একটী থিয়েটার দল বাঁধিয়া অভিনয় কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। তিনি ১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষে নিজব্যয়ে বহু ধান্য চাউল ক্ষুধার্ত্ত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণকে বিতরণ করেন। তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। তাঁহার এই গুণাবলীর কথা তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মাননীয় E. G. Glazier esq. C, S, সাহেব লাট সভায় লিখিয়া পাঠান। লাট সভা

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী

হইতে রমণী মোহন চৌধুরীকে ইং ১৮৭৪ সনে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদত্ত হয়। রায় বাহাদুর রংপুরে প্রথম কলেজ স্থাপন সময় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং তিনি রংপুর জেলা স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি বরাবরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনঙ্গ মোহন রায় চৌধুরীর সহিত একান্নবর্ত্তী থাকিয়া একত্রে জমিদারী পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তি হইতে ১০০০০৲ দশহাজার টাকা মুনাফার সম্পত্তি তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী জগন্মোহীনী দেবীকে ও অবশিষ্ট সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরীকে দান করেন। বৰ্দ্ধমান নিবাসী মহানন্দ রায় মহাশয়ের কন্যা সরোজিনী দেবীর সহিত রমণী মোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্র মোহনের (অনঙ্গ মোহনের পুত্র) মহাসমারোহের সহিত ১৮০,০০০৲ ব্যয়ে ১২৯২ সনের ফাল্গুন মাসে শুভ বিবাহ দেন। এই বিবাহোৎসব রংপুরের মধ্যে একটী স্মরণীয় ঘটনা। রমণীমোহন অনেক দিন প্রজারঞ্জন করিয়া ১২৯৪ সনের ২২শে শ্রাবণ তারিখে কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৺কৃষ্ণদাস পাল, শোভা-বাজারের মহারাজা প্রমুখ দেশবিখ্যাত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার অভাবে তুষভাণ্ডারের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ। রায় বাহাদুরের স্ত্রী মোহনমঞ্জরী দেবী ১৩০৯ সনে ৺কাশী প্রাপ্ত হন।

অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী ক্রমশঃ দুই বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী নৃত্যকালী দেবীর গর্ভে তিনটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু প্রথম দুইটি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তৎপর তদীয় গুরুদেব সাধকপ্রবর গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য অনেক যাগ যজ্ঞ করিয়া তৃতীয় পুত্র সত্যেন্দ্র মোহনের জীবন রক্ষা করেন। দ্বিতীয়া পত্নী

কৃষ্ণরঙ্গিনী দেবীর গর্ভে জগন্মোহিনী দেবী ও আর একজন কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন ; কিন্তু দ্বিতীয়া কন্যাটী অকালে কালগ্রাসে পতিতা হয়। অনঙ্গ মোহন বাবু ধর্ম্মদহ নিবাসী ৺কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ৺শশী ভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত মহাসমারোহে তাঁহার একমাত্র কন্যা জগন্মোহিনী দেবীর শুভ বিবাহ দিয়া জামাতা ও কন্যার বসতির জন্য নিজ বাটীর পশ্চিমে অনতিদূরে একটী সুরম্য ইষ্টকালয় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দেন। জগন্মোহিনী দেবীর গর্ভে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ, ৺সুরেন্দ্রমোহন, প্রমথ ভূষণ, মন্মথ ভূষণ নামক ৪টি পুত্র ও চারিটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা অদ্যাপি সেই বাড়ীতেই বাস করিতেছেন।

অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী অতি সাধারণভাবে থাকিতেন। তিনি মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ পচ্ছন্দ করিতেন না ; তিনি পূজা পার্ব্বণ ও বিষয় কর্ম্মে সুদক্ষ ছিলেন। ১২৯৭ সালের কার্ত্তিক মাসে তুষভাণ্ডার ভবনে তদীয় জননী ভগবতী দেবী পরলোক গমন করেন। অনঙ্গমোহন বাবু মহাসমারোহে মাতার দান সাগর শ্রাদ্ধ করেন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া তুষভাণ্ডার জমিদার বাটীতে উপস্থিত হন। এই দান সাগর রংপুর জেলার মধ্যে একটি স্মরণীয় ব্যাপার।

ইং ১৮৯৯ সালে জুলাই মাসে মাননীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর উডবরণ (Woodburn) সাহেব বাহাদুর রংপুর পরিদর্শন করিতে যান। অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রংপুর যাত্রা করেন, কিন্তু বিশেষ দুরদৃষ্ট বশতঃ আকস্মিক জ্বরাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং সেই কাল ব্যাধিই তাঁহাকে ইহসংসার হইতে চির শান্তিময় ধামে লইয়া যাওয়ার কারণ হয়। ইহাতে ছোট

শ্রীযুত গিরীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী

লাট সাহেব বাহাদুর দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার দৌহিত্র বিধুবাবুকে একখানিঃ পত্র লিখেন।

অনঙ্গমোহন বাবুর পুত্র ৺সত্যেন্দ্র মোহনের দুই বিবাহ হয়। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম ৺সরোজিনী দেবী চৌধুরাণী, দ্বিতীয়ার নাম শ্রীযুক্তা বিজন বাসিনী দেবী। সত্যেন্দ্র মোহন বাবু ১৩০৫ সালের ৫ই বৈশাখ ৺কাশীধামে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ১মা পত্নী সরোজিনী দেবীর ১টি পুত্র সন্তান হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ২য়া স্ত্রীর কোন সন্তানাদি হয় নাই। তজ্জন্য ১৩০৬ সালের ১৮ই শ্রাবণ সরোজিনী দেবী বর্দ্ধমান জেলার খোসবাগান নিবাসী শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ২য় পুত্র শ্রীযুক্ত গিরিজা কুমার চট্টোপাধ্যায়কে দত্তক গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রংপুরের তদানীন্তন কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

এতদুপলক্ষে সরোজিনী দেবী মহাশয়া ১৩০৬ সালের ৩২শে শ্রাবণ তারিখে রংপুরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ও দত্তকপুত্রের নাম শ্রীযুক্ত গিরিজা কুমার চট্টোপাধ্যায় স্থলে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী নামে পরিবর্ত্তিত হয়। উক্ত যজ্ঞ সময়ে নলডাঙ্গার জমিদার সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবিসম্রাট প্রমুখ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। দত্তক গ্রহণের পর ৺অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের দৌহিত্র প্রভৃতির সহিত পারিবারিক জটিল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, কিন্তু এষ্টেটের তৎকালীন একমাত্র শুভানুধ্যায়ী ও উন্নত চরিত্র জমানবীশ ৺প্যারীমোহন দে মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় এষ্টেটের সর্ব্বপ্রকার গোলযোগের শান্তি স্থাপিত হইয়া বহু মঙ্গল সাধিত হয়। গিরীন্দ্রমোহন বাবু নাবালক

বলিয়া ১৯০৩-৪ সনে মহামান্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তদীয় জমিদারী পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে ও মধ্য প্রদেশস্থিত "রায়পুর রাজ কুমার কলেজে" রীতিমত শিক্ষা লাভ করেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আমলে তেলিনীপাড়া নিবাসী জমিদার ৺রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা অমীয়া বালা দেবীর সহিত ইং ১৯০৯ সনের জুলাই মাসে গিরীন্দ্র বাবুর পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। তৎপরে তিনি কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। এই স্থানে তাঁহার একটি সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া ভাগ্য দোষে উক্ত পুত্রটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। বর্ত্তমানে ইঁহার চারিটী কন্যা। গিরীন্দ্রমোহন বাবু যথাসময়ে সাবালক হওয়ায় ১৯১২ সালের ১৫ই নবেম্বর মহামান্য কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ তাঁহার হস্তে জমিদারী প্রত্যার্পণ করেন। এই উপলক্ষে তুষভাণ্ডারে বিরাট দরবার হইয়াছিল। তৎকালীন মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ কে, সি, দে মহোদয় এই দরবারে উপস্থিত থাকিয়া গিরীন্দ্র বাবুকে তাঁহার জমিদারী বুঝাইয়া দেন। সেই দরবারে তুষভাণ্ডার নিবাসী সুকবি শ্রীযুক্ত যাদব চন্দ্র বাণীভূষণ মহাশয় স্বরচিত একটি সুললিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।

১৯১২-১৩ সনের Wards Estate সমূহের Administration Reportএ তুষভাণ্ডার এষ্টেট ও ward শ্রীযুত গিরীন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে মহামান্য গবর্ণমেণ্ট যে পরিচয় দিয়াছিলেন; তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

According to the early history of this Estate, the Tushbhandar zamindari was acquired during the reign of Aurangzeb by one Murari Bhattacharji, a member of the

Bhukailas Raj family, who migrated to Coochbehar in 1634 and obtained a permanent tenure there, His son obtained the Zamindari on the conquest by the Mahammedans. The most notable personality in the family in recent times appears to have been Babu Ramani Mohan Roy Choudhuri grand-uncle of the present proprietor (Babu Girindra Mohan Roy Choudhuri), who in 1874 was made a "Rai Bahadoor", the first man in the district to be so decorated. He owned the zamindari jointly with his younger brother, Babu Ananga Mohan Roy Choudhuri. The former had no issue, but the latter had a daughter named Srimati Jaganmohini devi and a son named Satyendra Mohan. Babu Ramani Mohan bequeathed a portion of his property yeilding an income of Rs 10,000 a year to his niece and the rest to his nephew (Babu Satyendra Mohan).

The ward (Girindra Mohan Babu) has turned out an intelligent young man of excellent morals and loyal sentiments. He is keen at games and is a good rider and a decent shot. He has also become proficent in English and can converse in it with ease,

গিরীন্দ্র মোহন বাবু উদার, মিষ্টভাষী এবং চরিত্রবান। তাঁহার ব্যবহারে প্রজাপুঞ্জ সন্তুষ্ট। তিনি স্বহস্তে জমিদারী গ্রহণ অবধি প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার চেষ্টায় এই অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত বড়খাতা গ্রামে তদীয় স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর নামে (১৯১৭ সালে) সরোজিনী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি মেলা স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে চিকিৎসকের অভাবে দরিদ্র প্রজাপুঞ্জ ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিতেছিল। এই চিকিৎসালয় হওয়ায় তাহাদের সে অভাব পূর্ণ হইল। ইহা দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। তাঁহার উৎসাহে এবং সর্ব্বসাধারণ প্রজাবৃন্দের চেষ্টায় তুষভাণ্ডারে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। আশা করি, এই বিদ্যালয় পুনরায় তুষভাণ্ডারে স্বর্গীয় রমণীমোহন রায় বাহাদুরের পূর্ব্বগৌরব-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবে। তুষভাণ্ডারে পূর্ব্বে টেলিগ্রাফ আফিস ছিল না। তজ্জন্য সকলকে ভয়ানক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। বর্ত্তমান জমিদার মহোদয়ের চেষ্টায় এখানে একটি টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে এবং এজন্য যে প্রকার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় অচিরেই টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপিত হইবে। ইহা স্থাপিত হইলে সর্ব্ব সাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীযুত রমণীমোহন দাস।

শ্রীযুক্ত রমণী মোহন দাস।

বাঙ্গালা ১২৮০ সালের শ্রাবণ মাসে বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত রমণী মোহন দাস মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী করিমগঞ্জে বাস করেন। ইঁহারা জাতিতে বৈশ্য এবং এদেশের কায়স্থ ও বৈদ্য সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিয়া থাকে। ইঁহার বংশ-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রায় আত্মা রাম দাস

|

রায় নিধিরাম দাস

|

রায় ধনীরাম দাস

|

শ্রীযুক্ত রমণী মোহন দাস

শ্রীযুক্ত রমণী মোহন দাস মহাশয় বিগত একুশ বৎসর যাবত লোকাল বোর্ডের মেম্বর, মিউনিসিপাল কমিশনার, জেল পরিদর্শক, বণিক্ সভা ও জমিদার সভার নেতৃরূপে দেশের অনেক কার্য্য করিতেছেন। ইনি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি ও কনফারেন্স্ ও অন্যান্য সভাসমিতির সহিত ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ। ইনি আসাম লেজিস্লেটিভ্ কৌন্সিলের সভ্যস্বরূপেও দেশের অনেক দুঃখ দুরবস্থা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতেছেন। ইঁহার পিতৃদেব যেমন দানশীল ও পরোপকার-ব্রত-পরায়ণ ছিলেন, ইনিও দানশীলতায় ও পরোপকার ব্রতে পিতার পদাঙ্ক

অনুসরণ করিতেছেন। ইনি সর্ব্বদা লোকহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতে প্রস্তুত। ইনি নিরপেক্ষ, কি মধ্যপন্থী, কি চরমপন্থী সকলেই ইঁহার নিকট সমান শ্রদ্ধার ভাজন। ইনি একজন আদর্শ জমিদার। কোন প্রজাকেই বাকী খাজনারদায়ে গৃহ-চ্যুত হইতে হয় না, কোন প্রজা কর দিতে না পারিলে ইনি তাহাকে সময় প্রদান করেন, তত্রাচ নালিশ করিয়া প্রজার দায় দ্বিগুণ করেন না। রমণী মোহন একজন উত্তম ব্যবসায়ী। তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে "সাধুতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা" এই নীতির অনুসরণকারী। অবিশ্বাসী, প্রতারক লোকের স্থান তাঁহার দ্বারে নাই। ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্ম—এই তিনটী তাঁহার জীবনের আদর্শ। রমণী মোহন বিদ্যোৎসাহী। দেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যম অনুকরণীয়। তিনি স্বব্যয়ে একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়া তাহা সুচারুরূপে চালাইবার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

স্বর্গীয় রামতারণ চট্টোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় রামতারণ চট্টোপাধ্যায়।

সন ১২৪২ সালে ৺রামতারণ চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকট দাইহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামতারণের পিতা ৺ক্ষেত্রপাল চট্টোপাধ্যায় দাইহাটের প্রসিদ্ধ ঘোষাল পরিবারের ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে ঐ গ্রামে কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী ও বসবাসের জন্য একখানি দ্বিতল বাটী দান করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে ঘোষালদের একখানি নীলকুঠি ছিল, তিনি ঐ কুঠি ইজারা লইয়া নীলের কারবার করিয়া ও ব্রহ্মোত্তর জমীর উপসত্ব দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতেন। ক্ষেত্রপালের তিন পুত্র ও ছয় কন্যা হয়, তন্মধ্যে এখনও চারি কন্যা জীবিতা আছেন এবং কাশীবাস করিতেছেন। রামতারণ গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার সহিত কলিকাতায় নীল বিক্রয় করিতে আসেন। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার অত্যন্ত বলবতী ইচ্ছা দেখিয়া তাঁহার পিতা ভবানীপুরে লণ্ডন মিশন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তাঁহার পিতা বৃহৎ পরিবারের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া রামতারণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়বহন করিতে অসমর্থ হওয়ায় রামতারণ ভবানীপুরে নবকৃষ্ণ দাসের বাটীতে অবস্থান করিতেন ও তাঁহার পুত্রগণের গৃহ-শিক্ষকের কার্য্য করিয়া যে যৎসামান্য উপার্জ্জন করিতেন তাহাতেই স্কুলের বেতন ও অন্যান্য খরচ সঙ্কুলান করিতেন। এই সময়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার ভবানীপুরস্থ-ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে থাকেন।

যৎকালে তিনি লণ্ডন মিশন স্কুলে দ্বিতীয়শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, তখন তাঁহার পিতার বিশেষ অর্থকষ্ট হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে কোন কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে বলেন। সেই সময়ে সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালগণ বিদ্রোহী হওয়ায়, গবর্ণমেণ্টকে কলিকাতা হইতে তথায় বিদ্রোহদমন জন্য সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছিল। তখন মাত্র বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছিল, সুতরাং রেলে সৈন্য না পাঠাইয়া রাজমহল পর্য্যন্ত ষ্টীমারযোগে সৈন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। নবকৃষ্ণ বাবুর চেষ্টায় রামতারণ এই অভিযানে একটি কেরানীর পদে নিযুক্ত হইয়া সৈন্যদিগের সহিত ষ্টীমারে কলিকাতা হইতে রাজমহল যাত্রা করেন এবং তথা হইতে পদব্রজে ডুমকা গমন করেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পর তিনি তথা হইতে ছুটী লইয়া নিজবাটী দাইহাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কিছুদিন বাটীতে অবস্থান করিয়া তিনি পুনরায় ভবানীপুর গমন করেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে পুনরায় তাঁহার ডুমকা যাইবার আদেশ হইলে, তিনি দ্বিতীয়বার ডুমকা যাত্রা করেন। এবার গবর্ণমেণ্ট ষ্টীমারে যাইবার ব্যবস্থা করেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে ও তাঁহার চারিজন সহ কর্ম্মচারীকে কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত রেলে, পরে তথা হইতে পদব্রজে ডুমকা যাইতে হইয়াছিল। পথে নানাপ্রকার কষ্ট ও অনিয়ম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার দুইজন সঙ্গী অর্দ্ধেক রাস্তা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কেবল রামতারণ ও তাঁহার অপর দুইজন সঙ্গী ৭।৮ দিন ক্রমাগত জঙ্গলময় বিপদসঙ্কুল প্রদেশের মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া অবশেষে ডুমকায় উপনীত হন। সেখানে কয়েকমাস চাকরী করিয়া প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ঔষধি ও চিকিৎসার সুবিধা না থাকায় ৮ জন সাঁওতাল বাহক সঙ্গে লইয়া ডুলি করিয়া ক্রমাগত ৪।৫ দিনের পর নিজ বাটীতে উপস্থিত হন।

ক্রমাগত ৬ মাস কাল বাটীতে নানাপ্রকার পীড়াভোগ করিয়া তিনি অবশেষে আরোগ্যলাভ করেন এবং পুনরায় ভবানীপুর যাত্রা ও কলিকাতায় তাঁহার মুনিব সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যে সকল কর্ম্মচারী সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টের চাকুরী লইয়া বিপদ ও কষ্ট গ্রাহ্য না করিয়া সাঁওতাল পরগণায় যাইয়া বিদ্রোহদমন ও শান্তি-সংস্থাপন কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাঁহারা গিয়াছিলেন তাহাদের কেহ কেহ পুরস্কার গ্রহণ করিলেন। রামতারণ পুরস্কারের পরিবর্ত্তে কোন স্থায়ী চাকুরী প্রার্থনা করিলে,তাঁহাকে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে Eastern Canals Division এ Sub overseer পদে নিযুক্ত করেন। ঐ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ৫০০৲ টাকা জামিন দিবার হুকুম হয়। তিনি চাকুরী পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু জামিনের টাকার যোগাড় করিতে না পারায়, তাঁহার পক্ষে চাকুরী পাওয়া, না পাওয়া সমান হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার বন্ধু ও মুরব্বী নবকৃষ্ণ বাবু নিজের ৫০০৲ টাকার কোম্পাণীর কাগজ জামিন দিবার জন্য তাহাকে প্রদান করেন।

ত্রিশ টাকা বেতনের সব ওভারসিয়ার হইতে রামতারণ ক্রমশঃ সব ইঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি যখন সুরখালিতে সব ডিবি-সনাল আপিসারের কার্য্য করিতেন, সেই সময় খুলনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, গৌরদাস বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ও মুন্সেফ বলরাম মল্লিক ও রাড়ুলি কাটীপাড়ার জমীদার ডাক্তার পি, সি, রায়ের পিতা ৺হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী ইহাদের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র অক্ষয়কুমার বাল্যকালে কলিকাতায় হরিশ্চন্দ্রের বাসাতেই থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। হরিশ বাবুর পরামর্শে ও সহায়তায় তিনি যশোহরের রাজা

বরদাকান্ত রায় বাহাদুরের নিকট হইতে খুলনার সন্নিকট একটী বৃহৎ মৌরসী গাতি বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। তৎকালে উহা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, তিনি জঙ্গল কাটাইয়া ও প্রজা পত্তন করিয়া ঐ মৌজা আবাদ করেন। এক্ষণে উহা বহু মূল্যবান সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের বন্ধুত্বের প্রতি রামতারণের এত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কেবল মুখের কথায় বিনা দলিলে তাঁহাকে অনেকগুলি টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্বনামধন্য, ত্যাগশীল ও পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার পি, সি, রায়ের উপযুক্ত পিতা ছিলেন। যখন তিনি রামতারণের দেনা পরিশোধ করিতে অসমর্থ বিবেচনা করিলেন, তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাঁহার বাটীর সন্নিকটস্থ একখানি উৎকৃষ্ট জমিদারী রামতারণের বরাবর একখণ্ড বিক্রয় কবালা লিখিয়া রেজেষ্টারী করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাম-তারণ ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না, পরে যখন হরিশ্চন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, হরিশ্চন্দ্র ঐ কোবালাখানি রামতারণের হস্তে প্রদান করিয়া দেনা হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

সরকারী কার্য্যে অত্যধিক পরিশ্রম করায় ও পূর্ব্ববঙ্গের জলবায়ু তাঁহার সহ্য না হওয়ায়, তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং ৪০ বৎসর বয়সে পেন্‌সন গ্রহণ করিয়া রামতারণ কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। পেন্‌সন লওয়ার পর কলিকাতায় একটী জল, গ্যাস্ ও ড্রেনের কারবার করেন ও কলিকাতায় কয়েকখানি বাটী, বর্দ্ধমান ও খুলনা জেলায় অন্যান্য জমিদারী খরিদ করেন। লেখাপড়ায় বিশেষ পণ্ডিত না হইলেও সাধারণ বুদ্ধি অর্থাৎ Common aense তাঁহার খুব বেশী ছিল, এজন্য যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেন।”

৫০ বৎসর তিনি বিষয়-কর্ম্মের ভার তাঁহার একমাত্র পুত্র অক্ষয়-কুমারের উপর দিয়া কাশীবাস করেন, এবং ৬৯ বৎসর বয়সে কাশীলাভ

করেন। কাশীবাস কালীন তাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধব ৺বিশ্বেশ্বর দর্শন উপলক্ষে কাশীধামে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন এবং যে কয় দিন তাঁহারা তাঁহার বাটীতে থাকিতেন নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া কিসে অতিথির সন্তোষ হইবে তাহারই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিতেন। বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আলাপ করিবার সময় প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেন। বর্ত্তমান সভ্য সমাজের আদব কায়দা আদৌ পছন্দ করিতেন না। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ, চাল চলন ও আহারাদি নিতান্ত সাদাসিধে ছিল। আবশ্যক মত দাস দাসী থাকিলেও প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় দশাশ্বমেধ ঘাটের বাজারে তরিতরকারি প্রভৃতি খরিদ করিয়া স্বহস্তে গৃহে লইয়া আসিতেন। একদিন স্নানান্তে ঐরূপ বাজার করিয়া গামছায় বান্ধিয়া বাটী আসিতেছেন, পথিমধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া "বাবু আপনার এমন অবস্থা হইয়াছে" বলিয়া কান্দিয়া ফেলিলেন। রামতারণ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "তুমি কাঁদিতেছ কেন?" কতদিন পরে আজ তোমাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, চল, আমার বাটীতে চল সেই খানেই কথাবার্ত্তা হইবে।" রামতারণ যখন সুরখালীতে সবডিবিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন তিনি সেখানকার থানার দারোগা ছিলেন। P. W. D. সবডিবিসনাল আপিস থানার নিকটেই ছিল। খুলনায় যখন যিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিতেন তিনি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে ঐ অঞ্চলে কোন মফঃস্বল তদন্তে আসিলে রামতারণের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। এমন কি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও কখনও মফঃস্বলে তদারকে আসিলে থানায় না বসিয়া তাঁহারই আপিষে বসিয়া

কাজ কর্ম্ম করিতেন ও তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপ ও সসম্মান ব্যবহার করিতেন। তিনি সেখানকার এক প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। দারোগা বাবু এবম্বিধ সম্মানার্হ ও প্রতাপান্বিত রামতারণকে গামছায় বান্ধিয়া নিজ হস্তে বাজার করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে পেনসন লইয়া বৃদ্ধাবস্থায় ইহার এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে একটী চাকর রাখিবার সংস্থান নাই, তাই নিজ হস্তে বাজার বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। রামতারণ যখন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং আহারাদি করাইলেন তখন তিনি তাহার বাটী ঘর ও অবস্থার স্বচ্ছলতা দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অধিক উন্নতি হইয়াছে জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

কলিকাতায় থাকাকালীন একদা রামতারণ খালি গায়ে একখানি ছোট ধুতি পরিয়া তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ ফুট পাথের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার কোন বন্ধুর সহিত কথোপথন করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কোন সামান্য দোকানদারকে কোন দ্রব্যের ফরমাইস করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি সেই সময় আসিয়া রামতারণকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ঠাকুর আপনি যা ফরমাইস করিয়াছিলেন তা পাইয়াছি।" এই কথায় তাঁহার বন্ধু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "বেটা মানুষ চিনিস্ না, ঠাকুর বলিতেছিস্ কাকে? উনি একজন মস্ত বাবু, জমীদার, আবার সরকারী পেনসন পান।" রামতারণ তাঁহার বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "ভায়া! চট্‌চো কেন? ওত কোন মন্দ কথা বলে নাই। বাবু তো সকলকেই বলে। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া দেবতার সমান মর্য্যাদা করিয়া ঠাকুর বলিয়াছে।"

রামতারণ একবার হরিদ্বার কুম্ভমেলা দর্শন করিতে যান; সেখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন

উপদেশ পান নাই। অবশেষে একজন মহাপুরুষকে দেখিয়া তাঁহার বিশেষ ভক্তির উদ্রেক হওয়ায় বিনীতভাবে তাঁহার নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। সাধু বলিলেন, "দেখ, কাম ক্রোধাদি রিপুগণই মানুষের ধর্ম্ম পথের বিশেষ অন্তরায়। রিপুগণকে বশীভূত করিতে পারিলেই ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবার পথ সুগম হইয়া আইসে। আমি বহুদিন যাবৎ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি ও ভগবানের চিন্তায় দিনযাপন করিতেছি। তথাপি যে সম্পূর্ণরূপে রিপুবশ করিয়াছি এ কথা বলিতে সাহস হয় না, তোমরা গৃহী, তোমাদের ত দূরের কথা। ভাল সকল অপেক্ষা সহজ একটা উপায় বলিতেছি; তাহাই অভ্যাস কর। তুমি পরনিন্দা ত্যাগ কর, উহাতে গৃহীগণের কোন লাভও নাই লোকসানও নাই। এই একটা কাজ ভাল রকম অভ্যাস হইলে দেখিবে উহা হইতে প্রথমে তোমার সকলের প্রতি প্রেম ভাব উদ্রেক হইবে, তাহা হইতে ক্রমে হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি ত্যাগ হইবে এবং তাহা হইতে, ক্রমশঃ ক্রোধাদি রিপু সকল বশে আসিবে। এক বৎসর পরে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে।" এই বলিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। রামতারণের কাশীর বাটীতে প্রত্যহ বৈকালে গীতা পাঠ হইত। অনেক বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোক পাঠ শুনিতে আগমন করিতেন। যতক্ষণ পণ্ডিতজী আসিয়া পাঠারম্ভ না করিতেন, ততক্ষণ ঘন ঘন তামাকু সেবন ও নানাপ্রকার বৃদ্ধজনসুলভ গল্পগুজব চলিত। তিনি যখনই দেখিতেন যে ঐ সূত্রে কেহ ক্রমশঃ পরচর্চ্চা বা পরনিন্দা আরম্ভ করিয়াছেন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেন। পরে পণ্ডিতজী যখন আসিয়া পাঠারম্ভ করিতেন তখন পুনরায় তথায় আসিয়া বসিতেন। এক মাত্র পর নিন্দা ত্যাগ করাতেই শেষে তাঁহার চরিত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন হইয়াছিল।

ভগবানে তাঁহার দৃঢ়ভক্তি ছিল, মৃত্যুর দিনও প্রাতে জনৈক আত্মীয়ের গায়ে ঠেস দিয়া ইষ্টদেবের পূজাদি কার্য্য সমাপন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পাদক ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ছিলেন ও বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ লেখক, বক্তা ও সংবাদপত্র-সম্পাদক শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা ৺অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যাযের জামাতা। উক্ত বিবাহের দুই পুত্র মুরলী ও মণি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় রামতারণ বাবুর একমাত্র পুত্র। অক্ষয়ের একটি ভগ্নী আছে। এই পুত্র ও কন্যা এই দুইটীকে লইয়া রামতারণ বাবু সংসারে অশেষ সুখভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বারাসত দত্তপুকুর নিবাসী স্বর্গীয় অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ইনি পরে মুন্‌সেফ হইয়াছিলেন এবং সে কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অকালে মৃত্যু ঘটে, তাঁহার পুত্রগণ এখন পঞ্জাবে ব্রহ্মদেশে ও অন্যান্য স্থানে কাজ করিতেছেন। অক্ষয়কুমার একমাত্র পুত্র হইলেও আজন্ম সংযমী ও সচ্চরিত্র, তিনি পিতৃ মাতৃসেবক এবং ভক্ত। এ জীবনে কখন ইনি পিতামাতার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করেন নাই। অক্ষয়কুমার কিশোরকাল হইতে শিরপীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, এই জন্য তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ, ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অক্ষয়কুমার মিতব্যয়ী ও সংযমী বলিয়া পিতার অর্জ্জিত সম্পত্তি অনেক বাড়াইয়াছেন, এমন কি আয় দ্বিগুণেরও অধিক করিয়াছেন। তাঁহার মত কৃপালু ও সমবেদনাপূর্ণ জমিদার অল্পই আছে। অক্ষয়কুমারের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। পাঁচটীই সুশিক্ষিত, বড়টী এর্টর্ণি, মধ্যমটী হাইকোর্টের উকীল, তৃতীয়টী ইঞ্জিনিয়ার এবং অপর দুইটী লেখাপড়া শিখিতেছেন। অক্ষয় বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার

সহিত দাঁইহাট নিবাসী পরম ভাগবত ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ উত্তর পাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মনোহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমার ক্রিয়াশীল, হিন্দুগৃহস্থ ব্রাহ্মণের তিনি সকল কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেন। তিনি আদর্শ-চরিত্র হিন্দুগৃহস্থ, কুটুম্বিতা ও জ্ঞাতিত্বসূত্রে দক্ষিণ বাঙ্গালার প্রায় সকল গৃহস্থ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত তিনি সম্বন্ধ। পাটুলির প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ জমিদার স্বর্গীয় রামধন চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত অক্ষয় বাবুর বিবাহ হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার বাঙ্গালায় সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রথমে দেশাইয়ের কারখানা Match Factory খুলিয়াছিলেন, পরে আমেরিকা হইতে ধান ছাঁটাই মোজা তৈয়ারী করিবার কল আনাইয়াও তিনি ব্যবহার করিয়া লোককে দেখাইয়া শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার আনীত নমুনার চাউলের কলই এখন রামকৃষ্ণপুরে ও বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। তাঁহারই বাটীতে থাকিয়া পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এবং শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী কলিকাতায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার Bengal landholders associationএর কার্য্যকারী সভার জনৈক সদস্য, তিনি কংগ্রেসাদি রাজনীতি সভায় যোগদান করিয়া থাকেন। তিনি দেশের নানাবিধ সৎকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থ দাইহাটস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসার্থিনী স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী ওয়ার্ড নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন ও তাহার সংরক্ষণের সমুদয় ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন।

খুলনাতে করোনেশন হলের সম্মুখে কাছারি রোড় হইতে যশোহর রোড পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন এবং

মিউনিসিপালিটী উহা অক্ষয় "চ্যাটার্জ্জিরোড" নামে অবিহিত করিয়াছেন। তাঁহার রচিত "ভট্টাচার্য্য পরিবার" নামক উপন্যাস ও স্বায়ত্ত শাসন বা স্বরাজ্য "নামক রাজনীতি বিষয়ক পুস্তিকা প্রশংসা যোগ্য।

৺ রামতারণ চট্টোপাধ্যায়ের বংশাবলী

দক্ষ (১)

|

সুলোচন।

|

বাসুদেব।

|

নাথী।

|

(১) দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চজন কাণ্যকুব্জ দেশীয় ব্রাহ্মণ, আনুমানিক ১০০০ খৃঃ অব্দে আদিশূর রাজা কর্তৃক গৌড়দেশে আনীত হন।

|

বরাহ।

|

শ্রীকর।

|

বহুরূপ।

|

গোবিন্দ।

|

চাকু।

|

গুণাকর। (২)

|

কৃষ্ণ। (৩)

|

লোকনাথ।

|

শ্রীমান।

|

বাচস্পতি।

|

তপন। (ইনি কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করায় ইহার বংশাবলী সর্ব্বানন্দী মেল প্রাপ্ত হন।)

|

|

গদাধর।

|

ব্যাস।

|

বিষ্ণুদাস।

|

রামজীবন

|

রামেশ্বর।

|

(২) পাটলীয় কুলাখ্যাত গুণাকর উদারধীঃ। (কুলশাস্ত্র।)

(৩) পূর্ব্বাবতারো যদুগোপবংশে তদ্ব্রীড়য়া শ্রেষ্ঠ গৃহে চ চট্টো। পরাবতারো ভুবি কৃষ্ণ কস্য ক্ষেমার্ত্তি তুল্যেশ্চ যতঃ কৃতার্থঃ। (কুলশাস্ত্র।)

ইহার অর্থ কৃষ্ণের পূর্ব্বাবতার যদুগোপ বংশে হইয়াছিল, সেই লজ্জায় পারবতার শ্রেষ্ঠ চট্টগৃহে বিপ্রকুলে হইয়াছিল।

|

গোপাল।

|

জনার্দ্দন।

|

ভগবতীচরণ।

|

ক্ষেত্রপাল।

|

রামতারণ।

|

অক্ষয়কুমার।

|

কালিদাস, তারাদাস, শ্যামাদাস, দেবিদাস, বামাদাস।

শ্রীযুত দাশরথী সান্ন্যাল

শ্রীযুত দাশরথী সান্ন্যাল।

কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব শ্রীযুত দাশরথী সান্ন্যাল বি, এল্ মহাশয়ের পূর্ব্বনির্ব্বাস রাজসাহী জেলা। রাজসাহী হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন। তদনন্তর তাঁহার পিতা ৺বিশ্বনাথ সান্ন্যাল মহাশয় শান্তিপুর হইতে বরাহনগরে আসিয়া বাস করেন। তদবধি ইঁহারা বরাহনগরেই বাস করিতেছেন। ৺বিশ্বনাথ সেন মহাশয় কোন সওদাগরী অফিসে হিসাব রক্ষকের কার্য্য করিতেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার একটি কয়লার খনিও ছিল। জাতিতে ইঁহারা ব্রাহ্মণ। দাশরথী প্রথমে বরাহনগর হিন্দু স্কুলে, মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরে জেনারল এসেম্ব্লী ইন্‌ষ্টিটিউসন্ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একমাসকাল ফরিদপুর ও কিছুদিন আলিপুরে ওকালতী করিবার পর তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের (তখন নরেন্দ্র নাথ দত্ত) সহিত একত্র বি,এ পড়িয়াছিলেন। বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, তাঁহারা একত্রে বরাহনগর মঠে গমনাগমন করিতেন।

দাশরথী ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভের পূর্ব্বে কিছুদিন জয়নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারীতে প্রধান শিক্ষকতা ও সহকারী শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

দাশরথীর চারিপুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ললিতমোহন কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, দ্বিতীয় সুহৃদমোহন বি, এ, ইউনিভার্সিটী ল

কলেজের ছাত্র, তৃতীয় মনোমোহন সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, চতুর্থ ফণীন্দ্রমোহন মিত্রইন্‌ষ্টিটিউসনের ভবানীপুর শাখার ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর ছাত্র।

ইঁহার তিনটী কন্যা; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা মৃতা, অপর দুইটী বিবাহিতা।

নিম্নে ইঁহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল :—
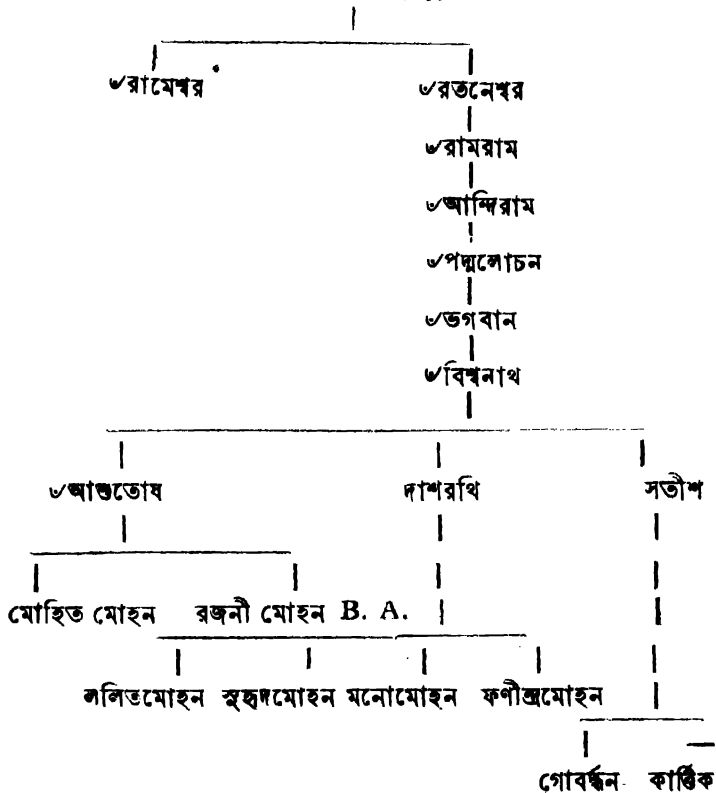
ফৌজদারী মোকদ্দমা পরিচালনে ইহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি আছে। ইনি মেদিনীপুর ষড়যন্ত্রের মামলা, আরা মন্দিরে হত্যা মামলা, আলিপুর বোমার মামলা, কুমিল্লা গুলি মারার মামলা প্রভৃতি পরিচালনা করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবে পরিণত হইয়াছেন। ইনি বড় মিষ্টভাষী, আমায়িক ও সামাজিক।

রাণী রাসমণি।

বঙ্গদেশে অলোকসামান্য দানশৌণ্ডতা, আদর্শস্থানীয় প্রকৃতি-বাৎসল্য, দেবদ্বিজে অকপট ভক্তি প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণের দ্বারা যে সমস্ত পুণ্যশীলা ভূম্যধিকারিণীগণ চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণির নাম যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাণী রাসমণি অতি দরিদ্র মধ্যবিৎ গৃহস্থের কন্যা। কলিকাতা মহানগরীর উত্তরে গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থিত হালি সহরের সন্নিকটবর্ত্তী কোনা নামক একটি গণ্ডগ্রামে ১২০০ সালের ১১ই আশ্বিন তারিখে রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺হরেকৃষ্ণ দাস ও মাতার নাম ৺রামপ্রিয়া দাসী। রাসমণির দুই সহোদর ছিল, অনেক সাধ্যসাধনার ফলে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া তাঁহার স্নেহময় ও স্নেহময়ী জনক-জননী "রাণী" বলিয়া ডাকিতেন।

রাণী রাসমণির পিতা হরেকৃষ্ণ দাস সামান্য মাত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া জানিলেও সহৃদয়তা, পরহিতৈষিণা ও ধর্ম্মবুদ্ধির জন্য তিনি আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভাজন হইয়া ছিলেন। পিতামাতা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, বালিকা রাসমণিও মাতাপিতার কৃষ্ণানুরক্তির অনুকরণ করিয়া কখনও বা অঙ্গে তিলক ধারণ করিতেন এবং কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাঁহার পূজার্চ্চনা করিতেন। এইরূপ বালিকাসুলভ খেলা ধুলার মধ্য দিয়া রাসমণি সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করেন। রাসমণির বয়স
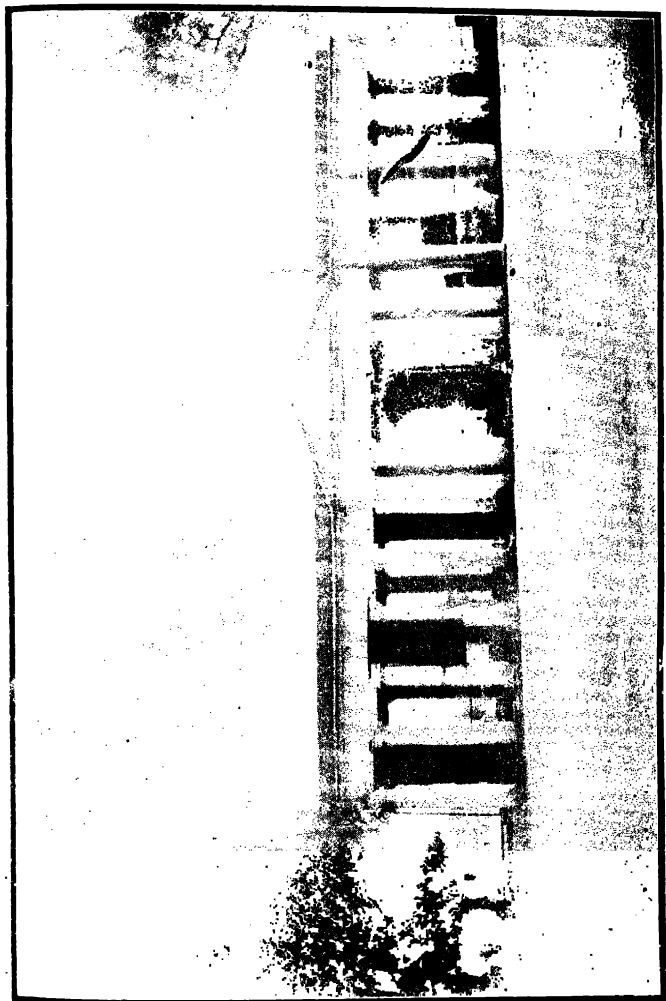
বাবুঘাট, কলিকাতা

যখন সবে সাত বৎসর মাত্র, তখন করাল কালের এক প্রবল ঝঞ্ঝা তাঁহার ভাগ্য-চক্র অন্য দিকে ঘুরাইয়া দিল—বিষাদের ঘনমসীবর্ণ জলদজালে তাঁহার হাস্যময় মুখশ্রী বিষন্ন হইল—তাঁহার স্নেহশীলা জননী আটদিন মাত্র জ্বরে ভুগিয়া ইহকালের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

পত্নীর স্বর্গারোহণের পর হরেকৃষ্ণ রাসমণিকে পাত্রস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। ১২১১ সালের ৮ই বৈশাখ তারিখে শুভক্ষণে দরিদ্রের উদ্যান জাত সামান্য বন্য-কুসুম রাসমণির সহিত রাজচন্দ্র নামক জনৈক ধনকুবের বংশীয় ব্যক্তির বিবাহ হইল। এই রাজচন্দ্রের বংশাবলীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা এ স্থলে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় সংক্ষেপে কিছু বর্ণিত হইতেছে।

কলিকাতা নগরীতে কৃষ্ণরাম দাস নামক জনৈক লোক ছিলেন। তিনি জাতিতে মাহিষ্য ছিলেন। তিনি বংশ বিক্রয়ের ব্যবসায় করিতেন বলিয়া এবং বংশসমূহ মাড় বাঁধিয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া হইত বলিয়া সাধারণতঃ তাঁহার বংশকে "মাড়" আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছিল। কৃষ্ণরামের পুত্র পিরীতরাম কাষ্টম্ হাউসে কর্ম্ম করিতেন। তিনি চাউলের কারবার করিয়া একদিনে পঁচিশ সহস্র টাকা প্রাপ্ত হন। ক্রমে উক্ত কাষ্টম্ হাউসের বড় কর্ত্তা বেব্ সাহেবের অনুগ্রহে ক্রমে ক্রমে চাউলের ব্যবসায় দ্বারা লক্ষপতি হন এবং যশোহর জেলার মকিমপুর পরগণা ক্রয় করিয়া জমিদারশ্রেণী ভুক্ত হন। প্রীতিরাম বাবুরই দ্বিতীয় পুত্র রায় রাজচন্দ্র দাস রাণী রাসমণির স্বামী। রাজচন্দ্র যেমন সত্যবাদী, তেমনি জিতেন্দ্রিয়, সুন্দর, সুদর্শন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১২৪৩ সালে ইঁহারই সহিত রাণী রাসমণির শুভ পরিণয় হয়। দরিদ্রের

কন্যা রাসমণি লক্ষপতি রাজচন্দ্রের সংসারে পদার্পণ করিবামাত্র ভাগ্যলক্ষ্মী যেন তাঁহার উপব দিন দিন প্রসন্না হইতে লাগিলেন। একে ত রাজচন্দ্র বাবু প্রভূত পরিমাণে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাবী হইয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত বাণিজ্যসম্ভারপূর্ণ জাহাজসমূহ ক্রয় করিয়া তিনি অতুল ধনরত্নের অধিকাবী হইয়াছিলেন। যে দিন বিশ পঁচিশ হাজার টাকা লাভ না হইত সেদিন তাঁহার লাভের পরিমাণ খুব অল্প হইল বলিয়া তিনি মনে কবিতেন। প্রত্যুত কোন কোন দিন লক্ষাধিক টাকা পর্য্যন্ত তিনি লাভ করিতেন। রাজচন্দ্র বাবু বাঙ্‌নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার বাক্য বেদ-বাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত, সত্য ও দৃঢ় ছিল। একবার তাঁহার মুখ হইতে যে বাণী নিঃসৃত হইত, জীবনপণ করিয়াও তিনি তাহা পালন করিতেন। একবার বার্ণার্ড কোম্পানী নামক একটি কোম্পানীকে লক্ষ টাকা ঋণ দিতে তিনি অঙ্গীকার করেন। যে দিন ঋণেব টাকা দিবার কথা ছিল, তৎপূর্ব্ব দিবস শুনিতে পান যে উক্ত কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছে। তথাপি সত্যবদ্ধ রাজচন্দ্র বাবু ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া উক্ত কোম্পানীর প্রতিনিধি টাকা লইতে আসিবামাত্র তাঁহার হস্তে প্রতিশ্রুত টাকা সমস্তই অর্পণ কবিলেন। রাজচন্দ্র বাবু পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছে, ফলেও তাহাই হইল, তাঁহার লক্ষাধিক টাকা আর তিনি ফিরিয়া পাইলেন না। এইরূপ বহু সত্যনিষ্ঠার পবিচয় রাজচন্দ্র বাবুর জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সাধারণ জনহিতকর কত শত অনুষ্ঠান যে তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহাব আর ইয়ত্তা নাই। রাজচন্দ্র বাবু চৌরঙ্গী হইতে বাবু ঘাট পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করেন। তাহা পূর্ব্বে রাজচন্দ্র দাস রোড নামে খ্যাত ছিল, অধুনা ইহাকে ক্রীক্ রো বলে। আহীরিটোলার গঙ্গায় সাধারণের স্নানের ঘাট, এবং হাইকোর্টের সন্নিকটে

রাসমণির রৌপ্যরথ

"বাবু ঘাট" ইটালি, তালতলা জানবাজার ও বহুবাজার প্রভৃতি স্থানে ভদ্রব্যক্তিগণের স্নানের সুবিধার জন্য ঘাট প্রস্তুত করণ, নিমতলার সংলগ্ন মুমূর্ষু গঙ্গা যাত্রীদিগের জন্য গৃহ অধুনা ৬৫।২ Strand Road) চানকের তালপুকুর প্রভৃতি আজিও তাঁহার পর হিতৈষিণা বুদ্ধির জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন তিনি মেট্‌কাফ্ হলে গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীর উন্নতি কল্পে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন, বেলেঘাটার খালের জন্য নিজ বিলাসের বাগান জমি গবর্ণমেণ্টকে দান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ রাসমণি যেমন গুণবতী পত্নী, রাজচন্দ্র তেমনি গুণবান্ স্বামী ছিলেন। আলস্য কাহাকে বলে তাহা তিনি আদৌ জানিতেন না, ক্রোড়পতি হইয়াও সর্ব্বদা আপন ব্যবসায় কার্য্যাদি স্বয়ং স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন রাজচন্দ্র বাবুর কোন পুত্র সন্তান হয় নাই, চারিটিমাত্র কন্যা, তিনটী জামাতা এবং চারি পাঁচটী দৌহিত্র রাখিয়া রাজচন্দ্র রাসমণিকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া ১২৪৩ সালে ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সর্দ্দি গর্ম্মি (heat appoplexy) রোগে স্বর্গারোহণ করেন।

রাণী রাসমণি ইতঃপূর্ব্বেই পিতৃহারা হইয়াছিলেন, এইবার পতিহারা হইয়া তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিলেন। যথাসময়ে মহা-সমারোহে রাজচন্দ্রের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল—ভূরি ভোজনে তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণ রাণীকে শতমুখে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—নগ্নবাস ভিখারী ভিখারিণীগণ বহু মূল্য কম্বল, বনাত, পরিধেয় বস্ত্র লইয়া ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে রাণী মায়ের উদ্দেশে অশেষ প্রকার আশীর্ব্বচন করিতে লাগিল—চতুর্দ্দিকে দিগ্‌দিগন্তে রাণী রাসমণির পাতিব্রত্যের প্রশংসাধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

স্বামীর স্বর্গপ্রাপ্তির পর রাণী হিন্দু বিধবার ন্যায় আহারে বিহারে

কঠোর সংযমের পরিচয় দিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাণী প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ছাদের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে স্ফটিকের মালা জপ করিতেন এবং জপ সমাপনান্তে ৺রঘুনাথ জীউকে প্রণিপাত করিতেন, তদনন্তর পুষ্পাদি লইয়া পূজায় বসিতেন। রাণী গলায় একটা মোটা তুলসীর মালা ধারণ করিতেন। তৎপরে বেলা ১টার সময় আহ্নিক সমাপনান্তর হবিষান্ন করিয়া বেলা ৪টার সময় কিছু বিশ্রাম করিতেন।

রাজচন্দ্রবাবু মৃত্যুকালে বিশাল জমিদারী নগদও ৬৮ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। ইহা ছাড়া বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেয়ার ৮ লক্ষ টাকা, ২ লক্ষ টাকা প্রিনস্‌কে ঋণ ও ১ লক্ষ টাকা হেড্ ডেভিডসন্ এণ্ড কোংকে ঋণ দিয়া গিয়াছিলেন। এই প্রভূত অর্থ রাণী রাসমণির বুদ্ধিপ্রাখর্য্য গুণে একটিও অপব্যয় হয় নাই, অধিকন্তু উত্তরোত্তর তিনি ইহার পরিমাণ বাড়াইয়াছিলেন। জমিদারীর সমস্ত কাগজ পত্রে রাণী রাসমণি স্বয়ং স্বাক্ষর করিতেন। তাঁহার জামাতাত্রয় পালা করিয়া জমিদারীর সমস্ত কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতেন। রাণী কেবল তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বৈষয়িক পরামর্শ দিতেন এবং দলিল পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিতেন।

রাণী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রীয় আলোচনা ও পুঁথি পুরাণাদি পাঠ শ্রবণ করিতেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাসের পরামর্শানুসারে ১২৪৫ সালে রথযাত্রা উৎসব করিবার জন্য রাণীর মানস হয়। সময়ের অল্পতা নিবন্ধন হ্যামিল্টন কোম্পানী রূপার পাত প্রস্তুত করিতে অস্বীকৃত হইলে, রামচন্দ্র বাবু ভবানীপুর ও স্বগ্রাম (অর্থাৎ) সিঁতী
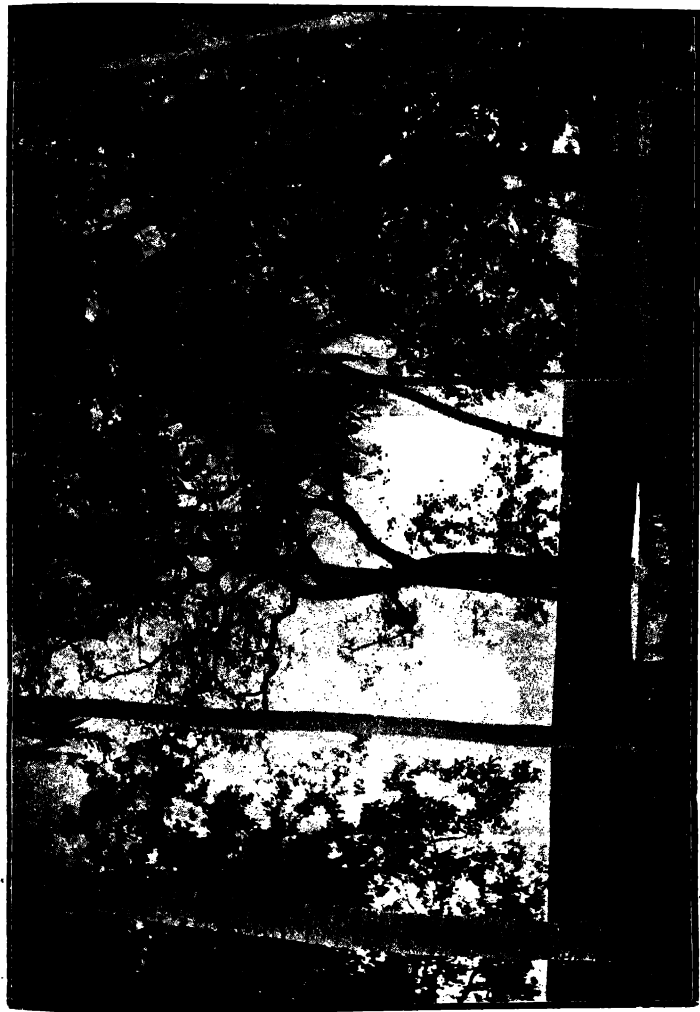
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিদ্ধস্থান

হইতে উত্তমোত্তম কারিগর আনাইয়া ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সুন্দর একখানি রজত-রথ প্রস্তুত করেন। এই রজত নির্ম্মিত রথ যেদিন প্রথম তাঁহার ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটস্থ প্রাসাদ-তোরণ হইতে বহির্গত হইয়া কলিকাতা মহানগরীর রাজমার্গে দর্শন দিল, তখন লক্ষ লক্ষ লোক বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এরূপ সুন্দর রথ, এরূপ বাদ্য-বাজনা তাহারা জীবনে কখনও দর্শন ও শ্রবণ করে নাই। এই রৌপ্য বিনির্ম্মিত রথ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। বলরাম বাবুর মাসী মাতা ৺রাসমণির কনিষ্ঠা কন্যা পরলোক গমন করিলে বিষয়াদি বিভক্ত হওয়ার সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস দক্ষিণেশ্বরের দেব-সেবা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং রৌপ্য রথটীও নিজের বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। এদিকে বিষয় বণ্টনাদির কার্য্যাবলীতে অন্য দৌহিত্র-গণ ব্যাপৃত থাকায় ঐ দুই বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ দিতে না পারায় ত্রৈলোক্য বাবু ঐ রথ ও দক্ষিণেশ্বরের বিষয়াদি সমস্তই নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাধ্য হন। এদিকে বলরাম বাবু ত্রৈলোক্য বাবুর নিকট হইতে দক্ষিণেশ্বর সংক্রান্ত আয় ব্যয়ের ও রথ-সংক্রান্ত আয় ব্যয়ের কোন হিসাব নিকাশ না পাওয়ায় ১৮৮০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে ত্রৈলোক্য বাবুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করেন। ১৩০৮ সালে রথের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়, এবং ঐ বৎসরই বলরাম বাবু প্রথম পালা প্রাপ্ত হন। ১৯১০ সালে রৌপ্য রথখানির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হওয়ায় বলরাম বাবু অন্যান্য অংশীদারগণকে রথখানি ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্ত্তে একখানি নূতন রথ প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু এক অমৃতলাল দাস মহাশয় ব্যতীত অন্য কোন অংশীদার তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি ও অমৃত বাবু উভয়ে অনূন্য ৭০,০০০ সত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে একখানি নূতন রৌপ্য

রথ প্রস্তুত করেন। এই নব-রথ নির্ম্মাণ বিষয়ে বলরাম বাবুর কৃতীপুত্র অজিতনাথ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাজচন্দ্র বাবু আশ্বিন মাসে মহা-সমারোহে দুর্গোৎসব পূজা করিতেন, রাণীও ভর্ত্তার সেই পুণ্যানুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে রাণী ভবানীর দুর্গোৎসব, আর দক্ষিণ বঙ্গে রাণী রাসমণির দুর্গোৎসব দেখাইবার, দেখিবার ও বলিবার উৎসব ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজচন্দ্র বাবু হাইকোর্টের দক্ষিণদিকে একটি ঘাট ইষ্টকাদি দিয়া বাঁধিয়া দেন। বলা বাহুল্য রাণী রাসমণিরই অনুরোধে রাজচন্দ্র বাবু এই ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন এবং এক্ষণে "বাবু ঘাট" নামে তাহা কথিত হইয়াছিল। রাণী রাসমণির সময়ে এই বাবু ঘাট লইয়া সরকারের সহিত একটা গোলযোগ বাধিয়াছিল। ব্যাপারটি এই—একবার দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন কতিপয় ব্রাহ্মণ নব-পত্রিকা স্নান করাইতে বাবু ঘাটে যাইতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকরগণ মহোল্লাসে বাজনা বাজাইতেছিল। পথিপার্শ্বস্থ এক বাটীতে এক শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। ঢাকের বাদ্যে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি আদালতে অভিযোগ আনয়ন করিলেন। ইহাতে রাণী আরও উত্তেজিতা হইয়া পরদিন দ্বিগুণ সংখ্যক বাদ্যকর লইয়া গঙ্গায় যাইতে আদেশ করিলেন। সরকার হইতে হুকুম আসিল রাণী যেন ভবিষ্যতে এরূপ অবৈধ ও বেআইনী কাজ আর না করেন। রাণী আদালতে আইনজ্ঞ লোকের দ্বারা এবং গ্যারিসন্ কর্ম্মচারীর মঞ্জুর-সূচক দলিল দেখাইয়া জবাব দিলেন, এ রাস্তা আমারই স্বামী নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, আমার রাস্তায় আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, এ বিষয়ে সরকার যদি আমায় বাধা দেন, তবে আমি রাস্তা উচ্ছেদ করিয়া দিব।
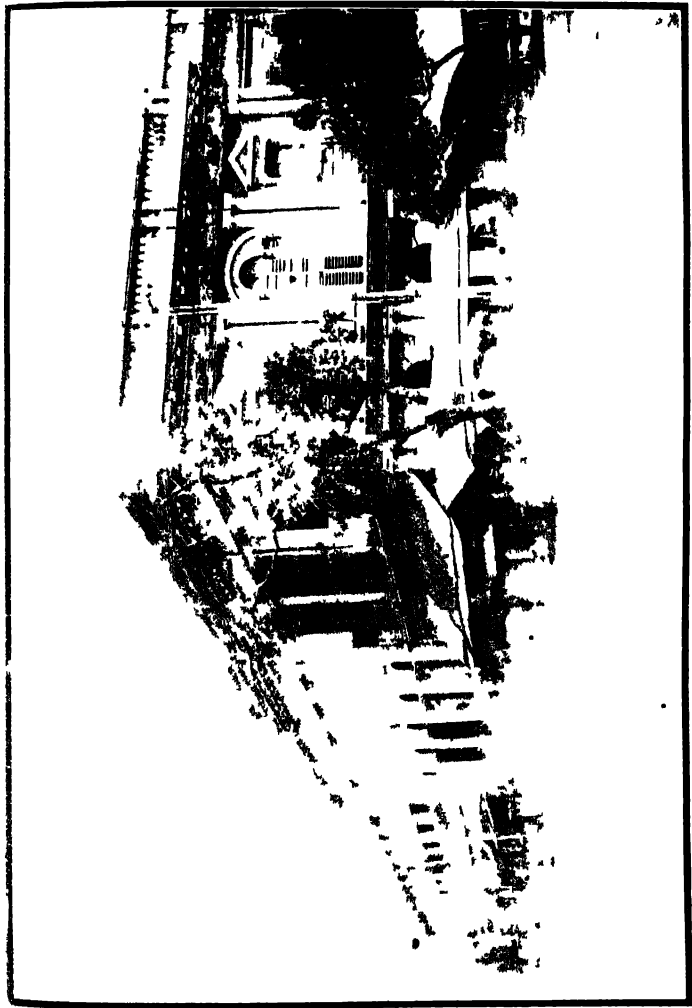
রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটী

রাজদ্বারে রাণীর জিদ্ টিকিল না ; বিচারে তাঁহার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা অর্থ দণ্ড হইল। রাণী জরিমানার টাকা ফেলিয়া দিয়াই জানবাজারের বাটী হইতে বাবু-ঘাট পর্য্যন্ত লম্বিত রাস্তার দুই পার্শ্বে দৃঢ় বেড়া দিয়া অন্যান্য রাস্তার যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। এবারও বেড়া খুলিয়া লইতে সরকার হইতে কড়া হুকুম আসিল। রাণী সরকারের সে "হুম্কি"তে কর্ণপাত না করিয়া ততোধিক কড়া ভাষায় প্রত্যুত্তর দিলেন "আমার রাস্তা, যদি সরকারের প্রয়োজন হয়, তবে আমাকে ন্যায্য মূল্য দিলেই আমি রাস্তা ছাড়িয়া দিব।" সরকার নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করিয়াও যখন রাণীকে বিচলিত করিতে পারিলেন না, তখন নরমস্বরে তাঁহাকে রাস্তা খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার জরিমানার টাকা প্রত্যর্পণ করিলেন। রাণীর জিদ্ বজায় রহিল—সরকারের অনুরোধও রক্ষিত হইল—চারিদিকে সহস্র কণ্ঠে রাণীর জয় জয়কার পড়িয়া গেল।

বলা বাহুল্য, এই সময় হইতেই কলিকাতা সহরে বিবাহ বা পুজোৎসবের মিছিল বাহির করিতে গেলে পুলিশের অনুমতি বা পাশ লইবার প্রথা প্রচলিত হয়।

রাণী রাসমণি শুধু যে কেবল দুর্গোৎসব করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার জামাতা রামচন্দ্র বাবুর ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তি দেখিয়া দোলে ও রাসোৎসবেও তিনি বেশ দু'পয়সা খরচ করিতেন। ইহা ছাড়া বাসন্তী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, কার্ত্তিক পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজাও মহা সমারোহে সম্পন্ন করিতেন।

১২৫৭ সালে রাণী রাসমণি বহু আত্মীয়া কুটুম্বিনী সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করেন। গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া সাগর সঙ্গমে উপনীত হইলে প্রবলবেগে ঝটিকা ও মুষলধারে বৃষ্টি

নিপতিত হইতে লাগিল। নৌকার পশ্চাতে তাঁহার পরিচায়ক-পরিচারিকা পূর্ণ যে তিন চারিখানি নৌকা আসিতেছিল, এই প্রবল বাত্যায় তাহারা আরও দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। রাণী অগত্যা প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সেই জন-মানবহীন সমুদ্রসৈকতে মগ্নপ্রায়া তরী হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে করিতে এক দ্বিজ-দম্পতীর কুটীর প্রাপ্ত হইলেন। তথায় আত্মপরিচয় গোপন করিয়া কোনমতে রাত্রিটুকু যাপন করতঃ পরদিন প্রাতঃকালে আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ-দম্পতীকে প্রণামী স্বরূপ ১০০৲ একশত টাকা দিয়া পুনরায় নৌকারোহণ করিলেন। রাণীর নৌকা যখন স্বর্ণরেখার পরপারে উপস্থিত হইল, তখন তিনি দেখেন তথা হইতে পুরুষোত্তমে যাইবার রাস্তা বড়ই মন্দ। পুরীধাম হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাণী বহু ব্যয়ে স্বর্ণরেখার তীর হইতে জগন্নাথক্ষেত্র পর্য্যন্ত অতি সুন্দর, প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণির দেবদ্বিজে অতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন বিগ্রহের মস্তকে হীরক-খচিত তিনটী মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য এই তিনটী মুকুটের দাম ন্যূনকল্পে ষাট হাজার টাকা।

রাণী রাসমণি তীর্থ দর্শন করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয় তীর্থের দেবতাসমূহের চরণ দর্শনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্যগ্র থাকিত। পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি সেই বৎসরই গঙ্গাসাগর যাত্রা করেন। তথা হইতে ত্রিবেণী, ত্রিবেণী হইতে নবদ্বীপ, নবদ্বীপ হইতে অগ্রদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমনের পথে চন্দননগরের নিকট গরুটীর জঙ্গলে তিনি একদল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। রাণী নৌকারোহণে আসিতেছিলেন, দস্যুগণ জঙ্গলের তলদেশে

দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরের উপর দৃশ্য

নদী সৈকতে অতি সংগোপনে অবস্থান করিতেছিল। রাণীর নৌকা দস্যুগণের অবস্থিতিস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা দ্বাদশজনে মিলিয়া রাণীর নৌকা আক্রমণ করিল। রাণীর শরীর রক্ষী, পরিচারক, দ্বারবানেরা তাহাদিগকে যথাসাধ্য বাধা দিল—উভয়পক্ষে ঘোরতর মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইল। দস্যুদলের একজন আহত হইয়া ভূপতিত হইল। তখন দস্যুদলপতি বলিল "রাণী মা! আমরা অনর্থক মানুষ খুন করিতে আসি নাই, টাকা কড়ি লওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।"

দস্যু দলপতির উত্তর শুনিয়া রাণী রাসমণি বলিলেন, "যদি টাকা কড়ি লওয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমার নিকট এখন কিছু অর্থ ও রূপার এই পাত্র কয়টী ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। যদি তোমাদের ইহাতে মনস্তুষ্টি হয় তবে তোমরা ইহা লও, আর যদি ইহাতে তোমাদের তৃপ্তি না হয় তাহা হইলে আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি কাল ঠিক্ এমনি সময়ে দ্বারবানের দ্বারা তোমাদের বার জনের নিমিত্ত বার হাজার টাকা পাঠাইয়া দিব।

দস্যুগণ রাণীর কথায় বিশ্বাস করিয়া স্থান ত্যাগ করিল। রাণী কলিকাতায় ফিরিয়া তৎ পরদিন বারটী তোড়ায় বার হাজার টাকা দ্বারবান দ্বারা সেই স্থলে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাকেই বলে বাক্‌সিদ্ধা নারী। এরূপ সত্যনিষ্ঠা না থাকিলে জগতে কেহ কি দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর হইতে লক্ষপতির মর্ম্মর-প্রাসাদে স্বর্ণসিংহাসনের অধিকারিণী হইতে পারেন?

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—একথা ধনী, নির্ধনী, ইতর, ভদ্র সকলের প্রতিই প্রযোজ্য। রাণী রাসমণি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধি-কারিণী হইলেও জন্মভূমির চিত্র সর্ব্বদাই তাঁহার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইত। মর্ম্মর-খচিত রাজ-সৌধ তাঁহার মন হইতে শৈশবের ও বাল্যের

ক্রীড়াভূমি জন্মভূমির চিন্তা বিদূরিত করিতে পারে নাই। রাণী মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ত্রিবেণীতে স্নান করিতে যাইতেন। একবার রাণী স্থির করিলেন, ত্রিবেণী হইতে ফিরিবার পথে জন্মভূমি কোনা দর্শন করিয়া আসিবেন। তাঁহার যেমন সঙ্কল্প, অমনি তাহা কার্য্যে পরিণতি। কোনাতে পিতৃপিতামহের ভিটায় একখানি কুড়ে নাই, পরিত্যক্ত শ্মশানের মত তাহা লুপ্ত মনুষ্য বসতির সাক্ষ্য দিতেছে মাত্র। রাণী বৎসর বৎসর খাজনা দিয়া পৈতৃক ভিটাটুকু আপন দখলে রাখিয়াছেন মাত্র। কিন্তু কোনাতে গেলে অন্ততঃ তিন রাত্রি ত থাকা চাই! তাই রাণীর ইচ্ছা ও আদেশানুসারে কয়েকজন ভৃত্য যাইয়া সেই বনাকীর্ণ পরিত্যক্ত ভিটায় দুইখানি মৃৎরচিত অস্থায়ী ঘর নির্ম্মাণ করিল। যথাসময়ে দীর্ঘ ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে রাণী রাসমণি কোনাতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। জন্মভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র শৈশব ও বাল্যের শত স্মৃতি আসিয়া তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিল। পিতার ভালবাসা, মাতার স্নেহ, সহচর সহচরীদের হাস্যকৌতুক কত কথাই রাণীর মনে পড়িতে লাগিল। রাণী যতই সে কথা ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। গ্রামবাসী কতিপয় বৃদ্ধ, বৃদ্ধা নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে রাণীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রাণী শোকাবেগ দমন করিয়া ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র সকলের সহিত সমভাবে আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রায় ৮।১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু লোক আসিয়াছিল। বৃন্দাবন ঘোষ নামে এক ব্যক্তি কোনা গ্রামের অধিবাসী ছিল। তাহার কন্যা রাণীর বাল্যের সহচরী ছিল। একদা দুই সখী ক্রীড়া করিতে করিতে একটু রাত্রি হইয়াছিল। রাণী রাসমণির মা ইহাতে একটু ক্রুদ্ধা হইয়া বৃন্দাবনের কন্যাকে রাণীদের
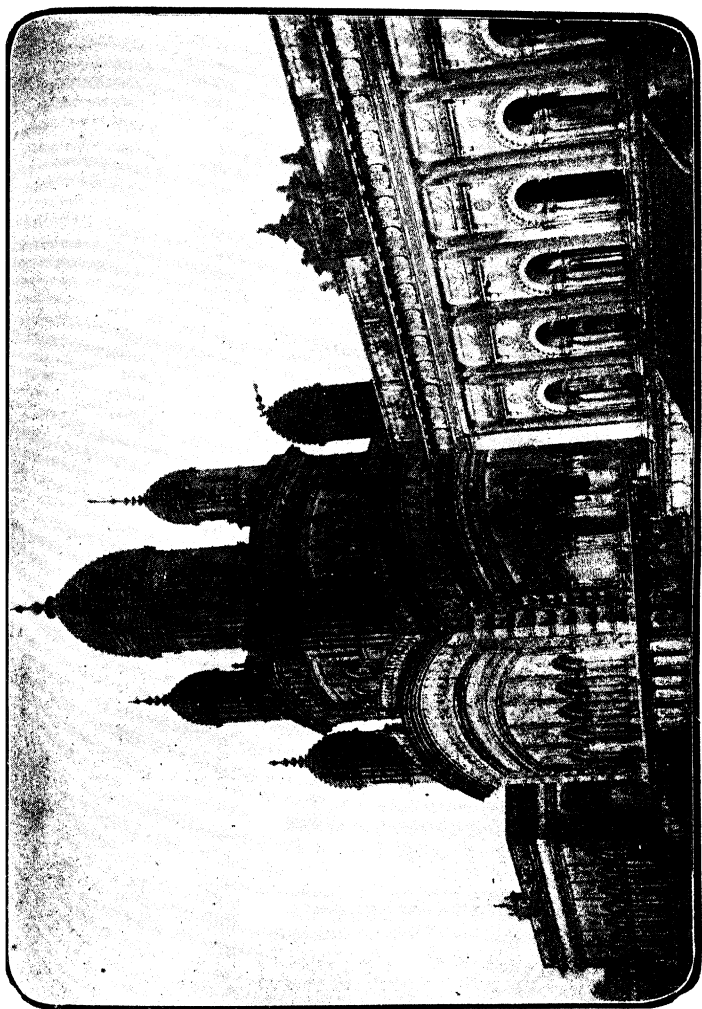
বাটীতে আসিতে কিংবা রাণীর সহিত খেলা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর কতদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, বৃন্দাবন-দুহিতা কিন্তু এখনও সে কথা ভুলে নাই। তাই দূর দূরান্তর হইতেও যখন লক্ষ লক্ষ লোক রাণীকে দেখিতে আসিতেছিল, তখনও বৃন্দাবনের কন্যা রাণীর নিকট যায় নাই। রাণী অনুসন্ধানে জানিলেন যে, বৃন্দাবনের কন্যা পিতৃগৃহেই আছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বহুদিনের পর দুই সহচরীর পরস্পর শুভ সাক্ষাত হইল। রাণী রাসমণি বাল্যের সেই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি সেইজন্য এতক্ষণে আইস নাই?" বৃন্দাবন কন্যা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। রাণী তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার মাতার নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সহচরী তরু-লতার মাতা ত একেবারে লজ্জায় মরিয়া গেলেন। এত বড় দেশ বিখ্যাতা কোটীশ্বরী রাণী রাসমণি তাঁহার নিকট অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মানা, বৃদ্ধা কি দিয়া যে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। যাহা হৌক, রাণী তরুলতাকে অর্থ বস্ত্রাদি ও তাহার মাকে একখানি মূল্যবান পট্টবস্ত্র দিয়া ত্রিরাত্রি বাসের পর জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। বিদায়কালে গ্রামের ব্রাহ্মণমণ্ডলী গঙ্গায় একটী স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, রাণী সানন্দে সেজন্য ৩৫ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাভূমি নবদ্বীপ দর্শনে যাইয়াও রাণী অকাতরে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দীন, দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে অর্থ-বস্ত্র দান করিয়াছিলেন।

কেবল যে তীর্থ দর্শন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান ধ্যানেই রাণী রাসমণির মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য পরিস্ফুট তাহা নহে, তিনি শরণাগত ও আশ্রিতের রক্ষার্থী ছিলেন। এক সময়ে গঙ্গায় জাল ফেলিয়া মৎস্য

ধরিত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ধীবরদিগের উপর কর ধার্য্য করেন। ইহার প্রতিকারের জন্য অন্যান্য ধনীলোকের নিকটে প্রার্থনা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায় ধীবরগণ অবশেষে রাণী রাসমণির করুণা ভিক্ষা করে। রাণী তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঘুসুড়ির নিকট হইতে মেটিয়া বুরুজের সীমা পর্য্যন্ত গঙ্গা ১০ দশ সহস্র টাকায় জমা লইয়া ধীবরগণের সমধিক সুবিধা করিয়া দিলেন। তদবধি গবর্ণমেণ্ট ধীবরগণকে বিনা করে মৎস্য ধরিতে দিলেন। আজিও সেই প্রথা প্রচলিত আছে।

১৮৫৭ সালে ভারতের মুখ সহসা ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় আবৃত হইল। টোটায় শূকরের ও গরুর চর্ব্বি আছে এবং সেই টোটা দন্ত দ্বারা ছিন্ন করিয়া বন্দুকে দিতে হইবে, ইহা শুনিতে পাইয়া ভারতের যেখানে যত সিপাহী ছিল, তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিল—চারিদিকে বিদ্রোহের অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইংরাজ দেখিলেই তাহাকে হত্যা করিতে হইবে, ইহাই সিপাহীদিগের মূলমন্ত্র হইল। কানপুরের সিপাহীদিগের মধ্যেই এই অগ্নি যেন কিছু অধিক পরিমাণে প্রজ্বলিত হইল। এইবার নিশ্চয়ই কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হইয়া ভারতে পুনরায় হিন্দু-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে তাহাদের কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। সুচতুরা বুদ্ধিমতী রাণী কিন্তু ইংরেজের বাহুবলের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিতেন, তিনি জানিতেন এ অশান্তি অচিরাৎ নির্ব্বাপিত হইবে, ইংরেজ জয়ী হইবে—সিপাহীদের গর্ব্বোন্নত শির শীঘ্রই ধূলি স্পর্শ করিবে। তাই তিনি কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় ত দূরের কথা বহু সহস্র টাকার কাগজ অল্প মূল্যে কিনিয়া রাখিলেন। শুধু ইহাই নহে, রাজার বিপদের সময় প্রজামাত্রেরই তাহাকে সাহায্য করা উচিত এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া রাণী হস্তী, অশ্ব, আটা, ছোলা,
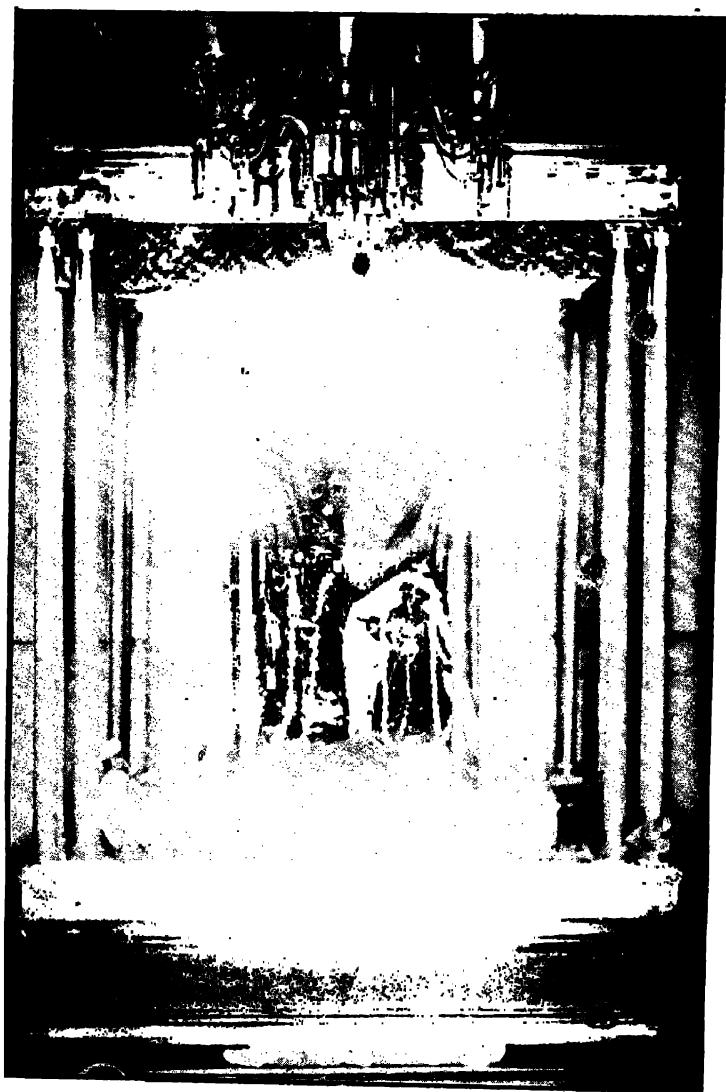
দক্ষিণেশ্বরের রাধাশ্যাম মূর্ত্তি

কদলী, চাউল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যদিগের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কানপুর বিজয়ের পর রাণীর এই বিপদে সাহায্য দানের জন্য ইংরাজগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এদিকে রাণীও স্বল্প মূল্যে ক্রীত কোম্পানীর কাগজ অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রভূত টাকা লাভ করেন।

রাণী রাসমণি স্নেহে ও দয়ায় যেমন কুসুম কোমলা ছিলেন, সাহসেও তেমনি বজ্রসম কঠিন ছিলেন। একবার তাঁহার জানবাজারস্থ বাটীতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় গোরা সৈনিকেরা আসিয়া উৎপাত, উপদ্রব ও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। উন্মুক্ত কৃপাণ করে গোরা সৈনিক দেখিয়া সকলেই ভীত, ত্রাস্ত হইয়া পশ্চাদ্দ্বার দিয়া অন্য বাটীতে আশ্রয় লয়, দ্বারবানেরা দুর্দ্ধর্ষ গোরাদিগকে প্রথম প্রথম বাধা দিয়া শেষে পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। এই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে রাণী রাসমণি কেবল স্থির থাকেন। তিনি একখানি শাণিত তরবারি হস্তে অন্দর মহলে রঘুনাথজীউর মন্দিরে ভৈরবী মূর্ত্তিতে বসিয়া রহিলেন। গোরারা আসিয়া তাঁহার বাটীর পশু পক্ষীর পক্ষচ্ছেদ করিল—হরিণ হরিণীর অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিল। সুন্দর সুন্দর দর্পণ, সুন্দর সুন্দর বাকস্ কেদারা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র বাবুর প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দকে বৈঠকখানায় কৌচের নিম্নে পাইয়া তরবারির দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিল। কিন্তু রাণী একটুমাত্র বিচলিত হইলেন না। গোরারা একজন পথিকের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল, তখন পথিককে রক্ষা করিবার জন্য রাণীর জামাতাগণ দ্বারবানদিগকে হুকুম দিয়াছিলেন, তাহাতে একজন গোরার মস্তকে একটু আঘাত লাগে। ইহারই ফলে সমস্ত গোরারা একত্রিত হইয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত রাণীর বাটীতে লুটপাট করিতে থাকে। রাণীর জামাতা রামচন্দ্র

বাবু তখন আহারাদি করিতেছিলেন, তিনি ঐ সংবাদ কিছুমাত্র জানিতেন না, তিনি আহারাদি সমাপন করিয়া খিড়কী দ্বার দিয়া বাহিরে গিয়া তৎক্ষণাৎ গোরাদিগের অধিনায়ককে (officer commanding) সঙ্গে আনিয়া গোলমাল থামাইলেন। বলা বাহুল্য রাণীর যে সমস্ত দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছিল সরকার হইতে সে সমস্তের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। সেজন্য সরকার হইতে জানবাজার বাটীতে গোরা পাহারার বন্দোবস্ত হয়।

রাণী রাসমণি শুধু দেব দ্বিজের উপাসনা ও দান ধ্যানেই নিমজ্জিতা থাকিতেন না, বিষয় সম্পত্তির প্রসার ও প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ও তিনি সদা সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। একবার তাঁহার জমিদারী মকিমপুর পরগণায় নীলকর ডোনাল্ড সাহেব নিরীহ প্রজাদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে থাকে, রাণী সদর হইতে পঞ্চাশজন বলবান দ্বারবান পাঠাইয়া ডোনাল্ডকে মারিয়া মৃতপ্রায় করেন। ডোনাল্ড আদালতে মোকদ্দমা আনিয়া নিষ্ফল হন এবং তদবধি নীলকরের অত্যাচারও লোপ পায়।

টোনা নামক অৰ্দ্ধ মাইলব্যাপী একটি প্রশস্ত খাল খনন করাইয়া দিয়া রাণী রাসমণি মধুমতী ও নবগঙ্গাকে একত্র সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই খাল খননে তাঁহার ১ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল।

রাণী রাসমণি দেবদ্বিজে এতাদৃশী ভক্তিমতী ছিলেন যে, তিনি প্রতিদিন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়াই ব্রাহ্মণকে একটি মুদ্রা প্রণামী দিতেন এবং স্বহস্তে অষ্টোত্তর শত দুর্গানাম লিখিতেন। তদনন্তর প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া দুই তিন ঘণ্টা জামাতাদিগের সাহায্যে জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি দেশের সংবাদও রাখিতেন, তাঁহার কোন কোন দৌহিত্র তাঁহাকে এই সময়ে সংবাদপত্র

স্বর্গীয় বলরামদাসের বৈঠকখানা

বলরামবাবুর ঠাকুর-দালান
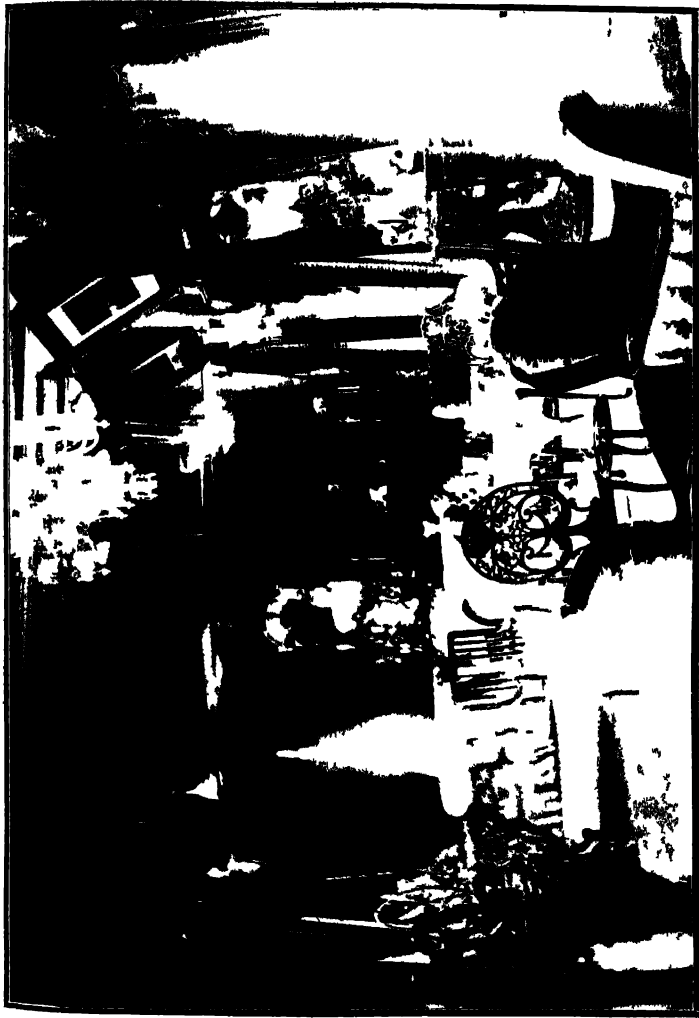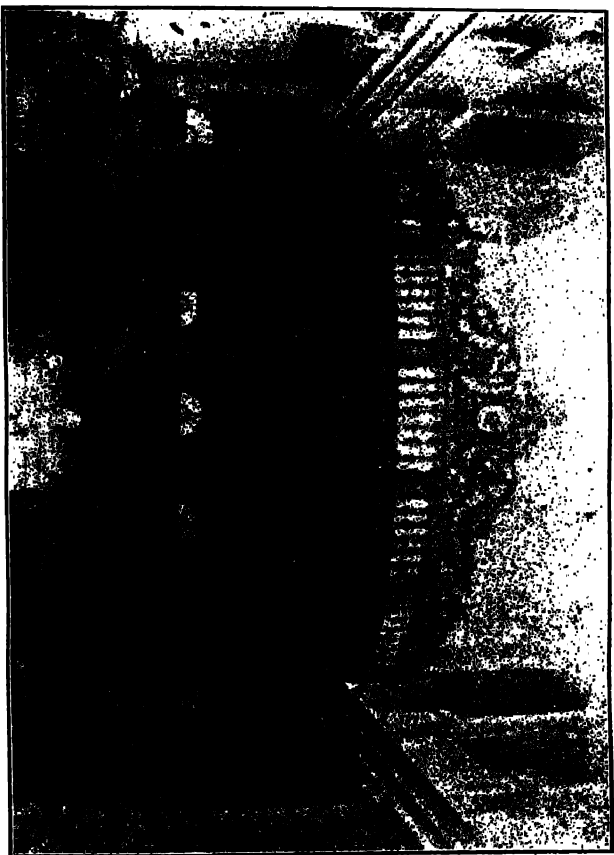
পড়িয়া শুনাইত। অতঃপর স্নান আহ্নিক সমাপনান্তর ও দীন দরিদ্রকে দ্বাদশটী মুদ্রা প্রদানান্তর তিনি অপরাহ্নে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন।

নিম্নে রাণী রাসমণির স্বামীকুলের বংশাবলীর চিত্র প্রদত্ত হইল :—

বংশ-তালিকা।
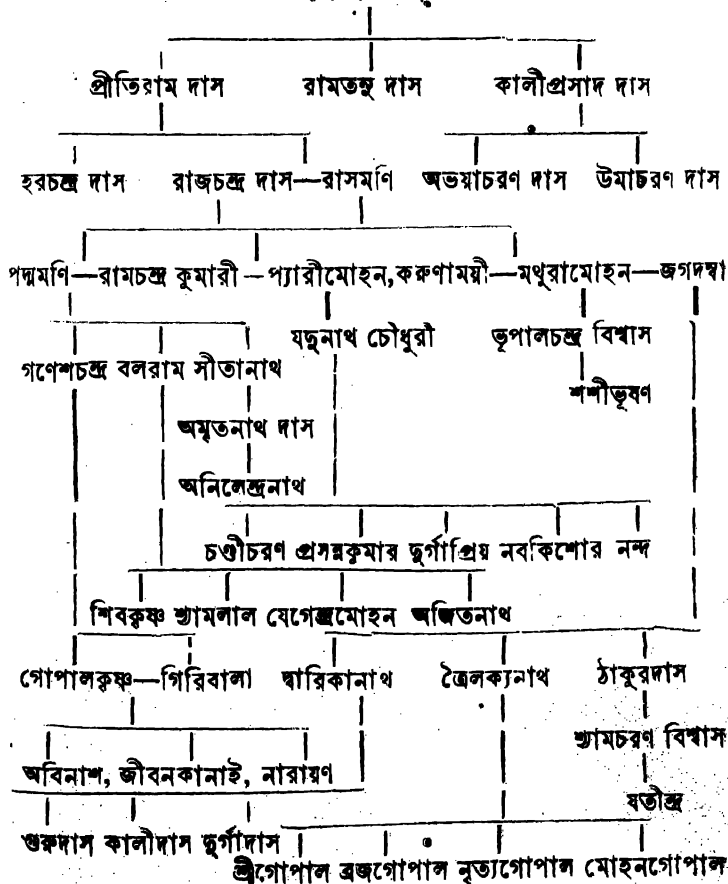
১২৪২ সালে রাণী রাসমণি বারাণসী দর্শনে অভিলাষ করেন, তদনুযায়ী সমস্ত দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহও হয়, কিন্তু মঙ্গলময়ীর ইচ্ছা কে বুঝিবে? যেদিন রাণী বারাণসী যাত্রা করিবেন, তৎপূর্ব্ব দিন তিনি স্বপ্নযোগে দেখেন যেন জগদ্ধাত্রী বিশ্বেশ্বরী তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুমি কাশীতে না গিয়া শিব-শক্তির মূর্ত্তি বঙ্গদেশে স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা কর, তাহাতেই তোমার কাশী দর্শনের ফল হইবে।" তদনুসারে রাণী দক্ষিণেশ্বরে বহুব্যয়ে রাধাশ্যামের যুগল মূর্ত্তি ও আদ্যাশক্তি কালীমূর্ত্তি দ্বাদশটী শিবলিঙ্গ ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ৩১শে মে (১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার) ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ মন্দির যিনিই নয়নগোচর করিয়াছেন ভাবে তিনি বিহ্বল না হইয়া পারেন নাই। দক্ষিণেশ্বর সাধকের সাধনাক্ষেত্র, ভাবুকের ভাবনাক্ষেত্র, মুমুক্ষুর মুক্তিমণ্ডপ, শাক্ত ও বৈষ্ণবের পবিত্র মিলন স্থল। পুণ্যতোয়া কলকলনাদিনী ভাগীরথীর বক্ষ হইতে সোপান শ্রেণী উঠিয়া মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে, মন্দিরে একাদশ বর্ষীয়া, এলোকেশী, নরমুণ্ড-মালিনী দানবদলনী, প্রহরণধারিণী মা মহাকালের উপর দণ্ডায়মানা। তাঁহার উত্তরদিকের মন্দিরে পীতবাস পরিহিত, বনমালা গলে, মোহনবাঁশী করে রাসবিহারী বংশীধারী ব্রজের গোপাল শ্রীরাধাকে বামে লইয়া দণ্ডায়মান। পশ্চিমদিকে শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তর-মণ্ডিত মন্দির-তলে কষ্টি প্রস্তরে শিবলিঙ্গ। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব এই তিনেরই তীর্থস্থান শ্রীদক্ষিণেশ্বর। ১২৬১ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে রাণী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপ্ত করেন।

রাণী রাসমণি এই কালীবাড়ীর দেবসেবা ও অতিথিসেবার জন্য দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণা বার্ষিক ৬০ ষাট হাজার টাকা আয়ের জমিদারী দান করিয়া গিয়াছেন। এখনও দক্ষিণেশ্বরের
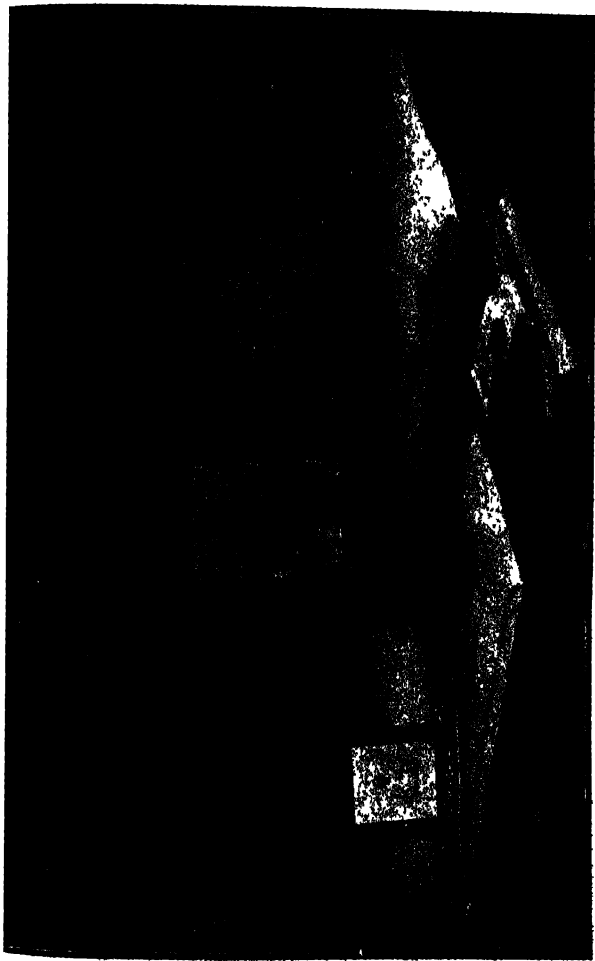
দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাটীর রামকৃষ্ণদেবের ঘর

নিকটবর্ত্তী সহস্র সহস্র মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অধিবাসী বিষ্ণু ও কালীমায়ের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া দিনাতিপাত করেন, বাটীতে কাহাকেও রন্ধন কার্য্য করিতে হয় না। প্রসাদ বলিতে কেহ ছাগ বা মেষের উপাদেয় মাংস বুঝিবেন না, কেননা দক্ষিণেশ্বরে করুণাময়ী, জগজ্জননী মায়ের সম্মুখে কোন প্রকার জীবহিংসা হয় না, মা আনন্দময়ী সন্তানের রক্তপান না করিয়া ফল, ফুল নৈবেদ্য ও অন্ন ভোজনেই পরম আনন্দিতা। পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে মহামায়ার সম্মুখে ছাগ বলি হইত, কিন্তু রাণীর অন্যতম দৌহিত্র ৺বলরাম দাস মহাশয় বহু অর্থ ব্যয়ে ভারতের যাবতীয় স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের ব্যবস্থা আনিয়া এই বলিদান প্রথা রহিত করেন। বলরামবাবুকে বলিদানে অনুকূল মত পোষণ করাইবার জন্য তাঁহার অন্যান্য অংশীদারগণ বিশেষভাবে চেষ্টা ও প্রযত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃঢ় সংকল্প বলরাম তাহাতে বিন্দুমাত্র সংকল্পচ্যুত হন নাই। দক্ষিণেশ্বরে এই বলিদান প্রথা রহিত করিবার জন্য তাঁহাকে আদালতের আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তদবধি দক্ষিণেশ্বরে মায়ের নিকট কোনরূপ ছাগাদি পশুবধ হয় না।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণের লীলাভূমি। এই দক্ষিণেশ্বর হইতেই পাগল গদাধর জগতের শিক্ষক "রামকৃষ্ণ পরমহংসে" পরিণত হইয়াছিলন। যতদিন রামকৃষ্ণ ভারতে ভক্ত সাধারণের হৃদয়ের পূজা ও অর্ঘ্য পাইবেন, রাণী রাসমণির নামও ততদিন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত থাকিবে। রাণী রাসমণি যদি শুধু দক্ষিণেশ্বরের দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াই যাইতেন তাহা হইলেও তাঁহার নাম বঙ্গের ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিত।

১২৬৭ সাল বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর পক্ষে অতি দুর্ভাগ্যের সাল। এই সালেরই ৯ই ফাল্গুন বঙ্গদেশকে কাঁদাইয়া—দীন দরিদ্র ভিখারীদিগকে

ঘোর শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া দীনের পালয়িত্রী, শরণাগতে রক্ষয়িত্রী, ব্রাহ্মণের সহায়া রাণী রাসমণি দেবলোকে প্রস্থান করেন। স্বর্গারোহণের কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই রাণী উদরাময় রোগে ভুগিতে ছিলেন। ক্রমে উহা কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে চলিল। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলে চিন্তিত হইলেন—প্রজাগণ রাণীমায়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। রাণী বলিলেন, "আমি আর এবার বাঁচিব না, আমাকে হয় দক্ষিণেশ্বরে না হয় কালী-ঘাটে লইয়া যাও।" দক্ষিণেশ্বরেই রাণীকে লইবার চেষ্টা হইল, কিন্তু সেখানে সুবিধা হইল না. তখন রাণীকে কালীঘাটে স্থানান্তরিত করা হইল। কত চিকিৎসা হইল, কত উত্তম উত্তম চিকিৎসক রাণীমায়ের চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মৃত্যুর যবনিকা যাহার উপর ধীরে ধীরে পতিত হইতেছে তাহাকে কি আর ভেষজ-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখা যায়। ১২২৭ সাল, ৯ই ফাল্গুন দিনটা কোনমতে কাটিল, সকলেরই মনে সংশয় হইতে লাগিল রাত্রিটা বুঝি কাটিবে না। ফলে ঘটিলও তাই, ঐ দিন শেষ রাত্রে পুণ্যাশ্লোকা, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণি তিন কন্যা, তিন জামাতা, ১৫।১৬ জন দৌহিত্র, অসংখ্য বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, স্বজন, ও প্রজাপুঞ্জের সম্মুখে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতে করিতে দু'নয়ন মুদ্রিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের ভাগ্যাকাশ হইতে একটা জলন্ত নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।

তাঁহার দৌহিত্রগণের মধ্যে বলরামবাবু বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য দেশ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বলরাম বাবু রাণী রাসমণির জ্যেষ্ঠ দুহিতা পদ্মমণির মধ্যম পুত্র। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডভ্‌টন কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি সাধারণ হিতকর অনেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কার্য্য করিয়াছিলেন। সঙ্গীত

বলরাম বাবুর ঠাকুরদালান

বিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট আনুরক্তি ছিল এবং তিনি পাখোয়াজ বাজাইতে সুনিপুণ ছিলেন। কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ পরিদর্শিত হইত। তিনি প্রজারঞ্জক ও দয়াবান ভূস্বামী ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। বস্তুতঃ যাঁহারাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন তাঁহারাই তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তির প্রশংসা-বাদ না করিয়া থাকিতে পারিত না। বলরাম বাবু রাজভক্ত ও অনুরক্ত ভূস্বামী ছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি রাজভক্তির অকপট নিদর্শনস্বরূপ স্বেচ্ছায় পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রার সমর ঋণ কাগজ ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অপ্রকাশ্যভাবে তিনি দেশের ও দশের জন্য যে দান করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি রাসমণির সুযোগ্য দৌহিত্র ছিলেন এবং আজীবন নিজের ব্যবহারে ও কার্য্যে তাঁহার পুণ্যশ্লোকা মাতামহীর স্মৃতি নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তাহার পত্নীবিয়োগ হয় এবং ১৯০৮ সালে মার্চ্চ মাসে তাহার দুই পুত্র শিবকৃষ্ণ ও শ্যামলাল দাস বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহারা দুই জনেই বি এল্ ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দুইটী পুত্র ও দ্বাদশটী পৌত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবিত পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যোগেন্দ্রমোহন তৃতীয় ও অজিতনাথ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। যোগীন্দ্রমোহন একজন Free mason, Bengal land holders'associtionও উত্তরবঙ্গ জমিদার সভার সদস্য। দিল্লীরাজ দরবারে ইনি সরকার পক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

অজিতনাথ রাণী রাসমণির উপযুক্ত বংশধর। দেশ হিতকর সকল সদনুষ্ঠানেই ইনি যোগদান ও সাহায্য করিয়া থাকেন। অজিতনাথ অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন।

ইনি একজন Justice of the peace, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যাসোসিয়েসনের সদস্য ও Royal reception কমিটির সভ্য হইয়াছেন। ইনি কলিকাতা ক্লাব, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ন্যাশনাল লিবারাল লীগ, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ রয়েল কলিকাতা টফক্লব প্রভৃতির সভ্য। ইনি হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে কলিকাতা ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের ভিসিটিং কমিটীর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

রাণী রাসমনির জ্যেষ্ঠ কন্যা পদ্মমনির গর্ভে যে তিনটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে গনেশচন্দ্র অন্যতম। গনেশচন্দ্রের পুত্র গোপালকৃষ্ণ তাঁহার স্ত্রী গিরিবালা দাসী এড়িয়াদহে একটী ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তাঁহার চারি জামাতা। জ্যেষ্ঠ জামাতা সতীশচন্দ্র সরকারের তিন পুত্র, পঞ্চানন, সারদানন্দ ও শিবানন্দ। দ্বিতীয় জামাতার নাম হৃদয় কৃষ্ণ দাস। তাঁহার পুত্রদের নাম আশুতোষ, গোপীনাথ ও কাশীনাথ। তৃতীয় জামাতার নাম ক্ষেত্র মোহন দলুই। তাঁহার পুত্রের নাম কানাই লাল দলুই। চতুর্থ জামাতার নাম হৃষিকেশ বিশ্বাস, তাঁহার পুত্রের নাম যতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস।

---

* এই জীবন চরিতের উপাদান ও প্রতিকৃতি সমূহ সংগ্রহ কার্য্যে ৺বলরাম-দাস মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অজিতনাথ দাস মহোদয় আমাদিগকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ রহিলাম।
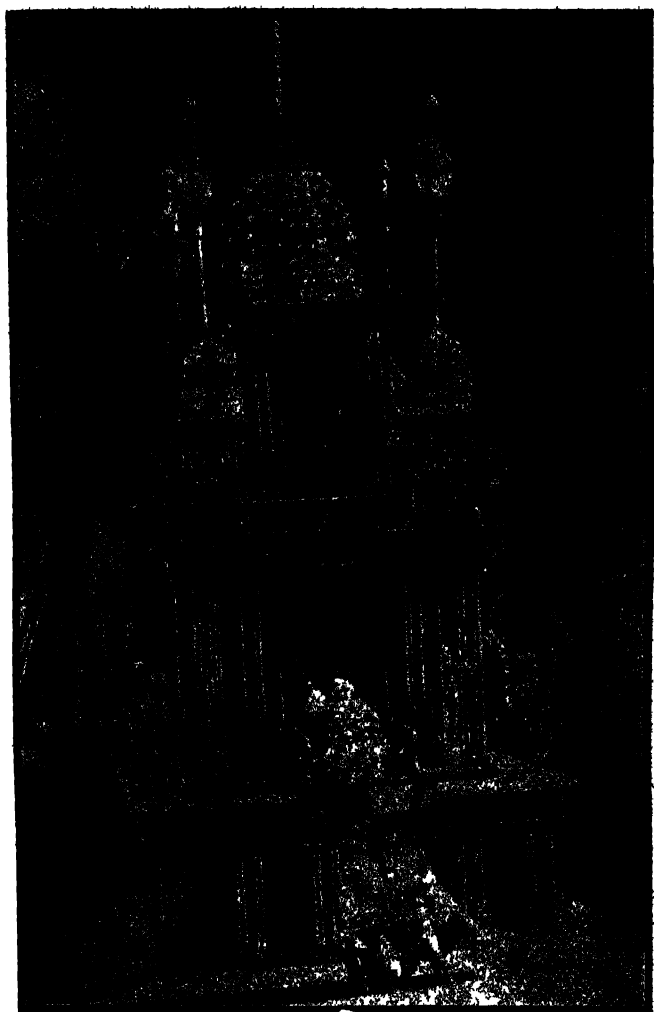
স্বর্গীয় বলরাম দাসের রৌপ্যরথ
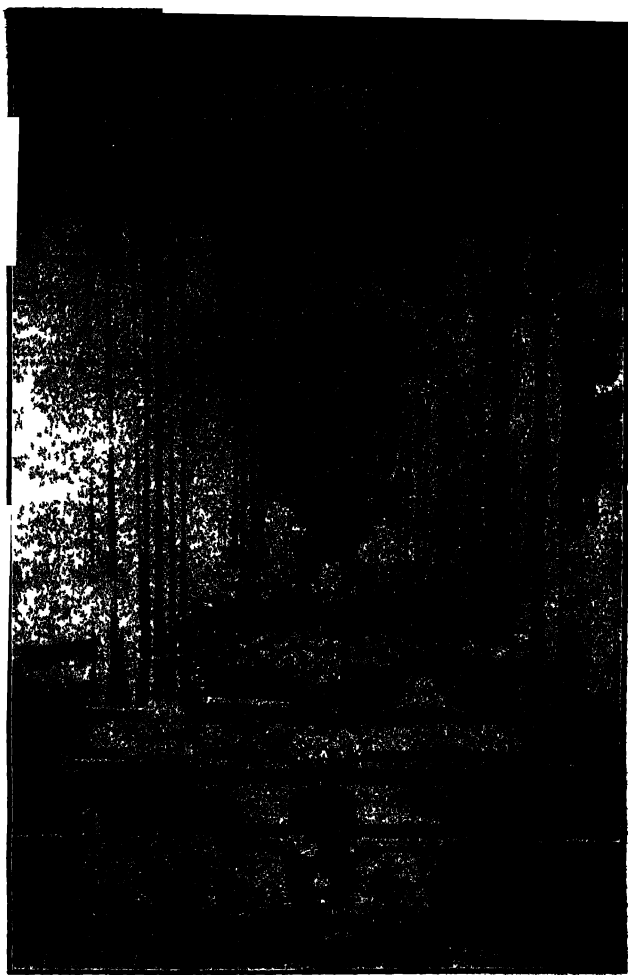
দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মূর্ত্তি (কালী)
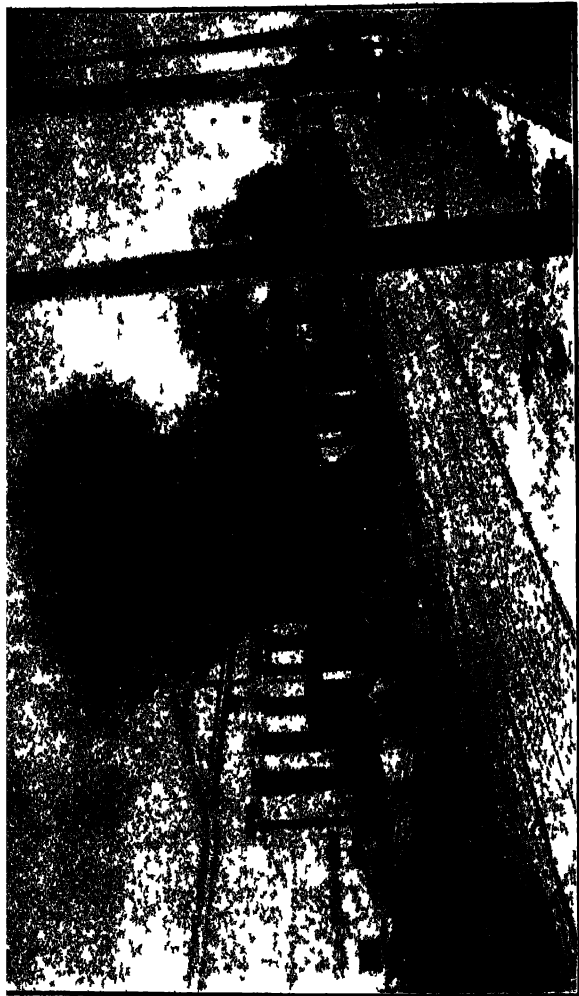
TABLET

"Was erected in the year 1834 by permission and under auspices of Lord William Cavendish Bentinck G C. B. G C H etc., Governor-General through the benevolence of Babu Raj Ch Doss for the accomodation of Hindoos brought to the riverside in the last stage of illness."

Sd. J Llewelyn

রাণী রাসমণি ।

গ্রন্থ মুদ্রণ সমাপ্ত হইলে আমরা পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি, তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা ৺মথুরানাথ বিশ্বাস ও জামাতৃ পুত্র ৺ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস মহাশয় সম্বন্ধে আরও নূতন উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছি। উপাদানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হওয়ায় সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিলাম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; রাণী রাসমণি যদি শুধু দক্ষিণেশ্বরের দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াই যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম বঙ্গের ইতিহাসে অনন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিত। এই দক্ষিণেশ্বরই যুগাবতার রামকৃষ্ণের লীলাভূমি। পরমহংসদেবের ধর্ম্মজীবনগত জন্ম, শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও অবসান মন্দির স্থাপয়িত্রী রাণী রাসমণি ও তদীয় কনিষ্ঠ জামাতা ৺মথুরানাথ বিশ্বাস এবং তৎপুত্র ৺ত্রৈলোক্য নাথ বিশ্বাস মহাশয়গণের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। এ সম্বন্ধে নব্যভারত পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"মন্বাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই, প্রাকৃত জনক-জননী হইতেও ধর্ম্মজীবনের পালক পালিকাগণের ঋণ অধিকতর গুরুভারাক্রান্ত। ধর্ম্মজীবনের সহায় ও আশ্রয়দাতৃগণের জীবনসহ ধার্ম্মিকের জীবন অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থাকে। সেই শৃঙ্খল-সৌন্দর্য্য ও মহিমা হৃদয়ঙ্গম না হইলে, ধার্ম্মিক জীবন বুঝিয়া উঠা যায় না। এমন কি, ধর্ম্মজীবনের শত্রুগণ পর্য্যন্তও আলোকপ্রাপ্ত হয়, এবং ধার্ম্মিকের সঙ্গে সঙ্গে অমরতা লাভ করিয়া থাকে।

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের স্থাপয়িত্রী রাণী রাসমণির পর তাঁহার [illegible]

দৌহিত্রী ও উত্তরাধিকারী ৺মথুর বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস মহাশয় আজীবন দক্ষিণেশ্বরের সেবাইতের কার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন। পরমহংস ঘটিত বহু কার্য্যই তাঁহার চক্ষের উপরে, তাঁহার কর্ত্তৃত্বের অধীনে ও রক্ষণাবেক্ষণে ঘটিয়াছে। তিনি পিতা ও মাতামহীর সহিত পরমহংস সম্বন্ধীয় বহু ঘটনাতেই স্বয়ং জড়িত ছিলেন, অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং যাহা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহাও তাঁহার জানিবার বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ছিল। বলিতে কি পরমহংস ঘটিত কোন কথাই তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি যে ভাবে পরমহংস সম্বন্ধে ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন তাহা হইতেই পরমহংসদেবের বাহ্যজীবন সম্বন্ধে এইরূপ আভাষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে :—

'গদাধর পূজারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, প্রথমতঃ কালীবাড়ীর ম্যানেজার,—সহকারী ম্যানেজার প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষকে তুচ্ছ করিতে থাকেন। সুন্দররূপে কালীপূজা ও শিবপূজাদি চলিতে লাগিল। শেষে গদাধরের ত্রুটি বাহির হইতে লাগিল। পূজকের যেরূপ নিষ্ঠা নিয়ম থাকা আবশ্যক, তাহাতে তাঁহার ত্রুটি দৃষ্ট হইতে লাগিল, পূর্ব্ববৎ যথা-নিয়মে পূজাগুলি তিনি নির্ব্বাহ করিতে শৈথিল্য করিতে লাগিলেন। যে পূজার জন্য এত আয়োজন, সেই পূজায় বাধা পড়িতে লাগিল। ঠাকুর বাড়ীর কর্ম্মচারীগণ যার পর নাই ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা গদাধরকে পূজারীর অযোগ্য স্থির করিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, উঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরিশেষে তাঁহারা সমস্ত বিষয় মথুর বাবুর নিকট জ্ঞাপন করিলেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, গদাধরকে কোন প্রকারের সাধক শ্রেণীর লোক বলিয়া সন্দেহ করিলেন, তাড়াইয়া দিলেন না ; তাঁহার দ্বারা কার্য্য চালাইয়া লইতে বলিলেন। রামকৃষ্ণের ভক্তগণ বলেন,—তিনি প্রেম-বিহ্বলতা বশতঃ পূজাদি করিতে

স্বর্গীয় অমৃতনাথ দাস

সমর্থ ছিলেন না। যাহা হউক, তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে নানা অর্থই হইতে লাগিল। মথুর বাবু নিজে একজন সাধক লোক ছিলেন; রাণী রাসমণিও বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া পরমহংসদেবকে সমাদর করিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারীগণ আর করিবেন কি? তাঁহাদের উভয়ের এইরূপ সমাদরের ভাব দেখিয়া গদাধরের বিপক্ষগণ নীরব হইলেন। গদাধর উত্তরোত্তর পূজাদি কার্য্যে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিকট সাধুভাবাপন্ন লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে মথুরবাবু পূজার জন্য অন্য বন্দোবস্ত করিয়া গদাধরকে জানবাজারের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে তিনি কতকাল বাস করিবার পর মথুরবাবু তাঁহাকে লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। প্রায় অশীতি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ান্তে তাঁহাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও স্বাধীনভাবে চলিবার অধিকার দান করিয়া দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়া দিলেন।'

"এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তাঁহাকে কোন কঠোর ভজন, সাধন ইত্যাদি করিতে দেখা যায় নাই; এবং উন্মত্তের ন্যায় আচরণশীল দেখা গিয়াছে। তাঁহার মুখে গভীর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনা গিয়াছে ও তাঁহাকে বহি-সংজ্ঞা-রহিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই সম্বন্ধে কর্ম্মপর মনুষ্যগণের ধারণা করা সহজ নহে। তবে মথুরবাবু ও রাণী রাসমণি স্বয়ং কতক অনুভব করিয়া এবং লোকের কাছে শুনিয়া তাঁহাকে বড় সাধক বলিয়া ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের আশা ছিল, রামকৃষ্ণের প্রভাবে দক্ষিণেশ্বর জাগ্রত হইয়া উঠিবে। তাঁহারা রামকৃষ্ণের সাধনায়, গুরুগম্ভীর কথায়, সমাধির ভাবে তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতে ও ভালবাসিতে লাগিলেন। মাতা যেমন শিশুপুত্রের শৌচাশৌচ, দোষাদোষ দর্শন করেন না, তাঁহাদের দৃষ্টিও রামকৃষ্ণের প্রতি সেইরূপ হইল। তাঁহারা

তাঁহার কার্য্য সমালোচনা চক্ষে দৃষ্টি করিতেন না; করিলে গদাধরের পক্ষে দক্ষিণেশ্বরে সেইভাবে সাধনমার্গে চলা সহজ হইত কিনা, বলিতে নিজ পারি না। এই সকল কথা চিন্তা করিলে মনে হয়, পরমহংস রামকৃষ্ণ সাধন, ভজন উন্নত জীবন লাভের জন্য, রাণীরাসমণি ও মথুর বাবুর নিকট কত ঋণী!! সে স্নেহ, সে কৃপা, সে শ্রদ্ধা ও মমতা, মহান্ উদারতা নিজ জনক জননীর নিকটেও তিনি পাইতেন না।'

ত্রৈলোক্য বাবু পরমহংসের কার্য্য সমালোচনার চক্ষে দেখিলেও কদাচ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই। পরন্তু তিনি পরমহংসের ভক্তি, জ্ঞান ও সমাধি প্রভৃতি দর্শন কবিয়া অতীব ভক্তি করিতেন; কিন্তু অনুষ্ঠান অংশে তাঁহাকে বিশেষ সমালোচ্য মনে করিতেন। ত্রৈলোক্য বাবু কেবল মাতামহী ও মাতার প্রতিষ্ঠিত মন্দির সমূহের সেবায়ত ছিলেন না, নিজেও বহুব্যয়ে কাশীতে শিবমন্দির স্থাপন ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

"রাণীরাসমণি একটা মহাশুদ্ধ পবিত্র প্রেরণায় পরমহংস রামকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্রের বিকাশ ও প্রসারোপযোগী স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন আর তাঁহার প্রভাবশীল জামাতা মথুরবাবু ঐরূপ উচ্চ প্রেরণায় সেই দেবচরিত্র বিকাশের সময় অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়াছিল, তৎ-সমুদায়ই যোগাইয়াছিলেন। মথুরবাবু ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতি-সম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত, হটকারী হইলেও বুদ্ধিমান; ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্য্যশীল এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনিও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ— কিন্তু কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে উহা বুঝিব না এরূপ স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন না। ঈশ্বর বিশ্বাসী ও ভক্ত—কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যাহা বলিবে তাহাই যে চোখ-কাণ বুঝিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন তাহা ছিলেন না, তা তিনি ঠাকুরই হউন বা গুরুই হউন বা
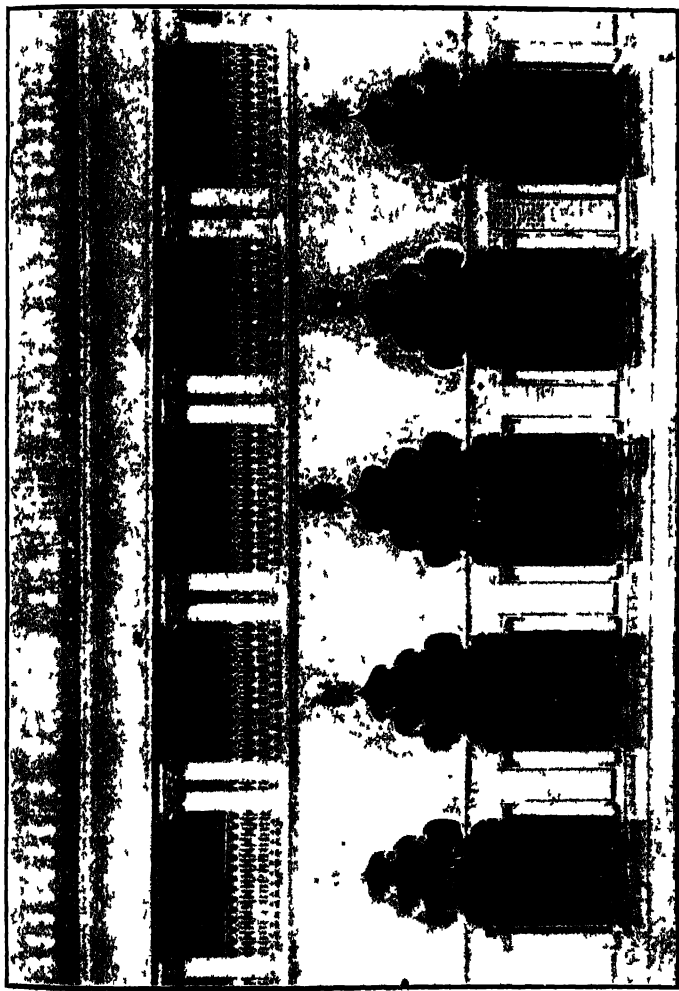
স্বর্গীয় অমনদাসের ঠাকর-দালান

স্বর্গীয় মথুরামোহন বিশ্বাস

শ্রীযুত যোগীন্দ্রমোহন দাস

শ্রীযুত অজিতনাথ দাস

শ্রীযুত অনিলেন্দ্র নাথ দাস

স্বর্গীয় মোহনলাল বিশ্বাস

স্বর্গীয় শ্রীগোপাল বিশ্বাস

স্বর্গীয় ব্রজগোপাল বিশ্বাস

স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস

যে কেহ হউন; উদার প্রকৃতিও সরল—কিন্তু তাই বলিয়া বিষয় কর্ম্মে বা অন্য কোন বিষয়ে যে মূর্খের মত ঠকিয়া আসিবেন তাহা ছিলেন না। বাস্তবিকই পুত্রহীনা রাণীরাসমণির অন্যান্য জামাতা বর্ত্তমান থাকিলেও বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান ও সুবন্দোবস্ত করিতে কনিষ্ঠ মথুর বাবুই তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহারই বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের সহায়তায় তৎকালে রাণীরাসমণির খ্যাতিপ্রতিপত্তি হইয়াছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণের ধর্ম্মজীবনও এই উচ্চ প্রকৃতি সম্পন্ন মথুরবাবু ও রাণীরাসমণির স্নেহভক্তির শীতল ছায়ায় পালিত ও রক্ষিত হইয়াছিল।"

ত্রৈলোক্য নাথ বিশ্বাস।

ত্রৈলোক্য বাবু তিনপুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া ইং ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীগোপাল তাঁহার জীবদ্দশাতেই কালকবলে পতিত হন। ত্রৈলোক্য বাবুর স্বজাতি-প্রীতি প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্নে বিভিন্ন জেলায় গণ্যমান্য মাহিষ্যগণকে লইয়া তদ্ভবনে এক বিরাট সভার অধিবেশনে জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন কল্পে "মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী" স্থাপনের সূত্রপাত করা হয়। তিনি ঐ কোম্পানীর এক হাজার টাকার সেয়ার গ্রহণ করেন। "বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির" প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল। তিনি বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া ঐ সমিতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। সহসা করাল কাল আসিয়া তাঁহার এই সাধু কার্য্যে চিরবাধা প্রদান করিয়া গেল। ত্রৈলোক্যবাবু জীবদ্দশাতেই তিন পুত্র ব্রজগোপাল, নৃত্যগোপাল ও মোহনগোপালকে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া যান। ব্রজগোপাল পৈতৃক বাড়ীতে থাকেন। নৃত্যগোপাল পৈতৃক বাড়ীর

সন্নিকটেই "রাণীরাসমণি-ভবন" নামে একটী সুন্দর ভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। মোহন গোপালের জন্যও একটী স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। এইক্ষণে উক্ত তিন ভ্রাতাই পরলোকে।

অনারেবল নবাব স্যর সৈয়দ সামস্‌-উল হুদা।

নবাব স্যর্ সামস্থল হুদা কে, সি, আই, ই।

আজ আমরা যে স্বনামধন্য পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব, তিনি জ্ঞানে গুণে মনস্বীতায় বঙ্গদেশে বিখ্যাত।

বংশ বিবরণ—পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলাস্থ সৈয়দবংশ অতি প্রাচীন। নবাব স্যর্ সামস্থল হুদার পিতামহ চট্টল ভূমির একজন বিচারকর্ত্তা ছিলেন। নবাবের পিতা আর্বী এবং ফার্শীভাষায় পরম স্থপণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতার অধিবাসী স্বর্গীয় নবাব আবতুল লতিফ সি, আই, ই, মহোদয় কর্ত্তৃক স্থাপিত, অধুনা বিলুপ্ত ফার্সী ভাষায় 'দুর্বীন" নামক সংবাদপত্র প্রায় পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে নবাব স্যর্ সামস্থল হুদার পিতৃদেবের সম্পাদকতায় পরিচালিত হইত। নবাব স্যর হুদা ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

নবাবের শিক্ষাজীবন—নবাব স্যর সামস্থল হুদা কলিকাতা নগরীস্থ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে তিনি বি, এল্ পরীক্ষায় এবং ইহার দুই বৎসর পরে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্ম্মজীবন—এই সময়ে তিনি কিছুকালের নিমিত্ত কলিকাতা মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্সী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দ হইতে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসায়ী আরম্ভ করেন।

১৮৯৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য পদে

নির্ব্বাচিত হন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যরূপে অধিষ্ঠিত হন।

এই সময় তিনি সমগ্র দেশবাসী এবং বিশেষতঃ তাঁহার স্বজাতীয়-বৃন্দের জন্য যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় তিনি সকলকেই বিচলিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহার সারবান বক্তৃতাগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জিয়ান লিখিয়াছিলেন—

"Mr. Shamsul Huda, a Mahomedan representative, has a delightfully refined English accent, and delivers short but pointed speeches which could scarcely be improved upon".

১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালা দেশের শাসন পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি উক্ত পদে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৭ সালের এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত নবাব স্যর হুদা উক্ত শাসন পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

১৯১২ সালে তিনি All India Moslem Leagueএর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি উপরোক্ত শাসন পরিষদের সভ্যপদ গ্রহণ করার জন্য লীগের সভাপতিত্ব করিতে পারেন নাই।

নবাব স্যর্ হুদা এক সময়ে বাঙ্গালা প্রদেশের মুসলমান লীগের ও বাঙ্গালা তালুকদার সংঘের সম্পাদক ছিলেন।

পাঁচ বৎসর কাল বাঙ্গালার শাসন পরিষদের সভ্যরূপে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর তিনি ইংরাজী ১৯১৭ সালের জুন মাসে, বিচার বিভাগের সর্ব্বোচ্চ আদালত কলিকাতা হাইকোর্টে, পিউনি জজের পদে বরিত

হন। সম্প্রতি তিনি হাইকোর্টের জজিয়তী হইতে অবসর লইয়া সুসংস্কৃত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তাঁহার এই নিয়োগের সংবাদ সাধারণে প্রচারিত হয়।

বঙ্গের গুণগ্রাহী গভর্ণর লর্ড রোণাল্ড্‌শে তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত পদে নিয়োজিত করায় দেশবাসী সকলেই গভর্ণর বাহাদুরের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিল।

উপাধি—ইংরাজী ১৯১২ সালে তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে "নবাব" উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কে, সি, আই, ই উপাধি দান করা হইয়াছে।

অনুরাগ—নবাব স্যর্ হুদা বাগিচা নির্ম্মাণ এবং ফার্সী কবিতা রচনায় বিশেষ আনন্দলাভ করিয়া থাকেন এবং এজন্য তিনি যথেষ্ট সময়ও ব্যয় করিয়া থাকেন।

পরলোকগত নবাব সৈয়দ হোসাম হাইদার চৌধুরী খান বাহাদুর।

কুমিল্লা হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্য্যন্ত বিজয় নদের তীর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া যাঁহারা গমনাগমন করিয়াছেন, তাঁহারা পথিপার্শ্বস্থ একটা প্রকাণ্ড পিপুল বৃক্ষের কিঞ্চিৎ উত্তরে যাইয়া নিঃসন্দেহে একটা দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া থাকিবেন। এই দুর্গের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে হোসেন সাহের বঙ্গ বিজয়ের চিহ্ন আজ পর্য্যন্তও দৃষ্টিগোচর হয়। এই দুর্গের দক্ষিণ ভাগস্থ গ্রামটীর নাম হোসেনপুর এবং পশ্চিমস্থ গ্রামের নাম—সাহাপুর। এই সাহাপুরে আজও একঘর অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার বাস করিতেছেন। তাঁহারা "সৈয়দ" বা মহম্মদের বংশধর বলিয়া পরিচিত। বলা বাহুল্য হোসেনপুর গ্রামটীও মুসলমান অধিবাসীতে পরিপূর্ণ। সুলতান হোসেন শাহও "সৈয়দ" ছিলেন। সাহাপুরের সৈয়দ বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ সুলতানের অধীনে সেনানায়ক ছিলেন এবং তাঁহাদের "শিল্লসলার" নামক উপাধি ছিল। *

প্রথমে দে ও দাস বংশের বংশধরগণ হোম্‌নাবাদের জমিদার ছিলেন। বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে, আমীর মির্জ্জা আক্র খাঁ হোমনাবাদের জমিদার হন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বংশধর দৌলত, জালাল এবং বাক্‌সা হোম্‌নাবাদের জমিদার ছিলেন। সাহাপুরের বিখ্যাত সৈয়দবংশের সৈয়দ বসরত আলি চৌধুরী বংশের হোমনা-

---

* Vide Rajmala, second edition, pages 48 and 49.

নবাব সৈয়দ হোসাম হায়দার চৌধুরী

বাদের কিয়দংশের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কুমিল্লার নবাব হোসাম সৈয়দ হাইদার চৌধুরী সৈয়দ বসরত আলিরই পুত্র।

সৈয়দ হোসাম হাইদার চৌধুরী গবর্ণমেণ্টের সহায়তা ও উপকার করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণের হিতকর অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। কুমিল্লা মিউনিসিপালিটীর এবং ত্রিপুরার সদর লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান্‌রূপে, মুসলমান বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন্‌ কমিটীর সদস্যরূপে এবং অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌রূপে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। কুমিল্লাতে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি যাহার বার্ষিক মুনাফা প্রায় দুই হাজার টাকা তাহা দিয়া একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য মুসল মান ছাত্রাবাসের জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য তিনি অনেক প্রযত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রকৃতিরঞ্জন জমিদার বলিয়া ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রজাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সৈয়দ হোসাম সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি যে সমস্ত সাধু ও সাধারণ হিতকর পদ অধিকার করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। কুমিল্লার আঞ্জমানি ইস্‌লামিয়ার সভাপতি।

২। কুমিল্লা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্‌।

৩। কুমিল্লা সদর লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান্‌।

৪। কুমিল্লা বেঞ্চের দ্বিতীয়শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্‌।

৫। কুমিল্লা ডিষ্ট্রীক্ট্‌ বোর্ডের সদস্য।

৬। ত্রিপুরা জেলের বেসরকারী জেল-পরিদর্শক।

৭। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির সদস্য।

৮। কুমিল্লা দাতব্য চিকিৎসালয়ের অবৈতনিক সভাপতি।

৯। কুমিল্লা হোসানিয়া মাদ্রাসার অবৈতনিক সভাপতি ও অধ্যক্ষ।

১০। বঙ্গীয় লেজিস্‌লেটিভ্ কৌন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সদস্য।

১১। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য।

তিনি প্রথমে ঢাকা নবাব পরিবারে বিবাহ করেন। তিনি খাজা আমিনুল্লার কন্যাকে বিবাহ করেন। খাজা আমিনুল্লা স্বর্গীয় নবাব স্যার আবদুল গণির ভাগিনেয় ছিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি তাঁহার পিতৃব্য কন্যাকে বিবাহ করেন, তৃতীয়বার কলিকাতার নবাব সিরাজউল্ ইস্‌লামের কন্যাকে বিবাহ করেন।

তিনি অশ্বারোহণে অথবা ক্রীড়ায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট ইঁহাকে মুসলমান গণের শিক্ষাবিধানে যত্নবান্ দেখিয়া ও মাদ্রাসা ছাত্রনিবাসে ইনি যে দান করিয়াছিলেন তজ্জন্য সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দেও তিনি পুনরায় সম্মান সূচক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

১৯১০ সালের ১৬ই মার্চ্চ ঢাকাতে একটি দরবার করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসামের তদানীন্তন ছোটলাট তাঁহাকে "খান বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।

১৯১১ সালে দিল্লীতে যে দরবার হয় তিনি তাহাতে যোগদান করিতে আহুত হইয়াছিলেন।

১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তাঁহাকে "নবাব" উপাধি প্রদান করা হয়।

ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সৈয়দ এতেসাম হাইদার ও কনিষ্ঠ পুত্রের সৈয়দ ওস্‌মান হাইদার। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিগত যুদ্ধের সময় স্বেচ্ছা সেনাদলে যোগদান করিয়াছিলেন।

চৌধুরী কাজেমুদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকী।

পূর্ব্ববঙ্গে যে কয়জন বিখ্যাত মুসলমান জমিদার আছেন, তন্মধ্যে ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী তালেবাদের জমিদার কাজেমুদ্দীন আহম্মদ সিদ্দিকীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের বংশধর ও সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই অগ্রণী। হজরত আবু বকর সিদ্দিকী রাজী আল্লা আহো, মহম্মদের শ্বশুর। তাঁহার বংশধরেরা সিদ্দিকী বলিয়া পরিচিত। এই আবু বকরেরই পঞ্চত্রিংশ বংশধর চৌধুরী কাজেমুদ্দীন। আবু বকরের পুত্র হজরত আব্দুর রহমন সিদ্দিকী রাজী আল্লা আহো আরবদের সহিত সিরিয়া বিজয়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কথিত আছে, এই বংশ হজরত আবদুল্লা সিদ্দিকী রাজী আল্লা আহোর সময় পর্য্যন্ত আরবদেশে বাস করিতেন। হজরত আবদুল্লার পর পাঁচ পুরুষ সাহাবুদ্দীনের সময় পর্য্যন্ত এই বংশ তুরস্কে বাস করিত। তাহার পর দুই পুরুষ নাজীমুদ্দিন ও জহরুদ্দিন ভারতবর্ষের কোথাও বাস করিতেন। এই বংশের অষ্টাদশ বংশধর কুতবুদ্দিন দিল্লীর বাদশাহ দরবারে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি বঙ্গদেশে বাস করেন। তাঁহার পুত্র সা'দুদ্দিন জাহাঙ্গীর নগরের সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ কর্ত্তৃক দুর্দ্ধর্ষ আফগান ওস্‌মান খাঁকে পরাজিত ও বশীভূত করিবার জন্য বঙ্গের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সুজাত খাঁর সমভিব্যাহারী হইতে আদিষ্ট হন। সা'দুদ্দিন সেই অভিযানে খুব যোগ্যতা ও পারদর্শিতা দেখাইয়া সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সন্তোষ উৎপাদন করতঃ তাঁহার নিকট হইতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রপ্রতাপ,

আমিনাবাদ এবং তেলেবাবাদ এই তিনখানি পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি পোলকার (পরগনা তেলেবাবাদ) গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বংশধর নাজিমুদ্দিন হোসেন পোলকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালিয়াদি নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। বালিয়াদি ঢাকা সদর মহকুমার অধীনে। বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বৌদ্ধযুগে যখন পালরাজারা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন এই পরগণা তিনটী রাজা যশোবন্ত পাল কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল, পরে বঙ্গে দ্বাদশজন ভুনিয়ানদিগের সময়ে ফজল গাজী ও চাঁদ গাজী এই পরগণার অধিকারী ছিলেন। পরে সা'দুদ্দিনের ঊনবিংশ বংশধরকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করা হয়। তাহার পর চন্দ্রপ্রতাপ ও আমিনাবাদ এই দুইটী পরগণা তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়; কিন্তু তৃতীয় পরগণাটী সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের হাতে ছিল। সে যাহা হৌক, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ সময়ে এই পরগণা উক্ত বংশের কতিপয় বংশধরের মধ্যে বিভক্ত হইল, দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম্ তাহা মঞ্জুর করিলেন এবং এই সনদ ভারতের সর্ব্বপ্রথম রাজপ্রতিনিধি ওয়ারেন হেষ্টিংস্ স্বয়ং স্বাক্ষর করেন। ১২০৪ বঙ্গাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ সা তেলেবাদ পরগণার জায়গীর ত্রয়োদশ বংশধর আবদুল ওয়াজেদ সিদ্দিকে প্রদান করেন। তিনি সম্রাট্ শাহ আলমের নিকট হইতে "চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই উপাধি এই বংশ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে বালিয়াদি বংশ পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বংশ।

কাজিমুদ্দীন আহম্মদ ১৮৭৬ সালে (বাঙ্গালা ১২৮৩ সালের ১৯শে পৌষ) বালিয়াদিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এখন এই প্রাচীন বংশের একমাত্র বংশধর, কারণ অন্যান্য বংশধরগণের জায়গীর দানে ও

মিঃ কে এ সিদ্দিকী।

বিক্রয়ে নষ্ট হইয়াছে। কাজিমুদ্দিন স্বগৃহে আরবী, পারশী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা এবং ইংরাজী শিক্ষা করেন। প্রথম চারিটী ভাষায় ইনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি একজন কবি এবং পারস্য ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ "কারদোষে" তিনি বঙ্গ-সমাজের অনেক কুরীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে "কারদোষ" কবিতাটী উদ্ধৃত হইল।

(১)

আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?
তুমিই আপন হাতে চিঠির শেষের পাতে
লিখিতে শিখালে মোরে হেমলতা বোস—
আমি যে হয়েছি বাবু আমার কি দোষ ?

(২)

প্রতিদিন নিজ হাতে, সিঁন্দুর মুছিয়ে দিতে
ঘোমটা খুলিয়া নিতে সাধের মুখোষ—
এখন পরিলে শাড়ী, তুমি বল গেঁয়ে নারী—
গাউন বডি পরে তাই মিটাই আপেসাস্
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

(৩)

প্রভাতে সন্ধ্যার বেলা, ঘর লেপা দীপ জ্বালা
ছিল মোর নিত্য কর্ম্ম পরম সন্তোষ—
তুমিত শিখালে সখা কাদা ও গোবর মাখা
অতিশয় অসভ্যতা জাতিগত দোষ
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

(৪)

আমিত ভাবিনি কভু ওহে রমণীর প্রভু
বাট্‌না বাটিতে যায় নখের খোলষ—
রাঁধিতে দাওনি মোরে, গায়ে যদি কালি ভরে
কাজেই রয়েছি যুড়ে এই তক্তপোষ—
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

(৫)

তুমিত শিখালে মোরে, উঠিতে হবে না ভোরে
শুধু স্বাস্থ্যহানি করে ব্রত ও উপোস
চিঠি লেখা বই দেখা সেলাই বুনন শেখা
আতর গোলাপ মাখা আমোদ নির্দ্দোষ
আমি যে হয়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

(৬)

রং মেখে সং সেজে কভু ছাদে কভু মেজে
চেয়ারে হেলিয়ে পড়ি শরীর অবশ—
প্রতিদিন যে সময়ে গৃহস্থের কত মেয়ে
পুকুরের ধারে যায় ভরিতে কলস—
আমি যে পারি না তাহা সে কাহার দোষ ?

(৭)

মিছে আমোদ খেলায় ভুলায়েছে দেবতায়
প্রণয়ের ইতিহাসে ক'রেছ বেহুঁস
এখন এখন আর কেন কর তিরস্কার
মন্থনে উঠেছে বিষ পিয়ো আশুতোষ
আমি যে হ'য়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

কাজিমুদ্দিন একজন আদর্শ স্থানীয় জমিদার। তাঁহার জমিদারী ঢাকা ও ময়মনসিং জেলায় বিস্তৃত। ১৮৯৮ সালে (বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ১১ই ফাল্গুন) তিনি জমিদারীর মালিক হন। তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করে, তিনিও প্রজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তিনি বালিয়াদিতে ৩৫,০০০ হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে অত্যন্ত প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। আর প্রত্যেক ভিক্ষুককে এক পোয়া চাউল ও নগদ এক আনা দিয়াছিলেন। ঐ দিন তাঁহার ঢাকার বাড়ীতেও একটি সান্ধ্যভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। যদিও সেই সান্ধ্য সম্মিলনে সহরের গণ্য-মান্য লোকেরাই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তথাচ তিনি নিকটবর্ত্তী সমস্ত দরিদ্রকে কম্বল, চাদর ও মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি কাঙ্গা হইতে কালিয়াকুড় পর্য্যন্ত একটি রাস্তা করিবার জন্য বিনামূল্যে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের হস্তে জমি দান করেন। তাঁহার অকৃত্রিম রাজভক্তি দর্শনে ঢাকার কতিপয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বিভাগীয় কমিশনার উচ্চ কণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বরূপে মিঃ জে, টি র‍্যাঙ্কিন্ ১৯০৯ সালে লিখিয়াছিলেন—"ঢাকা জেলার মধ্যে ইনি একজন শ্রেষ্ঠতম জমিদার এবং ইনি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" ১৯১৭ সালে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ হার্ট বলেন—"ইনি একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্ত্তা এবং রাজভক্তির জন্য বিখ্যাত।"

১৯০৮ সালের জুন মাসে নিখিল ভারতীয় মোস্‌লেম লীগের "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম শাখা" স্থাপিত হইলে কাজিমুদ্দিন তাহার সভাপতি ও নবাব স্যার সলিমুল্লা তাহার সেক্রেটারী মনোনীত

হন। এই লীগের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি অনেক দেশ-হিতকর কার্য্য করিয়াছেন। এই শাখা লীগ হইতে ১৯০৮ সালের ৯ই জুলাই তদানীন্তন ছোটলাট স্যার্ চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট বেলিকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। কাজিমুদ্দিন সেই অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।

১৯১৪ সালে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি মুসলমানদিগের নিকট যুদ্ধ সংক্রান্ত সত্য ঘটনা সমূহ প্রচার করিয়া অলীক জনরবের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে বালিয়াদি ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের সমবায়ে বালিয়াদি গ্রামে যে বিরাট সভা হয়, তিনি তাহার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেই সভায় তিনি স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রোতৃগণকে বুঝাইয়া দেন কিরূপে তুরস্ক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিয়া ঘোরতর অন্যায় কার্য্য করিতেছে। তাহার পর তিনি বলেন, ভারতীয় মুসলমান যদি ইস্‌লাম ধর্ম্মে সত্য সত্যই বিশ্বাসী হয়, তাহা হইলে তাহারা যেন রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মানসিক ইচ্ছা পর্য্যন্ত না করে; কারণ ইস্‌লাম্ ধর্ম্মমতে শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ঘোরতর পাপ। ১৯১৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এল্, বার্লি সি, আই, ই, আই, সি, এস্ তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন—"I am directed to convey to you the thanks of Government for your efforts in explaining to your Co-religionists the present international situation. Your assistance has been much appreciated both by myself personally and by Government", অর্থাৎ আপনি আপনার স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে

যুদ্ধের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সমূহ বিবৃত করায় আমি গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ আপনাকে জ্ঞাপন করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং গবর্ণমেণ্টও আপনার এই সাহচর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন।" ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইনি রাজকীয় যুদ্ধ সাহায্য ভাণ্ডারে (Imperial relief fund) ৫০০ শত টাকা প্রদান করেন। অধিকন্তু ইহাও ঘোষণা করেন যে, তাঁহার তেলেবাদ পরগণার মধ্যে যে কোন প্রজা বঙ্গীয় সেনাদলে স্বেচ্ছায় যোগদান করিবে যতদিন তাহারা যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে ততদিন তাহাদিগকে কর দিতে হইবে না, আরও প্রত্যেককে তিনি দশ টাকা করিয়া দিবেন।

তিনি তিনবার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয়পত্নী বাখরগঞ্জের সায়েস্তাবাদ নবাব বংশীয়া। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা করেন তাহা মিঃ বার্লির পত্র হইতে জানা যাইবে। মিঃ বার্লি ৩১—৭—১৩ তারিখে নিম্নলিখিত একখানিপত্র তাঁহাকে লেখেন—Dear Chowdhury Saheb, Please accept my heartiest Congratulations on the birth of your son, I expect to pay a visit to Baliadi early in September and to give you my Congratulations personally", অর্থাৎ আপনার পুত্রের জন্ম উপলক্ষে আমার আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করিবেন। আমি সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বালিয়াদি দর্শন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমার আনন্দ জানাইব।"

তাঁহার চরিত্রগত মহানুভবতার জন্য কি ধনী, কি নির্ধন, কি সরকারী, কি বেসরকারী, কি বৃদ্ধ কি যুবা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তিনি দুঃখীর দুঃখ মোচনে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। আত্মীয় স্বজনের অভাবের সময় তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে সাহায্য

করিয়া থাকেন। তিনি সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষক এবং নিজেও একজন সাহিত্যসেবী।

বংশ-তালিকা।

(১) হজরত আবু বকর সিদ্দিকী
(২) আবদুর রহমন সিদ্দিকী
(৩) আবদুল্লা সিদ্দিকী
(৪) কোয়াসেম সিদ্দিকী
(৫) মহম্মদ সিদ্দিকী
(৬) ওসমান্ সিদ্দিকী
(৭) ইদ্রীস্ সিদ্দিকী
(৮) আহম্মদ সিদ্দিকী
(৯) আবদুল ওয়াহব সিদ্দিকী
(১০) ইস্মাইল সিদ্দিকী
(১১) এহিয়া সিদ্দিকী
(১২) ইব্রাহিম সিদ্দিকী
(১৩) আবু সৈয়দ আবদুল খের সিদ্দিকী
(১৪) মহম্মদ সিদ্দিকী
(১৫) সাহাবুদ্দীন সিদ্দিকী
(১৬) নাজিমুদ্দীন সিদ্দিকী
(১৭) জহিরুদ্দীন সিদ্দিকী
(১৮) সাহ কুতবুদ্দীন সিদ্দিকী
(১৯) সা' তুদ্দিন সিদ্দিকী
(২০) আবদুর রসিদ সিদ্দিকী

(২১) ওবিদুল্লা সিদ্দিকী
(২২) গীয়াসুদ্দীন সিদ্দিকী
(২৩) মজহুদ্দীন সিদ্দিকী
(২৪ মজলেস্ হোসেন সিদ্দিকী
(২৫) মজলেস্ গৌহর সিদ্দিকী
(২৬) মজলেস্ দৌলত সিদ্দিকী
(২৭) মজলেস্ আ আলম্ সিদ্দিকী
(২৮ সাহেব মহম্মদ খাঁ বাহাদুর সিদ্দিকী
(২৯) সা'তুল্লা খাঁ বাহাদুর সিদ্দিকী
(৩০) চৌধুরী আবদুল ওয়াহেদ সিদ্দিকী
(৩১) চৌধুরী নাজমুদ্দীন হোসেন সিদ্দিকী
(৩২) চৌধুরী সাহামুদ্দীন হোসেন সিদ্দিকী
(৩৩) চৌধুরী হোসেহুদ্দীন হোসেন সিদ্দিকী
(৩৪) চৌধুরী বৈস্নুদ্দীন আহম্মদ সিদ্দিকী
(৩৫) চৌধুরী কাজেমুদ্দীন আহাম্মদ সিদ্দিকী।

কুমিল্লার ফারুকী বংশ।

কাজী রায়জদ্দীন মাহাম্মদ ফারুকী বংশ ত্রিপুরা জিলার অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ সম্ভূত। আরব দেশে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক এ পরিবারের পূর্ব্ব পুরুষ। সেই মহীয়ান খলিফার কোন এক বংশধর ভারতবর্ষে আগমনকরতঃ দিল্লী নগরীতে বসবাস করিতে থাকেন। এই বংশের "ওমর সাহ" নামক এক মহা পুরুষ দিল্লী ছাড়িয়া পূর্ব্ব বঙ্গের দিকে চলিয়া আসেন। তাহার পুত্র আবুল খয়ের ত্রিপুরা জিলায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। নিম্নে এ বংশের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

কাজী ওমর সা ফারুকী
" আবুল খয়ের "
" সার ওয়ার "
" ওমর খেতাব "
" হবিব উল্লা "
" ইসমাইল "
" সুয়াদদ্দীন "
" আইনদ্দীন "
" আপ্তাবদ্দীন "
" রায়জদ্দীন "
" গোলাম মহিদ্দীন "

কাজী আবুল খয়ের ফারুক সাহ জালাল নামক সুবিখ্যাত পীরের শিষ্য ছিলেন। সাহজালালের সমাধিস্তম্ভ শ্রীহট্ট নগরে অবস্থিত।

কাজি রেয়াজউদ্দীন কারকুই

অদ্যাবধিও তথায় হিন্দু মুসলমানের ভক্তি অর্ঘ্য অর্পিত হইতেছে। আবুল খয়েরের পৌত্র ওমর খেতাবও একজন ঈশ্বর-ভক্ত কর্ম্মী মহাপুরুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তাঁহার অলৌকিক কার্য্য কলাপ দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়া শ্যাম গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ জমিদার তাঁহার রূপবতী কন্যা রত্নমালাকে তদীয় শ্রীকর কমলে অর্পিত করেন। মহাপুরুষ ও মুসলমান শাস্ত্রানুসারে বিবাহের পবিত্র বন্ধনে বাঁধিয়া রত্নমালাকে আপন সহধর্ম্মিনী করিয়া লন।

এই বিবাহের পর পীর শ্যাম গ্রামের অনতিদূরে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আপন বাস ভূমি মনোনীত করিয়া লন এবং তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যার নামানুসারে সেই স্থানের নাম "রতনপুরা" রাখেন। তাই আজ পর্য্যন্তও জন সমাজে সেই গ্রামটী "রতনপুরা" নামে অভিহিত ও সমাদৃত। এখনও রতনপুরায় অনেক ধ্বংশ অট্টালিকা ও মসজিদের ধ্বংশাবশিষ্ট চিহ্ন বক্ষে লইয়া তাহার অতীত গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ওমর খেতাবের ঔরষে ও উক্ত ব্রাহ্মণ দুহিতার গর্ভে হবিব উল্লার জন্ম হয়। এতদসম্বন্ধীয় পুরাতন সনদে দেখা যায় যে সম্রাট ফরুক সিয়ার কাজী ইসমাইল ও তাহার বংশধর গণকে "বলদা খালের কাজী" এই উপাধিতে ভূষিত করিয়া অনেক নিষ্কর জমিদারী দান করিয়া যান।

মুন্সী আপ্তাবদ্দীন ফারুকী ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রতনপুরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুমিল্লার একজন সরকারী উকিল ছিলেন, এবং ক্রমে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ও বুদ্ধির প্রভাবে অল্পকাল মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমানের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। তখন তিনি উকীল সম্প্রদায়ের মুখ পত্র ও হিন্দু মুসলমানের নেতৃস্বরূপ ছিলেন, সে কালে তাঁহার মত ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ভদ্র কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তিনি প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। উক্ত মুন্সী সাহেব অলৌকিক অসামান্ত বুদ্ধির প্রভাবে কয়েকটী জমিদারী ক্রয় করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা সহরে তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়। এই নিদারুণ ঘটনার ফলে সমগ্র সহরে একটা শোকের ছায়া পড়িয়াছিল এবং পরলোকগত আত্মার সম্মানার্থে সহরের সমস্ত সরকারী ও বে-সরকারী অফিসাদি বন্ধ হইয়াছিল। মুন্সী আপ্তাবদ্দীন সাহেবের একমাত্র পুত্র উত্তরাধিকারী রায়জদ্দীন মাহাম্মদ ফারুকী"। ইনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিপুরা জিলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথমে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার মানসে কলিকাতা নগরীতে গমন করেন।

কাজী সাহেব বাখরগঞ্জ জিলার সম্ভ্রান্ত প্রাচীন সায়েস্তাবাদ পরিবারের সর্ব্বজন সম্মানিত ইণ্ডিয়া কাউনসেলের ভুতপূর্ব্ব সদস্য নবাব ইমাদুল মুল্‌ক ইমাদু দোল্লা সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামি সি, এস, আই, মহোদয়ের সর্ব্বগুণ সম্পন্না ভগ্নীর পানিগ্রহণ করেন।

ত্রিপুরা জিলার জন হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি সমাজ ও দেশের কল্যাণে অজস্র টাকা ব্যয় করিয়া হিন্দু মুসলমানের আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি জেলা বোর্ডের মেম্বর, মিউনিসিপাল কমিশনার ইত্যাদি গৌরবান্বিত পদগুলি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ও অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। অনেকবার তিনি মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যানের কার্য্যও করিয়াছিলেন। পরোপকারিতা, অতিথি-সৎকার, দানশীলতা ইত্যাদি মহদগুণের জন্য এই জিলাবাসীর অন্তঃকরণে আজ পর্য্যন্তও তিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন। পরোপকার করিতে করিতে তিনি তাঁহার ষ্টেটে ১৫০০০০৲ দেড় লক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া যান।

'ফারকুই হাউস'—কুমিল্লা।

তাঁহার বিপুল দানের মধ্যে কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য দানের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	ফুলার ইস্‌লামিয়া হোষ্টেল কুমিল্লা	১১০০০৲
২।	সীতাকুণ্ড মাদ্রাসা	১২০০০৲
৩।	বরিশাল মোসলেম্ ইনষ্টিটিউসন	১৫০০৲
৪।	আলীগড় ইউনিভারসিটি কলেজ ফণ্ড	১২৫০০৲
৫।	হায়দারাবাদ বন্যা বিপন্ন নর নারীর সাহায্যার্থ	৪০০০৲
৬।	কুমিল্লা মসজিদ নির্ম্মাণ	১২০০০৲
৭।	কুইন ভিক্টোরিয়া স্মৃতি ভাণ্ডার	২০০০৲
৮।	সম্রাট এডওয়ার্ড স্মৃতি ভাণ্ডার	৬০০০৲
৯।	দেবীদ্বার তিনটী পুষ্করিণী ও খাল খনন	৫০০০৲
১০।	কোম্পানীগঞ্জ　　”　　”	১০০০৲
১১।	শ্রীমন্তপুর ২টী　　”　　”	৪২০০৲
১২।	কুমিল্লায় ৩টী　　”　　”	২৩০০৲
১৩।	কুমিল্লা দাতব্য চিকিৎসালয়	৬০০০৲
		৭৯৫০০৲

এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক দরিদ্র হিন্দু মুসলমান ভদ্রপরিবারকে গোপনে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এমন কি অনেক বাবু যাহারা বর্ত্তমানে সহরে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদের জীবন যুদ্ধের প্রথম অঙ্ক কাজী সাহেবের সাহায্যে আরম্ভ সমাপ্ত হইয়াছিল। এবং তিনি অনেক যুবকগণকে শিক্ষার মানসে ইউরোপে ও আমেরিকায় নিজ সাহায্যে পাঠাইয়াছিলেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ৭৯ বৎসর বয়সে কাজী সাহেব নশ্বর জীবন পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে

প্রজ্জলিত অগ্নি শিখার ন্যায় সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া হিন্দু মুসলমানের ঘরে ঘরে হায় হায় রবের প্রতিধ্বনি করিয়াছিল। তিনি এরূপ সর্ব্বজন-প্রিয় ছিলেন যে যখন তাঁহার "শবাধার" বাহিত হইয়া সমাধিস্থানের দিকে চলিতে থাকে সেই সময় জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কুমিল্লার অধিকাংশ লোকই তাঁহার শব দেহের অনুগমন করিয়াছিল। সে দিন বাস্তবিকই কুমিল্লা নগরী এক বিস্ময়কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, প্রতি ঘরে ঘরে শোকের চিহ্ন প্রতি-ফলিত হইয়ছিল, ঐদিন সমস্ত আফিস আদালত, স্কুল, কলেজ, বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য সহানুভূতি সূচক পত্রাদি আসিয়াছিল।

তিনি ৫ পাঁচটী কন্যা ও একটী পুত্র সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা সুবিখ্যাত আদি জমিদার সৈয়দ আকমল খাঁর পৌত্র সৈয়দ আহাম্মদ বক্তের সহিত বিবাহ দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যা যথাক্রমে ঢাকার মীর আশরফ আলী, সাহেবের পৌত্র সৈয়দ মহম্মদ শরিপ ও সৈয়দ মুজাফর সাহেবদ্বয়ের সঙ্গে বিবাহ দেন। চতুর্থ কন্যা বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও ইম্পিরীয়েল কাউনসিলের সদস্য মহম্মদ ইছমাইল খাঁ চৌধুরীর সহিত বিবাহ দেন। পঞ্চম কন্যা বামনার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার আপছরদ্দীন চৌধুরীর পুত্র ফখরুদ্দীন চৌধুরীর সহিত বিবাহ দেন। কাজী সাহেব তাঁহার একমাত্র স্নেহের পুত্র গোলাম মহিউদ্দীন ফারুকীকে ময়মনসিংহের প্রতিভাশালী সর্ব্বজন সম্মানিত ইম্পিরিয়েল কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সদস্য মিঃ এঃ কে গজনবী সাহেবের প্রথমা কন্যার সহিত বিবাহের পবিত্র বন্ধনে বাঁধিয়া যান।

কাজী গোলাম মহিউদ্দীন ফারুকী একজন প্রতিভাশালী সদ্বিবেচক

গোলাম মহীউদ্দীন ফারুকী ।

ও উন্নত স্বভাব বিশিষ্ট যুবক। তিনি তাঁহার পিতার সম্পত্তি ঋণভারে জর্জ্জড়িত ও তাঁহার ভবিষ্যত শোচনীয় দেখিয়া অনেক চিন্তা ও উপায় উদ্ভাবনার পর বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করতঃ তিনি তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজ স্যাহেবের সুপরামর্শে সম্পত্তি কোর্ট ওব ওয়ার্ডসের অধীনে দিতে তাঁহার পিতাকে সম্মত করান। তৎপর এই জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে দিবার জন্য আবেদন করেন। প্রায় অনেক দিনের চেষ্টার পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তাঁহার নাবালক ওয়ার্ড কাজী গোলাম মহিউদ্দীনকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে ঢাকা কলেজে প্রেরণ করেন। কলেজে অধ্যয়নের পর গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সেটেলমেণ্ট ট্রেনিং পাইবার মানসে ময়মনসিং সেটেলমেণ্ট প্রেরণ করেন। তথায় তিনি সুখ্যাতির সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। এবং প্রায় দুই বৎসর কাল কিশোরগঞ্জ সার্কেল অফিসারের কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই বিষয় তৎকালীন সেটেলমেণ্ট অফিসের ডিপার্ট-মেণ্টাল রিপোর্টে তাহার অতি প্রসংশা করেন, অল্প দিনের মধ্যে তাহার নিজ জমিদারীর ম্যানেজার পদে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তিনি কর্ত্তৃক বরিত হন। ওয়ার্ডের নিজ ষ্টেট্ পরিচালনার ক্ষমতা পাওয়া এই বঙ্গে সর্ব্ব প্রথম, এ পর্য্যন্ত আর কখনও কোন ওয়ার্ড তাহার ষ্টেট্ পরিচালনের ভার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে পাইতে সক্ষম হন নাই। পরম করুণাময়ের কৃপায় তিনি অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার জমিদারীর ঋণ প্রায় পরিশোধ করিয়াছেন এবং এমন কি জমিদারীর আয়ও অনেক বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই প্রতিভাশালী যুবক যে তাঁহার ষ্টেট্ সংক্রান্ত কাজেই ব্যস্ত থাকেন এমন নহে, তিনি জন সাধারণের কাজও দক্ষতার সহিত পরিচালন

করিতেছেন। দেবীদ্বারে রায়জুদ্দীন হাই স্কুল নামক একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্তপুরে আওাবিয়া মাদ্রাসা নামক একটী জুনিয়ার মাদ্রাসা ও করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান সময় মিউনিসিপাল কমিশনার, জেলা বোর্ডের সদস্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং কাউনসিলের পুলীশ শাখা সমিতির একজন অন্যতম সভ্য।
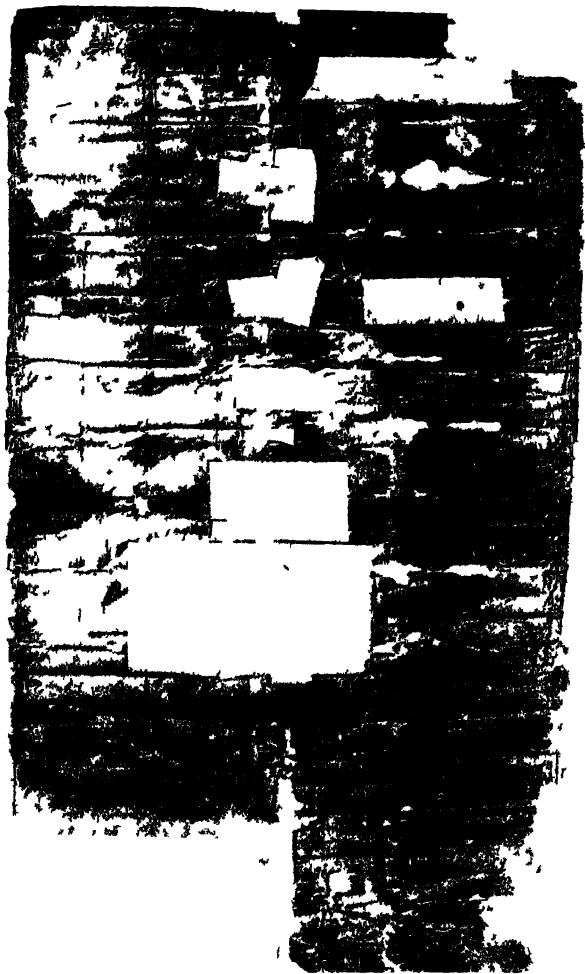
ফাবকুই ব শধবগণকে ভাবত সম্রাট্-প্রদত্ত সনন্দ পত্র

খাঁন বাহাদুর মৌলবী মজহর উল্ আনোয়ার চৌধুরী।

বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ থানার এলেকাভুক্ত সেখপুর গ্রামের বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত চৌধুরী-বংশ পশ্চিম বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে সবিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী। এই বংশের আদিপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতার নাম ইয়ার মহম্মদ খাঁ। ইনি আফগানিস্থানের অন্তর্গত কান্দাহারের অধিবাসী ছিলেন। ইনি সম্রাট সাজাহানের সময়ে মোগল সৈন্যবিভাগে সেনানীর কর্ম্ম করিতেন। তিনি মোগল সেনাদলের সহিত বাঙ্গালা দেশে আসেন এবং বর্দ্ধমান জেলায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

ইঁহার জনৈক বংশধর বরা খাঁ হাজারীর একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন। বরা খাঁ একহাজার সৈনিকের অধিনায়ক হইবার অধিকারি লাভ করিয়া "হাজারী" আখ্যা পাইয়াছিলেন। বরা খাঁ পূর্ব্ব হইতেই হুগলী জেলার উত্তরাঞ্চলে আরামবাগ থানার এলেকায় সেখপুর গ্রামে বসবাস সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বরা খাঁ হাজারীর সময় পশ্চিম বাঙ্গালায় বর্গীদের ঘন ঘন আক্রমণ হইত। এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে গড় বা পরিখা খনন করিয়াছিলেন। প্রায় ৫০।৬০ বিঘা জমিতে তাঁহার বাসস্থান ছিল। এই সমস্ত জমির চারিদিকে গড় কাটা হইয়াছিল। এইজন্য এখনও এইস্থানকে লোকে "গড়ভিটা" বা "গড়বাড়ী" বলিয়া থাকে। এই ভূমিখণ্ডের ভিতরেই বরা খাঁ হাজারীর আশ্রিত

ও পোষ্যবর্গ এবং খানাবাড়ীর প্রজাগণও বাস করিত। খানাবাড়ীর প্রজাগণের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। এখনও এখানে ৩।৪ ঘর সূত্রধর বাস করিতেছে। বরা খাঁ হাজারী গড়ের বাহিরে একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন; ইহার নাম বড়-পুকুর। এই পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বরা খাঁ হাজারীর সমাধি বিদ্যমান।

বরা খাঁ হাজারীর দৌহিত্র বংশের মহম্মদ ওমর খাঁ তদানীন্তন মুসলমান সরকার হইতে "চৌধুরী" উপাধি পাইয়াছিলেন। এক্ষণে এই বংশের বংশধরগণ কেবল চৌধুরী উপাধিটী ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাঁহারা খাঁ উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন।

মহম্মদ ওমর খাঁ চৌধুরী ও তাঁহার বংশধরগণ ভূসম্পত্তির আয় হইতেই জীবন যাপন করিতেন। তখন জমিদারীর আয়ও যথেষ্ট ছিল। ক্রমে বংশবিস্তৃতির সহিত জমিদারী ভাগবাটোয়ারা হইতে থাকে এবং কতক কতক হস্তান্তরিত হইয়াও যায়। ইহাতে জমিদারীর আয় অত্যন্ত কমিয়া যায়। বাঙ্গালার বহু বনীয়াদী বংশের গতি এক্ষণে এইরূপই হইয়াছে।

মজহর উল আনোয়ার চৌধুরীর প্রপিতামহের নাম মুন্সী পভা উল্লা চৌধুরী এবং পিতামহের নাম মুন্সী করমৎআলী চৌধুরী। মুন্সী করমত আলী পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। তাঁহার সহিত অনারেবল ডাক্তার আবদুল্লা সাহ্‌ওয়ার্দ্দির পিতা পরলোকগত মৌলবী ওবেদুল্লা-উল্ ওবুদির ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। মৌলবী ওবেদুল্লা কয়েক বৎসর হুগলী কলেজের আরবী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সেই সময়ে দুই বন্ধুতে কবিতায় পার্শীতে পত্র ব্যবহার হইত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জমিদারীর আয় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল।

এইজন্য মুন্সী করমত আলি মধ্যে মধ্যে ওকালতি করিতেন। পরে তিনি একরূপ স্থায়ীভাবে আরামবাগে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯২ বৎসর বয়সে মুন্সী করমত আলির মৃত্যু হয়।

মজহর-উল আনোয়ার চৌধুরীর মাতামহের নাম মুন্সী গোলাম আলি খাঁ চৌধুরী। ইনি ১৮৬০।৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলীর সরকারী উকীল ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌলবী নাজিমুদ্দীন মহম্মদ খাঁ চৌধুরী প্রথমে হুগলীর, পরে ঢাকার সবজজ ছিলেন। তিনি ১৮৬৯।৭০ খৃষ্টাব্দে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া হুগলীতে বাস করিয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি দরিদ্রগণকে সাহায্য করিতেন। হুগলীর হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে সময়ে ভারতের সম্রাজ্ঞী হন সেই সময়ে তিনি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মজহর উল আনোয়ার চৌধুরী প্রথমে আরামবাগ উচ্চ ইংরেজী স্কুলে এবং পরে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ও হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। হুগলী কলেজ হইতে তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরই তিনি হুগলীর উকীল-তালিকাভুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুন্সেফ নিযুক্ত হন। মেদিনীপুর জেলার দাঁতন মহকুমায় মুন্সেফী করিবার সময়ে তথাকার জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইতেছিল না। এইজন্য তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া দিবার জন্য দরখাস্ত করেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহার দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলে তিনি মুন্সেফী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া পুনরায় হুগলীতে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান বিভাগের মুসলমানগণের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য

নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। দামোদরের বন্যা হইতে যে ক্ষতি হয় তাহা নিবারণের জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সেই সময়ে তাঁহার প্রস্তাবের প্রতি দেশের জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং এই প্রস্তাব লইয়া দেশময় আন্দোলন হইতে থাকে। প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এডাম্‌স উইলিয়াম জলাধার নির্ম্মাণ দ্বারা বন্যা নিবারণের ব্যবস্থা করিতে বলেন। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৯১৬।১৭ খ্রীষ্টাব্দে জমি জরিপ ও জলাধার নির্ম্মাণের স্থান-নির্ণয় পর্য্যন্ত হইয়াছিল ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও কার্য্য হয় নাই। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মজহর উল আনোয়ার চৌধুরী মহাশয় হুগলীর সরকারী উকীল নিযুক্ত হন এবং সেইপদে তিনি অদ্যাপি অধিষ্ঠিত আছেন। গত ৩০ বৎসরকাল প্রায়ই তিনি হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ও হুগলী জেলা-বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। ১৯১৯খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডসে ইঁহাকে সাধারণ হিতকর কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ খান বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন।

চৌধুরী আসমত্ আলি খাঁ

অনারেবল—

হাজি চৌধুরী মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁ।

অনারেবল হাজি চৌধুরী মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁ বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী চরমেদ্দী বা চরআইমেদী গ্রামে একটি বিখ্যাত মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আহম্মদ খাঁর নামানুসারে এই গ্রামের নাম "চরআহম্মদী" হইয়াছে। আহম্মদ খাঁর বংশধরদিগের মধ্যে মাঙ্গা খাঁএর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। মাঙ্গা খাঁ একজন ধার্ম্মিক ও শক্তিশালী লোক ছিলেন এবং তিনি পৈতৃক সম্পত্তি প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন। তিনিই চর-মাদ্দি গ্রামের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, প্রকাণ্ড মস্‌জিদ ও বৃহদাকার পুষ্করিণীর স্থাপয়িতা ও খননকর্ত্তা। প্রত্যুত এই সমস্ত দেখিলে মাঙ্গা খাঁএর মহত্ত্ব ও ধর্ম্মানুরাগ প্রবৃত্তির জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

মাঙ্গা খাঁর একমাত্র পুত্র—চৌধুরী আবদুর মসিদ খাঁ। পিতার জীবদ্দশাতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় মাঙ্গা খাঁর পৌত্র আর্ম্মাণআলি খাঁ তাঁহার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত কালের নিষ্ঠুর আহ্বানে তিনিও অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আর্ম্মাণআলি খাঁ একজন সক্ষম ও উৎসাহশীল যুবক ছিলেন, এবং জীবদ্দশাতে তিনি স্বীয় বংশ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

আরমাণের উপযুক্ত পুত্র ও উত্তরাধিকারী চৌধুরী আস্‌মতআলি খাঁ বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বদান্য ছিলেন; একারণে বাখরগঞ্জের হিন্দু মুসলমান সমভাবে তাঁহাকে সম্মান করিত।

চৌধুরী আসমতআলি খাঁ একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন

করেন। বলা বাহুল্য এই পুত্রই অনারেবল হাজি চৌধুরী মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁ। ইহা ছাড়া আসমতের একটি কন্যাও হইয়াছিল, কিন্তু সে কন্যাটী তাঁহার মৃত্যুর পরেই পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে। ইস্‌মাইল ইংরাজী ১৮৭৪ সালের ১৪ই আগষ্ট, বাঙ্গালা ১২৮১সালের ৩০শে শ্রাবণ কটকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে বরিশাল জিলা স্কুল ও পরে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ ইঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি কলেজ ত্যাগ করিয়া তাঁহার বিশাল সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইস্‌মাইল্ ফরিদপুর জেলার পদমদি গ্রামের পরলোকগত নবাব মীর মহম্মদআলির কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সেই পত্নী অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তিনি প্রাগুক্ত নবাবের আর এক আত্মীয়াকে বিবাহ করেন। দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত সে পত্নীও বিবাহের অল্পদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অগত্যা ইস্‌মাইল কুমিল্লার বিখ্যাত কাজী রায়াজুদ্দীন মহম্মদের কন্যাকে তৃতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁহার শেষোক্তা পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র-সন্তান হইয়াছে। পুত্রটীর নাম চৌধুরী ফজলরাব খাঁ বা সাজাহান। ১৯১৮ সালে এই পুত্রটীর অন্নপ্রাসন ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়।

এদেশের সমস্ত লোক-হিতকর অনুষ্ঠানের সহিতই তিনি ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট। তিনি দুই দুইবার ভূতপূর্ব্ব পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিরূপে ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ্ কৌন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এখন তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে Council of stateএর সদস্যপদে বিরাজ করিতেছেন। ইস্‌মাইলই বাখরগঞ্জের সর্ব্বপ্রথম বেসরকারী সদস্য, এই দায়ীত্বপূর্ণ পদের কার্য্য তিনি যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত

হাজি চৌধুরী মহম্মদ ইস্মাইল খাঁ।

সম্পন্ন করিয়াছেন। বিগত পঞ্চদশ বৎসর কাল যাবত তিনি বরিশাল সহরের মিউনিসিপাল কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রধানতঃ ইঁহারই চেষ্টায় বরিশাল ও ফরিদপুরে সমবায় ঋণ সমিতি (Co-operative credit-society) প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বরিশাল ইস্‌লামিয়া ব্যাঙ্কের সভাপতি। তিনি তাঁহার পিতার নামে অভিহিত আসমতআলি খাঁ বাহাদুর ইনষ্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা ছাড়া ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী মহকুমায় তাঁহার মাতার নামে ওয়াজেদুন্নিসা বোর্ডিং স্থাপন করিয়াছেন। ফরিদপুরে তাঁহার প্রথমা পত্নীর নামে অভিহিতা আবেদুন্নিসা বোর্ডিংএর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। ফরিদপুর জেলার পাঙ্গসা জর্জ্জ হাইস্কুলে গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে তিনি একখণ্ড মূল্যবান জমি প্রদান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি দরিদ্র শিক্ষার্থীদিগের জন্য সদরে ও গোপনে এত দান করেন যে তাহার বিশেষ বর্ণনা এস্থলে অসম্ভব। তাঁহার বদান্যতা ও দেশহিতৈষিতায় মুগ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্ট ১৯০৩সালে তাঁহাকে সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় ইস্‌মাইলের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি আছে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রভূত বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। প্রজাবর্গের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করিয়া তিনি তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ১৯০৮ সালে ইস্‌মাইল "হজ্জ" তীর্থযাত্রা করেন। তিনি এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সাধারণ হিতকর কার্য্যে করিয়াছেন, যে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন এবং যে যে কার্য্যে দান করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করা গেল :—

(১) অধুনা লুপ্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টও ভারত গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ সভার সভ্য ছিলেন। বর্ত্তমানে ষ্টেট্ কৌন্সিলের সদস্য।

(২) বাখরগঞ্জের বেসরকারী চেয়ারম্যান্ ছিলেন, বরিশালের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের ও সদর লোকাল বোর্ডের মেম্বর। ফরিদপুরের ডিষ্ট্রীক্ট্ ও লোকালবোর্ডের সদস্য ছিলেন, বরিশালের সদর লোকাল বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান ছিলেন। রাজবাড়ীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

(৩) বরিশালের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, কাজি কমিটির মেম্বর, লণ্ডনস্থ এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য। বরিশাল ইস্‌লামিয়া আরবান্ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান লীগের সহঃ সভাপতি, বি, এম্, স্কুল এ, কে ইন্‌ষ্টিটিশান্, ও টাউনস্কুল কমিটির সভ্য। গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্মান সূচক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

(৪) দিল্লীর দরবারে নিমন্ত্রিত হন। সিললায় কো অপারেটিভ্ কন্‌ফারেন্সে যোগ দেন, দার্জ্জিলিঙ্গ স্বাস্থ্য সভায় যোগ দেন।

(৫) বরিশাল জলের কলে ১০০০, তত্রত্য হাঁসপাতালে ১০০০, হায়দ্রা বাদ রিলিফ ফণ্ডে ১২০০৲ বাখরগঞ্জের চরাদি খাল কর্ত্তনে ৪০০০৲ চরমুদ্দী লোয়ার প্রাইমারী স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণে নগদ ১০০৲ ও ৪০০৲ শত টাকার জমি, উক্তগ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্থানের জন্য ৬০০ শত টাকা মূল্যের জমি, ভোলায় মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণে ৫০০৲, বাখরগঞ্জের বাবহাদুদ্দীন হাইস্কুলে ২০০৲, বরিশাল বেল ইস্‌লামিয়া বোর্ডিং এ ২০০০৲ মৈমনসিংহের গাফর গাঁ স্কুলে ১০০০৲, কটক সেমিনারী স্কুলে ৫০০৲ বগুড়া সোনাতলা হাইস্কুলে ১০০৲ দিনাজপুর মুসলমান হোষ্টেলে ৫০৲ রাজবাড়ী ওয়াজেদুন্নিসা হোষ্টেলে ১৫০০৲ ব্রজমোহন কলেজে ১০০৲ দান করিয়াছেন।

(৬) বরিশালে আস্‌মত আলি খাঁ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ প্রতিষ্ঠা কল্পে ৬০০০৲ দান করিয়াছেন। ২০টী ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দেন। বি, এম্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্, ও জিলা স্কুলের ছাত্রগণকে বাৎসরিক স্বর্ণ পদক দেন, ইম্পিরিয়াল ওয়ার রিলিফ ফণ্ডে ৫০০৲ তুরস্ক রিলিফ ফণ্ডে ৫০০৲ কলিকাতা বেকার হোটেলের ভিটী ফণ্ডে ৫০৲ দরবার দিনে দরিদ্রগণকে ৭০০৲ টাকার কম্বল দান, ফরিদপুর আবেদুন্নিসা মুসলমান বোর্ডিং এ ৩০০০৲ পারশী জর্জ্জ হাই স্কুলে ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।
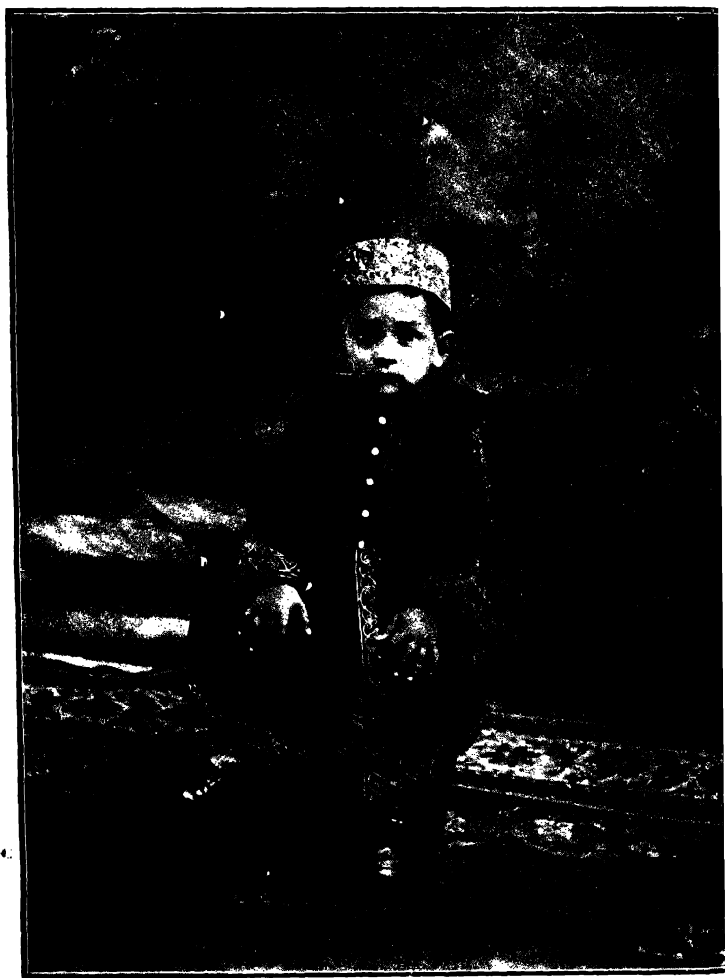
চৌধুরী ফজল রব খান।

রায় বাহাদুর বেণীমাধব চাকী।

রায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী বাহাদুর বাঙ্গালা ১২৬৩ সালের ফাল্গুন মাসে বগুড়া সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা জাতিতে বারেন্দ্র কায়স্থ। দুই বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইঁহারা মৌরাটের প্রাচীন ও বনিয়াদি চাকী-বংশ-সম্ভূত। জেলা পাবনার অন্তর্গত ঘরজান গ্রামে এই চাকী-পরিবার বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। বেণীমাধব বাবুর পিতা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বগুড়ায় আগমন করেন এবং তদবধি সেইখানে ইঁহাদের বসবাস হইয়াছে। বেণীমাধববাবুর পিতার নাম স্বর্গীয় ইন্দ্রলোচন চাকী।

বেণীমাধব বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এল উপাধিধারী। ইনি বগুড়ার সরকারী উকীল।

গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর ইঁহাকে একটী সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র (Certificate of honour) প্রদান করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

বেণীমাধব বাবুর চারি পুত্র; তাঁহার কন্যা সন্তান নাই। জেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিন্দুমাধব চাকী বগুড়ার ফৌজদারী আদালতের মোক্তার; দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রিয়মাধব চাকী শিক্ষকতা করেন; তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সন্তোষকুমার চাকী ও চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ বিনয়কুমার চাকী উভয়েই ছাত্র।

বেণীমাধব বাবু বঙ্গসাহিত্যের সেবক। ইনি দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিয়াছেন; একখানির নাম "মাতৃপূজা বা মহাব্রত" এবং অপরখানির নাম "সীতা নির্ব্বাসন"।

শ্রীযুত অমরনাথ দত্ত।

জেলা বর্দ্ধমানের ১৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কেশবপুর নামক গ্রামে শ্রীযুত অমরনাথ দত্তের নিবাস। ইঁহারা পাঠান রাজত্বের সময় হইতে পুরুষানুক্রমে এই গ্রামেই বাস করিতেছেন। ইঁহারা "নওদার দত্ত" নামেই সাধারণ্যে পরিচিত। এই "নওদা" কোথায় অবস্থিত তাহা জানা যায় না। কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদের সহিত পাঁচজন কায়স্থও আসেন। পুরুষোত্তম দত্ত এই পাঁচজন কায়স্থের অন্যতম। পুরুষোত্তম আপনাকে মৌদগল্য গোত্র-সম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইঁহারই বংশধরগণ সম্ভবতঃ বালি নওদা প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমের অধস্তন অষ্টম পুরুষ নারায়ণ দত্ত বঙ্গাধিপ বল্লাল সেনের সময় বঙ্গের প্রাড়বিবাক (Chief justice) ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপে কাশ্যপ গোত্র হইলেন তাহা জানিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ বঙ্গের স্বাধীন অবস্থায় উচ্চ রাজকর্ম্মে ব্রতী থাকায় ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্মানব্যঞ্জক "নিয়োগী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বহুদিন যাবত বাস করিতেছেন বলিয়া কেশবপুর অঞ্চলে বিশেষ সম্মানিত। ইঁহারা কেশবপুর ও সন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য কতিপয় গ্রামের জমিদার।

শ্রীযুত অমর নাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত ৺অমৃত লাল দত্ত মহাশয় সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র প্রমথ নাথ "ছায়াপথ" "জননী জন্মভূমি" প্রভৃতি কবিতা পুস্তক লিখিয়া রচনা শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের বংশের অন্য শাখার শ্রীযুত ভৈরব
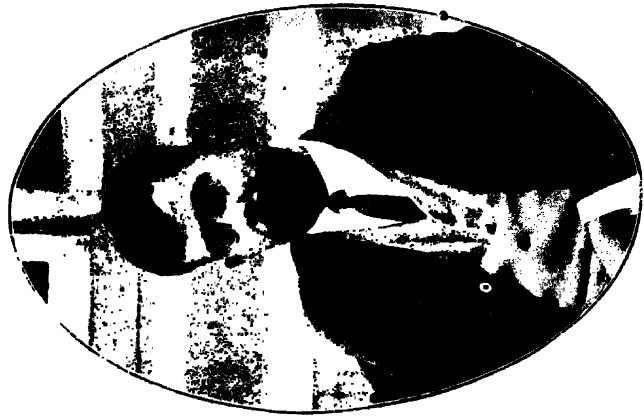
শ্রীযুত অমরনাথ দত্ত।
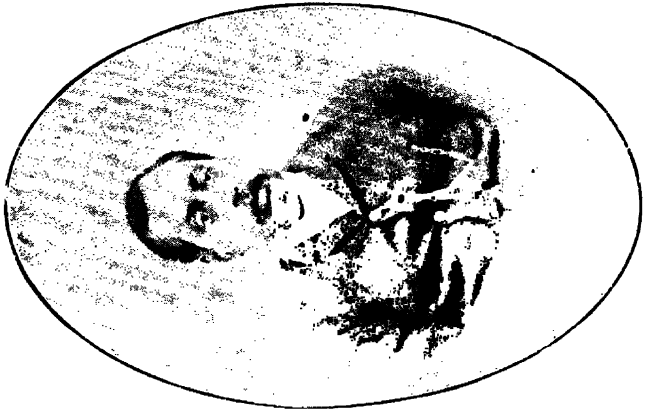
রায় বেণীমাধব চাকী বাহাদুর।

চন্দ্র দত্ত মহাশয় হাবড়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। তাঁহার পুত্র শ্রীযুত অবনী ভূষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ্চ স্কলার। গণিতের নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া অবনী ভূষণ বিশেষ কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীযুত অমর নাথ দত্ত মহাশয়ের পিতাও গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পিতামহ স্বর্গীয় বৃন্দাবন চন্দ্র দত্ত মহাশয় হাবড়ার অন্তর্গত সালিখায় বাস করিতেন। সালিখায় গঙ্গাতীরে তিনি গঙ্গাযাত্রীদের সুবিধাকল্পে নিজ ব্যয়ে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। আজও সে গৃহ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি হাবড়ার যাবতীয় জন হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় দুর্গাদাস দত্ত মহাশয় রুড়কী কলেজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া পূর্ত্ত বিভাগে সাব ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্য করিয়া ১৯১০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। রুড়কী কলেজের "দুর্গাদাস পদক" শ্রীরামপুরে "দুর্গাদাস স্কুল" এবং বর্দ্ধমানের "দুর্গাদাস রোড" তাঁহার পুণ্যস্মৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

শ্রীযুত অমর নাথ দত্তের পিতৃদেব গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি ভারতগবর্ণমেণ্টের অধীনে বঙ্গ, বিহার, আসাম, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে ত্রিংশৎ বর্ষ কাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বহু লোকের প্রতিপালক ছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

অমরনাথের পিতৃদেব যখন বিহার প্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পাটনার অন্তর্গত বাঢ় নগরে ইঁহার জন্ম হয়। অমরনাথ ক্রমে ক্রমে প্রবেশিকা, এফ্ এ, বি এ ও বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতেছেন এবং ১৯০৭ সাল হইতে হাইকোর্টের উকীল শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন।

ইনি দেশের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় অন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকেন। ১৮৯৯ সাল হইতে ইনি কংগ্রেস, কন্‌ফারেনস্ প্রভৃতিতে যোগদান করিয়া আসিতেছেন। ইনি ১৯০৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির বর্দ্ধমান অধিবেশনের সহকারী সম্পাদক ও ১৯১৫ সালের বর্দ্ধমান জেলা সমিতি (District association) নামের পরিবর্ত্তন হইয়া যখন উহার নাম বর্দ্ধমান জনসভা (Burdwah people's association) রাখা হয় তখন ইনি তাঁহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইহা ছাড়া জেলা ও লোকাল বোর্ডের সদস্যরূপে ইনি অনেক কার্য্য করিতেছেন। বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি ইহার প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। ইনি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে "আলো" নামে এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। মধ্যে মধ্যে অনেক মাসিক পত্রাদিতেও ইহার অনেক সন্দর্ভ দৃষ্ট হয়।

শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেহারের নব-গঠিত ব্যবস্থাপক সভায় কয়লাখনির দেশীয় অধিকারী-দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীযুত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী এবং কয়লার খনির দেশীয় স্বত্বাধিকারীদিগের অন্যতম অগ্রণী স্বরূপ। ইনি স্বাবলম্বন ও পুরুষকার প্রভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ বাঙ্গালী ব্যবসায় ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেই চায় না; সুযোগ পাইলেও হটিয়া আসে। ব্যবসায় বাণিজ্যকে এমনই সংশয়ের চক্ষে বাঙ্গালী দেখে। কেহ সাহস করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে অপরে তাহাকে নিরুৎসাহ করে। যে জাতির ও সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এইরূপ, সেই জাতির ভিতরে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি অকুতোভয়ে আত্মশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের অনিশ্চিত পথে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং যিনি গন্তব্য পথে উপনীত হইয়া কেবল নিজের ললাটে নয়, স্বজাতির ললাটে বিজয় টীকা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই আত্মবৈশিষ্ট সম্পন্ন স্বনাম ধন্য পুরুষ।

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত খড়দহ গ্রাম উমেশচন্দ্রের জন্মভূমি। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে উমেশচন্দ্র সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা শাণ্ডিল্য-গোত্র-সম্ভূত। ইঁহাদের আদি-পুরুষ ভগীরথ মহারাজা আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম।

উমেশচন্দ্রের পিতার নাম বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন ইঁহার বয়স ১৪ বৎসর, সেই সময়ে ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে ইংরেজী লেখাপড়া ভাল রকম শিখেন এবং ক্রমশঃ মেসার্স আরনথসেন লিমিটেড নামক ইউরোপীয় সওদাগর আফিসের হেড ক্লার্কের পদে উন্নীত হন। এই আফিসে তিনি প্রায় ৩০ বৎসরের অধিককাল কর্ম্ম করিয়া মোটা পেন্‌সন বা বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

উমেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণ্ডার গ্রাজুয়েট। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিবার পর ইনি গবর্ণমেণ্ট ক্লার্কসিপ পাবলিক ওয়ার্কস ও মিলিটারী একাউণ্টস্ এবং একাউণ্ট্যাণ্টসিপ্ পরীক্ষা প্রদান করেন এবং এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হন। ইনি ছাত্র-জীবনে ভাল খেলোয়াড় ছিলেন এবং এজন্য বহু পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন।

ইনি প্রথমে পিতার পদে বসিয়া মেসার্স আরনমসেন কোম্পানীর আফিসেই কর্ম্ম আরম্ভ করেন এবং কিছুদিন এই আফিসেই থাকেন। যে গুরু-কর্ম্মের দায়িত্বভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল, তিনি তাহা পূর্ণরূপে বহন করিতেন এবং একনিষ্ঠভাবে কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী থাকিতেন। এই আফিসের কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকিয়া ইনি ব্যবসায় বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি স্বয়ং ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সাহস পাইয়াছিলেন।

অতঃপর ইনি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি বিভাগে কিছুকাল কর্ম্ম করেন এবং পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর এজেণ্ট আফিসের কোল্ ট্যান্সপোর্টেশন শাখায় নিযুক্ত হন। এইখানে কর্ম্মসূত্রে তিনি কয়লার খনির কতিপয় মালিকের সহিত পরিচিত হন। বলিয়াছি

ক, ইতিপূর্ব্বেই তিনি ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রকৃতিগত ব্যবসায় বুদ্ধিও ছিল। এই দুইটি গুণের একত্র সমাবেশ থাকায় তিনি কয়লার দালাল ও ব্যবসায়ীরূপে ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ম্মে ইস্তফা দিলেন। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াই প্রথম প্রথম তাঁহার ভালই হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ কয়লার বাজার পড়িয়া গেল। এইজন্য তিনি আবার মেসার্স গ্রিণ্ডলে এণ্ড কোম্পানীর আফিসে কর্ম্ম লইলেন এবং এখানে তিন বৎসর, কার্য্য করিলেন। অতঃপর এই চাকুরী ত্যাগ করিয়া তিনি স্বয়ং কয়লাখনির এজেণ্টরূপে একটি ক্ষুদ্র এজেন্সি অফিস খুলিলেন। তাহার পর তিনি ইউরোপীয়-দিগের তত্ত্বাবধানে কয়লাখনি হইতে কয়লা উত্তোলনের ১৪টি যৌথ কোম্পানীর পত্তন করেন। ইহাতে তিনি বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন। অতঃপর তিনি কয়েকটি কয়লাখনির এজেন্সি গ্রহণ করেন এবং স্বয়ংও কয়লার খনি খরিদ করেন।

উমেশচন্দ্র এক্ষণে ১২টি কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী। ইহার মধ্যে ৪টি বা ৫টি তিনি সেলামী লইয়া অপরকে দীর্ঘদিনের মেয়াদে ভাড়া দিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় রেলওয়েতে, গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের বিভিন্ন শাখায়, জাহাজের কোম্পানীতে, পাটের কলে, তূলার কলে, চা বাগানে, নীলকুঠিতে ও অন্যান্য কল-কারখানাতে কয়লা সরবরাহ করিয়া থাকেন। তিনি "ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী" এই নামে ব্যবসায় করিতেছেন। তাঁহার এই কোম্পানী অনেকগুলি কয়লার খনির কয়লা বিক্রয়ের এজেন্সি লইয়াছেন। শালিমারে ও ভদ্রেশ্বর ঘাটে এই কোম্পানীর নিজস্ব কয়লার ডিপো আছে।

উমেশচন্দ্রের লোহা-লক্কড়ের কারবারও আছে এবং সেই কারবারও খুব ভাল চলিতেছে। এই কারবারের আফিস ৬৭নং ষ্ট্র্যাণ্ডরোড। এই কারবারের নাম "ব্যানার্জ্জি এণ্ড পাল চৌধুরী।"

অক্লান্ত পরিশ্রম, দৃঢ় অধ্যাবসায় এবং সাধুতা দ্বারা তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য লাভ করিয়াছেন এবং এক্ষণে কলিকাতার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অন্যতম অগ্রণীরূপে গণ্য হইয়াছেন।

উমেশচন্দ্র জিওলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট অফ্ ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের সদস্য; ইনি ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা; বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্সের সদস্য। ইনি ফ্রিম্যাসন এবং গ্রাণ্ডলজের সম্মানিত সদস্য।

উমেশচন্দ্রের পুত্র মিঃ পি, সি, ব্যানার্জ্জি এক্ষণে পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করিয়াছেন।

উমেশচন্দ্রের জামাতা শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল।

জাফরগঞ্জ বড় আখড়ার মহন্ত মহারাজ।

বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদ সহরের দুই মাইল উত্তরে পূত-সলিলা ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব নবাব মীরজাফরের স্বনাম প্রতিষ্ঠিত জাফরগঞ্জ নবাববংশের লুপ্তস্মৃতির চিহ্নমাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া অবস্থিত। নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভীষণ অমানুষিক অত্যাচারে প্রপীড়িত জন-সাধারণের ক্লেশ নিবারণে বদ্ধ-পরিকর হইয়া, সিরাজের প্রিয় সেনাপতি মীরজাফর ও বাঙ্গালার ধনকুবের জগৎশেঠ প্রভৃতি, লর্ড ক্লাইবের সহিত গোপনে মিলিত হইয়া ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জাফরগঞ্জই পূর্ব্বোক্ত নরপুঙ্গব লীলাভূমি। তবে আজ "সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই।" মীরজাফরের সুদূর বংশাবলী আজ ইংরাজের সামান্য পেন্‌সন্‌ভোগী হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন এবং জগৎশেঠের বংশধরগণ কিঞ্চিৎ জমিদারী ক্রয় করিয়া কোনরূপে বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। ধনকুবের জগৎশেঠ মহাশয়ের পূর্ব্ব বাস ভবন আজ ভাগীরথীর অঙ্কশায়িনী, তাঁহার মৃত্তিকা প্রোথিত অসীম ধনরাশি ও ভাগীরথীর প্রবলস্রোতে সমুদ্রগর্ভে নিহিত। এখনও শেঠ মহাশয়ের মৃত্তিকা নিম্নস্থিত গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহের ধ্বংশাবশেষ প্রাচীন স্মৃতির চিহ্নরূপে অবস্থিত। পলাশীর যুদ্ধাবসানে পরাজিত বন্দী নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফরের বাস ভবনের যে গৃহে রক্ষিত হইয়াছিলেন এবং যেখানে মীরণের কঠোর আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ হয়, সেই গৃহটী আজও অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান। ভারতের সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর

জেনেরল লর্ড হেষ্টিংশের প্রিয়পাত্র দেবীসিংহের বংশীয় নশিপুরাধিপতিগণ এই আখড়ার অনতিদূরেই সগৌরবে অবস্থিতি করিতেছেন।

এই আখড়া সুবিখ্যাত শ্রীসম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও বেদের ভাষ্যকর্ত্তা শ্রীশ্রী৺রামানুজ স্বামীর মতাবলম্বী। উক্ত স্বামীর বহু বিস্তৃত শিষ্য ও শিষ্যাদির মধ্যে ইহা বড়গল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মে দীক্ষিত। উক্ত সম্প্রদায়ের রাজপুতনার মধ্যবর্ত্তী জয়পুর রাজ্যের পলতা আখড়ার গদির শিষ্য অনন্ত রামানুজ দাস মহারাজ তথা হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া ঢাকা সহরের অন্তর্গত উর্দ্দূবাজার নামক স্থানে এক আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহাকেই এই আখড়ার এতদ্দেশস্থ আদি মহন্ত বলা যাইতে পারে। তিনি অতি সুপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার নামীয় দলিল-পত্রাদি দ্বারা বাঙ্গালা ১১০৩ সালে তাঁহার ঢাকায় অবস্থান অনুমান করা যায়। বঙ্গদেশে আগমনকালে তাঁহার নিকট ছোট সীতারাম শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। উহা এখন এখনকার প্রধান মন্দিরে রক্ষিত আছেন। তাঁহার সময়ে কোনও সম্পত্তি থাকার কিছু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কথকতা ব্যবসা দ্বারাই তাঁহার দেবসেবা ও নিজ ব্যয় সম্পাদিত হইত। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির সময় ঠিক নির্ণয় করা সুকঠিন।

তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার শিষ্য মহন্ত লছমন দাস মহারাজ তাঁহার নির্দ্দেশমতে মহন্তপদে অভিষিক্ত হন। তিনি ঢাকার শ্রীশ্রী৺-শার্ঙ্গধর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিগ্রহ এখনও তথায় আছেন ও তথাকার প্রধান বিগ্রহ বলিয়া গণ্য। তিনি একজন গণ্যমান্য সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পুরাণ-পাঠাদি ও ভিক্ষাদি দ্বারাই দেব-সেবা ও নিজ ব্যয় সম্পাদন করিতেন। ঐরূপে কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া গঙ্গাবাসের অভিলাষী হইয়া নিজ প্রিয় শিষ্য মনসারাম দাসের

উপর তথাকার দেব-সেবাদির ভারার্পণ পূর্ব্বক ১১৬৮ সালে মুর্শিদাবাদ আগমন করতঃ জাফরগঞ্জে ভাগীরথী তীরে এক পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করেন।

যে সময় মহাত্মা লছমন্ দাসের মুর্শিদাবাদে আবির্ভাব হয় তখন এখানকার অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। তিনি দুর্বৃত্ত মুসলমানদের অত্যাচারে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অস্তমিত হইবার উপক্রম দর্শনে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া সকলকে সনাতন ধর্ম্মের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ধর্ম্মোপদেশদানে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে ভাগবত পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করতঃ বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবক্তা ও সিদ্ধজনোচিত অলৌকিক মাহাত্ম্যদর্শনে পার্শ্ববর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানের অনেক ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধার্ম্মিক প্রবর লছমন দাস একজন বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। একদিন তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নবাব মীরজাফর তাঁহার জামাতা মীরকাশিম সমভিব্যাহারে তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া কুটীরে আগমন করিলে, তিনি নবাবের প্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া মীর-কাশিমকে বঙ্গের নবাব বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করেন। ইহাতে নবাব মীরজাফর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন "আপনি চিনিতে পরেন নাই, আমিই বঙ্গের নবাব এবং যাঁহাকে নবাব মনে করিয়াছেন ইনি আমার জামাতা মীরকাশিম।" তদুত্তরে মহন্ত মহারাজ বলিয়া-ছিলেন "বিশ্বাস-ঘাতকতা ও উৎকোচের উপর ভিত্তি বিশিষ্ট হইয়া রাজলক্ষ্মী স্থায়ী হওয়া অসম্ভব; আমি ঠিক চিনিয়াছি অচিরে আমার বাক্যের সত্যতা বুঝিবে।"

তাঁহার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। সপ্তাহ মধ্যে মীরজাফর তৎকালীন গভর্ণর ভান্সিটার্ট কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইলে মীরকাশিম বঙ্গে

নবাব হন। মীরকাশিম বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত ধন সহ মহন্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাত করেন এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ প্রার্থী হন। মহন্ত মহারাজ যখন প্রদত্ত ধনরাশি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন "শীঘ্রই বঙ্গে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে ; সেই সময় এই অর্থ দ্বারা যাহাতে দীন-দরিদ্রের উপকার হয় তাহার ব্যবস্থা কর।" মীরকাশিম তাঁহার উপদেশ অনুসারে ভাবী দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্নক্লিষ্ট দরিদ্রগণের সাহায্যার্থে দরিদ্র-ভাণ্ডারে উক্ত ধন অর্পণ করেন। মহাত্মার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে ; ১১৭৬ সালে বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। উক্ত দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ।

মহন্ত লছমন দাস মহারাজ মীর কাশিমের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন প্রবল শত্রু মীরজাফর নিকটে থাকিতে তাঁহার রাজ্যপদের স্থায়িত্ব আশা বৃথা ; তবে ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন, সতীর সতীত্ব রক্ষা এবং নিরাশ্রয় ব্যক্তির প্রাণদান উন্নতির সোপান বলিয়া জানিবে। মীরকাশিম দুর্জ্জনকে দূরে পরিত্যাগ করা সঙ্গত ভাবিয়া স্বকীয় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে মুরশিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। প্রজাবর্গের আর্থিক উন্নতির জন্য বাণিজ্য শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মীরজাফরের ষড়যন্ত্রে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া মুঙ্গের ইংরাজের করতলগত হইল। ক্রোধান্ধ মীরকাশিম পাটনাস্থিত নিরাশ্রয় ইংরাজ বন্দীদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন, অবশেষে পাটনাও ইংরাজের অধিকারে আসিল।

এই সময় একদিন ভূতপূর্ব্ব নবাব মীরজাফর মহন্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহার ভাবী শুভাশুভ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন।

তদুত্তরে তিনি বলেন, "তোমার জীবন বেশীদিন স্থায়ী হইবার আশা দেখি না, তবে তুমি রাজমুকুট শিরে ধরিয়া ইহজীবন ত্যাগ করিবে কিন্তু তোমার জীবনান্তে বঙ্গের সিংহাসন জারজের অধিকারভুক্ত হইবে।" মহাত্মার বাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। মীরকাশিম বাঙ্গালার যুদ্ধে ইংরাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়া দেশত্যাগী হইলে মীরজাফর কিছুদিনমাত্র বঙ্গের সিংহাসন ভোগ সুখলাভ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জারজপুত্র নাজিমউদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহন্ত লছমন দাস মহারাজ ১১৭৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহার শিষ্যগণের সাহায্যে অনশন-ক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষ পীড়িত নর-নারীর ক্লেশ ও দুর্দ্দশা আনয়নের জন্য সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার সাধন ও বহুসংখ্যক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নরনারীর প্রাণপণ শক্তিতে কার্য্য করিয়াছিলেন। মনে হয় নির্ব্বাণোন্মুখ প্রাণরক্ষার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। অবশেষে নিজ কার্য্য সমাধান্তে ১১০ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া অনুমান ১১৯১ সালে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

মহন্ত লছমন দাসের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার নিয়োগানুসারে তাঁহার শিষ্য নারায়ণদাস মহারাজ মহন্তপদে অভিষিক্ত হন। তিনি তাঁহার গুরু পিতার অনুরূপ সুপণ্ডিত ও দৈবশক্তি বিশিষ্ট মহাপুরুস ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, একদা জনৈক নবাব বংশধর কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত হইয়া বহু চিকিৎসায় আরোগ্যলাভে হতাশ হইলে মহন্ত মহারাজের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া অবশেষে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। মহন্ত মহারাজ তাঁহার গাত্রে নিজ অঙ্গুলী সঞ্চারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলে রজনী প্রভাতে যুবকের শরীরে রোগের চিহ্ন মাত্র ছিল না। নবাব বাহাদুর মহন্ত মহারাজকে

পুরস্কার স্বরূপে দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তিনি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাহা প্রত্যাখান করতঃ দীন-দুঃখীকে উক্ত অর্থ দান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

তাঁহার সময়ে দেব সেবার জন্য কতক নাখেরাজ সম্পত্তি খরিদের নিদর্শণ পাওয়া যায়। ধর্ম্মপ্রাণ মহন্ত মহারাজ ১২০১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তৎপরে তাঁহার শিষ্য হরিনারায়ণ দাস মহারাজকে ভাবী মহন্ত নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্বর্গারোহন করেন। মহন্ত হরিনারায়ণ দাস মহারাজ নানা শাস্ত্রজ্ঞ, বিশেষতঃ বেদান্ত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, ইনি ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন। কোন ব্যক্তি কোন কোন প্রশ্ন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আগন্তুকের প্রশ্ন ও সদুত্তর বলিয়া দিতেন। ইঁহার কথকতা দ্বারা অর্জ্জিত অর্থে আরও কতক নখেরাজ সম্পত্তি খরিদ হয়। মহন্ত মহারাজ তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই হরিদাস মহারাজকে ভাবী মহন্ত মনোনীত করেন এবং তৎপরে তাঁহার অন্যতম শিষ্য চতুর্ভুজ দাস মহারাজ মহন্ত হইবেন ইহাও নির্দ্দেশ করিয়া যান। এতদ্বারা প্রকাশ যে এই আখড়ার মহন্তগণের নিজ অব্যবহিত পরবর্ত্তী মহন্ত ব্যতীত তৎপরবর্ত্তী মহন্ত নির্দ্দেশে ও ক্ষমতা থাকার প্রথা প্রচলিত আছে। মহন্ত হরি নারায়ণ দাস ১২৩৬ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত মহন্তের পরলোক প্রাপ্তি হইলে মহন্ত হরিদাস মহারাজ তৎপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি বেশীদিন ইহজগতে থাকিবার অবসর পান নাই। ১২৩৯ সালে তিনি মর্ত্তজগৎ পরিত্যাগ করেন

মহন্ত হরিনারায়ণ দাসের নির্দ্দেশ অনুসারে তৎপরবর্ত্তী মহন্ত হরিদাসের স্বর্গ প্রাপ্তির পর চতুর্ভুজ দাস মহারাজ, জাফরগঞ্জের মহন্ত

হন। ইনিও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং দানশীল মহাপুরুষ ছিলেন। ইঁহার আমলেই সাধু সেবাদি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত সাধু সেবাদি চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে শস্যাদি দূরদেশে রপ্তানী করিবার ব্যবস্থা করতঃ যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়া নাখেরাজ সম্পত্তি খরিদ পূর্ব্বক দেবোত্তরের আয় বৃদ্ধি করিয়া যান। ইঁহার সময় ৺ঠাকুর বাটীর পাকা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হয়। ১২৪৭ সালের মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে মহন্ত চতুর্ভুজ দাসের জীবনান্ত হয়।

মহন্ত চতুর্ভুজ দাস মহারাজের দিব্যলোক প্রাপ্তির পর পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে রামদাস মহারাজ, মহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি দেশবিখ্যাত নানাশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়েও তাঁহার সুকীর্ত্তি সমূহ বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হয় নাই। মহন্ত মহারাজ নৌকা প্রস্তুত করতঃ দিনাজপুর, ঘুঘুডাঙ্গা, রাজসাহী ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ব্যবসা পরিচালন দ্বারা সমধিক লাভবান হন। ঐ সকলের লব্ধ আয় হইতে তিনি সাধুসেবার অত্যধিক উন্নতি সাধন করেন এবং দেবমন্দির ও অন্যান্য আবশ্যকীয় অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণে ভাগীরথী যদিও ঠাকুরবাটীর ১০।১২ বিঘা পশ্চিমে প্রবাহিত দেখা যায় কিন্তু মহন্ত রাম দাস মহারাজের সময়ে উহা ঠাকুরবাটীর ঠিক পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত। এক সময় ভাগীরথীর কুটিল গতিতে ঠাকুরবাটী সংলগ্ন স্থান ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়া দেবমন্দিরের কতকাংশ গঙ্গাগর্ভে নিহিত হইলে, সকলে মন্দিরস্থ বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিতে পরামর্শ দেন। মহন্ত মহারাজ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া উক্ত ভগ্নমন্দিরে প্রবেশ করতঃ দ্বার বন্ধ করিয়া অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। সমস্তদিন অতীত হইল, রজনীর অন্ধকার ধরণী সমাচ্ছন্ন করিল, কিন্তু তিনি অনাহারে মন্দির মধ্যেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে

দেখা গেল মন্দির সংলগ্নস্থানে চর পড়িয়া গিয়াছে এবং গঙ্গা তথা হইতে ১০।১২ বিঘা পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। সূর্য্যোদয় হইলে মহন্ত মহারাজ মন্দিয়ের দ্বার উদঘাটন পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন এবং গঙ্গামাতার যথোপ-চারে পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তদবধি এখনও প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট দিনে গঙ্গামাতার মহাসমারোহে পূজা দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

মহন্ত মহারাজ অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তাঁহার সময়ে একবার এতদ্দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইনি প্রচুর পরিমাণে প্রত্যহ চাউল বিতরণ দ্বারা সহস্র সহস্র অন্নক্লিষ্ট নরনারীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তীর্থ পর্য্যটন ক্রমে ইনি ৺অযোধ্যাধামে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সাধু বৈষ্ণব ও দীন দরিদ্রগণকে যথোপযুক্ত ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে বস্ত্রাদি দান করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে নাখেরাজ ও জমিদারী সম্পত্তি খরিদ হওয়াতে আখরার আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১২৭৪ সালের ২৩শে বৈশাখ তারিখে মহন্ত রাম দাস মহারাজ তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে গোপাল দাস মহারাজকে স্বস্বপদে মনোনীত করতঃ, মানবলীলা সম্বরণ করেন।

১২৭৪ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে গোপাল দাস মহারাজ মহন্ত পদে অভিষিক্ত হন। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। ইনি ব্যবসা কার্য্য উঠাইয়া দিয়া সঞ্চিত অর্থে বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাট মল্লারপুর ও অন্যান্য স্থানে জমিদারী সম্পত্তি খরিদ করেন। পরোপকার ইঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল; কেহ দুঃখিগণের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তৎপ্রতীকারার্থে বদ্ধ পরিকর হইতেন। দৈববলে অনেক অনেক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি ইনি অনায়াসে আরোগ্য করিয়া দিতে পারিতেন। ইনি প্রজাগণের উপকারার্থে নানাস্থানে পুষ্করিণী খনন ও বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

এক সময়ে অগ্নিদাহে জাফরগঞ্জের দক্ষিণস্থ ইছাগঞ্জ হইতে লালবাগ পর্য্যন্ত ৫।৬ শত গৃহ ভস্মীভূত হইলে দয়ার্দ্রহৃদয় মহন্ত মহারাজ দরিদ্রগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিগণকে গৃহনির্ম্মানোপযোগী বাঁশ খড় ও ১৫ দিনের খাদ্যোপযুক্ত চাউল এবং আবশ্যক মত নগদ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎকালীন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের রিপোর্টে মহন্ত মহারাজের ঈদৃশ দেশ হিতৈষিতার কার্য্য শুনিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর বাহাদুর মহন্ত মহারাজকে সম্মানপূর্ব্বক উপাধি দানে ভূষিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি উক্ত উপাধি গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালের ফাল্গুন মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে মহন্ত গোপাল দাস মহারাজ জনসাধারণকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন।

বর্ত্তমান মহন্ত ভগবান দাস মহারাজকে গোপালদাস মহন্ত পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু পিতার স্বর্গারোহণের সময় ইনি নাবালক থাকিলেও ইহার রক্ষণাবেক্ষণে ও দেবসেবাদি পরিচালন জন্য তুলসীদাস মহারাজকে একজিকিউটার মনোনীত করিয়া মহন্ত ভগবান দাস মহারাজকে মহন্তের গদিতে অভিষিক্ত করা হয়।

তুলসীদাস মহারাজ দেবসেবাদির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্নকরতঃ ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসে স্বর্গারোহণ করিলে বর্ত্তমান মহারাজ নিজস্কন্ধে মহন্তের কার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য ইহার কোমল স্কন্ধে অর্পিত গুরুভার ইনি অতি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। ইহার ন্যায় সহৃদয় ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী, বদান্য ও ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা এ জগতে অতি বিরল। বাল্যসুলভ চপলতা, যৌবনের তেজস্বিতা, বার্দ্ধক্যের সহিষ্ণুতা যদি কেহ একাধারে দেখিতে চান তিনি মহন্ত মহারাজকে একবার দেখিয়া যাইবেন। তিনি সর্ব্বদা শিশুগণের

সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের আবশ্যকীয় খেলানাদি ক্রয় করিয়া দিয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ বোধ করেন।

প্রজা সকলে ইঁহার সময়ে রামরাজত্বে বাস করিতেছেন; দেশে অজন্মা উপস্থিত হইলে প্রজাগণের প্রার্থনা অনুসারে খাজনা আদায় তো নিষেধ থাকেই, অধিকন্তু তাহারা অবস্থা বিশেষে ধান, চাউল ও নগদ অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। তমশুক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিলেও সুদের টাকা সমস্ত বাদ দিয়া আসল টাকা দীর্ঘ মিয়াদে কীস্তিবন্দী দ্বারা আদায় লইয়া থাকেন। প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণ এবং চাষের সুবিধার জন্য মহন্ত মহারাজ নানাস্থানে নিজ ব্যয়ে পুষ্করিণী ও কুপ খনন করিয়া দিয়াছেন। মহন্ত মহারাজের জমিদারী মল্লারপুরস্থ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত প্রজাবর্গের দুঃখ নিবারণ জন্য রামপুরহাটের সবডিভিসিনাল অফিসারকে অনুরোধ করতঃ মল্লারপুরে এক দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন এবং চিকিৎসালয়ের আবশ্যকীয় পাকা গৃহাদি নির্ম্মাণ ও আসবাবাদি খরিদের ব্যয়ভার সমস্তই নিজে বহন করেন এবং উক্ত লোক হিতকর কার্য্যের জন্য ৫।৭ বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন।

রামপুর হাটে জন সাধারণের অসুবিধা নিবারণ জন্য এক টাউন হল নির্ম্মাণার্থে এক কালীন পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। চট্টগ্রাম জেলার চন্দ্রনাথতীর্থে পর্ব্বত শিখরস্থিত উনকোটি শিবের মন্দিরে উঠিবার সুবিধা মত পথ না থাকায় যাত্রিগণের প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ মহন্ত মহারাজ বহু অর্থ ব্যয়ে প্রশস্ত পথ ও পাকা সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

আমাদের মাননীয় ভারত সম্রাট্ ইউরোপীয় মহাসমরে ব্যাপৃত হওয়ায় ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য সংগ্রহের আবশ্যক হইলে, রাজভক্ত মহন্ত মহারাজ নিজ মহলে তাঁহার প্রজা মধ্যে যাহারা সৈন্য দলে

যোগদান করিবে তাহারা প্রত্যেকে ১০/০ দশ বিঘা করিয়া নিষ্কর জমী পাইবে, এইরূপ ঘোষণা পত্র প্রচার করেন।

গৃহদাহে সর্ব্বস্বান্ত, কন্যা বা মাতৃ পিতৃ দায় গ্রস্ত ও দরিদ্র্য প্রপীড়িত ব্যক্তি মহন্ত মহারাজের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিলে কখনও বিফল মনোরথ হইয়া যাইতে দেখা যায় না। দূর দেশস্থ এবং স্থানীয় শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতবর্গের বৃত্তির ব্যবস্থা এবং দরিদ্র সন্তানগণের বিদ্যা লাভের জন্য মহন্ত মহারাজ বাৎসরিক যথেষ্ট পরিমান অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

কালের পরিবর্ত্তন প্রভাবে স্থানীয় মধ্যবিত্ত জমিদার বর্গের ঋণগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া মহন্ত মহারাজ নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাঁহাদের ভাবী দুর্দ্দশা নিবারণে কৃতসংকল্প হইয়া বিভিন্ন স্থানে লক্ষাধিক টাকা নামমাত্র সুদে কর্জ্জ দিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কলির প্রভাব অধার্ম্মিকগণ মহন্ত মহারাজের মহৎ উদ্দেশ্যকে উৎসাহিত না করিয়া অসদুপায় অবলম্বনে সচেষ্ট হইলে অবশেষে ক্ষেত্র বিশেষে উক্ত উদ্দেশ্য সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হয়েন।

এইরূপে কত শত কার্য্যে ইঁহার মুক্ত হস্ততা ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন।

শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ জীউ এই আখড়ার প্রধান দেবতা। তদ্ভিন্ন ৺গোবিন্দ জী, ৺রাধামাধব, ৺লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি বিগ্রহ ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য অনেক বিগ্রহ সহ এই আখড়ায় আছেন। বহু সাধু সন্ন্যাসী ও অতিথি প্রত্যহ এখানে আসিয়া থাকেন ও অনেকে স্থায়িভাবে এখানে বাস করেন। তাঁহাদের খাদ্য, পরিধেয় ও শীত বস্ত্রাদি এই আখড়া হইতে দেওয়া হইয়া থাকে এবং পীড়া হইলে চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত করা হয়। এখানে দৈনিক ২০০।২৫০ লোক দুই বেলা ভোজন করিয়া থাকেন ও নিত্য নৈমিত্তিক ভগবানের আরাধনা করেন। এই আখড়ায় বহু

গোধনও আছে এবং তাহাদের পরিচর্য্যার ও সুবন্দোবস্ত আছে। ৺ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, রামনবমী, গোবর্দ্ধন পূজা প্রভৃতি পর্ব্ব সকল এখানে মহা সমারোহে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঝুলন যাত্রাদির সময় দূর দেশ হইতে অনেক যাত্রী এখানে উৎসব দর্শনার্থ আসিয়া থাকেন। এই আখড়ার সকল দেবতারই পৃথক্ পৃথক্ মন্দির ও ভিন্ন ভিন্ন সেবাইত নির্দ্দিষ্ট আছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ব্যাপী ভজন গান হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান মহন্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত মহন্ত ভগবান দাস মহারাজের সময়ে কি দেব সেবা, কি মন্দির সংস্কার, কি উৎসব সমস্ত যথারীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং সকল বিষয়েই আখড়ার সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইঁহার অমায়িক ব্যবহার ও মিষ্ট সম্ভাষণে, কি সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ, কি আগন্তুক সাধু সন্ন্যাসী, কি সাহায্যপ্রার্থী বিপদ্ গ্রস্ত জনমণ্ডলী, কি প্রজাবর্গ, কি বেতন ভোগী কর্ম্মচারীগণ সকলেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন।

এই আখড়ার নিয়মাবলী।

১। গৌড় জাতীয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণ এই আখড়ার মহন্ত মনোনীত হইতে পারেন না। এই প্রথা বরাবর প্রচলিত আছে ও থাকিবে।

২। এই আখড়ার মূল মন্দির বা প্রধান মন্দিরের দেবতার পূজা মহন্তের সমজাতীয় ব্রাহ্মণকে শঙ্খ চক্র চিহ্নিত ও মন্ত্র প্রদান করতঃ তাঁহার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ উক্ত মন্দিরের পূজাদি করিতে পারেন না।

৩। এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রকার শঙ্খ চক্র চিহ্নিত ও মন্ত্র দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় ব্রাহ্মণের পক্ক অন্নের ভোগ হয় না।

মহান্ত মহারাজ ভগবান দাস

৪। কোন ব্যক্তি ভোগাদি দিবার অভিলাষ করিলে, মহন্তের অনুমতি গ্রহনান্তর পূজারীর অনুরূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইলে, তবে তাহা প্রধান মন্দিরে ভোগ দিবার যোগ্য হইতে পারে।

৫। এই আখড়ার প্রথম মূলধন ব্যবসা ও কথকতাদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে লাখেরাজ ও মালজমা এবং জমিদারী প্রভৃতি যাহা খরিদ হইয়াছে, তাহা মহন্তগণ কখনও স্বনামে কখনও বা বেনামীতে খরিদ করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী ঐ সকল সম্পত্তি মহন্তগণ পত্তনী বা মৌরসী মোকবরী বন্দোবস্ত কিম্বা আবশ্যক বোধে পত্তনী সম্পত্তি দরপত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। মহন্ত হরিনারায়ণ দাস, মহন্ত চতুর্ভুজ দাস, মহন্ত রামদাস ও মহন্ত গোপাল দাসের প্রদত্ত পাট্টা ও গৃহীত কবুলতি সকল হইতে এইরূপ প্রথা থাকা স্পষ্ট প্রমানীত হয়।

করটীয়ার জমিদার

শ্রীযুত ওয়াজেদ আলী খান পন্নি *

সাহেবের বংশ-পত্রিকা।

সোলেমান কররাণী। (গৌড়ের সুলতান)

|

বায়েজিদ খান পন্নি। (* *)

|

সইদ খান পন্নি। (১)

|

ফতে খান পন্নি।

|

সলিম খান পন্নি। (২)

|

---

* করটীয়ার জমিদার বংশ পন্নিবংশীয় পাঠান। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ সোলেমান খাঁ আফগানিস্থানের কররাণ গ্রামবাসী ছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইনি সোলেমান কররাণী নামে খ্যাত। সোলেমান কররাণীর বংশধরগণ এদেশবাসী হইয়া কররাণী উপাধি ত্যাগ করেন এবং অনেকেই স্বীয় বংশের পরিচয় জন্য পন্নি উপাধি নামের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ পন্নি উপাধি না লিখিয়া জমিদারী কার্য্যের জন্য বাদসাহী উপাধি "চৌধুরী" ও "দেওয়ান" নামের সহিত ব্যবহার করিতেন। এই পন্নিবংশ আটীয়া পরগণার সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও পুরাতন। চিত্তের উদারতা, লোকহিতৈষিতা, দান ও সৎকীর্ত্তির জন্য এই বংশ বিশেষ বিখ্যাত।

হাফেজ মাহমুদ আলি খান পন্নি।

মইন খান চৌধুরী। (৩)

|

মুনায়েম খান চৌধুরী।

|

দেওয়ান খোদা নেওয়াজ খান চৌধুরী। (৪)

|

দেওয়ান আলেপ খান চৌধুরী।

|

দেওয়ান ফয়েজ আলী খান চৌধুরী

|

দেওয়ান সাদৎ আলী খান্ চৌধুরী। (৫)

|

হাফেজ মাহামুদ আলী খান পন্নি।

|

ওয়াজেদ আলী খান্ পন্নী (৬)

|

মস্উদ আলী খান্ পন্নি।

করটীয়ার জমিদার-বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(১) বাদসাহ "আকবর" ইহাঁকে সরকার বাজুহা ও সরকার ঘোড়াঘাটে জায়গীর দিয়া বাঙ্গালার উত্তর পূর্ব্বভাগে শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহাঁর চেষ্টায় মোগল পাঠানের মিলন হয়। পাঠান যুদ্ধের অবসানে ইনি আটীয়া গ্রামে আপনার আবাস বাটী ও কার্য্যালয় নির্ম্মাণ

করেন। সইদখাঁই আটীয়া পরগণার লোক-প্রতিষ্ঠার মূল। ইহাঁর প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি পাইয়াই সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান আটীয়া পরগণায় বসতি স্থাপন করেন। সইদ খাঁ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আটীয়ার সমস্ত প্রজাকে কর্ষিত ভূমির একপঞ্চমাংশ নিষ্কর প্রদান করেন। এই নিষ্করের নাম "সরকমী"। এখনও আটীয়া পরগণার অধিবাসিগণ সইদ খাঁর প্রদত্ত এই সরকমী ভোগ করেন।

(২) ইনি চট্টগ্রামের নায়েক স্থবেদার হইয়া গমন করেন।

(৩) বাদশাহ আওরঙ্গজেব ইহাঁকে আটীয়া ও আলেপসাহী পরগণার চৌধুরাই ফর্ম্মাণ প্রদান করেন। ইনি মইননগর গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় আপনার বাস ভবন ও কার্য্যালয় নির্ম্মাণ করেন।

(৩) খোদা নেওয়াজ খান চৌধুরী খুব প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। গোড়াইর যুদ্ধের জন্য মুর্শিদকুলী খাঁ ইহাঁর জমিদারী কাড়িয়া লইয়া নাটোরের রাণী ভবানী ঠাকুরাণীকে প্রদান করেন। কিছুদিন পরে খোদা নেওয়াজ খাঁ স্বীয় সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন।

(৫) ইনি গোড়াই পরিত্যাগ করিয়া করটীয়া গ্রামে আবাস স্থাপন করেন।

(৬) ইনি এখন পন্নিবংশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে অপক্ষপাত ব্যবহার এবং বিবিধ সৎকার্য্যের জন্য ইনি দেশ-প্রসিদ্ধ। ইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও খিলাফত কমিটীর অন্যতম সহকারী সভাপতি ও জাতীয় দলভুক্ত অন্যতম জননায়ক।

ওয়াজেদ আলি খান পান্নি।

ওয়াজেদ আলি খান পন্নি।

মঙ্গলাপোতার রাজবংশ

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত "বগড়ী" অতি প্রাচীন জনপদ। এই স্থানের পৌরাণিক নাম "বক দ্বীপ"। মহাভারতে লিখিত মহাবল নিশাচর "বক" এই বকদ্বীপের অধীশ্বর ছিল এবং তাহার নামানুসারে ইহার নাম বক দ্বীপ হইয়াছিল, পরে এ স্থান বকৃড্ডিহী ও তদনন্তর বগড়ী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অমিত বিক্রমশালী ভীমকায় বৃকোদর যে স্থানে বক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডবগণ যে একচক্রা নগরে বাস করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন তাহা এই বগড়ীর অন্তর্ভূক্ত। এক্ষণে একচক্রা নগরকে "একাড়্যা" আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। এখনও পর্য্যন্ত বক রাক্ষসের অস্থিচূর্ণ ঐ স্থানে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। বগড়ীতে বিখ্যাত তিনটী দেবকার্ত্তি বিদ্যমান আছে। একটি বগড়ীর পূর্ব্বতন রাজধানী গড়বেতা গ্রামে শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবী, দ্বিতীয়টী বগড়ী কৃষ্ণনগর গ্রামে বিরাজিত প্রভু শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণ রায় জীউ, তৃতীয়টী বগড়ীর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত শ্রীশ্রী৺অলকা দেবীর। গড়বেতায় বিরাজিতা সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির উত্তরমুখী। এ সম্বন্ধে মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হ্যারিসন সাহেব তদীয় আর্কিলজিকাল রিপোর্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"সর্ব্ব মঙ্গলার মন্দির অতি প্রাচীন ও বিস্তৃত। কে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন তাহা জানা যায় না। জনশ্রুতি এইরূপ যে, উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্য তাল ও বেতাল নামক দৈত্য দুইটীকে লাভ করিবার জন্য এই মন্দিরে দেবীর আরাধনা করিতে আসেন। দেবী তাঁহার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া বলেন যে, তাল

বেতাল দৈত্য তোমার আজ্ঞাবহ হইবে এবং তুমি যখনই যাহা অভিপ্রায় করিবে তখনই তাহা সিদ্ধ হইবে।" দেবীর কথা সত্য হয় কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা বলিলেন তবে দক্ষিণাভিমুখী মন্দির উত্তরাভিমুখী হৌক, ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই মন্দির উত্তরাভিমুখী হইল। এই স্থানকে এখনও বেতালের নামানুসারে "বেতা" বলে।

বগড়ীর পূর্ব্বতন রাজধানী গড়বেতা। গড়বেতার ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গ দর্শন করিলে এখানকার প্রাচীন রাজন্যগণের লুপ্ত সম্পদ ও প্রনষ্ট গৌরবের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। যেখানে এক সময়ে দুর্গ তোরণ সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল, সেখানে এখনও লাল দরোজা, হনুমান দরোজা, পেশা দরোজা ও রত্ন দরোজার ক্ষীণ চিহ্ন রহিয়াছে। এক সময়ে যেখানে অম্বরচুম্বী-শ্বেত মর্ম্মর খচিত প্রাসাদ সমুন্নত শিরে দণ্ডায়মান ছিল, এখন সেই রায়কোটে কেবল স্তূপীকৃত কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চোহান নামক জনৈক শক্তিশালী রাজপুত বগড়ীর তদানীন্তন রাজাকে পরাস্ত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার নাম চোহান কি না অথবা তিনি চোহান বংশীয় অন্য কোন নামধারী ব্যক্তি কি না তাহা সবিশেষ জানা যায় না। তিনি সমরে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক রাজাদের মধ্যে তিনি রণকুশল যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তি সামর্থ্য দর্শনে বগড়ীর নিকটবর্ত্তী মাল্লোভূম রাজ (বিষ্ণুপুর) ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। চোহান পরম শাক্ত ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় দেবী সর্ব্বমঙ্গলার উপাসনায় অতিবাহিত করিতেন। চোহান একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য ও চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট বিস্তার

চোহান রাজ
১৫৫৫—১৬১০

করিয়াছিলেন। দীর্ঘ ৫৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া চোহান মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আউচ্ সিং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। আউচ সিংহ বড়ই দুর্ব্বলচেতা ও অক্ষম রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের পরিচালনা ভার সচিবর্গের হস্তে অর্পণ করিয়া নিজে বিলাসিতা ও আমোদপ্রমোদে রত হইয়াছিলেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর চন্দ্রকোনার ক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তা, চোহানের অন্যতম বংশধর চত্তর সিংহ গড়বেতার রাজা হন। তিনি ২৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন এবং তাঁহার পুত্র তালুক চন্দ্র সিংহ তাঁহার রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তালুক চন্দ্র ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন, ইহা ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নাই। তালুকচন্দ্রের উত্তরাধিকারী তেজচন্দ্র অতি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী হইলেও, বড়ই জাঁকজমক প্রিয় ছিলেন। তিনি রায়কোটে একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া একটি কামান প্রস্তুতের কারখানাও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং পুরাতন দুর্গের সংস্কার করিয়াছিলেন ও সৈন্যদলের সংখ্যা বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর হওয়ায় এবং সেই বয়স পর্য্যন্ত কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তেজচন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া যাগ যজ্ঞে সারাদিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দেবীর অনুগ্রহে রাণীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। রাজা তেজচন্দ্র বগড়ীর শাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া ভাবী পুত্র-মুখ নিরীক্ষণের আশায়

আউচ্ সিংহ
১৬১০—১৬২০

চত্তর সিংহ
১৬২০—১৬৪৩

তালুক চন্দ্র সিংহ
১৬৪৩—১৬৭৬

তেজচন্দ্র সিংহ
১৬৬৭—১৬৯৭

অহোরাত্র কেবল দেবীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। মাল্লোভূমের রাজা তেজচন্দ্রের স্বরাজ্য পরিচালনায় শৈথিল্য দর্শনে বগ্‌ড়ী জয় করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বিপক্ষ দলের সৈন্যগণ যখন অতর্কিতে আসিয়া তেজচন্দ্রের দুর্গ তোরণে উপস্থিত হইল, তখন রাজা তেজচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া রাণীকে ও শিশু পুত্রকে গুপ্ত দ্বার দিয়া তদীয় বন্ধু ময়ুরভঞ্জ রাজার বাটীতে প্রেরণ করিলেন এবং নিজেও ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন। তদবধি তেজচন্দ্রের সম্বন্ধে আব কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

দুর্জ্জন সিংহ
১৬৯৭—১৭১০

খেয়ার মাল্লো
১৭১০—১৭২০

বগডী মাল্লোরাজেব্ করতল গত হইল। মাল্লোরাজেব পুত্র দুর্জ্জন সিংহ বগ্‌ডীর রাজা হইলেন। তাঁহার পব খেয়ার মাল্লো রাজা হন। খেয়ার অতি নৃশংস, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন।

তেজচন্দ্রের স্ত্রী ময়ুরভঞ্জে উপস্থিত হইয়া তথায় সামান্য পরিচাবিকা-রূপে রাজ অন্তঃপুরে অবস্থান কবিতে থাকেন। তাঁহাব অসামান্য সৌন্দর্য্য, নম্রতা, সলজ্জতা প্রভৃতি দর্শনে রাজা তাঁহাকে অচিরাৎ তাঁহার বন্ধু পত্নী বলিয়া চিনিতে পারেন। রাজা তাঁহার বন্ধু পুত্রকে অশেষ যত্নে বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি তাঁহাকে "সমশের সিংহ" নামে নাম কবণ করেন এবং বহু সংখ্যক সৈন্য দিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারেব জন্য সম্‌শেরকে প্রেবণ করেন। সমশের অপূর্ব্ব বীর দর্পে গড়বেতায় পৌছিয়া তদানীন্তন দুর্গাধিকারী খেয়ারী মাল্লোকে হত্যা করিযা পিতৃ-দুর্গ অধিকার করেন। সমশের গড়বেতার পূর্ব্বদিকে মঙ্গলাপোতা নামক স্থানে একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এইখানে তাঁহার বংশধরগণ আজিও বাস করিতেছেন।

সমশের সিংহ
১৭২০—১৭৪৪

সুখে ও শান্তিতে ২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিবার পর সমশের পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। রাজা

সমশের সিংহ বাহাদুর বগড়ীর একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বিভিন্ন স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন এবং রাজোচিত আরও অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজা সমশের সিংহের পর তদীয় পুত্র রাজা বৈষ্ণব চরণ সিংহ বগড়ীর রাজা হন।

১৭৪৪—১৭৬০

বৈষ্ণব চরণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা যাদব চন্দ্র সিংহ বগড়ীর উত্তরাধিকারী হন। কিছুকাল শান্তির সহিত রাজত্ব করিবার পর ইংরেজ সরকার তাঁহার নিকট হইতে কর চাহিয়া পাঠান, যাদব চন্দ্র তাহা দিতে স্বীকৃত হন।

১৭৬০—১৭৭৯

যাদব চন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজা ছত্র সিংহ বগড়ীর রাজা হন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় বিনা আপত্তিতে ইংরেজ সরকারকে বার্ষিক কর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতি বৎসর নিয়মিত কর দিতে না পারায় ইংরেজ সরকার তাঁহাকে বেহালা নামক বার্ষিক ছয় সহস্র টাকা আয়ের একটি মৌজা প্রদান করেন এবং বগড়ীর স্বত্ব অন্য একজনকে প্রদান করেন। ইহাতে ছত্র সিংহের বিশেষ ক্ষতি হয়। তাঁহার সময়ে বগড়ীতে নায়েক নামক একজাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। নায়েকেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। এই বিদ্রোহের পরিচালক বলিয়া ছত্র সিংহকে সন্দেহ হওয়ায় তাঁহাকে বন্দী করিয়া হুগলীতে আনা হয়। তথায় তিনি দশ বৎসর কাল বন্দীভাবে অবস্থান করেন। ইত্যবসরে ইংরেজ সরকার নায়েক বিদ্রোহে ছত্রসিংহের কোন সম্বন্ধ দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে বার্ষিক ছয় সহস্র টাকা বৃত্তি দিবেন অঙ্গীকার করিয়া মুক্তি প্রদান করেন।

১৭৭৯—১৮২৫

রাজা ছত্র সিংহের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। তাঁহার দৌহিত্র মনোমোহন সিংহকে তিনি তাঁহার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি উইল দ্বারা প্রদান করিয়া যান। মনোমোহন ইংরাজ সরকার হইতে মাসিক ২৫০৲টাকা বৃত্তি পাইতেন এবং তদ্দারা মাতামহ প্রচলিত দুর্গা পূজা, রাস যাত্রা প্রভৃতি সমাধা করিতেন এবং তিনিই নায়েক বিদ্রোহী দিগকে দমন করিতে ইংরাজ সরকারকে সাহায্য করায় তাঁহার মাতামহ ছত্র সিংহ মুক্ত হন। মনোমোহনের তিন পুত্র যথা—জগজ্জীবন সিংহ, মিত্রজয় সিংহ এবং জগত্তারণ সিংহ। ৺জগজ্জীবন সিংহের পুত্র শ্রীযুক্ত রণ কেশরী রামচন্দ্র সিংহই এখন এই বংশের একমাত্র বংশধর। ৺জগজ্জীবন সরকার হইতে মাসিক ১২৫৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে এই বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে; ইঁহারা জাতিতে ছত্রী রাজপুত। নিম্নে এই বংশের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল:—

১৮২৫—১৮৭৩

(১) রাজা সমশের সিংহ

|

(২) রাজা বৈষ্ণব চরণ সিংহ

|

(৩) রাজা যাদব চন্দ্র সিংহ

|

(৪) রাজা ছত্র সিংহ

|

(৫ (দৌহিত্র) ৺মনমোহন সিংহ

|

(৬) ৺জগজ্জীবন সিংহ

৺জগজ্জীবন সিংহ

|

শ্রীযুক্ত রণ কেশরী রাম চন্দ্র সিংহ।

রণ কেশরী রামচন্দ্র বাঙ্গালা ১২৯৪ সালে, ২৩ ফাল্গুন মঙ্গলাপোতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। ইহার দুইটি কন্যা।

রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর

রায় বাহাদুর শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের নাম বাঙ্গালার ব্যবসায়ী সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। ইহার পিতামহ স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুলতানপুরের স্বর্গীয় কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। ক্ষেত্রনাথের পিতার নাম রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার আদি নিবাস যশোহর জেলার প্রতাপকাঠী গ্রাম।

ক্ষেত্রনাথের পুত্র রামচন্দ্র। ইনিই অবিনাশচন্দ্রের জনক। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূম জেলার নাক্রাকোন্দা গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম বরদাসুন্দরী দেবী। ইনিই অবিনাশচন্দ্রের মাতা।

নাক্রাকোন্দা গ্রাম অবিনাশচন্দ্রের জন্মভূমি। যখন তাঁহার পাঁচ মাস বয়স, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। নাক্রাকোন্দার বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অবিনাশচন্দ্রের প্রথম শিক্ষা হইয়াছিল। এখান হইতে ১১ বৎসর বয়সে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি শিয়ারশোলের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেই সময়ে তাঁহার মেসো মহাশয় স্বর্গীয় যাদব বাবু রাণীগঞ্জে কার্য্য করিতেন। অবিনাশচন্দ্র রাণীগঞ্জে আসিয়া তাঁহার মেসো মহাশয়ের বাসায় রহিলেন। বাসা হইতে স্কুল প্রায় দেড় ক্রোশ। এই পথ বাহিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ স্কুলে যাতায়াত করিতে হইত। এই শিয়ারশোল স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া
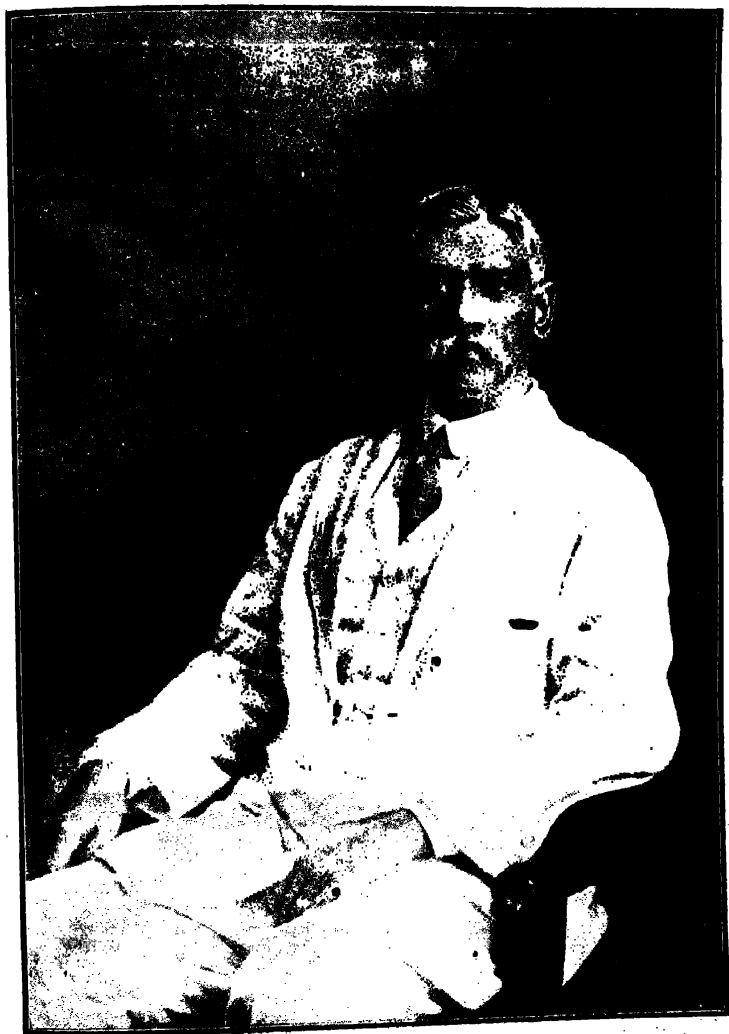
রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর।

এলাহাবাদে গমন করেন। সেখানে তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুত অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ওকালতি করিতেন। তাঁহারই বাসায় অবিনাশচন্দ্র অবস্থান করিতে থাকেন এবং এইখানে থাকিতেই তিনি এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার ছাত্রজীবন শেষ করিয়াছিলেন।

অবিনাশচন্দ্র কৃতী ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। তাঁহার মাতা অলঙ্কার পত্র বিক্রয় করিয়া এবং ঋণ করিয়া তাঁহার লেখাপড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্যর চার্লস ইলিয়ট বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ৩৫৲ টাকা। এই বৃত্তি পাইয়া তাঁহার অবস্থা কতকটা স্বচ্ছল হয়।

'বীরভূম বিবরণে'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'লাভপুর কাহিনী'তে তাঁহার যে জীবনকাহিণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"সুলতানপুরে অবিনাশচন্দ্রের সম্পত্তির মধ্যে ১১৷৵০ বিঘা মাত্র মালের জমি ছিল। সে সম্পত্তিও আবার সুলতানপুরের 'গয়ামণি মোড়লানী' তাঁহার পিতাকে যজ্ঞোপবীতের সময়ে ভিক্ষা দান করিয়াছিলেন। নাক্রাকোন্দা তাঁহার মাতা, আপনার ভ্রাতার নিকট হইতে থাকিবার জন্য একখানি বাড়ী ও পাঁচ বিঘা মাত্র জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং অবিনাশচন্দ্রের জননী আপনার অলঙ্কারাদি বিক্রয় পূর্ব্বক শেষে ঋণ করিয়া সংসারের ও তাঁহার পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। অবিনাশচন্দ্র সে সংবাদ জানিতেন, এবং সেজন্য অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। ভগবৎ কৃপায় এলাহাবাদে একটা সুবিধা হইয়া গেল, বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ৩৫৲ হিসাবে স্যার চার্লস ইলিয়ট স্কলারসিপ প্রাপ্ত হইলেন।

বি, এ ক্লাসে তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন—শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি ধনী সন্তান। দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ণচন্দ্র বি, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। গণিতে অনভিজ্ঞতাই এই অকৃতকার্য্যতার কারণ। পূর্ণচন্দ্র জানিতেন অবিনাশচন্দ্র গণিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, সুতরাং তিনি অবিনাশচন্দ্রের নিকট প্রাইভেট্ পড়িতে আরম্ভ করেন এবং সেজন্য তাঁহাকে মাসিক ত্রিশ টাকা হিসাবে বেতন দেন। ইহার পর অহিফেন বিভাগের কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছুটি লইয়া আসিয়া অবিনাশচন্দ্রের নিকট সায়ান্স অধ্যয়ন করেন, তিনিও মাসিক ৩৫৲ টাকা করিয়া দিতেন। এই সমস্ত টাকা জমাইয়া অবিনাশচন্দ্র প্রথম, মায়ের কৃত ঋণগুলি পরিশোধ করিয়া দেন। পরে অবশিষ্ট টাকা হইতে ৫৩৩ নং লাট সুলতানপুরের কিয়দংশ খরিদ করেন। এই অংশে খাসে অনেক জমি পুকুর বাগান প্রভৃতি ছিল, অপিচ ইহার মুনাফা একশত টাকা ছিল। বাল্যকালে সুলতানপুর তিনি দেখেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তাঁহার পিতার মাসীমাতা কল্যাণী ঠাকুরাণী পরলোক গমন করিলে, ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে সুলতানপুরে আসিতে হয়। সেই সময়েই কি জানি কেন সুলতানপুরের প্রতি তাঁহার মমতা জন্মে। সুলতানপুরে সম্পত্তি খরিদের ইহাই সর্ব্বপ্রধান কারণ। এম, এ, পাশ করিয়া তিনি আগ্রা কলেজের প্রফেসার নিযুক্ত হন। বলিতে ভুলিয়াছি তিনি যখন এন্ট্রান্স স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়িতেন সেই সময়েই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। লাভপুরের ৺ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার সহিত অবিনাশ চন্দ্রের বিবাহ হয়। স্বর্গীয় যাদব বাবুর অনুরোধে ইং ১৯০১ সালের ১১ই আগষ্ট তিনি প্রফেসারের কার্য্য ত্যাগ করেন। ইং ১৯০১ সালের মে মাসে ২৫০৲ টাকা এলাউয়েন্স লইয়া যাদব বাবুদের নায়েক

ব্যানার্জ্জী কোম্পানীর এজেণ্ট হইয়া তাহাকে পশ্চিমে যাইতে হয়, দিল্লী তাঁহার প্রধান কর্ম্মস্থান ছিল।

১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৬ সালে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতায় উঠিয়া আসে, এখানে তিনি ৪৫০৲ টাকা করিয়া মাসিক এলাউয়েন্স্ পাইতেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় এই কার্য্যে তাঁহার প্রাপ্য কমিশনের হার ছিল শতকরা দুই আনা হিসাবে। এই সময় মাসে মাসে তিনি প্রায় দুই হাজার টাকা পাইতেন। আগ্রায় তাঁহার বেতন ছিল মাত্র মাসিক একশত টাকা। ইং ১৯১০ সালে লায়েক ব্যানার্জ্জী কোংর ফারম উঠিয়া যায়। ১৯১১ সাল হইতে অবিনাশ বাবু কলিকাতায় দালালী কার্য্য আরম্ভ করেন। জিনাগড়া, নিচিৎপুর, টিস্‌রা, সোণাবড়ি, প্রভৃতির কলিয়ারীর কয়লা খরিদ বিক্রয় কার্য্যে কলিকাতার তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। এখন অবিনাশ বাবু প্রায় হাজার বিঘা আন্দাজ চাষের জমি এবং দুই হাজার টাকা লাভের জমিদারী করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা সুলতানপুরের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় ও দাতব্য-চিকিৎসালয়ের দ্বারা সুলতানপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহার চাষের উন্নতি দেখিয়া স্থানীয় চাষীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। চাষের সুবিধার জন্য অবিনাশ বাবু বঙ্ক বিনোদ রায়ের প্রতিষ্ঠিত "সায়র" নামক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা প্রায় আড়াই হাজার টাকা ব্যয়ে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। গ্রামে এমন দেবমন্দির নাই, যাহা তিনি সংস্কার করিয়া দেন নাই, দুই একটি নূতন করিয়াও নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। শুনিতে পাই, তিনি যখন নিজ বাস ভবনের জন্য অট্টালিকা প্রস্তুত করাইবার সংকল্প করেন, তখন তাঁহার জননী

দেবীই তাঁহাকে দেব মন্দির সংস্কার কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। জননী স্বর্গীয়া বরদাসুন্দরী দেবী অগ্রে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তবে বাসগৃহ নির্ম্মাণে হস্তার্পণ করিতে দিয়াছিলেন। গত ১৩১৪ সালের ২৬শে কার্ত্তিক এই পুণ্যবতী রমণী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মায়ের দেওয়া শিক্ষাই অবিনাশ বাবুকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে।

ইং ১৯১৭ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোল কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবিনাশ বাবুই তাঁহার একমাত্র বাঙ্গালী মেম্বর ছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বিভাগের মেম্বর অনারেবল স্যার জর্জ্জ বার্ণেস তাঁহার কার্য্য দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টেব নিকট প্রশংসা করিয়া এক রিপোর্ট দেন। তাহারই ফলে গত ১৯১৮ সালের ১লা জানুয়ারী অবিনাশ বাবুকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে অবিনাশ বাবুর অকৃত্রিম অনুরাগ। পুরাতন 'বীরভূমি' (কীর্ণাহার হইতে প্রকাশিত) মাসিক পত্রিকায় তাঁহার দুই একটি প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়। তাহার পরে আর তাঁহার কোন লেখা দেখি নাই বটে, কিন্তু বহু ব্যাপারে তাঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাইয়াছি। তিনি সুসংস্কৃত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়া দশের ও দেশের উপকার করিতেছেন। অবিনাশ বাবু ভারতীয় খনি সম্মেলনের (Indian mining federation) সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার

স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার।

স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার জাতিতে সম্মৌলিক কায়স্থ ছিলেন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া যে বংশকে গৌরবান্বিত করেন সে বংশের আদি নিবাস ছিল প্রথমে কৃষ্ণনগরে, পরে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী তড়াগ্রামে। নিকটস্থ আঁটপুর গ্রাম অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া তড়াগ্রাম "তড়া আঁটপুর" নামে পরিচিত। প্যারিচরণের পূর্ব্বপুরুষ বীরেশ্বর দাস খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে তড়ায় শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করেন। বীরেশ্বর স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি নবাব সরকারের তহশীলদার ছিলেন এবং তাঁহার শুভঙ্করী বিদ্যায় ও জমিদারী সংক্রান্ত অভিজ্ঞতায় প্রীত হইয়া তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব তাঁহাকে "সরকার" উপাধিদানে সম্মানিত করেন। বীরেশ্বরের পৌত্র শিবরাম পুরুষানুক্রমিক পল্লীবাস পরিত্যাগ করিয়া জীবন সায়াহ্নে ৬৯ বর্ষ বয়সের সময় খ্রীষ্টীয় ১৭৯১ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। শিবরাম চোরবাগানে যে ভদ্রাসন বাটী সংস্থাপন করেন উহা প্রায় দেড়বিঘা ভূমি ব্যাপৃত ছিল। এখনও মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে ঐ পুরাতন ভবনের অস্তিত্ব আছে; এক্ষণে উহা বিভক্ত হইয়া "জোড়াদরজা" বাটী নামে অভিহিত। বিধাতা শিবরামের ভাগ্যে ছয় বর্ষ মাত্র নব-ভবন বাস লিখিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ১৭৯৭ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণীচরণের বয়ঃক্রম তখন একাদশ বর্ষ এবং কনিষ্ঠ ভৈরবচন্দ্র অষ্টম বর্ষীয় বালকমাত্র। ভৈরব চন্দ্র বাল্যকালে মাতামহ আঁটপুরের দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের আলয়ে প্রতিপালিত হন।

তারিণীচরণ ও ভৈরবচন্দ্র সামান্যরূপ ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং উভয় ভ্রাতাই এই রাজধানীর প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা থ্যাকার কোম্পানীর আপিসে শিক্ষানবিস নিযুক্ত হন এবং সত্বর কার্য্য তৎপরতা ও সততাগুণে কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিশ্বাস ও স্নেহভাজন হন। অল্পকাল মধ্যে তারিণীচরণ ঐ আপিসের বেনিয়ান পদ প্রাপ্ত হন এবং কনিষ্ঠের সহযোগীতায় থ্যাকার কোম্পানীর ব্যবসার প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। অগ্রজের সহকারী কার্য্য ব্যতীত ভৈরবচন্দ্রের অর্থাগমের আর একটী উপায় ছিল। ভৈরবচন্দ্র জাহাজের রসদ সরবরাহ করিতেন। উভয় ভ্রাতাই ধার্ম্মিক ও দয়ালু ছিলেন। কন্তু ভৈরবচন্দ্রের সরলতা এবং দান প্রবৃত্তি কিছু অনন্যসাধারণ ছিল। ভৈরবচন্দ্র জাহাজের যে আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতেন, উহা বিত্তবান সাহেবদিগকে যথোচিত লাভে বিক্রয় করিয়া লভ্যাংশ দীন দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতেন। ভৈরবচন্দ্র পূজা পার্ব্বনের কোনটী বাদ দিতেন না এবং ঐ সকল ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে উৎকৃষ্ট ভোজন দান, তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন সমস্তই ধর্ম্মার্থে ও পরার্থে ব্যয় করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। চোর বাগানের সুপ্রসিদ্ধ গোকুলচন্দ্র বসুর তৃতীয় পুত্র ভৈরবচন্দ্র বসুর একমাত্র দুহিতা ও তদীয় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী দ্রবময়ীর সহিত ভৈরবচন্দ্রের শুভ পরিণয় সংঘটন হয়। ভৈরবচন্দ্র পত্নীসুখে পরম সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর রূপ ও গুণের অবধি ছিল না। তিনি আদর্শ গৃহিণী ছিলেন এবং সাংসারিক অনেক চিন্তা ও কর্ত্তব্যভার হইতে স্বামীকে নিষ্কৃতি দিয়া সেগুলি নিজেই বহন করিয়াছিলেন। ভৈরবচন্দ্র খ্রীঃ ১৮৩৮ সালে ৪৯ বৎসর বয়সের সময় চারিটী পুত্র, তিন কন্যা, শোকাতুরা
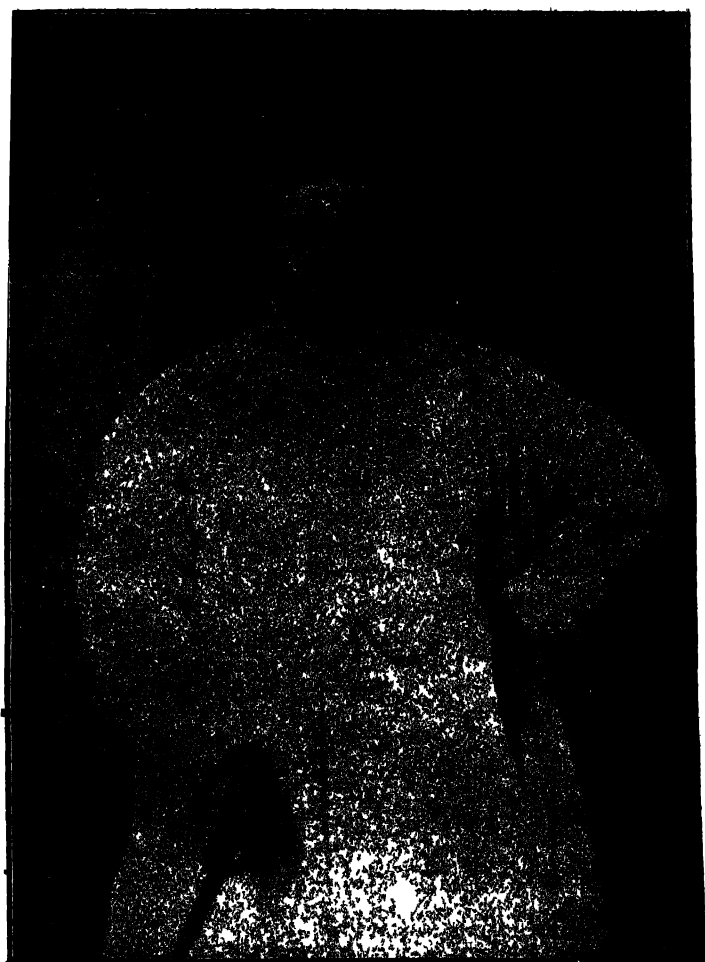
স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ সরকার

পত্নী এবং শতবর্ষাধিক বর্ষীয়সী জননীকে রাখিয়া মর্ত্তলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং তারিণীচরণও তিনটী পুত্র রাখিয়া অমরধামে অনুজের অনুগমন করেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের গর্ভধারিণী ধনমণি প্রায় দশ বর্ষ পরে ১১৫ বৎসর বয়সে ৺কাশী লাভ করেন।

প্যারীচরণ ভৈরবচন্দ্র সরকারের তৃতীয় পুত্র। তিনি বঙ্গীয় ১২৯০ সালের ২৮শে মাঘ, ইং ১৮২৩ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী, কলিকাতায় মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। চোরবাগানে যে বাটী উত্তরকালে প্যারীচরণ সরকারের বাটী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল এবং এক্ষণে যাহা ডাক্তার ভুবনমোহন সরকারের বাটী বলিয়া পরিচিত সেই বাটীতেই প্যারীচরণ ভূমিষ্ঠ হয়েন। ঐ বাটী প্যারীচরণের পৈতৃক ভবনের সন্নিকটেই অবস্থিত এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, প্যারীচরণের প্রসূতি, প্রসবকালে নিজ জননীর স্নেহ-দৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য, আসন্ন প্রসবা অবস্থায় স্বামী সদন হইতে অতি নিকটবর্ত্তী পিতৃ-ভবনে আগমন করেন। আসিয়া দেখেন তাঁহার মাতা তৎকালে কালীঘাটে দেবীদর্শনে গিয়াছেন এবং বাটীতে অপর কেহ নাই। সেইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় মাতামহী বা ধাত্রীর আগমনের পূর্ব্বেই প্যারীচরণ নিরাপদে ইহলোক দর্শন করেন।

প্যারিচরণ* প্রথমে কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। এই পাঠশালা তখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ দেবী সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের নিকট অবস্থিত ছিল। একাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি এই স্কুলেই শিক্ষা লাভ করেন এবং ঐ বয়সেই ঢাকায় জ্যেষ্ঠ সহোদর পার্ব্বতী চরণের নিকট যান। তথায় এক বৎসর থাকিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া তিন বৎসর কাল তিনি হেয়ার স্কুলে পাঠ করেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ হেয়ার

* নবকৃষ্ণ ঘোষের "প্যারিচরণ সরকার" হইতে গৃহীত।

স্কুলে জুনিয়ার স্কলার শিপ পরীক্ষায় পাশ হন এবং মাসিক আট টাকা বৃত্তি লাভ করেন। জুনিয়ার স্কলার শিপ পাশ করিবার পর তিনি হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি একজন প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং নানারূপ বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমাগত তিন বৎসব কাল তিনি তদানীন্তন সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চল্লিশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা হেতু তিনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর প্যারি-চরণ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকেব কর্ম্ম গ্রহণ কবেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তিনি চব্বিশ পরগণার বারাসত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট প্যাবীচরণ কলিকাতা হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। নয় বৎসর কাল তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন; এই সময়ে তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত নানারূপ সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। প্যারীচরণই আধুনিক হিন্দু হোষ্টেলের স্থাপয়িতা। সুরাপাণ নিবারণ কল্পে প্যারীচরণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি Well wisher ও হিতসাধক নামক দুই খানি কাগজ প্রকাশ করেন। প্যারীচরণ কৃষি, শিল্প ও বালিকা শিক্ষারও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং বারাসতে অবস্থানকালে এতদুদ্দেশ্যে কৃষিবিদ্যালয়, শ্রমজীবি বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ সরকারী পত্র Education gazette এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইহার পারিশ্রমিক স্বরূপ তিনি সরকারের নিকট হইতে মাসিক ৩০০৲ শত টাকা বেতন পাইতেন।
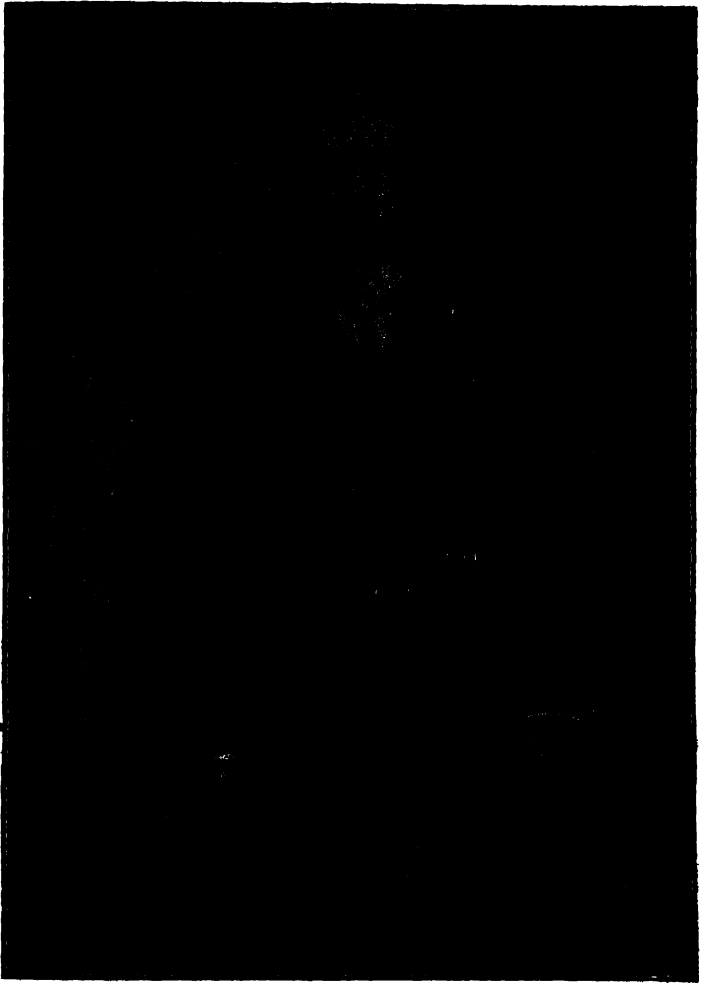
শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি বহুমূত্র জনিত বিস্ফোটক রোগে পরলোক গমন করেন। প্যারীচরণের First book of reading, Second book of reading না পড়িয়াছেন ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ লোকের মধ্যে এমন লোক বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভৈরবচন্দ্রের চারিটী পুত্র। প্রথম পার্ব্বতীচরণ, দ্বিতীয় প্রসন্নকুমার, তৃতীয় প্যারীচরণ এবং চতুর্থ রামচন্দ্র। পার্ব্বতীচরণের দুই পুত্র ছিল ৺গোপাল চন্দ্র ও ৺ভুবনমোহন। গোপালচন্দ্র ভাগলপুরের বিখ্যাত উকিল ছিলেন এবং রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ভুবনমোহন ডাক্তার ছিলেন। উভয়েই প্যারীচরণের যত্নে পালিত ও শিক্ষিত; কারণ তাঁহাদের পিতা পার্ব্বতীচরণের মৃত্যুর সময় তাঁহাদের বয়স অতি অল্প ছিল। গোপালচন্দ্রের এক পুত্র এখন বর্ত্তমান—হেমন্ত-কুমার ইনি হাইকোর্টের উকিল ও জমিদার। ভুবনমোহনের দুই পুত্র এখন বর্ত্তমান।

প্যারীচরণের ছয় পুত্রের মধ্যে এখন দুইটী বর্ত্তমান। প্রথম পুত্র মহেন্দ্রনাথ বাল্যকালেই ইহধাম ত্যাগ করে। দ্বিতীয় পুত্র ৺যোগেন্দ্রনাথ মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। তৃতীয় পুত্র ৺নগেন্দ্রনাথ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্রই রত্ন। প্রথম নৃপেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার, (মিঃ এন্ সরকার) দ্বিতীয় জিতেন্দ্রনাথ, কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট নৃপেন্দ্রনাথ এলগিন্ রোডে প্রাসাদ তুল্য বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে-ছেন। নৃপেন্দ্রের পুত্রগুলিও বেশ—জ্যেষ্ঠ রমেন্দ্র বি, এস্ সি, পাশ করিয়া বিলাতে ব্যারিষ্টার হইতে গিয়াছেন। ইনি অনারেবল স্যর বি, সি,

মিত্রের জামাতা। নৃপেন্দ্র নাথের দ্বিতীয় পুত্র বীরেন্দ্র বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারী শিক্ষা করিতে গিয়াছেন। অন্যান্য পুত্রগুলি নরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, রবীন্দ্র এখন পড়িতেছে ও অপর তিন ভ্রাতা শিশু।

প্যারীচরণের চতুর্থ পুত্র ৺মুণীন্দ্রনাথ, এম্ এ, বি এল্ ও বিলাসপুরের উকিল ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র এখন বর্ত্তমান—শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ—ইনিও এম্ এ, বি এল, কলিকাতায় ওকালতি করিতেছেন।

প্যারীচরণের পঞ্চম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ এখন পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছেন, ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বি এ পাশ করিয়া "ল" পড়িতেছেন।

প্যারীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ। ইনি এম্ এ, কলিকাতা সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউসনের স্বত্বাধিকারী ও হেডমাষ্টার। ইঁহার একটীমাত্র পুত্র, সেটি এখন স্কুলে পড়িতেছে। প্যারীচরণের বংশের সকলেই সুশিক্ষিত।

———

মাদলার জমিদার সরকার বংশ।

বংশ-তালিকা।

ইঁহারা আলম্যান গোত্র, দেবঘর, শিখিধ্বজ দেবের বংশ।

কাণসোণার দেব।

৺কৃষ্ণদাস চৌধুরী
|
৺লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী — নবাবী আমলে ইঁহারা রাজকান্দায় প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন
|
৺ রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী — ইনি মাদলায় আইসেন।
|
৺যুগলকিশোর চৌধুরী
|
৺গৌরী প্রসাদ সরকার — ইনি চৌধুরীর পরিবর্ত্তে সরকার উপাধি গ্রহণ করেন এবং এ অঞ্চলে কিছু ভূসম্পত্তি করেন।
|
৺বিশ্বনাথ সরকার, ৺গুরুপ্রসাদ সরকার

৺বিশ্বনাথ সরকার
|
৺গোবিন্দনাথ সরকার, (দত্তক) | ৺ব্রজেন্দ্র নাথ সরকার, | ৺কৃষ্ণেন্দ্রনাথ সরকার, | ৺জগদীন্দ্র নাথ সরকার, | শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার, | শ্রীদিগেন্দ্র নাথ সরকার
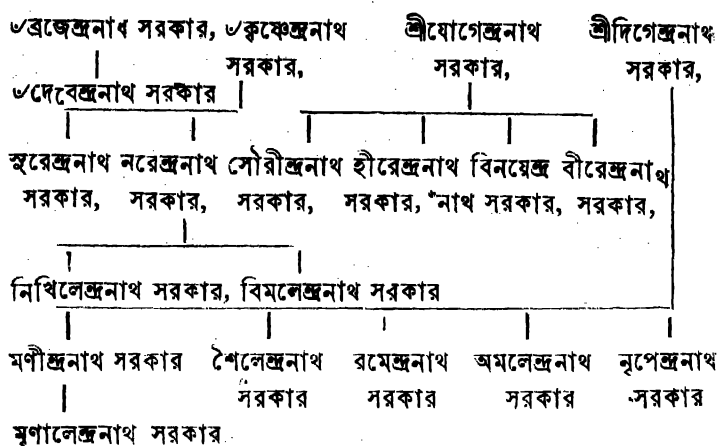
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

নবাবী আমলে ৺কৃষ্ণদাস চৌধুরী মহাশয় এবং ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়েরা রাজকান্দায় "বর্ত্তমান রাজসাহী জেলাতে প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জমিদারীর ভার অমাত্যের উপর অর্পণ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে বহির্গত হন। তখনকার দিনে লোকে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট একরূপ চিরবিদায় লইয়া যাইত। যাহা হউক লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় তীর্থ দর্শনে বাহির হইলে বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গ নবাব সরকারে রাজস্ব বাকী ফেলায় সম্পত্তি নবাব সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হয়। বহুদিবস পরে ইনি তীর্থ দর্শন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া নিজ অবস্থার কথা জ্ঞাত হন। ইঁহার পুত্র ৺রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় রাজকান্দায় নিজ সম্মান বজায় রাখিয়া চলা দুরূহ বিবেচনা করিয়া সেখান হইতে বাস উঠান এবং বগুড়া জেলাস্থিত মাদলা গ্রামে উপস্থিত হন।

মাদলা তখন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল—বহু হিন্দুর বাস এবং পুণ্যতোয়া করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া, ইনিও এখানে বাসস্থান নির্ব্বাচন করেন। ইঁহার পৌত্র ৺গৌরীপ্রসাদ সরকার মহাশয় নিজ অবস্থার সহিত চৌধুরী উপাধির অসামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া উক্ত উপাধি ত্যাগ করিয়া নবাব সরকার হইতে সরকার উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হন এবং এ অঞ্চলে কিছু সম্পত্তিও ক্রয় করেন। ইঁহার দুই পুত্র ছিল ৺বিশ্বনাথ সরকার এবং ৺গুরুপ্রসাদ সরকার। ৺গুরুপ্রসাদ সরকার অপুত্রক ছিলেন। ৺বিশ্বনাথ সরকার হইতে এ বংশের পুনরুত্থান আরম্ভ হয়। ইনি বহুসম্পত্তি অর্জ্জন করেন এবং স্বগৃহে ৺শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইনি সরকার গৃহে "বার মাসে তের পার্ব্বণের" ব্যবস্থা করেন। ইনি স্বগৃহে উন্নতি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বহু পুষ্করিণী এবং দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, বৃন্দাবন-ধামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করতঃ এবং অন্যবিধ বহু পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ইনি এ প্রদেশে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহার স্থাপিত মাদলার প্রসিদ্ধ ৺রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা প্রায় ৮০ বৎসরের অধিককাল চলিতেছে। ইঁহার মত স্বধর্ম্মরত, জ্ঞানী ভক্ত, দয়াবান এ প্রদেশে বিরল ছিল। লোকে জানিত বিশ্বনাথ দীননাথ। ইঁহার ৬ পুত্র ও ৭ কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে ১ম পুত্র গোবিন্দনাথ ও ৪র্থ জগদীন্দ্র নাথ অপুত্রক অবস্থায় গত হয়েন। দ্বিতীয় পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথ এবং তাহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণেন্দ্র নাথ, কনিষ্ঠ যোগেন্দ্রনাথ ও দীগেন্দ্রনাথের সহিত বহুকাল একান্নবর্ত্তী ছিলেন এবং সংসারের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে পোষ্ট আফিস, রেজেষ্টারী আফিস, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি ইঁহাদের গ্রামে স্থাপিত হয়। মাদলা হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত প্রশস্ত

রাস্তা ইঁহারা প্রস্তুত করেন এবং পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি বহু সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ইনি বগুড়া মিউনিসিপালিটীর বহুদিন সভ্য ছিলেন এবং বগুড়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের একজন মেম্বর ছিলেন। বগুড়া টাউনে এড্-ওয়ার্ডপার্ক ও থিয়েটার হল প্রস্তুত করার জন্য ইঁহারা বিশেষ চেষ্টা ও সাহায্য করেন এবং অনেকাংশে ইঁহাদের চেষ্টাতেই বগুড়াবাসী আজ উক্ত শান্তি-দায়ক বাগান ও থিয়েটার হলের অধিকারী হইয়াছেন। সাধারণ দান ছাড়া ইঁহাদের বিশেষ দানের সাক্ষীস্বরূপ ব্যাণ্ডষ্টাণ্ড ও হল বিদ্যমান। ইঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান, প্রথম সুরেন্দ্রনাথ এবং দ্বিতীয় নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্র নাথ বগুড়ার জয়েণ্ট সবরেজিষ্ট্রার। সুরেন্দ্রনাথের পুত্র সন্তান নাই। নরেন্দ্রনাথের দুই পুত্র বিদ্যমান।

পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কর্ম্মীপুরুষ। ইনি বগুড়ার সদর বেঞ্চে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বহু দেশহিতকর এবং স্বজাতীয় উন্নতিকর উৎসাহশীল সভার সভ্য। কৃষিসভার ইনি একজন উৎসাহশীল সভ্য এবং তুলার চাষ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তুলা উৎপন্ন করার জন্য বগুড়া প্রদর্শনী হইতে ইনি রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি হাওড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ও ডিরেক্টার; শেলবর্ষ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার, মাদলা হাই স্কুল স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ও ঐ স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। জমিদারদিগের মধ্যে ইঁহার মত উদ্যমশীল কৃষিকার্য্যের সহায়ক অল্প দৃষ্ট হয়। স্ত্রী শিক্ষার বিষয়েও ইঁহার বিশেষ যত্ন লক্ষিত হয়। ইনি গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহার ৪ পুত্র ও ২ কন্যা জীবিত। প্রথম সৌরীন্দ্রনাথ, ইনি এম, এ, বি, এল, উপাধি লইয়া আপাততঃ হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী হইয়াছেন। অন্য তিন পুত্র হীরেন্দ্রনাথ, বিনয়েন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথের এখনও পাঠ্যাবস্থা।

শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সরকার　　　　শ্রীদিগেন্দ্রনাথ সরকার

৬ষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ। ইনি ধীর, স্থির, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন পুরুষ। ইনি কর্ম্মের কোলাহল হইতে দূরে বাস করিতেই ভালবাসেন এবং জ্ঞান ও ভক্তির চর্চ্চা করিতেই সমধিক উৎসুক। একালে এরূপ নির্ব্বিরোধী লোক কদাচিৎ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্রগণের সকলেরই পাঠ্যাবস্থা।

উপসংহার।

মাদলার জমিদারদের বাৎসরিক আয় প্রায় অর্দ্ধলক্ষমুদ্রা। বগুড়া জেলার মধ্যে ইহাদের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে। গভর্ণমেণ্টের নিকটও ইহারা বিশেষ পরিচিত! ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত জে, এন, গুপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর বগুড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারে ইহাদের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য—"Madla is an important village about four miles from Bogra. It has a Middle English School (now a High School) which is maintained by the Sarkar Zaminder. Babu Krishnendra Nath Sarkar is the head of the family and is one of the most public spirited Zaminders of the District," সাধারণের হিতের জন্য ইহারা প্রচুর দান করিয়াছেন এবং কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। ইহারা এতকাল বিশেষভাবে লক্ষ্মীর আরাধনাই করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন পুত্রদিগকে উচ্চশিক্ষা দিয়া এবং স্থানীয় জনসাধারণের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই অর্চ্চনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন।

জিতপুরের সিংহ বংশ।

মুরশিদাবাদ জেলান্তঃপাতী ডুমকল আজিমগঞ্জ থানার অধীন জিত পুর গ্রামে, মহেশচন্দ্র সিংহ ও কৈলাস চন্দ্র সিংহের নিবাস স্থল। তাঁহারা বৈশ্য তাম্বুলী কুলোদ্ভব ছিলেন, কিম্বদন্তী আছে উহাঁদের চতুর্থ পুরুষ বিপ্রদাস সিংহ বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্দ্ধমান জেলার বেড়েলা গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া সুদূর মফঃস্বলে জিতপুরে আসিয়া বসতি করেন, উঁহাদের পিতা বৈদ্যনাথ সিংহের অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না, তিনি ব্যবসায় ব্যপদেশে বেহার প্রদেশে যাইয়া মিথিলা পুরী দ্বারভাঙ্গা নগরীতে বাণিজ্য কার্য্যে মনোযোগ দেন। তাহাতেই তাঁহার উন্নতির প্রথম সোপান প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার উভয় পুত্র মহেশচন্দ্র ও কৈলাশ চন্দ্র পরম সৌহার্দ্দ্যে বাস করতঃ তুল্য পরিশ্রমে পিতৃ ব্যবসায় ব্যাপৃত থাকিয়া যশের সহিত প্রভূত বিত্ত উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা দেশে ও দ্বারভাঙ্গায় বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি ক্রয় ও বৃদ্ধি করেন। মহেশচন্দ্র ও কৈলাশচন্দ্র সতত দুঃস্থ, নিরন্ন, বিপন্ন বিশেষতঃ স্বদেশস্থ ব্যাক্তিগণকে প্রয়োজনানুসারে অকাতরে অন্নদান. ও অন্যবিধ সাহায্য করিতেন। প্রকৃত সাত্বিক দানের মর্ম্মবোধে, নামের প্রয়াশী না হইয়া, অধিকাংশ সময়ে গোপনেই দান করিতেন, এবং তাহাতেই তাঁহাদের সম্যক আনন্দ হইত। দেশে স্বগ্রামেও নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে কয়েকটী পুষ্করিণী দীর্ঘিকা খনন ও তাহাতে বাঁধা ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া বহু লোকের পানীয় জলের সংস্থান সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। দ্বারভাঙ্গা নগরীতে পানীয়ের জন্য ইন্দারা, বাগবতী নদীতীরে সুদৃশ্য ও সুপরিসর প্রস্তর নির্ম্মিত বাঁধা ঘাট, এবং দেব মন্দির
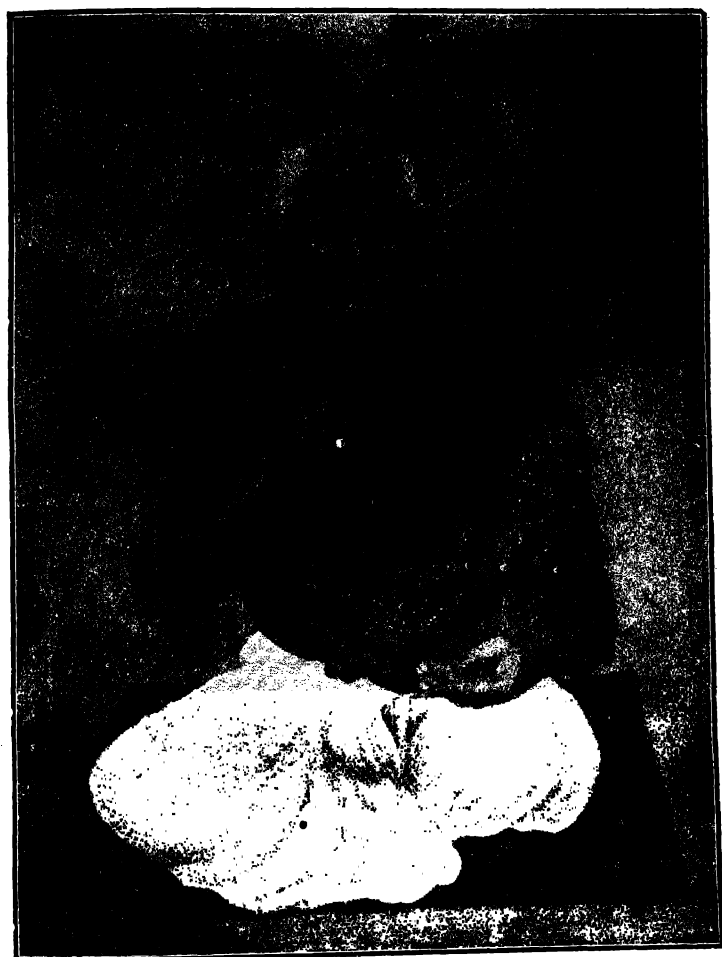
স্বর্গীয় মহেশ্চন্দ্র সিংহ

নির্ম্মাণ করাইয়া ও তাহাতে নিত্য সেবার ব্যবস্থা করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বারভাঙ্গার তদানীন্তন মহারাজা মাননীয় লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুরের সময়ে, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় গ্রহনার্থে তথায় সমাগম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের বাসস্থলীতে পদার্পণ করিতেন ও বিদায় না পাওয়া কাল অবধি অবস্থান করিতেন। এতদুপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইত, তাঁহারা তাঁহাদের অকুণ্ঠ আদর, সেবা ও ভক্তি দর্শনে বিমুগ্ধ চিত্তে সানন্দান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া গৃহে ফিরিতেন। দেশেও তদনুরূপ কার্য্য কলাপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও তাঁহাদের কীর্ত্তি ও কার্য্যকলাপ রক্ষাকল্পে সদা যত্নবান রহিয়াছেন। একবার দ্বারভাঙ্গায় দুর্ভিক্ষকালে দান শৌণ্ডতায় চমৎকৃত হইয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ মহেশচন্দ্রকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দান করিতে ইচ্ছুক হইলে মহেশচন্দ্র চিরাচরিত আচরণ ও স্বভাব গুণে রাজসিক সম্মানের প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ না হইয়া বিনীতভাবে ঐ উপাধি প্রত্যাখান করেন। সে কালে ঐরূপ সম্মান যদিচ অধিকাংশ লোকেরই লোভনীয় ছিল, মহেশচন্দ্র তাহার জন্য লালায়িত হন নাই। মহেশচন্দ্র ১২৩৪ সালের মাঘ মাসে, ও তদীয় অনুজ কৈলাস চন্দ্র ১২৩৯ সালের মাঘী শ্রীপঞ্চমীর দিন জিতপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় একান্নবর্ত্তীভাবে পরস্পরের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহন করিয়া ও অতি সাধারণভাবে হিন্দু ধর্ম্মের উন্নত আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন; তাহার দৃষ্টান্ত বিরল ও দেশের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের অনুকরণীয়। ধার্ম্মিক হৃদয়, পুত্রগত প্রাণ কৈলাস চন্দ্র, তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক তৃতীয় পুত্র রূপ-গুণোপেত উপেন্দ্র নারায়ণ, অকালে এ সংসার হইতে অপসৃত

হওয়ায়, সকল সংসার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ চরণ ধ্যানে আত্ম-নিয়োগকরতঃ মাত্র পঞ্চদশ দিবস জীবিত থাকিয়া মুরসিদাবাদ বহরমপুর নগরীতে পূণ্যতোয়া জাহ্নবী তীরে সজ্ঞানে পুত্র শোকাতুর জীবনের অবসান করেন। ১৩১০ সালের ২রা বৈশাখ তাঁহার গঙ্গালাভ হয়। তাঁহার বৃষোৎসর্গ দান সাগর শ্রাদ্ধ, জন্মভূমি জিতপুরে প্রচুর ব্যয় সহকারে সম্পাদিত হয়। এতদুপলক্ষে বিস্তর আত্মীয় স্বজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পদার্পণ হয়। কাঙ্গালীগণকে ভূরী ভোজন, বস্ত্রাদি বিতরণ ও জমিদারীর অধীন সমগ্র প্রজামণ্ডলীকে বিপুল আয়োজন সহকারে ভোজন করাইয়া পরম পরিতৃপ্ত করান হয়, অনুজের ও অনুজ পুত্রের মৃত্যু শোকে মুহ্যমান্ হৃদয়, জ্যেষ্ঠ মহেশচন্দ্র সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দ্বারভাঙ্গার বাটী ত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে গমন করেন। সেখানে কয়েক মাস অবস্থিতির পর, ঐ বৎসরের মধ্যেই, ৯ই পৌষ তারিখে তাঁহার তাপ-দগ্ধ হৃদয় ৺বিশ্বনাথ চরণে চিরশান্তি লাভ করে। তাঁহারও বৃষোৎসর্গ দান সাগর শ্রাদ্ধ, তাঁহার অনুজের অপেক্ষাও অধিক ব্যয়ে ও অধিক সমা-রোহের সহিত দ্বারভাঙ্গায় সম্পন্ন হয় এবং একই বৎসরের মধ্যে এই দুই শ্রাদ্ধ তাঁহাদের পুত্রগণ, যেরূপ বিনয়, সৌজন্য, অকুণ্ঠিত দান ও ঐকান্তিকতা সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের নিজের পূণ্যের ও পুত্রগণের পিতৃভক্তির ও উন্নত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মহেশচন্দ্র একমাত্র পুত্র রাখালচন্দ্রকে রাখিয়া যান। রাখালচন্দ্র দ্বার-ভাঙ্গার মিউনিসিপালিটীর কমিশনার, ডিষ্ট্রীক্ট ও লোক্যাল্ বোর্ডের মেম্বার। সমগ্র মিথিলা ব্যাপী তাঁহার সুযশঃ পরিব্যাপ্ত। তাঁহার তিন পুত্র, চণ্ডীচরণ, চন্দ্রশেখর, ও শশাঙ্কশেখর। কৈলাসচন্দ্র চারি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। রাজেন্দ্র নারায়ণ, যতীন্দ্র চন্দ্র, নরেন্দ্র নারায়ণ, ও দেবেন্দ্র নারায়ণ। রাজেন্দ্র নারায়ণ নানা ভাষা-

স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র সিংহ
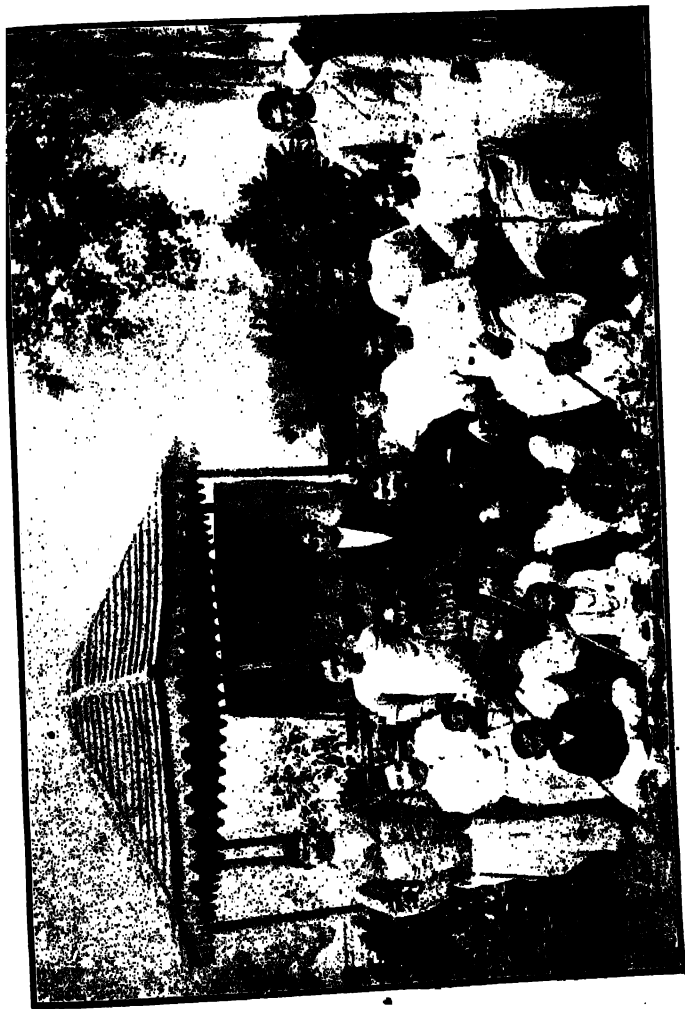
জিতপুরের জমিদার বংশীয়গণ

ভিজ্ঞ, ও সুপণ্ডিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রাদি গ্রন্থে বিশেষ অভিজ্ঞতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ৺কাশীধামের মহা মহা পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "সরস্বতী সিন্ধু" উপাধি প্রদান করেন। তিনি বর্দ্ধমানে শ্বশ্রু-সম্পত্তি, প্রাপ্ত হইয়া অধিকাংশ কাল, সেই স্থানেই যাপন করেন। রাজেন্দ্র নারায়ণের তিন পুত্র, রমেন্দ্র কুমার, সৌরেন্দ্র কুমার ও সমরেন্দ্র কুমার। যতীন্দ্র চন্দ্র দ্বারভাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপাল কমিশনার এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ও মধুবনী মহকুমার লোকাল বোর্ডের মেম্বর। তাঁহার দুই পুত্র অমরেন্দ্র কুমার, ও অনিলেন্দ্র কুমার। নরেন্দ্র নারায়ণ ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপৃত আছেন। দেবেন্দ্র নারায়ণ গত ১৩২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যোগ্যতার সহিত বি, এ, উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তিনি পৈতৃক বিষয় কর্ম্মাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন। ভ্রাতাগণের পুত্রগণ সকলেই বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। দ্বারভাঙ্গা নগরীতে ও স্বগ্রামে কেবল মাত্র এই সিংহ বংশই অন্ন দান ও নানাবিধ পরোপকারের জন্য দেশ বিদেশের লোকের নিকট প্রশংসনীয়, ও গৌরবের স্থল হইয়া রহিয়াছেন।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ১৮৮৮ সালের ২১শে জুলাই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বুন্দেল রাজপুত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলম সিংহ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুন্দেলখণ্ড হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করেন এবং তুলার ব্যবসায় করিয়া ধনবান হন। তুলার ব্যবসায় এই বংশের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল এবং ইঁহারা ইউরোপে তুলার রপ্তানী করিতেন। ইঁহাদের বিশাল জমিদারী। বঙ্গদেশের ছয়টী জেলায় ইঁহাদের জমিদারী বিস্তৃত, ইহা ছাড়া নীলের কারখানাও ইঁহাদের আছে। ইনি ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখিবার অধিকার পাইয়াছেন। সুরেন্দ্রনারায়ণ একজন প্রজারঞ্জন বলিয়া সুপরিচিত। তিনি বহরমপুর কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি আছে। ইনি ধর্ম্মপরায়ণ, রাজভক্ত এবং জনহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত। কয়েক বৎসর যাবত ইনি স্থানীয় লোকালবোর্ডের মনোনীত ও নির্ব্বাচিত সদস্যরূপে কার্য্য করিয়াছেন। গত পঞ্চদশ বৎসর যাবত ইনি আজিমগঞ্জ মিউনিসিপালিটীর কমিশনার স্বরূপে কার্য্য করিতেছেন। ইঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর অনেক শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অনেক সভাসমিতির সহিত ইনি ঘনিষ্ট সূত্রে সংবদ্ধ। ইনি অনেক দরিদ্র ও রোগাতুর ব্যক্তিদিগকে ঔষধ বিতরণ করেন। ইনি স্বব্যয়ে জিয়াগঞ্জ ও মণিহারীতে চারিটী কূপ খনন করিয়া দিয়াছেন। ইঁহার জমিদারী

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

মধ্যে কতিপয় রাস্তার নির্ম্মাণ কার্য্যে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি আজিমগঞ্জ ও মণিহারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে মাসিক অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, রামমোহন লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ প্রভৃতি বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সহায়ক ও সভ্য। তিনি লণ্ডনের রাজকীয় কৃষিসম্মিলনীর (Royal Horticultural association) সদস্য। ইঁহার নিজের বাটীতেও একটি সুন্দর উদ্যান আছে। তিনি জিয়াগঞ্জ এড্ওয়ার্ড করোনেশন ইন্‌ষ্টিটিউসনের অন্যতম উন্নতি কর্ত্তা। উক্ত স্কুলে মাসিক অর্থ সাহায্য ছাড়া তিনি সাগরদিহি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, জিয়াগঞ্জ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, জিয়াগঞ্জ প্রাথমিক পাঠশালা, মণিহারী মধ্য ইংরাজী স্কুল প্রভৃতিতেও মাসিক অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি কতিপয় ছাত্রকে আহার বাসস্থান দান করিয়া তাহাদের বিদ্যাশিক্ষায় সহায়তা করিতেছেন। তিনি যৌথ কারবারের বড়ই পক্ষপাতী; দরিদ্র কৃষক ও গ্রামবাসিগণের সহায়তা কল্পে তিনি লালবাগ কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক্ ও জিয়াগঞ্জ সহর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের সম্পাদকতা করিতেছেন। ইনি কয়েকটী যৌথ কোম্পানীর অংশীদার ও ডিরেক্টার। তিনি একজন উত্তম ক্রীড়ক ও অশ্বারোহী। তিনি জিয়াগঞ্জে একটি টেনিস্ক্লাব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বালুচর ক্রীড়া সমিতির (Sporting club) বিশেষ সহায়তাকারী। তিনি সমর-ঋণ তহবিলে মুক্তহস্তে টাকা দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উন্মুক্ত দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারেও তিনি অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি "যুদ্ধবিজয়দিনের উৎসব" বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। জিয়াগঞ্জ থানায় রাজনৈতিকবন্দীগণের তিনি বে-সরকারী পরিদর্শক ছিলেন। আজিমগঞ্জের তিনি একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্। ভারতীয় যুদ্ধ ঋণ

সম্পর্কীয় নিঃস্বার্থ কর্ম্মের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে একখানি সম্মানজ্ঞাপক সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া উক্ত যুদ্ধ-ঋণ সম্পর্কীয় কার্য্যের জন্য তিনি একটী পদকও প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১৯ সালের ২৯শে জুলাই তারিখের India Gazette এবং ঐ সালের আগষ্ট মাসের Calcutta Gazetteএ ও তাঁহার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার বিশাল পুস্তকালয় সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। তিনি সঙ্গীত প্রিয় এবং দেশীয় শিল্প কাজের উৎকর্ষ সাধনে সর্ব্বদাই সমুৎসুক। সম্প্রতি ইনি জিয়াগঞ্জ এড্‌ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউসনের সংলগ্ন ছাত্রাবাস ও কলিকাতার একটী প্রাচীন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ-কল্পে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি সুসংস্কৃত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম নির্ব্বাচিত সদস্য।

স্বর্গীয় শ্রীনাথ চন্দ্র।

কলিকাতা ঠন্‌ঠনিয়া ২২৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ফুলবাগান নিবাসী স্বনামধন্য সুবর্ণবণিককুলোদ্ভব স্বর্গীয় শ্রীনাথ চন্দ্র মহোদয়ের বাসস্থান। ইনি কলিকাতার অন্তর্গত ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে ১৮৩৭—৩৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সনাতন চন্দ্র মহাশয়ের তিন পুত্র—গোবিন্দ চন্দ্র, উদয়চাঁদ চন্দ্র ও শিব চন্দ্র। উদয়চাঁদ চন্দ্র মহাশয় অপুত্রক থাকায় এই শ্রীনাথ বাবুকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা ওরিএণ্টাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং মৃত্যুকালে যে বিনিয়োগ পত্র করিয়া যান তাহাতে তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে এককালীন পাঁচশত মুদ্রা দান করিয়াছেন। তিনি সনাতন হিন্দু বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ বংশোদ্ভব শ্রীপাঠ খড়দহ নিবাসী গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। শ্রীনাথ, সুইনহো, রমানাথ লাহা ও গিরীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়েরা যে ওকালতি আফিস চালাইতেন ঐ আফিসে আর্টিকল ক্লার্করূপে প্রবেশ করেন। ঐ আফিস হইতে উকীল হইয়া এতদূর অনুরাগ সহ কার্য্য করিতেন যে, গিরিশচন্দ্র মিত্র ও রমানাথ লাহা মহাশয়গণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করিয়া লন। গিরিশ বাবু ও রমানাথ বাবুর মৃত্যু হইলে যথাসাধ্য চেষ্টা ও অনুরাগে মাসিক বেতন ও আর্টিকেল ক্লার্ক রাখিয়া পুরাতন মক্কেলগুলির কার্য্য বজায় রাখিয়া স্বীয় অধ্যবসায়ে ওকালতি কার্য্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে কেবল যে তিনি ওরিয়েণ্টাল বিদ্যালয়েই দান করিয়াছিলেন তাহা নহে; এতদ্ব্যতীত হিন্দুবিধবা ও পিতৃমাতৃহীন

বালকবালিকাগণের ভরণপোষণ জন্য কলিকাতা ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীতে এবং সুবর্ণবণিক দরিদ্রগণকেও সুবর্ণবণিক চ্যারিটেবল এসোসিয়েসনে দিবার জন্য প্রত্যেককে পাঁচশত করিয়া মুদ্রা দিয়া যান। মেও হাঁসপাতাল, লেডি ডফরণ হাঁসপাতালেও প্রত্যেকে একশত করিয়া মুদ্রা দিয়া যান। দৈনিক দরিদ্র্য নিঃস্ব ভিখারীগণের জন্য দাল চাউল দান জন্য ব্যবস্থা করিয়া যান। শ্রীনাথ বাবু নিত্য একটী ব্রাহ্মণসন্তানকে পরিতৃপ্ত করিয়া খাওয়াইতেন। ওকালতি করিয়াও সনাতন কুল বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে কোনওরূপ বিচলিত হন নাই। তিনি ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে ১১ই জুন তারিখে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র গোপীনাথ চন্দ্র মহাশয়কে হাতে ধরিয়া ওকালতি কর্ম্ম কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়া "নোটারী পাবলিক" নামে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া যান।

গোপীনাথ বাবু ১৯০২ খৃঃ ২৫শে আগষ্ট পরলোক গমন করেন।

গোপীনাথ বাবুর পুত্রগণের নাম বাবু ব্রজনাথ চন্দ্র, বাবু রাধানাথ চন্দ্র ও বাবু গিরীন্দ্রনাথ চন্দ্র।

শ্রীনাথ বাবুর বংশধরগণ ত্বদীয় প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিকলাপ দুর্গোৎসব, মহালয়া, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বজায় রাখিয়াছেন।

———

স্বর্গীয় শ্রীনাথ চন্দ্র ।

চট্টগ্রাম মধুরাম চৌধুরীর বংশ।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামে ৺মধুরাম চৌধুরীর বংশ অতি প্রাচীন কাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। এই কায়স্থ বংশের আদি পুরুষের নাম ৺তিলকচাঁদ রায় চৌধুরী। তিনি বগুড়া হইতে চট্টগ্রাম আসিয়াছিলেন। শিকারপুর গ্রামে এখনও তাহার নির্ম্মিত মন্দির, পুষ্করিণী প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। এই প্রাচীন মন্দির প্রায় ৪০০ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহাতে কূর্ম্মচক্র নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিলকচাঁদের ছয় পুত্র ছিল, তন্মধ্যে ৺মধুরাম চৌধুরী স্বীয় বুদ্ধিবলে বহুসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারই নামে এই বংশ চট্টলে সুপরিচিত। এই বংশে ৺অভয়াচরণ চৌধুরী, ৺কাশীমোহন চৌধুরী, ৺রামকুমার চৌধুরী (সরকার) ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী, ৺বৈদ্যনাথ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত উমাচরণ চৌধুরী পেন্সনপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার ও শ্রীযুত রামকালী চৌধুরী ও শ্রীযুত রামকুমার চৌধুরী বিশিষ্ট ব্যক্তি। ৺অভয়াচরণ চৌধুরী মহাশয় চট্টগ্রামে স্বনামখ্যাত জমিদার ও প্রধান ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত। তিনি দারিদ্র্যের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া চট্টলে প্রধান ব্যক্তি রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ৺অভয়াচরণ চৌধুরী মহাশয় ১২৭৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে ২৬শে আষাঢ় শণিবার প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় ৫৮ বৎসর বয়সে তিনি প্রায় ১২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি ১টী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন এবং ৫টী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়াছিলেন।

তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। শ্রীযুত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে ভূমিদান পূর্ব্বক বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। তিনি একাগ্নি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া চট্টলের পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরিতৃপ্তরূপে আহার করাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পাকা দ্বিতল বাটীর সম্মুখে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই মন্দিরের সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গনে প্রতিবৎসর ৺শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এবং ভৃত্যগণকে প্রায় চারি সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি শিকারপুর ইংরেজি বিদ্যালয়ে আংশিক অর্থ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। ৺অভয়াচরণ চৌধুরী মহাশয়ের দুই পত্নী এখনও বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার চারি পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল চৌধুরী বিশেষ দক্ষতার সহিত ব্যবসায় ও জমিদারি কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ৺অভয়াচরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মুক্তকেশীর সহিত চট্টলের সুপ্রসিদ্ধ লালা চাঁদ রায়ের বংশধর ৺অপর্ণাচরণ চৌধুরীর বিবাহ হয়। তাঁহারই সাহায্যে ৺অপর্ণাচরণ চৌধুরী মহাশয় বহুলক্ষ টাকার অধিকারী হইয়া ছিলেন। দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারীকে ৺ক্ষীরোদচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেনকে বিবাহ প্রদান করেন। তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী প্রমদাবালার সহিত নয়াপাড়া গ্রাম নিবাসী মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের বংশের প্রাণকৃষ্ণ সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেনের বিবাহ হয়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চৌধুরী তাঁহার ভগ্নিপতি ৺অপর্ণাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একত্র হইয়া ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন এবং ভূসম্পত্তিও

শ্রীযুত নগেন্দ্র লাল চৌধুরী, শ্রীযুত সুরেন্দ্র লাল চৌধুরী

বৃদ্ধি করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার নাবালক ভ্রাতাগণকে যথারীতি বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করেন। তিনি তাহার স্বর্গত পিতৃদেবের সদগতির জন্য দানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পাদন করেন। সেই শ্রাদ্ধোপলক্ষে নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, নোয়াখালী ও কুমিল্লার বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং চট্টলের সমস্ত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি তাঁহার পিতৃদেবের আজ্ঞানুসারে পিতামহীর শ্মশানে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শিব প্রতিষ্ঠা করেন। নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার ভ্রাতাগণের উদ্যোগে শিকারপুর গ্রামের রাস্তার উন্নতি সাধিত হয়। এমন কি এক্ষণে উক্ত রাস্তা দিয়া ঘোড়ারগাড়ী পর্য্যন্ত অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে। তাঁহারা চেষ্টা করিয়াই শিকারপুর গ্রামে পোষ্টাফিস আনয়ন করেন। এক্ষণে উক্ত পোষ্টাফিসের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা গ্রামবাসীগণের বহুদিনের অসুবিধা দুরীভূত হইয়াছে। শিকারপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে তাঁহারা বহু টাকা দান করিয়াছেন। ফতেয়াবাদ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, কধুরখিল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, সর্ত্তা মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়, সারোয়াতল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া ইস্‌লাম হোষ্টেল প্রভৃতিতে সাহায্যকল্পে তাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এবং চট্টগ্রামের জননায়ক ৺যাত্রামোহন সেন প্রমুখ বহুব্যক্তি যখন তাঁহাদের নিকট জাতীয় শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অর্থ সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন তখন তাঁহারা অহাদের প্রার্থিত অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা "যাত্রামোহন হল" নির্ম্মাণ কল্পে ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহারা চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটী প্রথম জলের কলের প্রতিষ্ঠার সময় এককালীন ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা our day উপলক্ষে ১০০৲ ও Ambulance corpse এ ২০০৲ দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজবাটীর

অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাটীর সম্মুখে তাঁহাদের পিতৃদেবের নামে একটী হাট বসাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। তাঁহারা নিজগ্রামের তিনটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়াছেন এবং একটী দীর্ঘিকা খননের জন্য অনেক জমি খরিদ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ৺তিলক চাঁদ রায় চৌধুরীর প্রাচীন মন্দির সংস্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের পিতৃদেব ৺অভয়াচরণ চৌধুরী মহাশয়ের চট্টগ্রাম, আকিয়াব, কলিকাতা, রেঙ্গুন, ভোলা, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে কারবার ছিল। নগেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ ঐ সমস্ত কারবারের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহারা আকিয়াবের অন্তর্গত ভুষিদংএ ৪০০ চারিশত দ্রোণ পরিমিত ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। এই ভূসম্পত্তি কোয়াইনদং কুজ নামে পরিচিত। আকিয়াব সহরে তাঁহাদের ১৭ খান পাকাবাড়ী আছে এবং চট্টগ্রাম সহরে ১১ খান পাকাবাড়ী বর্ত্তমান রহিয়াছে। সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ তীর্থে তাঁহাদের একটী বাড়ী আছে। চট্টগ্রামে তাঁহাদের ৪৩ খান তরফ ও ১৫০ খান লাখেরাজ বাহালী ও বাজেয়াপ্তি তালুক আছে এবং ২৩ খান নয়াবাদ মহাল আছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চৌধুরী মহাশয় শিকারপুরের সুপ্রসিদ্ধ লালা বংশের শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন চৌধুরীর প্রথমাকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল চৌধুরী পটীয়া থানার অন্তর্গত ডেঙ্গাপাড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ ওয়াদ্দাদার বংশের ৺গিরিশচন্দ্র ওয়াদ্দাদারের তৃতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী নয়াপাড়া গ্রামের মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের বংশের শ্রীযুক্ত রামকমল সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার এবং কেলিসহর গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ কেদার বংশের শ্রীযুক্ত শশী কুমার

চৌধুরীর প্রথমা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল চৌধুরী কোয়েপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ রাজারাম বংশের ৺অন্নদাচরণ সেনের প্রথমা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। নগেন্দ্র বাবুর প্রথমা কন্যার সহিত কধুরখিল গ্রামের প্রসিদ্ধ সবজজ ৺অভয়াচরণ চৌধুরীর বংশের ৺গিরিশ চন্দ্র চৌধুরীর প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চৌধুরী বি, এ মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় কন্যাকে রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল দত্তের সহিত বিবাহ প্রদান করিয়াছেন।

নগেন্দ্র বাবুর মাতাঠাকুরাণী কাশীশ্বরী ১৩২১ সাল ৬ই মাঘ এবং উঁহার বিমাতা দিগম্বরী ১৩২৬ সাল ২৩ ফাল্গুন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

বংশ-তালিকা।

তিলকচাঁদ রায় চৌধুরী
|
মধুরাম চৌধুরী
|
ঘনশ্যাম চৌধুরী
|
রুদ্রনারায়ণ চৌধুরী
|
ভবানীচরণ চৌধুরী
|
ফকিরচাঁদ চৌধুরী
|

অভয়াচরণ চৌধুরী

- নগেন্দ্রলাল চৌধুরী
  - দুর্গাপদ
  - শিবপদ
  - অনিল
- সুরেন্দ্রলাল
  - কালীপদ
- যোগেন্দ্রলাল
  - অমূল্যবিকাশ
- হেমেন্দ্রলাল

৺রাম নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

বহুকাল পূর্ব্বে বরিশাল জেলার অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ বাকলা হইতে একজন অতি তেজস্বী, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ উলায় কোন ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আসিয়া তথায় বাস করেন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণনগরে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করতঃ প্রায়ই ঐ স্থানে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার নাম ৺রুদ্রদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি ফুলের মুকুটী, রাজ বল্লভ ঠাকুরের সন্তান, স্বভাব কুলীন। কৃষ্ণনগর, উলা, শান্তিপুর কুমারহট্ট প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মহারাজা-ধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সমসাময়িক। মহারাজ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন, কিন্তু তাহা সত্বেও তিনি কুলীন বলিয়া মহারাজের গৃহে কোন দিন অন্ন গ্রহণ করিতেন না। মহারাজ রুদ্রদেবের কোন এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, ফলে রুদ্রদেব অন্ন ত্যাগ করিয়া ফল মূল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য, তদবধি জীবনের শেষ পর্য্যন্তও তিনি অন্ন গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তদীয় পুত্র ৺ব্রজবল্লভ মুখোপাধ্যায় কুল ভঙ্গ করেন। ব্রজবল্লভের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী ক্ষেমঙ্করী দেবীও তাঁহার সহমৃতা হন। ব্রজবল্লভের পুত্র কালীদাস, কালীদাসের পুত্র ৺রামনারায়ণ। ১১৯৭ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। রাম নারায়ণ শৈশব হইতেই হরিভক্তি পরায়ণতার বিশেষ পরিচয় দিতে থাকেন। পরিণত বয়সে তিনি এতাদৃশ ভগবদ্ভক্ত হইয়া উঠেন যে, তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে উলা গ্রাম ত্যাগ-

করতঃ ২৪ পরগণার অধীন হালিসহর গ্রামে গঙ্গার ধারে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। ক্রমে কলিকাতা অঞ্চলে একজন ভক্ত বলিয়া তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। হালিসহরে কবিরাজ ও পণ্ডিতের অভাব ছিল না, তাঁহারা একে একে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল—মদ্যপায়ী তাঁহার উপদেশে মদ্যত্যাগ করিয়াছিল।

তাঁহার বাটীতে নিত্য বিস্তর সন্ন্যাসী, মহন্ত আগমন করিয়া আহার করিয়া যাইতেন। "নামে রুচি জীবে দয়াই" তাঁহার ব্রত ছিল। ধর্ম্ম আলোচনা ভিন্ন তাঁহার আর কোন কাজ ছিল না। এখনও লোকে তাঁহার চণ্ডী মণ্ডপের ধার দিয়া যাইবার সময় ভক্তিভরে তাঁহার উদ্দেশ্তে প্রণাম করিয়া যায়।

তিনি বারাসতের নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামের ৺শ্রীহরি চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার নামে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত হরি গোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি ১২৫৭ সালের শিবচতুর্দ্দশীর পূর্ব্বদিনে গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত হরি গোপাল মুখোপাধ্যায়ের নাম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি উপযুক্ত পিতার যোগ্য সন্তান। ৺কাশীধামে তিনি দুইটী শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বহুকাল কৃতীত্বের সহিত পুলিশ বিভাগে কার্য্য করিয়া উত্তরকালে অস্থায়ী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি (pension) প্রাপ্ত হইতেছেন। হরিগোপাল বাবু বর্ত্তমানে হালিসহরের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্। শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅরবিন্দ নাথ মুখোপাধ্যায় নামক হরিগোপাল বাবুর দুইটী পুত্র

শ্রীযুত হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়

জীবিত। ইহারা দুই ভ্রাতাই পিতৃ পিতামহের ন্যায় ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার তৃতীয় পুত্র ডাক্তার রতি নাথ মুখোপাধ্যায় হালিসহরে চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী, অমায়িক, ও প্রতিভাশালী ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আপামর সাধারণে শোক প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাঁহার অভাবে হালিসহর অঞ্চলেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

জীবিত। ইহারা দুই ভ্রাতাই পিতৃ পিতামহের ন্যায় ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার তৃতীয় পুত্র ডাক্তার রতি নাথ মুখোপাধ্যায় হালিসহরে চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী, অমায়িক, ও প্রতিভাশালী ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আপামর সাধারণে শোক প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাঁহার অভাবে হালিসহর অঞ্চলেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

তাড়াশ জমিদার বংশ।

পাবনা জেলার অন্তর্গত তাড়াশের জমিদার বংশ অতি প্রাচীন বংশ বলিয়া বঙ্গের আভিজাত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চাসন পাইয়া আসিতেছে। প্রাচীন খোদিত লিপি প্রভৃতি পাঠে জানা যায় যে এই বংশ তিন শতাব্দীর উপরও প্রাচীন এবং খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এ বংশ অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ছিল।

তাড়াশ জমীদার বংশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, এই গ্রামের দশ মাইল পূর্ব্বদিকে দেবচড়িয়া নামক একটী পল্লীতে নারায়ণ দেব চৌধুরী (অন্যনাম বাসুদেব তালুকদার) নামক জনৈক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি নবাব সরকারে অতি যোগ্যতার সহিত কার্য্য করায় নবাব ইসলাম্ খাঁ তাঁহাকে "চৌধুরাই তাড়াশ" নামক সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। তখন পরগণা কাটারমহল্লা রাজসাহী সাতৈলের রাজার জমীদারী ছিল। তদন্তর্গত দুইশত মৌজা লইয়া এই "চৌধুরাই তাড়াশ" নামক জমিদারীর সৃষ্টি হয়।

বলরাম রায়।

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের দেববংশে বলরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান জেলা পাবনা ও পরগণা কাটার মহল্লার অন্তর্গত তাড়াশ (১) গ্রামে ইহার বাসস্থান—বলরাম ও তাঁহার জ্ঞাতিবংশ তাড়াশের জমিদার বলিয়া পরিচিত।

---

(১) প্রসিদ্ধ চলন বিলের একপার্শ্বে তাড়াশ গ্রাম। ইহার পূর্ব্ব দিকে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ পূর্ণ নিমগাছি নামক স্থানে বিলুপ্ত করোতোয়া তটে সংস্থাপিত

শুকদেব পুত্র বাসুদেব তালুকদার।
তাহার বংশের কথা শুনহ বিস্তার॥
ধনবান্ কীর্ত্তিমন্ত বিষয় ব্যাপারে।
তার পুত্র চাকুরী কৈলা নবাব সরকারে॥
সেই বংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়।"

বাসুদেব কর্ত্তৃক তাড়াসের ভদ্রাসন নির্ম্মিত হয়। বাসুদেব পিতার নিকট উক্ত অনাদি বাণলিঙ্গের মহিমা শ্রবণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ দেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উক্ত বাণলিঙ্গ চড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বাসুদেব রাজকার্য্য বশতঃ ঢাকায় যান। উক্ত বাণ-লিঙ্গকে প্রণাম করিবার জন্য তাড়াশে আসেন ; এখানে একস্থলে ভেককে সর্প ধরিতে দেখিয়া তথায় ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (২)

নারায়ণ দেব ঢাকায় নবাব সরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত যে সকল অট্টালিকা ও পুষ্করিণীর পরিচয় পাওয়া যায়, দেব প্রতিষ্ঠা এবং অতিথি সেবাদি নিত্যকর্ম্মের যে যশঃ-সৌরব আছে সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহার সম্পত্তি যে নিতান্ত সামান্য ছিল না তাহা প্রতীয়মান হয়। নারায়ণ দেব উক্ত বাণলিঙ্গের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বাণলিঙ্গটি এ প্রদেশে অনাদি লিঙ্গ বলিয়াই খ্যাত এবং

নিমগাছিকে সাধারণে বিরাটের দক্ষিণ গো গৃহ নামে অভিহিত করেন। তথায় জয়-সাগর নামে সুদীর্ঘ জলাশয় ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

(১) তাড়াশের জমীদার বাটীর যে স্থান "মাঁঝের বাটী" নামে কথিত হয় সেই স্থানে ভেককর্ত্তৃক সর্প ধৃত হওয়ায় বাসুদেব কর্ত্তৃক তথায় মনসারবেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বেদী অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

তাহা কপিলেশ্বর নামে পরিচিত। ঐ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বহির্দ্দি-কের শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোক অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে :—

"শোকে বাজি শরাঙ্গুগেন্দু গণিতে শ্রীরাম দেবাৎপরঃ।
শ্রীনারায়ণ দেব এব সুকৃতিঃ স্বশ্লোক লোকোত্তরম্॥
প্রাসাদং শ্রুতি দৃষ্টিতো নিরুপমং ভক্ত্যা দদৌ শম্ভবে।
মাতুঃ স্বর্গ-পুর প্রয়াণ করণং সোপান মেকং ভুবি॥
ইতি শুভমস্তু শকাব্দ ১৫৫৭ শ্রীগৌরাঙ্গো জয়তি।"

বাসুদেবের নামান্তর নারায়ণ দেব। শ্রীরাম দেব তাঁহার পিতা ছিলেন। বাসুদেব রায়ের প্রথম পুত্র জয় কৃষ্ণ ও দ্বিতীয় পুত্র রামনাথ। ইঁহারা দুই ভ্রাতা ঢাকার নবাব সরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই বিষয় কর্ম্ম হইতেই "রায় চৌধুরী" উপাধি হয়। বাসুদেবের কার্য্যে নবাব অতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনিই প্রথমে "চৌধুরাই তাড়াশ" নামক সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। পরগণে কাটারমহল্লা তৎকালে সাতৈলের রাজার জমীদারী ছিল। তদন্তর্গত দুইশতেরও অধিক মৌজা লইয়া এই চৌধুরাই তাড়াশ নামক সম্পত্তির সৃষ্টি হয়। চৌধুরাই তাড়াশের অধিকাংশ মৌজাই তাড়াশের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী।

জয়কৃষ্ণ রায়ের পুত্র বলরাম। ইব্রাহিম খাঁ যে সময় নবাব সেই সময়ে সম্রাট পৌত্র আজিম অস্‌মান বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আগমন করেন; বলরাম রায় এই সুবাদারের দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন। এ সময়ে রঘুনন্দনের আধিপত্যের সূত্রপাত। মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপিত হইলে কানুনগো দপ্তরে তাঁহার একাধিপত্য ও অতিবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছিল। পুঠিয়া রাজসরকারে কার্য্যকালে তিনি সাতৈলের জমীদারির বিষয় বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, তজ্জন্য সাতৈলের জমীদারীর প্রতিই তাঁহার প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হয়। সাতৈলের তদানীন্তন জমীদার রাণী সর্ব্বাণী

বাধাকুণ্ডেব মন্দিব

বৃন্দাবনের প্রাসাদ
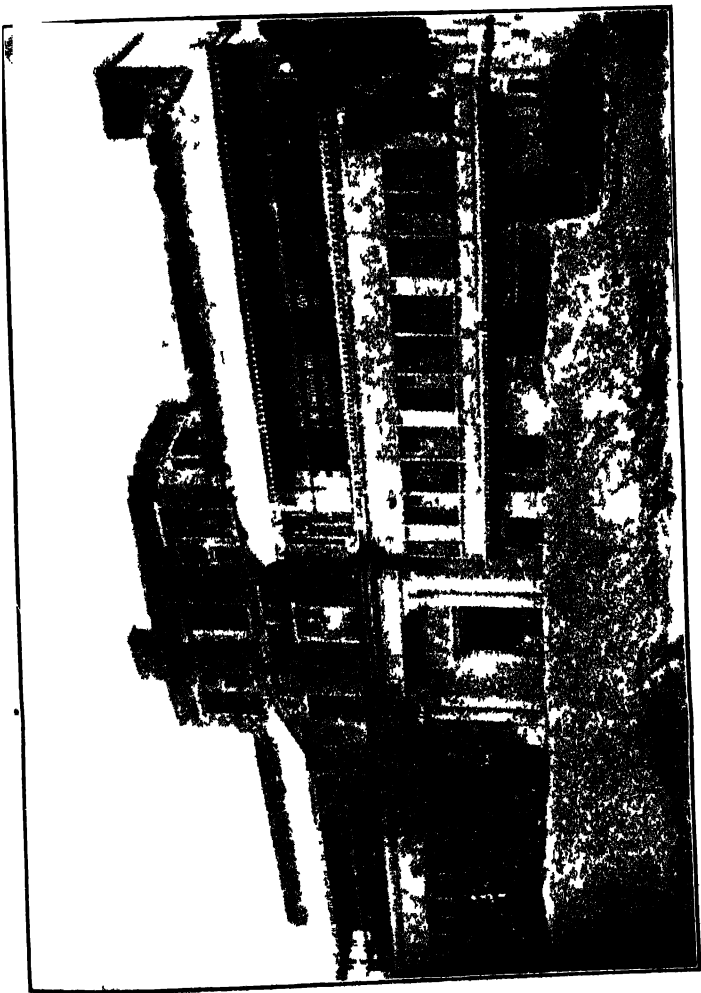
অতি বৃদ্ধা ও রাজকার্য্যে অসমর্থা এবং তাঁহার জমীদারীর কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাব থাকায় তিনিই তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করেন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সুদৃষ্টি রঘুনন্দনের প্রতি নিপতিত হইয়াছিল তজ্জন্য, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কেহ সাহসী হন নাই

সাতৈল জমীদারীর সুশৃঙ্খলায় কার্য্য প্রণালীর জন্য অনেক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইয়াছিল। তাড়াশ গ্রাম সাতৈল হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। জয়কৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্রগণ পৈত্রিক সম্পত্তি ও নবাব সরকারের বিষয় কর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। রঘুনন্দন সাতৈল জমীদারী পরিচালনে উপযুক্ত ভাবিয়া বলরাম রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম রাম রায়কে স্থির করেন। বলরাম নবাব সরকারে ও রাম রাম রায় বাটীতে থাকিয়া পৈত্রিক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। পৈত্রিক বিষয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান হেতু অনেকে তাঁহার জমীদারী পরিচালনের পরিচয় পাইয়াছিলেন।

রঘুনন্দন যে সময় রাম রামকে স্বীয় ভ্রাতা রাজা রামজীবনের দেওয়ানী পদে নিয়োগার্থ নির্ব্বাচন করেন তৎকালে বলরাম রায়ের ঢাকায় অবস্থান হেতু রাম রাম জ্যেষ্ঠের মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ তৎকালে সাতৈল প্রভৃতি জমীদারীর পরিণাম দেখিয়া রামরাম কেন এদেশের অনেক জমীদারই ভীত হইয়াছিলেন। তিনি ঢাকা হইতেই স্বীয় ভ্রাতা রামজীবন বা রঘুনন্দনের দেওয়ানী কার্য্য গ্রহণের বিষয় শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে ম্রিয়মান হইয়া ভ্রাতার মুখাবলোকন করিবেন না বলিয়া পত্র লিখেন।

বলরাম ভ্রাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কিছুদিন বাটীতে আগমন করেন নাই। তিনি অতি মাতৃভক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া

বাটীতে আগমন না করায় মাতৃবিয়োগের সময় জননীর চরণ দর্শন করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধ অতি সমারোহের সহিত করিতে হইবে এবং সেই কার্য্যের ব্যয় সংসার হইতে বা ভ্রাতা কর্তৃক সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখেন যে তুমি সামান্য জমিদারের কর্ম্ম কর, একটী বৃহৎ দানসাগর শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা তোমার সাধ্য হইবে না, অতএব সামান্য মত একটী শ্রাদ্ধের আয়োজন করিবে। আমি বাটীতে উপস্থিত হইয়া যথাকালে দান সাগরের আয়োজন করিব।

রাজা রামজীবন এই পত্রের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেওয়ান মাতৃশ্রাদ্ধে দান সাগরের আয়োজনে অসমর্থ এ কথা তাঁহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়। দেওয়ানের কার্য্য দক্ষতায় জমিদারী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে জানিয়া রামজীবন তাঁহার উপর যথেষ্ট প্রীত ছিলেন। এখন তিনি আদেশ প্রচার করিলেন যে নিরূপিত দিবসে দেওয়ানের মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর ব্যাপারের আয়োজন করিতে হইবে। রাজার অমাত্যগণ শ্রাদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, অত্যল্প কাল মধ্যেই বিবিধ সামগ্রীতে তাড়াশ-ভবন পূর্ণ হইয়াছিল।

বলরাম মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য একলক্ষ টাকা ব্যয় করার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি একটী নীল বৃষ মাত্র ও নগদ অর্থ সঙ্গে করিয়া শ্রাদ্ধের কয়েক দিবস পূর্ব্বে বাটীতে উপনীত হয়েন। তৎকালে রাজা-রামজীবনের জমিদারীর প্রত্যেক গ্রাম হইতে দ্রব্যাদি সহ বহুতর নৌকা তাড়াশে আসিয়াছিল এবং সমস্ত দ্রব্য রাখিবার স্থান সংকুলান না হওয়ায় অধিকাংশ দ্রব্য নৌকাতেই ছিল।

বলরাম রায় দান সাগর শ্রাদ্ধের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন "দান সাগরের বিপুল আয়োজন হইয়াছে, এ সমস্তই

রাধাবিনোদের মন্দির (বৃন্দাবন)
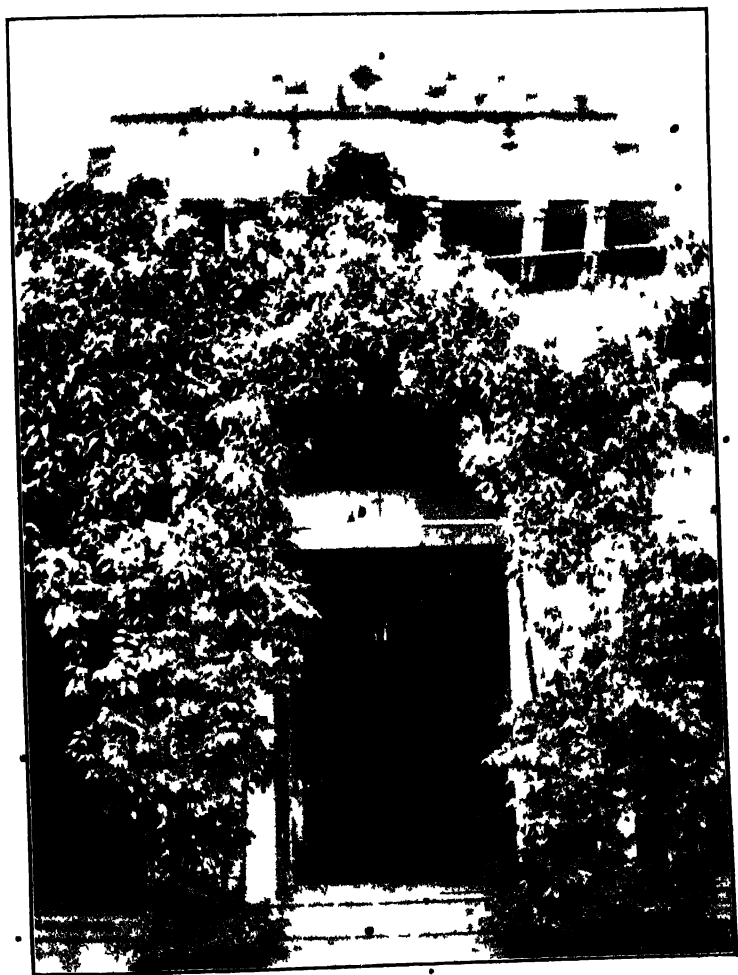
তোমার কর্ম্ম, অভাবের মধ্যে একটী নীল বৃষ দেখিতেছি, মাতৃশ্রাদ্ধে কেবল এই সামগ্রী সংগ্রহ করাই আমার অদৃষ্টে ছিল"। বলরাম রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ ত্বদীয় কনিষ্ঠ রাম রায় কর্ত্তৃক রাজা রামজীবনের সাহায্যে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

বলরাম রায় মাতৃভক্তির নিদর্শনস্বরূপ জননীর স্বর্গসুখ কামনায় দান সাগর শ্রাদ্ধে যে লক্ষ টাকা ব্যয় করা সংকল্প করিয়াছিলেন ঐ টাকা মাতৃভক্তির স্মৃতিস্থাপনার্থ ব্যয় করাই উচিত মনে করেন। এই অর্থের দ্বারা তিনি রসিক রায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও "পুরাতন কুঞ্জবন" নামক দিঘী খনন, পুষ্করিণী খনন, "দোলমঞ্চ" নামক মন্দির নির্ম্মাণ, কপিলেশ্বরের মন্দির সংস্কার এবং কাশী, গয়া ও বৃন্দাবন ধামে ছত্র স্থাপন করেন।

কপিলেশ্বরের মন্দিরে পুর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের নিম্নে এই শ্লোকটি বিদ্যমান আছে :—

"কালাগ্নিতর্কেন্দু মিতে শকাব্দে
বরং শিবস্যালায় মিষ্টকাষ্ঠৈঃ"।
জীর্ণং স্ফুটঞ্চোদ্ধরতেত্ত ভক্ত্যা
তস্মিন্ প্রবীণো বলরাম দাসঃ।"

কাল, অগ্নি, তর্ক, ইন্দু শব্দ দ্বারা ১৬৩৬ শকাব্দ (১৭১৪ খৃঃ অঃ) উপলব্ধি হইতেছে। বলরাম রায় মাতৃ-বিয়োগের পর নিজ-ভবনে রসিক রায় নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। উক্ত বিগ্রহের পাদপদ্মে বলরাম রায়ের নাম লিখিত আছে। বলরাম উক্ত বিগ্রহের জন্য ত্রিতল দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন তাহাতে নিম্নোক্ত শ্লোক আছেঃ—

"শাকে শাকে ভ্রবেদতর্কেন্দুমিতে প্রসাদমুত্তমম্।
শ্রীকৃষ্ণায় দদৌ শ্রীল বলরামো মহাত্মনে ॥"

১৬৪০ শকাব্দে শ্রীরসিক রায় বিগ্রহের শ্রীমন্দির রাম রাম রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। শ্রীমন্দিরটী দ্বিতল গৃহ! তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে :—

"রস বেদ ঋতু ক্ষৌণী মিত শাকে মহাত্মনা।
শ্রীকৃষ্ণায় দদৌ শ্রীল বলরাম গৃহংশুভং॥"

রস, বেদ, ঋতু, ক্ষৌণী শব্দ ১৬৪৬ শকাব্দ (১৭২৪ খৃষ্টাব্দ) হইতেছে। বলরাম রায় পরগণে বড়বাজু হুসেম সাহীর হিস্যা জমীদারী অর্জ্জন করেন। মুর্শিদকুলির পর সুজা খাঁ যে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন তাহার কাগজপত্র মধ্যে বলরামের পুত্র রঘুরাম ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদেব প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। ১১৪১ সালের পূর্ব্বেই বলরাম রায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রামরাম রায় অতি পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার যত্নে এই প্রদেশের অনেক লোক ও কতিপয় আত্মীয় স্বজন নবাব সরকারে বিষয় কর্ম্ম লাভ করেন। দেবসেবা, অতিথি সেবা প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যে তাঁহার অতিশয় আস্থা ছিল। এতদ্দেশে তৎকালে ঐ সকল কার্য্যই একমাত্র সদনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। বলরাম রায়ের পরলোক গমনের কিছুদিন পরও ত্বদীয় পুত্র এবং রামদেব ও রাম রাম রায়ের পুত্রগণ একত্র ছিলেন; পরে পৃথক হইয়াছিলেন। বলরামের বংশ বড় তরফ রাম দেবের বংশ মধ্যম তরফ ও রাম রাম রায়ের বংশ ছোটতরফ নামে পরিচিত।

রাম রাম রায়ের উদারতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্বন্ধে বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহার লোকজন ভাল আহার করিত, কিন্তু নিজে কখনও ভাল আহারের জন্য লোলুপ ছিলেন না। তিনি যে সময় রাজা রামজীবনের দেওয়ান, তৎকালে তাঁহার স্বগ্রামবাসী একব্যক্তি মুন্সী ছিলেন। তিনি রাম রাম রায়কে অপদস্থ করিবার জন্য অনেক কাগজের মধ্যে একখানি

স্বর্গীয় রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুর।

তালুক দানপত্র সহি করিয়া লয়েন। "তিনি বরাত আসমান" কথা লিখিয়া দেন। রাজা রামজীবন মুন্সীর নিকট দেওয়ানের দানের কথা শুনিয়া তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন, কিন্তু পরে প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্তোষ লাভ করেন।

রাম রাম নাটোর জমীদারীর সৃষ্টি হইতে রাজা রামজীবনের পরলোক গমনের পরও অত্যল্প কাল দেওয়ানী করেন। আধুনিক সময়ে স্বর্গীয় বনওয়ারি লাল রায় ও রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুর তাড়াশ জমীদার বংশে স্ব স্ব কর্ম্মগুণে খিখ্যাত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় বনওয়ারি লাল রায় স্বাধীনচেতা, উদার চরিত্র ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি সংসারে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরোধী ছিলেন। কোনও পরাক্রমশালী লোক কোন দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিলে তিনি দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পরাক্রমশালীর হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতেন। তাঁহার যৌবনকালে উত্তরবঙ্গের বহু মুসলমান প্রজা বিদ্রোহীভাবাপন্ন হইয়া হিন্দু জমীদারগণকে বিপন্ন করিয়াছিল; এমন কি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতেও বিরত হয় নাই। স্বর্গীয় বনওয়ারিলাল রায় মহাশয় এই সময় উক্ত মুসলমান বিদ্রোহ-দমনে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সিরাজগঞ্জের তদানীন্তন সবডিভিসনাল অফিসার (যিনি পরে কমিশনার হইয়াছিলেন) মিঃ পি, নোলান তাঁহার পরম বন্ধু হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় বনওয়ারি লাল রায় শীকারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তিনি বহু ব্যাঘ্র ও বন্য শূকর শীকার করিয়া তাঁহার প্রজাগণের হিতসাধন করিয়াছিলেন।

রাজর্ষি বনমালী ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাড়াশ জমিদার বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বনওয়ারি লাল রায় তাঁহাকে পোষ্য গ্রহণ করেন। তিনি পাবনা জিলা স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে অধ্যয়ন

করিবার সময় ১৮৮২ সালে তাঁহার পিতা বনওয়ারি লালের মৃত্যু হয়। বাধ্য হইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন পরিত্যাগ করতঃ সেই সময় হইতে স্বীয় জমিদারীর কার্য্য তাঁহাকে তত্ত্বধান করিতে হয়। সংসারে বৈষয়িক বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও ধর্ম্ম কর্ম্মে আন্তরিকতার একত্র সম্মিলন নিতান্ত বিরল; কিন্তু তিনি যেমন পরম ধার্ম্মিক ছিলেন তেমনই বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি ১০।১২ বৎসরের মধ্যে তাঁহার জমীদারীর আয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। অথচ জমীদারীর মধ্যে পুষ্করিণী, কূপখনন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, হাট বাজার চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং দুঃস্থ প্রজাগণকে বিনাসুদে কর্জ্জদাদন দিয়া প্রজাগণের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আন্তরিকতা ছিল। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান হন, পরে বৈষ্ণবধর্ম্মে দেহ মন ও আত্মসমর্পণ করেন। ৩২ বৎসর বয়সে তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। কর্ম্মজীবনে দেশের সর্ব্ববিধ হিতকর অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষ ঐকান্তিকতার সহিত যোগদান করিতেন। তিনি পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ, টাউন হল, ইলিয়ট টেক্‌নিকাল স্কুল, সিরাজগঞ্জ বি এল স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ, শ্যামকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার, ৺জগন্নাথ দেবের মন্দির সংস্কার ও সাময়িক দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে এবং সর্ব্ব প্রকার সাধারণ হিতকরকার্য্যে অকাতরে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন; নবদ্বীপ সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া, বনওয়ারিনগরে হাইস্কুল ও তাঁহার জমীদারীর প্রত্যেক হেড্ কোয়ার্টারে এম-ই স্কুল স্থাপন করিয়া তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি জমীদারীর প্রত্যেক হেড কোয়ার্টারে দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু ছাত্রকে শিক্ষার জন্য মাসিক ও এককালীন অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন এবং

বিবস্ত্রকে বস্ত্রদান করিতেন। গুণগ্রাহী গভর্ণমেণ্ট তাঁহার অসামান্য বদান্যতা ও লোক হিতৈষণার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি পাবনা জেলার প্রধানতম জমীদার ও বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি বার্ষিক ৭০ হাজার টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি কুলদেবতার সেবার জন্য দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার অহর্নিশি আরাধ্য দেবতা ছিলেন। তাঁহাকে নবদ্বীপের বৈষ্ণব মণ্ডলী "রাজর্ষি" উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। তাঁহার সহিত যাঁহার একদিনেরও আলাপ পরিচয় হইয়াছে তিনি তাঁহাকে প্রকৃতই "রাজর্ষি" জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে বহু অর্থব্যয় করিয়া সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় কুল দেবতা স্থাপন করিয়া দেবসেবা করিতে থাকেন। পরে শ্রীধাম বৃন্দাবনে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীরাধা বিনোদ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া সেবাব্রতে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯১৪ সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখে শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা চিন্তা করিতে করিতে ও প্রলাপে লীলা কাহিনী বলিতে বলিতে রজঃ প্রাপ্ত হন।

গোয়ালিয়রের মহারাজার ভ্রাতার গুরুদেব পরম ভক্ত সিদ্ধ হরিচরণ গোস্বামী তৎকালে শ্রীকুণ্ড সন্নিকটস্থ কুসুম সরোবর তীরে আশ্রমে নিদ্রা যাইতেছিলেন, রাজর্ষির রজঃ প্রাপ্তি সময়ে তিনি রাজর্ষির গলার শব্দ পাইয়া দরজার অর্গল উন্মুক্ত করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের কয়েক জন অনাসক্ত বৈষ্ণবও ঐরূপ শব্দ পাইয়া জাগ্রত হইয়াছিল; তজ্জন্য শ্যামকুণ্ডতীরে রাজর্ষির অস্থি সংস্থাপিত হইয়া সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

সরোজ মোহিণী

রাজর্ষি বনমালীর সহধর্ম্মিণী।

সরোজমোহিনী কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনে রাজর্ষির সহকারী ছিলেন। অতিথি সেবা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম। এই সেবাব্রত তিনি আজীবন সহৃদয়তার সহিত প্রতিপালন করিয়াছেন। স্বজন, কুটুম্ব অতিথি, আশ্রিত, প্রতিপাল্য প্রত্যেককে পরিতোষ করিয়া আহার করাইয়া সকলের সচ্ছন্দতার অনুসন্ধান করিয়া তিনি তৃতীয় প্রহরে একমুষ্ঠি প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। নিজের সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি তাঁহার একবারেই দৃষ্টি ছিল না। কুল-দেবতার সেবার কার্য্য তাঁহার জীবনের মুখ্য ধর্ম্ম ছিল। তিনি আজীবন কুলদেবতার সেবা নিজ তত্ত্বাবধানে করাইয়াছেন এবং স্বয়ং স্বহস্তে সেবা সম্বন্ধীয় অনেক কার্য্যের ভার লইয়া সুশৃঙ্খলায় সমাধা করিতেন। তিনি মূর্ত্তিমতী দয়া ছিলেন; পরোপকার তাঁহার জীবনের দৈনিক অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। ১৩২৬ সালের ১৩ই ভাদ্র তারিখে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরাধাবিনোদের ধ্যান করিতে করিতে তিনিও শ্রীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজর্ষি বনমালী রায় মহোদয় দুইটী পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ কুমার ক্ষিতীশ ভূষণ রায় স্বনামেই পরিচিত; কনিষ্ঠ কুমার রাধিকা ভূষণ রায় শ্রীধাম প্রাপ্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক পুণ্যধাম বৃন্দাবনেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।

কুমার ক্ষিতীশ ভূষণ রায় ১৮৮৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। রাজর্ষি বনমালী তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা দিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি সর্ব্ব বিষয়েই পিতার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বিশাল জমিদারীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তিনিও

কুমার রাধিকাপ্রসন্ন রায়.

পিতার ন্যায় বদান্যবর ও দানশীল। ক্ষিতীষভূষণ ইতঃপূর্ব্বে দেশে শিক্ষা বিস্তারকল্পে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন। যুদ্ধ ঋণ ভাণ্ডারে ২৫০০০.০৲ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন, লেডি কারমাইকেল যুদ্ধঋণ ভাণ্ডারেও অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া যুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে যে যে যুদ্ধে গিয়াছিল তাহাদিগকে করদায় হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন।

তাঁহার এই সৎকার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯২০ সালের নববর্ষের দিন "রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। পাবনায় কুমার ক্ষিতীশ ভূষণ সম্প্রতি স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর নামে জলের কল সংস্থাপন জন্য ৫০০০০৲ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

কুমার ক্ষিতীশ ভূষণের দুইটী পুত্র; জ্যেষ্ঠ রাখালদাস; অষ্টমবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স একবৎসর মাত্র।

কুমার রাধিকা ভূষণ রায়।

রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার রাধিকা ভূষণ রায় নানা সদগুণের অধিকারী। ইঁহারই সহায়তায় একযোগে কুমার ক্ষিতীশ ভূষণ নানা সৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। ইঁহাদের দুই ভ্রাতায় যেরূপ মিলন, সেরূপ ভ্রাতৃপ্রেম বঙ্গদেশে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। রাধিকা ভূষণ বিনয়ী, শিষ্টাচারী ও দয়াধর্ম্মপরায়ণ। তাঁহার দুইটী পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিনোদপদ; ত্রয়োদশ বর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গোবিন্দপদ।

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।